বৈষয়িক বাংলা

কলিকাতা, উত্তরবঙ্গ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিবার্ষিক স্নাতক
শ্রেণীর (বাণিজ্য) পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত

লেখকবৃন্দ :

অধ্যাপক **অবন্তীকুমার সান্যাল**

অধ্যাপক **হরশংকর ভট্টাচার্য**
,, **কালিপদ সিংহ**
,, **রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়**

অধ্যাপক **প্রতিভাকান্ত মৈত্র**
,, **সুব্রত চক্রবর্তী**
,, **গিরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

সম্পাদক

অধ্যাপক **সত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়**

উপাধ্যক্ষ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ (বাণিজ্য)

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

জুলাই—১৯৬৪

প্রকাশক
বি, চট্টোপাধ্যায়
চ্যাটার্জি পাব্‌লিশার্স
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর :
শ্রীভোলানাথ হাজ
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগা
কলিকাতা—৯

ভূমিকা

প্রতি বৎসর বাংলা বিষয়ে বি. কম. শ্রেণীর বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হইতেছেন। ইহার কারণ তাঁহাদের বাংলা ভাষা-জ্ঞানের অভাব নহে। বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিকে সুস্পষ্টভাবে বাংলাভাষায় প্রকাশ করার যে বিশেষ রীতি ও ধরন আছে সেই সম্পর্কে তাঁহাদের অজ্ঞতাই এই বিপর্যয়ের মূল। বৈষয়িক বাংলার পাঠ্যসূচীতে যে-সকল বিষয় নির্ধারিত হইয়াছে, উহারা কেবল বাংলাভাষার বিষয় নয়, অনেকটা বাণিজ্য, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ব্যবসায় সংক্রান্ত টেক্‌নিকাল বিষয়। এই বিষয়সমূহের প্রতি পরীক্ষার্থীর সামগ্রিক দৃষ্টি থাকে না বলিয়াই বোধহয় বৈষয়িক বাংলায় অকৃতকার্যতার পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইতেছে।

গত পনের বৎসর যাবৎ বাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যে আমার যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহার ভিত্তিতে আমি এই পুস্তকের সম্পাদনায় অগ্রসর হইয়াছি। বিভিন্ন বিষয়ের যে খ্যাতনামা অধ্যাপক-গণ এই পুস্তক রচনা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। বিশিষ্ট সাংবাদিক রাখালদাস চক্রবর্তী বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ
বাণিজ্য বিভাগ
কলিকাতা

সম্পাদক

বিষয় সূচী

১। প্রবন্ধ রচনা

বিষয়			পৃষ্ঠা

২। বৈষয়িক পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

৩। অনুবাদ

৪। বৈষয়িক পরিভাষা

‘প্রবন্ধ-রচনা’

প্রবন্ধ রচনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা

প্রবন্ধ ও তাহার শ্রেণীবিভাগ—সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, যাহা উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদির পর্যায়ভুক্ত নয়, যাহার বাহন গদ্য এবং মাধ্যম যুক্তি তর্ক, তাহাকেই প্রবন্ধ বলা চলে। আর, ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে হয় যে, গদ্যাশ্রয়ী ও যুক্তি-তর্ক-সমন্বিত বক্তব্য-বিষয়ের বাঁধুনিটি প্রকৃষ্ট ধরনের হইলেই তাহা প্রবন্ধের মর্যাদা লাভ করিবার যোগ্য।

প্রবন্ধ সাধারণত দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর প্রবন্ধে থাকে **বিষয়ীর প্রাধান্য**। এই শ্রেণীর প্রবন্ধগুলিই সাহিত্য-গুণ-সমন্বিত হইয়া থাকে এবং ইংরেজীতে ইহাদের বলা হয় Literary Essay। এখানে বক্তব্যবিষয়টিকে আচ্ছন্ন করিয়া লেখকের ব্যক্তিসত্তা বা personality-ই প্রধান হইয়া উঠে। আর, অন্যশ্রেণীর প্রবন্ধে থাকে **বিষয়ের প্রাধান্য**। এখানে বক্তব্য-বিষয়টিই লেখকের ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধকেই **বৈষয়িক প্রবন্ধ** নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। বৈষয়িক প্রবন্ধে বিষয়ের প্রাধান্য থাকিলেও ইহা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিসত্তা-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। একই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (perspective) হইতে গ্রহণ করিতে পারেন এবং বিভিন্ন রীতিতে উপস্থাপনা করিতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কোন বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং উহার উপস্থাপন-রীতির মধ্য দিয়া বৈষয়িক প্রবন্ধে ব্যক্তিসত্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়া থাকে।

বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটির দিকে দৃষ্টি দিলে উপরোক্ত বক্তব্যটি পরিস্ফুট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 'মানুষ বনাম যন্ত্র', 'নৈতিকবোধ বনাম ব্যবসায়বুদ্ধি', 'বিজ্ঞাপন-শিল্প' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুগুলিকে এমন দৃষ্টিভঙ্গি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং এমন উপস্থাপন-রীতি অনুসৃত হইয়াছে যাহার ফলে, বিষয়বস্তুর মর্যাদা রক্ষা করিয়াও উহাদের মধ্যে সাহিত্যগুণ সঞ্চার করা সম্ভবপর হইয়াছে। এই বিষয়বস্তুগুলিকে ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি হইতেও গ্রহণ করিতে পারেন এবং সে স্বাধীনতা তাহাদের আছে।

প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে উপরে যে-মন্তব্য করা হইল তাহা সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষার দিক হইতে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে ছাত্রদের কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরীক্ষায় 'বৈষয়িক বাংলা'র প্রশ্নপত্রে প্রবন্ধ সম্পর্কে, সাধারণত, যে-ধরনের প্রশ্ন আসিয়া থাকে, তাহাতে উহাদের নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা চলে—

(১) তত্ত্বধর্মী, (২) তথ্যধর্মী (৩) মিশ্রধর্মী (৪) সাম্প্রতিক ঘটনা বা বিষয়ধর্মী। বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি উপরোক্ত শ্রেণী-বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সংকলিত হইয়াছে।

(১) **তত্ত্বধর্মী প্রবন্ধ**—তত্ত্ব যেমন বিভিন্ন প্রকারের, তত্ত্বধর্মী প্রবন্ধও তেমনি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। তবে, বৈষয়িক বাংলার ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের পরিধি বহুলাংশে সীমাবদ্ধ। সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ের উপর তাঁহাদের কোন প্রশ্ন আসিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদের সম্ভাব্য প্রশ্নের পরিধি **অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক** তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরিধি সীমাবদ্ধ হইলেও প্রশ্ন যে বিচিত্র ধরনের হইতে পারে সে-কথা স্মরণ রাখিয়া ছাত্রদের আত্মপ্রস্তুতি কর্তব্য। সেই আত্মপ্রস্তুতির ব্যাপারে ছাত্রদের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই বর্তমান গ্রন্থে ওই জাতীয় প্রবন্ধের কিছু কিছু সংকলিত হইয়াছে। 'ঘাটতি ব্যয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন', 'বৈদেশিক মূলধন' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত। 'জাতি-সংঘের ভবিষ্যৎ', 'সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ', 'ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ', 'গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি রাজনৈতিক তত্ত্বভিত্তিক। আর, 'নৈতিকবোধ বনাম ব্যবসায়বুদ্ধি', 'বিজ্ঞাপন-শিল্প', 'ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি বাণিজ্যতত্ত্বভিত্তিক।

(২) **তথ্যধর্মী প্রবন্ধ**—তত্ত্বধর্মী প্রবন্ধ অপেক্ষা তথ্যধর্মী প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে উপস্থাপন-রীতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। নচেৎ, এই শ্রেণীর রচনা প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত না হইয়া নিছক তালিকার মর্যাদা লাভ করিবে। যেমন, ধরা যাক্, 'ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' নামক প্রবন্ধটি। ইহার অন্তর্ভুক্ত তথ্যসমূহ তালিকাকারে সাজাইয়া গেলে 'ভারতীয় অর্থনীতি' বা 'অর্থনৈতিক ভূগোল'-এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রশ্নের হয়তো আদর্শ উত্তর হইতে পারে, কিন্তু উহাকে আদর্শ প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে না। **প্রবন্ধ হইতেছে, কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা**; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট প্রশ্নের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত একটি উত্তরের মধ্যে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকে না। অর্থাৎ, কোন প্রবন্ধের রচনা-কৌশল এবং কোন প্রশ্নের উত্তরদান-কৌশল এক গোত্রের নয়।

'বৈষয়িক বাংলা'র ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাসম্ভব বর্তমান গ্রন্থের তথ্যধর্মী প্রবন্ধগুলি সংকলিত হইয়াছে। পটভূমিকা ও বিষয় অনুসারে তথ্যধর্মী

প্রবন্ধগুলি মোট দুইটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা চলে। 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার', 'নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা' ইত্যাদি তথ্যধর্মী প্রবন্ধগুলি আন্তর্জাতিক পটভূমিকা-ভিত্তিক এবং 'ভারতের জনসমস্যা', 'ভারতের শ্রমিক আন্দোলন', 'ভারতীয় পরিকল্পনা ও কৃষি', 'ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প' ইত্যাদি তথ্যধর্মী প্রবন্ধগুলি ভারতীয় পটভূমিকা-ভিত্তিক। আর, 'বিগত দশকে ভারতের শিল্পোন্নতি', 'ভারতের কর-কাঠামো', 'ভারতে মূলধন- গঠনের সমস্যা' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির তথ্য অর্থনীতি-বিষয়ক এবং 'কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র', 'ভারতের বৈদেশিক নীতি' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলির তথ্য রাজনীতি-বিষয়ক। তথ্যধর্মী প্রবন্ধগুলি প্রায়ই অর্থনীতি-বিষয়ক হইয়া থাকে।

মিশ্রধর্মী প্রবন্ধ—কোন কোন প্রবন্ধের দুইটি সুস্পষ্ট ভাগ থাকে। সাধারণত, প্রথম অংশ হয় তত্ত্বধর্মী এবং দ্বিতীয়াংশে থাকে উক্ত তত্ত্বের প্রয়োগগত দিক বা তথ্যধর্মিতা। এই শ্রেণী প্রবন্ধগুলিকেই **মিশ্রধর্মী** বলা চলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'মিশ্র-অর্থনীতি ও ভারত' নামক বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রবন্ধের প্রথমাংশ গড়িয়া ওঠা উচিত মিশ্র অর্থনীতি সম্পর্কে অর্থনৈতিক তত্ত্বালোচনার উপর ভিত্তি করিয়া এবং দ্বিতীয়াংশ গড়িয়া ওঠা উচিত ভারতের ক্ষেত্রে উক্ত তত্ত্বের প্রয়োগগত দিক বা তথ্যধর্মিতার মধ্য দিয়া।

(৪) **সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিষয়ধর্মী প্রবন্ধ**—এই শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনার প্রস্তুতির জন্য ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকিতে হইবে। এই ধরনের ঘটনা ও বিষয়গুলি পটভূমিকার দিক হইতে আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ এই দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। সাধারণত, আমাদের বিদ্যালয়ে সেই ধরনেরই আন্তর্জাতিক ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধের প্রশ্ন আসিয়া থাকে, যে-ধরনের বিষয় ও ঘটনার সহিত ভারতের স্বার্থ বিজড়িত। এইরূপ আন্তর্জাতিক পটভূমিকা-ভিত্তিক প্রশ্নের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে 'ইউরোপীয় সাধারণ বাজার' প্রবন্ধটি। আভ্যন্তরীণ পটভূমিকা-ভিত্তিক সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিষয়ধর্মী প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা চলে 'তৃতীয় পরিকল্পনা', 'ভারতীয় লোকগণনা', 'কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিকে। সাধারণত, এই ধরনের ঘটনা ও বিষয়গুলির সাম্প্রতিক প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই ওই সম্পর্কে প্রশ্ন আসিবার সম্ভাবনাও তিরোহিত হয়।

প্রবন্ধ রচনা-কৌশল : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রবন্ধ হইতেছে এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা। তাই, প্রবন্ধকে স্বয়ংসম্পূর্ণতার মর্যাদা দান করিবার জন্য, ইহার বিষয়বস্তুটিকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা উচিত। উক্ত পর্যায় তিনটি হইতেছে, (১) ভূমিকা, (২) আলোচনা এবং (৩) উপসংহার। সাধারণত, ভূমিকা

ও উপসংহারের জন্য থাকিবে একটি করিয়া স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ। কিন্তু আলোচনার জন্য কয়টি অনুচ্ছেদ থাকিবে তাহা নির্ভর করে আলোচনার স্তরের উপর। বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্য 'ভারতে পঞ্চায়েৎ রাজ' প্রবন্ধটিকে গ্রহণ করা হইবে।

(১) **ভূমিকা**—প্রবন্ধের এই অংশটির স্থান সর্বাগ্রে। মূল বিষয়বস্তু এবং প্রবন্ধলেখক উহাকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে গ্রহণ করিতেছেন, সে-সম্পর্কে আলোকপাত করিবার জন্য এই অংশটি গঠিত হয়। উল্লিখিত প্রবন্ধটির প্রথম অনুচ্ছেদ ভূমিকার পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু শুধু 'পঞ্চায়েৎ রাজ' নয়—'ভারতে পঞ্চায়েৎ রাজ', সেইহেতু ভারতবর্ষের প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত পঞ্চায়েৎ রাজের ক্রমবিকাশ দেখাইবার জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন আছে; এবং সেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি যে গ্রহণ করা হইতেছে তাহা প্রবন্ধের এই অনুচ্ছেদে পরিস্ফুট। উপরন্তু পঞ্চায়েতের স্বরূপটি পরিস্ফুট করিবার জন্য জনসাধারণের কোন্ প্রবণতা ও প্রয়োজন হইতে উহার উদ্ভব হইয়াছে তাহাও এই অংশে দুর্লক্ষ্য নয়। আসল কথা, প্রবন্ধের এই অংশটি উহার সামগ্রিক কাঠামোটিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং আলোচ্য প্রবন্ধের ক্ষেত্রে উহা তাহাই করিয়াছে। সুতরাং প্রবন্ধ মাত্রেরই এই অংশটির উপস্থাপন কৌশল যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহা স্মরণ রাখা উচিত।

(২) **আলোচনা**—ভূমিকায় উপস্থাপিত বক্তব্যের সূত্র ধরিয়া এই অংশে প্রবেশ করিতে হয়। আর, সেইভাবেই ইহার স্তর-বিন্যাস করা হইয়া থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার সূত্র ধরিয়াই এই অংশে প্রবেশ করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক ও ভাবগত কারণে কিভাবে প্রাচীন পঞ্চায়েৎগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে দেখানো হইয়াছে। আর তৃতীয় অনুচ্ছেদে দেখানো হইয়াছে প্রাচীন ভারতের পঞ্চায়েৎগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িবার রাজনৈতিক কারণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ দুইটি মিলিতভাবে পরবর্তী আলোচনার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে। কারণ, যাহা বর্তমান যুগে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে যাওয়া হইতেছে, তাহা যাহাতে বর্তমান যুগজীবনের উপযোগী হয় সে-সম্পর্কে অবহিত থাকিতে হইলে পূর্ব ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই সূত্র ধরিয়াই চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্তমান যুগজীবনে সংগঠিতব্য ও সম্ভাব্য পঞ্চায়েৎগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা আলেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু, যেহেতু বর্তমান ভারতে পঞ্চায়েৎ রাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই পরিচালিত হইতেছে, সেইহেতু, পঞ্চম অনুচ্ছেদে পরিকল্পনা-কমিশনের ধারণার পরিচয় দিয়া সরকারী আদর্শ অনুসারে পঞ্চায়েৎগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা সমর্থন করা হইয়াছে। এইভাবে চারিটি অনুচ্ছেদ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে 'ভারতে পঞ্চায়েৎ রাজ' সম্পর্কে আলোচনার অংশটি।

(৩) **উপসংহার**—আলোচনাংশের সূত্র ধরিয়াই প্রবন্ধের এই অংশে প্রবেশ করিতে হয়। এখানে থাকে প্রবন্ধকারের নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করিবার সুযোগ। অবশ্য, প্রবন্ধকার প্রথমেই বিষয়বস্তুটিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি হইতে গ্রহণ করেন তাহার মধ্য দিয়াই তাঁহার নিজস্ব ধারণাটি পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। কিন্তু ভূমিকা ও আলোচনার মধ্য দিয়া যাহার আভাসমাত্র পাওয়া যায়, এই অংশে তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। আসল কথা, প্রবন্ধে উপস্থিত বক্তব্য-বিষয়টি সম্পর্কে প্রবন্ধকার তাঁহার নিজস্ব ধারণার পরিচয় দিবার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভূমিকা ও আলোচনার বিন্যাস করেন এবং পূর্ববর্তী সেই বিন্যাসধারারই অনিবার্য পরিণতি হইল উপসংহার। আলোচ্য প্রবন্ধের উপসংহার অংশে দেখানো হইয়াছে যে, কোন্ পথে চলিলে পঞ্চায়েৎ রাজ গঠনের স্বপ্ন সফল হইবে এবং কোন্ পথে চলিলে তাহা হইবে না।

শেষকথা—পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদিও বর্তমান গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি বৈষয়িক বাংলার ছাত্রগণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সংকলিত হইয়াছে, তবুও সেই প্রয়োজনের সার্থকতা ঐগুলি যথাযথভাবে মুখস্থ করিবার মধ্যে নাই। উপরে প্রবন্ধ রচনা সম্পর্কে যে-কয়েকটি কথা বলা হইল তাহার আলোকে সংকলিত প্রবন্ধগুলি পড়িয়া ছাত্রগণ যদি নিজেরা প্রবন্ধ রচনার কৌশলটি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই এই সংকলনের উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া আশা করি।

বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

যে-সকল অতিকায় প্রাণী প্রতিবেশীদের নগণ্য শঙ্কাতুর অস্তিত্বকে উপেক্ষা করিয়া একদা সগর্বে বিচরণ করিত আজ তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে অবলুপ্ত হইয়াছে। কারণ তাহারা আপন আপন পারিপার্শ্বিককে জানিতে ও বুঝিতে পারে নাই এবং উহার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে নাই। প্রাণধারণের জন্য এই সামান্য শিক্ষাটুকুও তাহাদের ছিল না। জীবজগতের সকলে দৈহিক চাহিদা মিটাইবার জন্য পারিপার্শ্বিকের সহিত সামঞ্জস্য বিধানে সতত সক্রিয়। এই শিক্ষা আয়ত্ত করিতে পারিলেই প্রাণপ্রবাহ নির্বিঘ্ন থাকে। কিন্তু মানুষের প্রাণের সম্যক পরিচয় দেহের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সে মনোময় জীব, আনন্দময় সত্তার অধিকারী। তাই দেহের প্রয়োজন মিটাইলেই তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অন্ন সংস্থান করিবার শিক্ষাটুকুই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। দেহের মাপে ঘর করিলে তাহার চলে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুতেও তাহার প্রয়োজন। তাই তাহার শিক্ষা প্রাথমিক উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করিয়া

চলিয়াছে। নিজের মধ্যে পূর্ণতার যে-সম্ভাবনা সুপ্ত রহিয়াছে তাহার বিকাশ করিতে হইবে। যাহা না হইলেও চলে তাহার জন্য বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া তীব্র বেদনার মধ্যে তাহাকে অভাবিতপূর্ব আনন্দের সন্ধান পাইতে হইবে। অজানা পথে অভাবিতের অভিমুখে তাহার অভিযান। যতই অগ্রসর হয় ততই নূতন দিক্‌চক্রবাল তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। তাই তাহার শিক্ষা কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

দিনের পর দিন মানুষের শিক্ষাক্ষেত্র তাই বিস্তীর্ণ হইতেছে। এককালে শিকার ও তাহার আনুষঙ্গিক বিদ্যা শিখিলেই তাহার চলিত। সে প্রথম প্রথম শিকার কাঁচা, পরে ঝলসাইয়া খাইত। বৃত্তিভেদ শুরু হইল। আদিম জীবনের সরল শ্রমবিভাগও বেশি দিন টিকিল না। এক বিদ্যা চর্চা করিতে গিয়া অন্যতর বিদ্যাচর্চার জগতে সে উত্তীর্ণ হইয়াছে। কত বিচিত্র বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। চিকিৎসা, আইন, হিসাব, ভূতত্ত্ব, পদার্থ,—এমনি কত কী। এককালে ভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য এবং ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন চর্চা করিলেই চলিত। যুগজীর্ণ প্রথার বাঁধ ভাঙিয়া মানুষ প্রশ্ন করিয়াছে, তাহার উত্তর খুঁজিয়াছে এবং নূতন নূতন সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে। তাহার এই অন্তহীন জিজ্ঞাসা নিছক প্রাণধারণের ব্যাপারকেও বিশেষজ্ঞের বিষয় করিয়া তুলিয়াছে। আধুনিক কোন পুরোহিতের পক্ষে আর কাহারও আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নহে। আলোচনার সুবিধার জন্য জীবনের অন্যান্য দিকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা শুধু তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গই তুলিব। একজন অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপারীকেও বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আজকাল কত বিচিত্র সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। এই বৈচিত্র্য তাহার কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে ব্যাপকতা ও জটিলতা আনয়ন করিয়াছে উহার মুখোমুখি হইবার জন্য তাহাকে বাণিজ্যবিদ্যার চর্চা করিতে হয়; অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি দেশ যতই অপরের সান্নিধ্যে আসিতেছে ততই একের সঙ্গে অপরের দৃশ্য ও অদৃশ্য লেন-দেন বাড়িয়া চলিয়াছে। শুভঙ্করীর আর্যা আর ইহার হিসাব কষিতে পারে না। সেইজন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে বাণিজ্য-বিদ্যার মর্যাদা আজ আমরা উপলব্ধি করিতেছি।

আধুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিয়াছে। ব্যবসায় জগতে বিনিময় প্রথা তাহার প্রাথমিক সারল্য হারাইয়াছে। আজকাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সকল প্রকার পণ্যবিনিময়ই গাঁটছড়া বাঁধা। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর না রাখিলেই নয়। কোরিয়ায় যুদ্ধ চলে, পশ্চিম বাংলার গণ্ডগ্রামের বাজারে মসলার দাম বাড়িয়া যায়। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ব্রিটেন প্রবেশ করিবে কি করিবে না—ইহার উপর ভারতের বাণিজ্য-কাঠামোর সম্ভাব্য চেহারা নির্ভরশীল। কোথায় কোন সুদূর কিউবায় গণবিদ্রোহ দেখা দেয়, আমাদের দেশের চিনির বাজারে তাহার প্রতিফলন

পড়ে। বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিলেও জটিলতা কমে না। জনগণের কল্যাণ কামনায় সরকার এক একটি আইন পাস করেন, আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। কত রকমের ট্যাক্স বসিতেছে,—তাহার জন্য কত বিভিন্ন খাতা করিতে হয়; কত রকমের হিসাবপত্র সরকারের নিকট দাখিল করিতে হয়। বাণিজ্য-বিদ্যায় মুনশিয়ানা এমতাবস্থায় অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও তাহার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতেছে। আজিকার তত্ত্ব আগামী কাল ব্যবহারিক জগতে অনুপ্রবেশ করিতেছে, আজিকার জল্পনা কাল বাস্তবে পরিণত হইতেছে। আবার, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ককে সহজ করার জন্য মুদ্রা ও ওজনের মানও পরিবর্তিত হইতেছে। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সহিত সমতালে পদক্ষেপ করিতে গেলে অনেক কিছু জানিতে ও বুঝিতে হয়। ফলে বাণিজ্য-বিদ্যার অভাবনীয় প্রসার হইতেছে। ইহাও আজকাল বিশেষজ্ঞের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব-বিদ্যায় বিশারদের দিন চলিয়া যাইতেছে। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া বাণিজ্য-বিদ্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

আমাদের দেশে বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ এবং শিক্ষার্থীর সম্মুখে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে সরকারও বহুবিধ বাণিজ্য ও বৈষয়িক ব্যাপারে অধিকতর লিপ্ত হইতেছেন। কল্যাণকামী সরকার নানাবিধ আইন ও ট্যাক্স হাতে করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তেল-নুন-লকড়ির ঝাঁপিতেও উপস্থিত হইতেছেন। এমতাবস্থায় বাণিজ্য-বিদ্যায় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির পটভূমিকার উপর সামান্যতম ব্যবসাও নির্ভরশীল। বিশেষভাবে শিক্ষিত না হইয়া অগ্রসর হইলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অন্য দিক দিয়া বিচার করিলেও ব্যক্তিগত উদ্যমের ক্ষেত্র সংকুচিত হওয়ায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি অপরিহার্য হইয়া উঠিতেছেন। বাণিজ্য-বিদ্যা শিক্ষার্থীর আজ যে গতানুগতিকভাবে ব্যাঙ্ক, বীমা ও সওদাগরী হাউসের কনিষ্ঠ কেরানী হইয়া জীবন কাটাইতে হইবে তাহা আদৌ নহে। পরিকল্পনার অর্থ-নীতিতে আজ প্রতি ক্ষেত্রেই তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতেছে। সর্বভারতীয় চাকরির দ্বার আর তাহার নিকট রুদ্ধ থাকিতেছে না। উপরন্তু আয়কর-বিশেষজ্ঞ কিংবা অডিটর ও হিসাবনবীশীর স্বাধীন বৃত্তিও তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থায় তাঁহার নূতন মূল্যায়ন হইতেছে—এই সত্যটি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাই দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে যন্ত্র-বিদ্যার ন্যায় বাণিজ্য-বিদ্যাও অপরিহার্য।

বাণিজ্যবিদ্যার গুরুত্ব পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়া আমাদের আর একটি বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি, মানুষের দেহের মধ্যে এক ফোঁটা মন আছে, এই মনের স্ফূর্তির জন্যই তাহার যত মাথাব্যথা। দেহের চাহিদা মিটিলেই তাহার সকল অভাব দূর হয় না। এইজন্য শিল্প, সংগীত, সাহিত্য ও দর্শনের মত অবৈষয়িক বিষয় লইয়া সে ব্যাপৃত থাকে। ইহাতে তাহার চিন্তাশক্তি ও কল্পনা-শক্তির স্ফুরণ হয়। তাহার ফলে তাহার মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, তাহার সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন ঘটে। সেইজন্য সকল বিদ্যাই মানবমুখী হওয়া প্রয়োজন। বাণিজ্য-বিদ্যাও ইহার ব্যতিক্রম নহে, মানবিক-বিদ্যার অঙ্গীভূত হইতে পারিলেই ইহার সার্থকতা।

২
মানুষ বনাম যন্ত্র

কোনও কৌতুকপ্রিয় শিশুদেবতা যদি এক সুপুষ্ট সবুজ আতাগাছের মধ্যে এক ফোঁটা মন ফেলিয়া দেন তবে সেই গাছটির যে কী দুরবস্থা হইবে তাহা ভাবিয়া শংকিত হইয়াছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, যে-সবুজ আতাগাছটি তাহার সতেজ পত্র দোলাইয়া, ফল ফলাইয়া পরমানন্দে দক্ষিণ বায়ুভরে হিল্লোলিত হইতেছে তাহা বিন্দুমাত্র মনের স্পর্শে অকস্মাৎ চিন্তায়-ভাবনায় একেবারে সংকুচিত হইয়া যাইবে ; পাতা শুকাইবে, ফল ঝরিয়া পড়িবে, আতপতপ্ত মধ্যাহ্নে চিন্তাতাড়িত সেই আতা বৃক্ষ শুধু বাতাসে বাতাসে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে থাকিবে।

গাছের মন নাই, তাই তাহার পরম শান্তি, অপার নির্লিপ্ততা। মানুষের মন আছে বলিয়াই তাহার চিন্তা আছে, ভাবনা আছে। এই মনের যন্ত্রণাই মানুষকে যন্ত্র নির্মাণে উদ্যোগী করিয়াছে ; মন আছে বলিয়াই মানুষ যন্ত্রে পরিণত হইতেছে না। নতুবা, মানুষের দেহটিও একটি যন্ত্রবিশেষ, মানবদেহের অভ্যন্তরে নিত্যচলমান এক কারখানা। শুধু ঐ এক ফোঁটা মন আছে বলিয়াই মানুষের ভাললাগা-মন্দলাগা আছে ; আছে তাহার কত কৌতুক, কত-না কৌতূহল। সহস্র যান্ত্রিকতার পেষণেও শুধু ঐ 'মন' নামক বস্তুটির অস্তিত্বের জন্যই দয়া-মায়া, প্রেম-প্রীতি, করুণা-কামনা ভরা মানুষ যন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র। যন্ত্রের শক্তি আছে, বুদ্ধি নাই ; মানুষের বুদ্ধি আছে শক্তি নাই—মানুষ তাই যন্ত্রের দেবতা, যন্ত্র তাই মানুষের আজ্ঞাবহ। একদিন ছিল, যখন মানুষ আকাশের নীল, বনের সবুজ, ধরিত্রীর ধূসরতায় তৃপ্ত ছিল। কর্ষণ করিয়াই মানুষ তখন জীবন নির্বাহ করিত, আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা তখনও এমন করিয়া তাহাকে তাড়িত করে নাই। সকলকিছুর রসটুকু নিঙড়াইয়া শাঁসটুকু বাহির করিবার জন্য যে ব্যগ্রতা আজ মানুষকে

পাইয়া বসিয়াছে তাহাই তাহাকে প্রকৃতির কোল হইতে দূরে টানিয়া আনিয়া যন্ত্র নির্মাণে উদ্যোগী করিয়াছে। সময়ের মূল্য বুঝিয়াছে সে, জানিয়াছে আয়াসসাধ্য কর্মকে কেমন করিয়া সহজসাধ্য করিতে হয়। আকাশ, জল ও মৃত্তিকা আজ তাহার করায়ত্ত। অর্ণবতরীতে পাল তুলিয়া দিয়া সে আজ অনুকূল বাতাসের পথ চাহিয়া থাকে না, আকাশচারী পুষ্পক-রথের গল্প শুনিয়া বিস্ময়বোধ করে না, মন্থরগতি গো-শকটে চাপিয়া দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বাহির হয় না। জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন সকল কিছু আজ তাহার কাছে সহজলভ্য। মন আছে বলিয়াই তাহার বুদ্ধি আছে। বুদ্ধির বলে সে হইয়াছে যন্ত্রের নির্মাতা, আর সেই যন্ত্রেরই দাক্ষিণ্যে যান্ত্রিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়াছে। সে আজ নির্ভয়, নিরাপদ।

কিন্তু যাহা একদিন ছিল অভাবিত তাহাই যে স্বভাবে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে প্রকৃতির দুলাল মানুষকে যন্ত্র আজ পল্লীর স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশ হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছে—আজ নিভৃত ছায়ার অপেক্ষা অনেক বড় হইয়া দেখা দিয়াছে যন্ত্রের মায়া। মাত্র সেদিনের কথা: অষ্টাদশ শতকে ইওরোপে এই যন্ত্র-তন্ত্রের সূত্রপাত। কর্ষণ-সভ্যতাকে পিছনে ফেলিয়া মানুষ সেদিন হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে যন্ত্রসভ্যতার যুগে। প্রকৃতির অন্ধশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইল, মানুষ তাহার সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করিতে থাকিল যন্ত্রের দাক্ষিণ্যে, কৃপণা প্রকৃতির অনিচ্ছুক হাত হইতে মানুষ সমস্ত শক্তি দু' হাত বাড়াইয়া কাড়িয়া লইল। আজ মানুষের গৌরবের দিন, তাহার গর্ব, সে আজ উচ্চতর জীবনযাত্রার অধিকারী। যন্ত্র তাহাকে দিয়াছে অফুরন্ত দ্রব্যসামগ্রীর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া। যন্ত্র তাহাকে দিতেছে স্বল্পশ্রমে অধিক ফল, স্বল্পকালে অনেক ফসল। যন্ত্রের নিয়ামক হইয়া মানবশক্তি আজ দানবশক্তি লাভ করিয়াছে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু উৎপাদন; অপচয় নাই, অপব্যয় নাই—এমন নিয়মিত উৎপাদন যন্ত্রেরই সাহায্যে সম্ভব হইয়াছে। স্বল্পকালে অল্পসংখ্যক মানুষের মিলিত চেষ্টায় যন্ত্র মানুষের জন্য যে-ফল প্রসব করিতেছে তাহা মানুষের মাথাপিছু ব্যয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

জীবনযাত্রা সহজ হইয়াছে, প্রাত্যহিক প্রয়োজনের সামগ্রী সুলভ হইয়াছে। কিন্তু সে প্রাণ আজ অন্তর্হিত। যে-মনের যন্ত্রণায় যন্ত্রের জন্ম দিয়াছিল মানুষ, সেই মন আজ ক্লান্ত, রিক্ত; তাহার মুক্তি নাই। নিয়মের নাগপাশে মানুষের মন আজ পাকে পাকে বাঁধা। বর্তমান যন্ত্রযুগ মানুষের জীবনের সুখ শান্তি কাড়িয়া লইয়াছে। কোলাহলে কলরবে মানুষের জীবন আজ ভরিয়া উঠিয়াছে। অশান্তির বিষবাষ্পে অবকাশের আনন্দ হারাইয়া গিয়াছে। সর্বদা কোন্ অতৃপ্তি লইয়া মানুষ কিসের আশায় বাস করিতেছে তাহা সে নিজেও জানে না। যন্ত্রের জন্ম দিয়া আজ সে সেই যন্ত্রেরই দাসে পরিণত হইয়াছে।

উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু উৎকর্ষ গিয়াছে কমিয়া। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের শোষণে জনতা আজ দিশাহারা; যন্ত্রের আধিক্যে জনসাধারণের ক্রমশ কর্মহীন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা বাড়িতেছে। চিন্তাবিজ্ঞানিগণ বলিবেন যে, এই অশুভ সম্ভাবনা সত্যে পরিণত হইবে না, শেষ পর্যন্ত যন্ত্রেরই দাক্ষিণ্যে মানুষের জন্য কর্মসংস্থান বাড়িবেই। যে কৃত্রিমতা আজ মানুষের জীবনকে করিয়াছে আচ্ছন্ন, তাহার সহজ আনন্দ, সবল প্রাণশক্তিকে করিতেছে বিনষ্ট, তাহার জন্য যন্ত্রকে দায়ী করিয়া লাভ নাই। মানুষের মন হইতে উদ্ভূত এক বিশেষ সমাজ-কাঠামো, তাহার স্বার্থবুদ্ধি এই যান্ত্রিকতার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছে। যন্ত্রের আবিষ্কারক মানুষ আজ নিজেই যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। যন্ত্রের সেই অসহ-যন্ত্রণার মধ্যেও এক ভীমকান্ত সুন্দরকে স্বার্থলোভী মানুষ নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছে। সেই ভীমকান্ত প্রচণ্ড-সুন্দর যন্ত্রের বন্দনায় মুখর মানুষ আজ প্রতিমুহূর্তে এক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে—

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখর মন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নি বন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষদংশ ধ্বংস-বিকট দন্ত।

যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করিতেছে, প্রাণ দিয়া সেই যন্ত্রকে আঘাত করিবার শক্তি আজ আর মানুষের নাই। নিজের যন্ত্রে মানুষ নিজেই আজ বন্দী। এই বন্ধনদশার জন্য দায়ী যন্ত্র নহে, দায়ী যদি কেহ হয়, তবে সে মানুষেরই ঐ এক ফোঁটা মন। মন যন্ত্র নহে, কিন্তু মনেরই জন্য যন্ত্রের যত যন্ত্রণা।

৩

নৈতিকবোধ ও ব্যবসায়-বুদ্ধি

অপার নিশ্চিন্ততায় সেদিন সরকারী অপিসের কেরানী হরিপদবাবু চোখ বুজিলেন। বুঝিলেন, এই চোখ তাঁহাকে আর খুলিতে হইবে না। প্রভাতে উঠিয়া আর দেখিতে হইবে না অভুক্ত শিশুসন্তানদের উলঙ্গ চেহারা, জীর্ণ বস্ত্রে গৃহিণী আসিয়া শুষ্কমুখে দাঁড়াইবে না, মুদির দোকানে ধার চাহিতে গিয়া অপমানিত হইতে হইবে না, কাবুলিওয়ালার উদ্যত যষ্ঠি আর তাঁহাকে প্রকম্পিত করিবে না—আজিকার রাত্রি আর তাঁহার প্রভাত হইবে না। কি আনন্দ, কি আরাম! বহু যত্নে বহু ব্যয়ে যে-পরিমাণ ঘুমের ঔষধ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন—যে-ঔষধ তিনি এইমাত্র সেবন করিয়াছেন তাহা সুনিশ্চিতভাবে তাঁহাকে চিরতরে ঘুম পাড়াইয়া দিবে। প্রতিদিনের

অভাব-অনটনের সুতীব্র যন্ত্রণা হইতে মুক্তির নিশ্চিত পথ আজ হরিপদ কেরানীর সম্মুখে উন্মুক্ত। এই রাত কি মধুর, কি আশ্চর্য মাদকতায় ভরা এই রাত্রি!

কিন্তু সেই রাত্রিও প্রভাত হইয়া গেল। মৃত্যুর নিশ্চিত পদধ্বনি শুনিয়া হরিপদবাবু চোখ বুজিয়াছিলেন—অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খাইয়াও তাঁহার রাত্রি আবার প্রভাত হইল, আবার ঘুম ভাঙিয়া গেল; শান্তিময় মৃত্যুর ক্রোড় হইতে তিনি আবার যন্ত্রণাময় জীবনে জাগিয়া উঠিলেন। কেন এইরূপ হইল? ঔষধে কিছু ভেজাল ছিল, তাই তাহার নির্ধারিত ক্রিয়ায় হরিপদ কেরানীর মৃত্যু হইল না। পাশের বাড়িতে রুগ্ন শিশুর জননীর বুকফাটা কান্না শোনা গেল। যে-অবধারিত ঔষধের ফলে শিশুর জীবন রক্ষা পাওয়ার কথা তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে ফল হয় নাই। ঔষধেও আজ ভেজাল, ভেজাল আজ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল সামগ্রীতে। ব্যবসায়-বুদ্ধি আজ মানুষের নীতিবোধকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। মুনাফার প্রলোভন ব্যবসাদারের মজ্জায় মজ্জায়; এই প্রলোভন যে কত ঘৃণ্য রূপ গ্রহণ করে তাহা আধুনিক জীবনে আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করিতেছি।

শুধু আধুনিক জীবনে কেন, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যবসায়ীদের এবম্বিধ মনোবৃত্তি মানুষের মনে ঘৃণা উপজিত করিয়াছে। প্রাচীন গ্রীস দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতি এই ঘৃণা অ্যারিস্টট্লের এক অবিস্মরণীয় উক্তির মধ্য দিয়া আভাসিত। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হওয়া যেমন অসম্ভব তেমনি মুদ্রারও সংখ্যা বৃদ্ধি অভাবনীয়। যাহারা এই অভাবিত কর্মসাধন করে তাহারা বিশ্বনিয়মের বিরোধী। বণিকসম্প্রদায় সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকের এই উক্তি স্মরণযোগ্য। শুধু পাশ্চাত্য দেশে নহে, আমাদের ভারতবর্ষেও বাণিজ্যবৃত্তিকদের সম্পর্কে কৌটিল্যের অভিমত খুব প্রশংসাপূর্ণ নহে। ব্যবসায়ীদিগকে প্রাচীন ভারতবর্ষে 'কুশীদজীবী', অর্থাৎ কুশ্রীজীবন যাহাদের—যাহারা অন্যায় পথে জীবন ধারণ করে—এইরূপ অভিধা দেওয়া হইত। এক কথায়, আমরা যাহাকে ন্যায়নীতি বলিয়া অভিহিত করি, তাহার প্রতি আনুগত্য যে ব্যবসায়জীবীদেরও থাকিতে পারে এমন বিশ্বাস কোনো কালেই মানুষের ইতিহাসে ছিল না। ব্যবসায়ীগণ তাই অভিজাত-সমাজে কখনও সম্মানিত স্থান পায় নাই।

কিন্তু মানুষের ইতিহাসের নূতন অধ্যায় শুরু হইয়াছে। দিন বদলের ফলে পালাবদল ঘটিয়াছে। বিত্ত কৌলীন্য অর্জনের সর্বোত্তম পন্থায় পরিণত হইয়াছে। যে-কোন উপায়ে ব্যক্তিগত অর্থ-সাচ্ছন্দ্য বাড়াইতে হইবে—ইহাই যখন জীবনের সার কথায় পরিণত, তখন নীতির কথা ভাবিয়া সততার আশ্রয়ে বসিয়া থাকিতে কেহই আজ সম্মত নহে। নিজ নিজ বিত্তগত শ্রীবৃদ্ধির জন্য সকলেই আজ অন্যায় পথ ধরিয়াছে। গোয়ালা জল চিনিয়াছে, চাউলওয়ালা কাঁকর চিনিয়াছে, ছোট বড় সকল

ব্যবসায়ী নিজ নিজ মুনাফাবৃদ্ধির সহজতম এবং সর্বোত্তম পথটি আজ চিনিয়া ফেলিয়াছে। উৎকলদেশীয় যে-ব্যক্তিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে গজানন মূর্তির পায়ে প্রতিদিন বিড় বিড় করিতে করিতে ফুল ফেলিয়া দিয়া যায় সে চিনিয়াছে উপবীতকে, অর্থহীন ব্যাকরণহীন কতকগুলি মন্ত্রকে। সেই মন্ত্র শুনিয়া প্রতিষ্ঠানের মালিক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গণেশ ঠাকুরের নধর ভুঁড়িটি কামনা করিয়া প্রতিদিন সভক্তি প্রণাম জানাইতেছে। জীবনে সবকিছুই যখন আপেক্ষিক, সকল কিছুই যখন তাহার পটভূমি অনুযায়ী পরিবর্তিত হইবার অধিকারী, তখন 'নীতি' শব্দটিই বা কেন তাহার অতি-প্রাচীন অর্থে চুপচাপ বসিয়া থাকিবে? পুঁথির পাতায় 'নীতি' শব্দটির যে অর্থ, ব্যবসায়ীর হিসাবের খাতায় তাহার সেই অর্থ নহে। ক্রেতার নিকটে যাহা অনৈতিক, বিক্রেতার নিকটে তাহাই নৈতিক। তাই আজ চাহিদা ও সরবরাহের উপরে দ্রব্যের মূল্য নির্ভরশীল নহে। দ্রব্যের সরবরাহ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও বড় বড় ব্যবসায়ীগণ কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া দ্রব্যমূল্য বাড়াইতে সক্ষম। হিম-গৃহের অনুগ্রহে কাঁচামাল মজুত করিয়া রাখিয়া খুচরা-বাজার পণ্যহীন করিতে ব্যবসায়ীগণ আজ দ্বিধাহীন। অপরকে শোষণ ও প্রতারিত করিয়া আত্মসুখের যে সৌধ ব্যবসায়ীগণ আজ নির্মাণ করিতেছে তাহা ধূলিসাৎ করিবে কোন্ শক্তি? মানুষের নিত্যমানবতা ও জাগ্রত-চৈতন্যকে পিষ্ট করিয়া মুনাফাবৃত্তিকদের যে বিলাস হর্ম্য আজ আকাশ স্পর্শ করিতেছে তাহার ভিত্তি তো কোনও নৈতিক বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু অনৈতিকতাকে প্রতিহত করিবে কে?

জাতির নীতিগত অধঃপতন যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিহত না হইতেছে ততক্ষণ ব্যবসায়-বুদ্ধিতে নৈতিকতাবোধ সঞ্চারিত হইতে পারে না। সমগ্রভাবে মানব-সমাজের মানসিক পরিবর্তন সাধিত হইলেই পুনর্বার ব্যবসায়গত দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের প্রবল ঘৃণা জাগ্রত হইবে, বিত্তকুলীন বণিকদল আভিজাত্যের উচ্চ মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিতে বাধ্য হইবে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার নির্ভয়লোক হইতে সেদিনই তাহারা বঞ্চিত হইবেন যেদিন সাধারণ মানুষের নৈতিক বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া নীতিহীন ব্যবসার প্রতি পুঞ্জিত ঘৃণার সৃষ্টি করিবে। নতুবা, আজিকার দুরবস্থার অবসান কিছুতেই সম্ভব নহে। আজিকার হরিপদ কেরানী ভেজাল ঘুমের ঔষধ অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিয়াও কাঙ্ক্ষিত মৃত্যু লাভ করিতে পরিবে না। রাত্রিশেষে প্রভাতের আলোয় সে পুনর্বার লাঞ্ছনাময় গ্লানিভরা জীবনে জাগিয়া উঠিবে। প্রাভাতিক সংবাদপত্রটি যদি সংগ্রহ করিতে পারে তবে প্রথম পৃষ্ঠাতেই সে দেখিবে—ওয়াল স্ট্রীটে ভূমিকম্প—মুনাফালোভী শেয়ার-মালিকদের ঘৃণিত চক্রান্তে মধ্যবিত্ত জীবনে অভাবিত বিপর্যয় দেখিবে, কলিকাতার মাছের বাজারে মূল্য বৃদ্ধির মৌন-প্রতিবাদে সমবেত নাগরিকদের

পাণ্ডুর মুখচ্ছবি। নৈতিকবোধ ও ব্যবসায়-বুদ্ধি যদি পারস্পরিক সহযোগিতায় চলিতে না পারে তবে নীতি শব্দটির নূতন অর্থ আমাদের অভিধানে স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা

রাস্তার মোড় ঘুরিতেই অকস্মাৎ বিরাট এক ধাবমান ব্যাঘ্রের ছবি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে; দেখা যাইবে তাহার পার্শ্বে বড় বড় ইংরেজী হরফে লিখিত একটি কথা—'এই ব্যাঘ্রটি আপনার তেলের ট্যাঙ্কে ভরিয়া লউন'। মনের মধ্যে এক সচকিত-বিস্ময় জাগিয়া উঠিবে। মুহূর্ত পরে পথিক বুঝিবেন কোন পেট্রল কোম্পানি তাহাদের ব্যাঘ্র মার্কা তেলের বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। বিজ্ঞাপন দেওয়ার অর্থ আপনার পণ্যসামগ্রীর কথা ক্রেতার নিকট বিশেষরূপে জ্ঞাপন করা। সুকৌশলে জ্ঞাপন করিতে পারিলে ধীরে ধীরে ঐ সামগ্রীটির চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা বাড়িয়া গেলে বিক্রেতা প্রয়োজনমত মূল্যবৃদ্ধি করিলেও ক্রেতার সংখ্যা কমে না। বড় বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয় করিতে বসিয়া বিজ্ঞাপনের এই ভূমিকাটি স্মরণে রাখেন। নিজের গাড়িকে তীব্র ব্যাঘ্রগতিসম্পন্ন করিবার প্রলোভনে গাড়ির মালিক হয়তো ঐ ব্যাঘ্র মার্কা পেট্রল কিনিতে অভ্যস্ত হইবেন, এবং একবার অভ্যাস হইয়া গেলে মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিবে না।

এই প্রকার বিজ্ঞাপনের মূলে দুই ধরনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। প্রথমত, নানা কোম্পানির পণ্যসমূহের তুলনায় নিজের কোম্পানির পণ্যটির উৎকর্ষ প্রচার ও সেই প্রচারের মাধ্যমে ক্রেতার মনকে আকৃষ্ট করা; দ্বিতীয়ত, নিজের ক্রেতাদের মনকে নূতন করিয়া আচ্ছন্ন করা, অধিকতর আকর্ষণ করা। বলা যাইতে পারে, এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ের বিক্রয়-ব্যয়। সুন্দরী চিত্রতারকার রূপমুগ্ধ ক্রেতা যাহাতে অন্য সাবান পছন্দ না করিয়া লাক্স সাবানটি কিনিতে মনস্থ করেন তাহারই জন্য চিত্রতারকার মন্তব্যসহ বিজ্ঞাপন লাক্স সাবানের অনুকূলে উৎপাদক কোম্পানি দিয়া থাকেন। অন্য কোম্পানির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এইরূপ বিক্রয়-ব্যয় করা হইয়া থাকে।

সকালবেলার সংবাদপত্র খুলিতেই এক পবিত্র সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিশুর কোমল মুখচ্ছবি চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। পাশে বড় বড় হরফে লিখিত আছে—শিশুর ভবিষ্যৎ, 'জীবনবীমা'। সংবাদপত্রের পাঠকবর্গের মধ্যে যাহারা সন্তানের

পিতা তাহাদের মনের মধ্যে একটি চিন্তার বীজ ঐ বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়া বুনিয়া দিবার প্রয়াস—শিশুর ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বিধান করিতে হইলে অবিলম্বে জীবনবীমার প্রয়োজন। ইহা প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন নহে। সাধারণভাবে জীবনবীমার কথা এখানে বলা হইয়াছে। যে-কোন জীবনবীমা কোম্পানি এই বিজ্ঞাপনের ফল লাভ করিতে পারে। ঐ একই শিশুর ছবির পার্শ্বে যদি লিখিত থাকিত 'Glaxo builds bonny babies' —তবে তাহা প্রতিযোগিতামূলক বিক্রয়-ব্যয়ের পর্যায়ে পড়িত।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ভূমিকা যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ সেইরূপ দেশের অর্থনৈতিক জীবনেও বিজ্ঞাপনের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশ যখন উন্নতির পথে অগ্রসরমান, প্রতিদিন নানা নূতন নূতন দ্রব্যসামগ্রী যখন দেশময় প্রস্তুত হইতেছে, তখন একমাত্র বিজ্ঞাপনের সাহায্যেই এই সব নব্যবস্তুর সংবাদ আপামর জনসাধারণের গোচরীভূত করা সম্ভবপর। ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপনে অর্থব্যয় করেন নিজেদের লাভের জন্য কিন্তু উহা আবার পক্ষান্তরে ক্রেতার লাভের অঙ্কেও জমা হয়। যেমন, সংবাদপত্র যদি প্রচুর বিজ্ঞাপন পায় তবে উহার মূল্য কম হয়, এবং সাধারণ পাঠক স্বল্প মূল্যে প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠের সুবিধা পান। চিত্রকর বিজ্ঞাপনের জন্য চিত্রাঙ্কন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পান। কারিগর বিজ্ঞাপনের বোর্ড তৈয়ারী করেন, মুদ্রণ-যন্ত্রের চাহিদা বাড়ে, বৈদ্যুতিক আলোয় বিজ্ঞাপন রচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট কারিগরবর্গ অর্থোপার্জন করিতে পারেন। এইভাবে বিজ্ঞাপন শুধু বিজ্ঞাপনদাতার মুনাফা বৃদ্ধির সাহায্যই করে না, ক্রেতারও প্রভূত লাভ এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘটিয়া থাকে।

সাধারণত, ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বহুবিধ পদ্ধতি বিজ্ঞাপনে অনুসৃত হয়—এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে যেমন প্রশংসার্হ দিকের অভাব নাই তেমনি অনেক নিন্দার্হ দিকও বিদ্যমান। আকবর বাদশাহর আমলের ঐতিহ্যমণ্ডিত পরিবেশের চিত্র রচনা করিয়া কী ভাবে প্রথম তাম্রকূট ভারতে আসিয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া কোনও সিগারেট কোম্পানি যখন বিজ্ঞাপন দেয় তখন একদিকে ক্রেতার মনকে ইতিহাসে আকৃষ্ট করা হয়, অন্যদিকে নিজ কোম্পানির সিগারেটের কথাটিও বলা হয়। কেশবতী রমণীর ছবি দিয়া যখন পাশে লিখিয়া দেওয়া হয়,—'কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?' তখন এক পরিচিত লোকগীতির ঐ ছত্রটি যেমন পাঠকমনকে আবিষ্ট করে তেমনই নিজের কেশ তৈলটির প্রচারও হইয়া যায়। কিন্তু যখন এক অশ্লীল ছবি দিয়া কোনও সিনেমার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় (হয়তো সেই ছবিটি পর্দার বুকে আদৌ প্রতিফলিত হয় না), তখন সেই ছবি অর্বাচীন-যুবার মাথা ঘুরাইয়া দেয়, প্রেক্ষাগৃহে প্রচুর দর্শক টানিয়া আনে; কিন্তু সাধারণভাবে দেশের মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে, জনসাধারণের রুচি-বিকারের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। বহু অশ্লীল বিজ্ঞাপন প্রাচীরে

প্রাচীরে লিপ্ত থাকিয়া প্রতিদিন ধীরে ধীরে দেশের যুবশক্তির সর্বনাশ করিতেছে, এই সকল বিজ্ঞাপন সরকারী নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে।

মনে রাখিতে হইবে, বিজ্ঞাপন আজ আর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে। দেশের পণ্যকে বিদেশের গৃহে গৃহে পৌঁছিয়া দিবার মাধ্যম আজ বিজ্ঞাপন। বাংলা দেশের কোন্ প্রান্তে এক বাঙালী সন্তান কবে লিখিবার কালি প্রস্তুত করিয়াছিল, আজ সেই কালি বিজ্ঞাপনের মহিমায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে; সুলেখা আজ আর কেবল বাঙালীর লেখাতেই ব্যবহৃত হয় না। এই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে এক দেশের মানুষের রুচি, সংস্কৃতি, শিল্পবোধের সহিত অপর দেশের মানুষের পরিচিতি সাধিত হয়। বিজ্ঞাপন আজ আর শুধু নিজেকে জ্ঞাপন করিবার উপায় নহে, ইহা পরকে আপন করিবারও ক্ষমতা রাখে। অপরের জাতিগত চরিত্র-পরিচয় বিজ্ঞাপন বহন করিয়া আনে। সুদূর সমুদ্রপার হইতে বিদেশী সন্তান যখন উদগ্র কৌতূহল লইয়া লণ্ডন বন্দরে আসিয়া উপনীত হন তখন জাহাজের ডেক হইতে সুদূর দিক্‌চক্রবালে উদ্ভাসিত বিদ্যুৎ লেখাটি তাঁহার চোখে পড়িয়া যায়—

Don't be vague
Ask for Hague !

'মনের মধ্যে প্রয়োজনের অস্পষ্টতা না রাখিয়া সরাসরি হেগ্-হুইস্কি চাহিয়া ফেলুন' —মোহময়ী লণ্ডন-নগরী এই আকুল আবেদনে বিদেশী সন্তানের নিকট প্রথম পরিচয়েই আপনাকে প্রকাশ করিয়া বসে।

৫

বিজ্ঞাপন শিল্প-কলা

কুবেরের প্রসাদলাভের সাধনায় যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার দাক্ষিণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাদের কোনোকালে ছিল না। লক্ষ্মীর চঞ্চল অঞ্চলকে আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলে যে সরস্বতীর পদ-বন্দনার প্রয়োজন হয়—সে কথা বণিক সমাজ পূর্বে কখনও ভাবে নাই। আজ তাহারা বুঝিয়াছে যে এক মাল্য-বাঁধনে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে বাঁধিতে পারিলেই লব্ধ হয় পরম সার্থকতা। তাই ব্যবসায়-বিস্তারের অন্যতম প্রধান উপায় যে বিজ্ঞাপন তাহাকে শিল্পময় করিয়া তুলিবার আগ্রহ দেখা দিয়াছে কুবেরের অনুগত অনুচরবর্গের মনে। মানুষের শিল্পবোধের শ্রীময় প্রকাশ তাই আজ বিজ্ঞাপনের অঙ্গে অঙ্গে। পণ্য বিক্রেতার তুলাদণ্ডের সহিত

ললিতকলার প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আজ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। শিল্পরুচি আজ ব্যবসায়-বুদ্ধির সহায়ক হইয়া পড়িয়াছে।

শিল্পরুচির এই নব-জাগরণে ব্যবসায়ী-সমাজ আজ বিজ্ঞাপনকে শিল্প হিসাবে দেখিবার প্রেরণা পাইতেছে। আজ তাহারা গভীর অভিনিবেশে বিজ্ঞাপনের গোড়ার কথাটি অনুধাবন করিয়াছে। এই নিত্যচলমান ব্যস্ত জগতের বহু বিচিত্র মানুষের মনটিকে অধিকার করা বা আকর্ষণ করাতেই বিজ্ঞাপনের সার্থকতা। মানুষের মন ও মেজাজ বুঝিয়া শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের চাতুর্যবলে ব্যবসায়ী তাহার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবে। মানবচরিত্র অতি বিচিত্র। কেহ-বা স্পর্শকাতর, কেহ-বা রুক্ষ গম্ভীর। কেহ-বা চপলচিত্ত, কাহারও-বা জলদস্বভাব। কেহ সহজে বিগলিত, কেহ সর্বদা সন্দিগ্ধ। মানবস্বভাবের এই বহুবৈচিত্র্যকে স্মরণে রাখিয়া ব্যবসায়ী শুধু কলা-বুদ্ধির বলে বিজ্ঞাপনের সহায়তায় মানুষের মনের সেই দুর্বল গহন প্রদেশটি অধিকার করিবে, যাহার ফলে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য হইবে সফল।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিবেন কোনও ব্যবসায়ী। মনে রাখিতে হইবে, যে-পণ্যটির বিজ্ঞাপন তিনি দিবেন তাহার ক্রেতা সাধারণত, কোন্ চরিত্রের মানুষেরা। যদি মাথার চুল মসৃণ, চকচকে রাখিবার মতন কোনও বস্তুর বিজ্ঞাপন হয় তবে তাহার যোগ্য স্থান খেলার পৃষ্ঠায়। তরুণেরা সংবাদপত্রের এই পৃষ্ঠাতেই আকৃষ্ট, এবং মাথার চুলকে চকচকে মসৃণ রাখিবার দায় তাহাদেরই বেশী। প্রসাধন সামগ্রীর বিজ্ঞাপনের প্রশস্ত স্থান সিনেমার পৃষ্ঠায়, তরুণী রমণীই সে পণ্যের সর্বোত্তম ক্রেতা। ইট-চুন-লোহের বিজ্ঞাপনের প্রশস্ত স্থান প্রথম পৃষ্ঠায়—গৃহকর্তা যে-পৃষ্ঠাটি সর্বাগ্রে পড়েন। তিনিই তো গৃহ নির্মাণোপযোগী পণ্য সম্পর্কে সর্বাধিক আগ্রহশীল। শুধু তাহাই নহে, কত বড় হরফ ব্যবহার করিলে দৃষ্টি বেশী আকৃষ্ট হইবে, কেমনতরো ছবি ঐ বিশেষ দ্রব্যের ক্রেতার মনকে সহজে অধিকার করিবে তাহার সম্পর্কেও বিজ্ঞাপনদাতাকে সর্বদা অবহিত থাকিতে হইবে। বিজ্ঞাপন আজ আর উপেক্ষণীয় বিলাস নহে, ইহা এক অনুশীলনযোগ্য কলাবিদ্যা। লক্ষ্মী-সাধনার সহিত সরস্বতীর আরাধনা আজ অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত।

কাপড় কাচিবার সাবানের পরিবর্ত-হিসাবে এক ধরনের পাউডার প্রস্তুত করিয়াছেন কোন এক কোম্পানি। তাঁহারা এই পণ্যটি বিক্রয়ের জন্য নানাভাবে বিজ্ঞাপন দিতেছেন। সিনেমায় সঙ্গীত-সমন্বিত খণ্ড-চিত্র, খবরের কাগজে বিচিত্র-কাহিনী, রাস্তার মোড়ে বিদ্যুৎ-লেখায় বস্তুটির নাম প্রচার করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। অবশেষে কিছু মহিলা-কর্মী নিয়োগ করিয়া ঐ পাউডারের কিছু নমুনা-প্যাকেট বিনা-মূল্যে বিতরণের জন্য পাড়ায় পাড়ায় তাঁহাদের প্রেরণ করিলেন। কোম্পানি বুঝিয়াছে

যে-কাপড়-কাচিবার কাজটি গৃহকর্ত্রীর এলাকাধীন। এক সুবেশা তরুণী এক মধ্যাহ্ন-বেলায় আপনার গৃহে আসিলেন, গৃহিণীর সহিত আলাপ করিলেন, বালতিতে জল লইয়া নিজ হাতে আপনারই একটি ময়লা গেঞ্জি ঐ পাউডার সহযোগে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন এবং বিদায়-কালে নমুনা-প্যাকেটটি রাখিয়া গেলেন। এবম্বিধ বিজ্ঞাপনের আশুফল শীঘ্রই ফলিবে, সন্দেহ নাই।

ইডেন উদ্যানে ভারত বনাম ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলা দেখিতে গিয়াছেন। প্রখর সূর্যালোকে বলের গতিবিধি নিরীক্ষণ করা কষ্টকর। ভাবনা নাই, নানা কোম্পানির বিজ্ঞাপনসহ কাগজের কাউন্টি বিনামূল্যে লাভ করিবেন। অসময়ের বন্ধু ঐ কাউন্টির গায়ে লিখিত কোম্পানির নামটি স্বভাবতই আপনার স্মরণে থাকিবার কথা। একটা নির্দিষ্ট অথচ বৃহৎ সংখ্যা দিয়া কোন কোম্পানি ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহাদের বিশেষ পণ্যটি ভারতের অতজন লোক ব্যবহার করেন। সংখ্যার সেই নির্দিষ্টতায় আপনার বিশ্বাস উৎপাদিত হইবে, আপনার মনের কোণে যূথবদ্ধতার যে আদিম-প্রবৃত্তি লুকানো আছে সেইখানে নাড়া পড়িবে, ভাবিতে শুরু করিবেন যে অতগুলি মানুষ যাহা ব্যবহার করিতেছে তাহা আপনারও ব্যবহার করা দরকার। আজকাল তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তথ্য সংযুক্ত করার এক নূতন কৌশল বিজ্ঞাপনে প্রযুক্ত হইতেছে। কোন দন্তমাজন বিক্রেতা কোম্পানি লিখিতে শুরু করিলেন, তাঁহাদের মাজনে ক্লোরোফিল আছে। ক্লোরোফিল কি বস্তু তাহা সম্যক না বুঝিয়াই বার বার শুনিতে শুনিতে আপনার মনে হইবে—যে-মাজনে ক্লোরোফিল নাই তাহা ব্যবহারযোগ্য নহে। বস্তু-বিশেষের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অংশবিশেষ তারস্বরে ঘোষণা করিয়া ক্রেতার মনকে অভিভূত করা অধুনা বিজ্ঞাপনে প্রচলিত এক অভিনব পদ্ধতি। অনভিজাত সমাজের ক্রেতাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে গিয়া বিজ্ঞাপনে বলা হয়—এই বস্তুটি অভিজাত সমাজ সর্বদা ব্যবহার করেন। এমন মানুষের অভাব নাই যাহার অভিজাত বনিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও দুরন্ত এই সাধটি রহিয়া গিয়াছে। জীবন-সংগ্রামে ব্যর্থকাম এই সকল স্বপ্নবিলাসী অবশেষে ঐ বিশেষ পণ্যটি ব্যবহার করিয়াই অভিজাত হইবার সাধ মেটায়।

বিজ্ঞাপন-কলা অধিগত না থাকিলে আধুনিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপন ব্যর্থ অর্থব্যয়ে পরিণত হয়। রেডিও সিলোনোর উপর্যুপরি লা-রে-লাপ্পা সঙ্গীতের অবকাশে বিশেষ পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন কোনও সার্থকতা বহন করে কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিশেষ পণ্যটির মর্মার্থ-জ্ঞাপক একটি উক্তিকে মুখে মুখে চালু করিয়া দেওয়ার অনেক মূল্য। ইংরেজীতে এই প্রতীক-বচনকে বলা হয় ক্যাপশন। "Time commands business,

commands time,' 'কেশে মাখো কুন্তলীন, রুমালেতে দেলখোস, সুবাসে মাতুক ধরা, ধন্য হোক এইচ্ বোস', 'Fill up and feel the difference', অথবা 'আপনি জানেন না আপনি কী হারাইতেছেন'—এই জাতীয় এক একটি প্রতীক-বচন প্রচলনের মধ্য দিয়া পণ্যদ্রব্যের প্রচার ও বিক্রয় যে কী পরিমাণ সুদূর প্রসারী হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। স্কুল-কলেজে, রান্নাঘরে, ট্রামে বাসে, অফিসে-আদালতে, ড্রয়িংরুমের কথাবার্তায় এই প্রচলনটির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়া ইহা জাতীয় বাকভঙ্গীর ও রুচির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িবে। জাতীয় ভাষা ও বাক্‌সম্পদের মধ্যে গণ্য হইলে সেই পণ্য জনসাধারণের মনের অবচেতন কোণে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া লইবে।

বিজ্ঞাপনে বিশ্বাসহীন মানুষের অভাব নাই। এই অবিশ্বাসী সুজন বলিবেন, বাণিজ্য বিস্তারে বিজ্ঞাপন-কলার কোনও মূল্য নাই, ইহা ক্রেতা-আকর্ষণ করে না। আমরা এমনতরো অবিশ্বাসী পাঠকদিগকে বলি, তাঁহারা প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলিয়া শুধু সেখানকার বিজ্ঞাপনগুলি মন দিয়া পড়ুন, সহৃদয়তার সহিত অনুধাবনে সচেষ্ট হউন—বিবিধ পত্র-পত্রিকার এই সব বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে সহসা একদিন এই বিজ্ঞাপন-বিশ্বাসহীন পাঠকের নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তখন বুঝিবেন, 'আপনি কি হারাইতেছেন তাহা আপনি জানেন না'।

৬

ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিজ্ঞানের প্রভাব

স্বভাবের সহজ পথ ছাড়িয়া মানুষ যখন হইতে নিজের বুদ্ধি ও বিচার-শক্তির উপর নির্ভর করিতে শিখিল, তখন হইতেই বিজ্ঞানের সূত্রপাত। তন্ত্র-মন্ত্রের শক্তি অলৌকিক হইতে পারে কিন্তু উহার উচ্চারণে জীবিকার হাতিয়ার নির্মাণ বা মেরামত—কোনটাই করা যায় না। জাদুবিদ্যার প্রভাবে সমাজে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহাতে পাথর ধারাল হয় না বা ধনুকের ছিলা পরানো যায় না। জীবিকার্জনের জগৎ কঠিন বস্তুর জগৎ। উহার কর্ষণ জড় বস্তুর সুষ্ঠু প্রয়োগেই সম্ভব। এইখানেই আসে বুদ্ধির বিশ্লেষণী শক্তি। ইহাই বিজ্ঞান। সভ্যতার উন্মেষ হইতেই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিজ্ঞান অনুস্যূত। প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কাজে নিযুক্ত করিয়া আদিম মানুষই বিজ্ঞানকে তাহার অজ্ঞাতসারে ব্যবহারিক জগতে টানিয়া আনিয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজে বিনিময়-প্রথার পূর্ব যুগেও বিজ্ঞান তাহার বিশ্বরূপ লইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপস্থিত হইয়াছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য নিছক বস্তুকে লইয়া। বস্তুকে কিভাবে কাজে লাগানো যাইতে পারে ইহা লইয়াই তাহার মাথাব্যথা। তাই বস্তুর সম্যক্ পরিচয় যাহাতে পাওয়া যায় তাহাকে বাদ দিলে ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কিসের অনুসন্ধান করিতেছেন সে-সংবাদ দূরদর্শী ব্যবসায়ীর একান্ত প্রয়োজন। কেননা আজ যাহা তত্ত্ব কাল তাহা তথ্য; গাণিতিক সূত্রের মধ্যে আজ যাহা শুষ্ক, নীরস, তাহার মধ্যে ভাবীকালের ব্যাঙ্ক ব্যাল্যান্সের কলধ্বনি শোনা যাইতে পারে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব পুঁথির মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জন্য নহে, প্রকৃতির উপর মানুষের অসপত্ন অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ইহার অভিযান। তাই বৈজ্ঞানিকের নিরলস সাধনায় বিজ্ঞান ব্যবহারিক জগতে নামিয়া আসিয়াছে। শুধু শিখিতে বা শিখাইতে পারার মধ্যে নহে, প্রয়োগ করার মধ্যেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। আর এই প্রয়োগ করার ক্ষেত্রই বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়ীর যৌথ বিচরণ ক্ষেত্র।

একটি কৌতূহলী বালক লক্ষ্য করিল, জল গরম হইলে উহা হইতে যে-বাষ্প নির্গত হয় তাহা কেট্‌লির ঢাক্‌নিকে নাড়াইতে সক্ষম। বাষ্পের এই শক্তি মানুষের ব্যবহারিক জীবনে যে-পরিবর্তন আনিয়াছে তাহার গতি আজও থামিয়া যায় নাই। কাজ-কারবারে মানুষ আর পশুশক্তির উপর নির্ভর করিল না। তাহার স্থলে এই নূতন শক্তিকে অধিষ্ঠিত করিল। ইহাতে যানবাহন, কল-কারখানা, কৃষি ও খনি—প্রতি ক্ষেত্রে নূতন যুগের পত্তন হইল। নূতন নূতন আবিষ্কারের ফলে মানুষের বিচরণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইল। তাহার ব্যবসায়ক্ষেত্রের পরিধিও বাড়িয়া গেল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নবকলেবরে জাতীয় অর্থনীতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিল। নূতন সামাজিক শক্তির উদ্ভব হইল, চিন্তার ক্ষেত্রে সৃজিত হইল নূতন আলোড়ন। বাণিজ্যের সহিত রাজশক্তির গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গেল। বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের যুগলাশ্ববাহিত রথে সগর্বে সাম্রাজ্য-বাদ অগ্রগামী হইল; ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপান্তর ঘটিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বণিককে অন্ত্যজ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া এইরূপে আভিজাত্যের উচ্চমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে অভাবিত-পূর্ব পণ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। দুই বৎসর পূর্বেও কেহ যাহার নাম শোনে নাই, আজ প্রাত্যহিক জীবনে তাহা অপরিহার্য। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ, চিকিৎসা, আমোদ-প্রমোদ কোন ক্ষেত্রেই আর সাবেকি ব্যবস্থা বজায় থাকিতেছে না। পণ্য উৎপাদনের উপায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার চেহারারও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতেছে। তাই বণিককে আজ সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিকের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। তাহাকে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হইতেছে। সময়ের সঙ্গে তাল রাখিয়া পূর্বের গদির সংস্কার করিয়া সে নূতন

আপিসের পত্তন করিতেছে। হিসাব-নিকাশের জন্যও সে আজ যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। বাষ্প-বিদ্যুৎ ও পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হইয়া মানুষ সকল কিছুই ঢালিয়া সাজাইতেছে। অতীতের কোন মহাজন যদি যুগভ্রষ্ট হইয়া বর্তমান ব্যবসায়-বাণিজ্য লক্ষ্মীর সন্ধান করিতে আসেন তবে তাহাকে অচিরেই গণেশ উল্টাইতে হইবে।

বস্তুত, ব্যবসায়-বাণিজ্যর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব পরিমাপ করা বর্তমান কালে আর সম্ভব নহে। কেননা অত্যন্ত স্থূলভাবে দেখিলেও আমাদের সকল প্রকার কাজকর্ম আজ বিজ্ঞান শাসিত। বিজ্ঞানের কোন ধার না ধারিয়া যদি কেহ ব্যবসায়ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে চায় তবে তাহাকে অতি শীঘ্রই দিশাহারা হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে হইবে। মানুষকে বাঁচাইবার কিংবা মারিবার জন্যই বিজ্ঞানের যত কার্যকলাপ। যেদিক দিয়াই অগ্রসর হওয়া যাক না কেন সকল পথই বিজ্ঞানের রাজপথে আসিয়া লয় পাইবে। সকল যুগের বণিকসমাজই কূট বাস্তব বুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ; তাহাদের দৃষ্টি সর্বকালেই মোহমুক্ত। চিরকাল তাহারা নিত্যধনের সন্ধানী না হইয়া অনিত্যধনের আকাঙ্ক্ষায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াছে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক শক্তির সীমাহীন সম্ভাবনাকে তাহারা বুঝিতে ভুল করে নাই। তাই বিজ্ঞানের সঙ্গে বাণিজ্যের গাঁটছড়া অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা হইয়া গিয়াছে।

৭

বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যে নূতন ভারত ভূমিষ্ঠ হইল তাহার জন্মযন্ত্রণা অনুভূত হইল পঞ্জাব ও বাংলায়। এককালের সোনার বাংলা দেশবিভাগের নিষ্করুণ খড়্গাঘাতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইল। কর্মে ও জ্ঞানে যে বাঙ্গালীর স্থান ছিল সারা ভারতে সকলের অগ্রে, সেই বাঙ্গালী মুহূর্তের মধ্যে অদৃষ্টের পরিহাসে ভগ্নোদ্যম হতাশার পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল। বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক জীবনেও দেখা দিল দারুণ দুর্যোগ। খনি ও শিল্পে সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ কৃষিসম্পদে অগ্রণী পূর্ববঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে উভয় বঙ্গের অর্থনীতিই বিপর্যস্ত হইল। পরস্পর নির্ভরশীল দুইটি অঞ্চল রাজনৈতিক কারণে একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাওয়ায় যে-প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাহা বাঙ্গালীর জীবনে দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিল।

দেশবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত বৃত্তিচ্যুত নরনারীর আগমন হইল। যথাসর্বস্ব হারাইয়া অসংখ্য লোক এই রাজ্যের আশ্রয়প্রার্থী হওয়ায় রাজ্যের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যয়ের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আগমনের তুলনায় নির্গমন নগণ্য হওয়ায়

সমস্যা আরো ঘোরাল হইল। সমগ্র রাজ্যে ভূমি, বাসগৃহ, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সকল ক্ষেত্রেই যে-চাপ পড়িল তাহার জন্য কোন প্রস্তুতি না থাকায় বাঙ্গালী দিশাহারা হইয়া পড়িল। কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বরাবরই সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে জীবিকান্বেষীকে আকর্ষণ করিয়াছে। তাই শিল্প-বাণিজ্যের অনেক ক্ষেত্রে আজও অবাঙ্গালীর প্রাধান্য। বাংলা সকলের জন্যই দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে, এই উদারতার ফলে বাংলা দেশের শিল্পে-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান নাই। বাংলার স্নায়ু-কেন্দ্র কলিকাতা বন্দরেও বাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যা নগণ্য। বাংলার বাহিরে অন্যান্য রাজ্যে বাঙ্গালী অবাঞ্ছিত। এমন কি সরকারী-বেসরকারী আপিসে কেরানীগিরি করার যে-সুযোগ বাঙ্গালী বহুদিন ধরিয়া ভোগ করিতেছিল তাহা হইতেও আজ সে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। সবকিছু মিলিয়া বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

কৃষি-ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় খনি ও শিল্পসমৃদ্ধ পশ্চিম বাংলা শিল্প-বাণিজ্যের উপরই নির্ভরশীল। ভারতের 'রুঢ়' অঞ্চল এই রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। তবুও বাঙ্গালীর অর্থ নৈতিক জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন কেন? কারণ এই রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের উপর বাঙ্গালীর কর্তৃত্ব নাই বলিলেই চলে। কলকারখানা, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রেই অবাঙ্গালীর প্রাধান্য। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। পশ্চিম বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পাটের উৎপাদন যৎসামান্য। বহির্বাণিজ্যে পাট-শিল্পের গুরুত্ব তাই অসীম। কিন্তু এই পাট- শিল্পের প্রায় সবটাই অবাঙ্গালীর হাতে। খুঁটিয়া খুঁটিয়া দৃষ্টান্ত বাহির করিয়া প্রবন্ধের কলেবর না বাড়াইয়া এককথায় বলা চলে, অর্থনীতির প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই দশা। অথচ বাঙ্গালী শ্রমবিমুখ জাতি নহে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে-ভাবে সারা দেশে জাঁকাইয়া বসিয়াছে তাহাতে ব্যক্তিগত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের ফলে কাহারও শিল্প-বাণিজ্যের জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব নহে। স্বাধীন উদ্যোগের স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিরই একচেটিয়া। তারপর আইনের জটিলতা, লাইসেন্স-পারমিটের ঘোরপ্যাঁচ কাটাইয়া কাহারও পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা-জগতে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব। শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্ত প্রসারণের ফলে ব্যক্তিগত উদ্যম এবং উদ্যোগের পক্ষে এমনিতেই এই অর্থপ্রসূ ক্ষেত্রটি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ঘাটতি বাণিজ্যের উষ্ণনিঃশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্যের রসধারাও শুষ্ক হইতে চলিয়াছে। এমতাব্যবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যে বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কোথায়?

চাকরিজীবীর জাত হিসাবে এতদিন বাঙ্গালী সারা ভারতে উপহাসের পাত্র ছিল। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর উচ্চাশা কোনরকমে একটা চাকরি সংগ্রহেই চরিতার্থ হইত। কিন্তু

আজ সে-ক্ষেত্রও প্রতিযোগিতায় কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা হইতে বাঙ্গালী ক্রমেই হটিয়া আসিতেছে। উচ্চস্তরের চাকরির দ্বার নানা কারণে তাঁহার নিকট রুদ্ধ প্রায়। কায়ক্লেশে কেরানীগিরি জুটাইতে পারিলেই সে খুশী হইত। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হইবে? এই রাজ্য হইতে নানা দপ্তর একটি একটি করিয়া স্থানান্তরে উঠিয়া যাইতেছে। সেই সব জায়গায় আঞ্চলিক অগ্রাধিকারের দাবী মানিয়া লইয়া আর বাঙ্গালীকে ঠাঁই দেওয়া যাইতেছে না। অপরপক্ষে বাংলায় যে-সব আপিস-কাছারি আছে সেখানে দ্বিমুখী প্রতিযোগিতার চাপে বাঙ্গালী পিষ্ট হইতেছে। একে শিক্ষার হার পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট বেশি, ফলে স্বল্প শিক্ষিতদের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষিতের বিষম প্রতিযোগিতা চলিতেছে। তাহারই পাশাপাশি আছে ভিন্ন রাজ্য হইতে আগত জীবিকান্বেষীর চাপ। আবার অশিক্ষিত বিত্তহীন বা নিম্নবিত্ত বাঙ্গালীর সমস্যাও কম নহে। ভূমিহীন কৃষক কিংবা সঙ্গতিহীন শ্রমিকের পক্ষেও কর্মসংস্থান করা দুরূহ। সামান্য কুলিগিরি পর্যন্ত অবাঙ্গালীর করায়ত্ত। অদক্ষ শ্রমিক, ছোটখাট দোকানদার, মাঝিমাল্লা প্রায় সকলেই অবাঙ্গালী, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে অভারতীয়ও। বহুদিন আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন, বিহার বিহারীর জন্য, উড়িষ্যা ওড়িয়ার জন্য, কিন্তু বাংলা সকলের জন্য। আর সেইজন্যই বাঙ্গালীর কোথাও স্থান নাই।

কিন্তু হতাশ হইবার মত অবস্থা এখনও আসে নাই। শিক্ষা, দীক্ষায় অগ্রসর বাঙ্গালী শ্রমবিমুখ নয়। সম্প্রসারণশীল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে তাহার জন্য নূতন নূতন সম্ভাবনা দেখা দিতেছে। চিকিৎসক, উকিল, হিসাবনবীশ হিসাবে অতীতে সে যেমন নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করিয়াছে তেমনি আজও নূতন বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সে আত্মরক্ষা করিতে পারে। যন্ত্রসভ্যতার অভাবনীয় প্রসারের ফলে বৈষয়িক জগতের প্রায় সকল ক্ষেত্র হইতেই অশিক্ষিত পটুত্ব বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। এই শূন্যস্থান বাঙ্গালী পূরণ করিতে পারে। যন্ত্রবিদ্যা ও প্রয়োগবিদ্যার অধিকারী হইয়া দক্ষ শ্রমিক হিসাবে আত্মরক্ষা করিবার পথ এখনও তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত। বৃত্তির মর্যাদাবোধ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করিয়া ওকালতি, চিকিৎসা প্রভৃতির ন্যায় সে যদি এই নব্যবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে তবেই তাহার মঙ্গল। নতুবা বিপুলসংখ্যক সঙ্গতিহীন শরণার্থী সমেত তাহার ভবিষ্যৎ তিমিরাবৃতই থাকিবে। এইজন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়া তাহার পক্ষে একান্ত দরকার। একদিকে যেমন তাহাকে দণ্ডকারণ্যের ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে অপরদিকেও তেমনি তাহাকে নূতন নূতন সম্ভাবনার দ্বারে আঘাত হানিতে হইবে। সমবায় প্রথার সুযোগ গ্রহণ করিয়া কৃষি, যানবাহন, ছোট এবং মাঝারি শিল্প-ব্যবসায়ে অগ্রণী ভূমিকা তাহারই লওয়া উচিত। বুদ্ধির সহিত শ্রমের সমন্বয়ে নূতন দৃষ্টান্ত সারা ভারতের সামনে আজ সে-ই তুলিয়া ধরিবে।

আর এই চেষ্টায় তাহার সফলতার সম্ভাবনা সর্বাধিক। এই ভাবপ্রবণ জাতির আবেগ উদ্দীপ্ত হইলে কিছুই তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য থাকিবে না। কিন্তু আবেগ, সততা এবং আন্তরিকতাই যথেষ্ট নহে। বাস্তববুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নূতন উদ্যমে তাহাকে বুক বাঁধিতে হইবে। অতীত গৌরবে মশগুল ও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে তাহাকে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। অতীতের বিলাস ব্যক্তির ন্যায় জাতিকেও কর্মবিমুখ করিয়া তোলে। বাঙ্গালীকে যাহারা কর্মবিমুখ বলে তাহাদের মুখের মত জবাব দিবার জন্য আজ প্রতিটি বাঙ্গালীরই প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

৮
কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনা

কলিকাতার গৌরব অস্তগামী হইলেও এখনও উহা শূন্যে মিলাইয়া যায় নাই। খণ্ডিত বাংলার রাজধানীই ইহার একমাত্র পরিচয় নহে। কাহারও কাহারও দুঃস্বপ্নের কারণ হইলেও কলিকাতা এখনও অনেকের স্বপ্ননগরী। আবেগকে বাদ দিয়া নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকাইলে দেখা যাইবে, কলিকাতার কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে অসংখ্য জনের হৃৎস্পন্দন মিশিয়া আছে। 'নরক-নগরী' কলিকাতার কল্যাণী মূর্তি এখনও নিষ্প্রভ নহে। দেশবিদেশে পণ্য বিতরণ করিয়া অনেকেরই অন্ন সে আজও সংস্থান করিয়া থাকে। বাণিজ্যকেন্দ্র তথা বন্দর রূপে কলিকাতার আকর্ষণী শক্তি বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নাই। তাহার আবেদন শুধু বাঙ্গালীর কাণে নহে, ভারত ও পাকিস্তানের অনেকের নিকটই পৌঁছিয়াছে। অর্থোপার্জনের এত বড় শ্রীক্ষেত্র ভারতে আর নাই বলিলেই চলে। চা, পাট, কয়লা, লৌহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কৃষিজ ও খনিজ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি কলিকাতার সমীপবর্তী। পূর্ব ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল কলিকাতা বন্দরের উপর কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানীর জন্য নির্ভরশীল। কলিকাতার আশে-পাশে ভাগীরথীর দুইধারে অগণিত কলকারখানা দিবারাত্র ধূম উদগীরণ করিয়া অসংখ্য-জনের প্রাণবহ্নি অনির্বাণ রাখিয়াছে। এখানকার সরকারী-বেসরকারী কত শত প্রতিষ্ঠান সারা ভারতের কর্মপ্রার্থী মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানাইতেছে।

কলিকাতা সকলের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে। তাই সে নানা সমস্যার পাশে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। বহু লোকের মুখে অন্ন যোগাইয়া সে অনেকেরই বাসভূমি হইয়াছে। পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল সকলেরই জীবিকাক্ষেত্র এই কলিকাতা। ফলে ইহার জন-সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এই জনসমুদ্রে আসিয়া যোগ দিয়াছে কয়েক লক্ষ বাস্তুহারা। ফলে কলিকাতায় আর্তরব

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই"। জীর্ণ নোনা-ধরা বাড়ির স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে হাজার হাজার পরিবার শুধু প্রাণধারণের গ্লানি বহন করে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটাইবার সামান্য আয়োজনও নাই—এইরূপ বস্তিতে অনেককেই এখানে দিনযাপন করিতে হয়। মাথা গুঁজিবার ঠাঁই নাই, পানীয় জল নাই, ময়লা-নিকাশের কোন ব্যবস্থা নাই, তবু ঠেলা-ঠেলি ধাক্কাধাক্কি করিয়া মানুষকে এখানে থাকিতে হয়। ট্রাম-বাসে ঝুলিবারও উপায় নাই, ফুটপাথে পা ফেলিবারও জায়গা নাই। ইহার মধ্যেই মানুষ টাকার অন্বেষণে ঘুরিতেছে। তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা কোন কিছুই পর্যাপ্ত নহে; ধূম, ধূলায় রাজপথ পরিকীর্ণ। নামমাত্র বৃষ্টিপাতে এই সকল রাজপথই জলপথে পরিণত হয়। তাহার উপর নানা মানুষকে নানা প্রয়োজনে মিছিলের সামিল হইতে হয়। এমতাবস্থায় স্নায়ুর উপর যে-চাপ পড়ে তাহা মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার অনুকূল নহে। গোটা নগরী যেন অন্তরে-বাহিরে অন্ধ হইয়া প্রলয়ের দিকে ছুটিয়াছে।

অবস্থা এমনই সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে যে, কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। 'ভারত-ভাগ্য-বিধাতা'র টনক নড়িয়াছে। 'দুঃস্বপ্ন নগরী', 'মিছিল নগরী,' 'আবর্জনাপুরী' কলিকাতার নাভিশ্বাস সকলের তন্দ্রা টুটাইয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, কলিকাতাকে আর ভাগ্যের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। অযত্ন-বর্ধিত, যথেচ্ছ-বিন্যস্ত এই নগরীর সহিত অনেকেরই নাড়ীর টান। ভারতীয় অর্থনীতির স্নায়ুকেন্দ্র কলিকাতাকে তাচ্ছিল্য করিলে সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক কর্মপ্রবাহ বিপর্যস্ত হইবে। কি বাণিজ্যকেন্দ্র, কি বিমান-বন্দর, কি শিল্পনগরী কোনদিক দিয়াই কলিকাতার স্থান সহজে পূরণ হইবার নহে। তাই কলিকাতাকে বাঁচাইতে হইবে, উহার বন্দরকে রক্ষা করিতে হইবে এবং উহার বাসিন্দাকে সুস্থ মনোরম পরিবেশে থাকিতে দিতে হইবে। খেয়াল-খুশি মাফিক যে-নগর গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে পরিকল্পিত শৃঙ্খলার মধ্যে আনিত হইবে। প্রাচীনকালের যে-সমস্ত জনপদ মাটি চাপা পড়িয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয় হইয়াছে উহাদের সহিত কলিকাতার ভাগ্যকে সমসূত্রে যোজনা করা চলে না। সমস্যা যখন মানুষ ও তাহার সমাজ-ব্যবস্থার হাতে সৃষ্ট, সমাধানও তখন মানুষেরই হাতে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গকে নহে, গোটা ভারতকে বাঁচাইতে হইলে কলিকাতার উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশ্বব্যাঙ্ক এবং বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থার মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাই কলিকাতার সমস্যা লইয়া মাথা ঘামায়। বৃহত্তর কলিকাতা গঠনের পরামর্শ তাঁহাদেরই।

কলিকাতাকে বাঁচাইতে হইলে বহুমুখী পরিকল্পনার প্রয়োজন। বিশ্বস্বাস্থ্য-সংস্থা কলিকাতার জল সরবরাহ ব্যবস্থার জরিপ করিয়া সমস্যার ভয়াবহতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

করিয়াছেন। প্রতি বৎসর প্রাচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ও বন্দর, কলিকাতা শুধু জলের জন্যই কলেরায় বছরে বছরে অসংখ্য সন্তানকে হারায়। এখানকার ময়লা নিকাশের ব্যবস্থাও যে যথেষ্ট নহে—ইহাও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। কলিকাতাকে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। আবার ইহার পশ্চাদ্‌ভূমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ইহার অন্যবিধ সমস্যার সমধান করিতে হইবে। বিশ্বব্যাঙ্ক আমাদের সামনে সমস্যার এই দিকটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। বেকার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, বাসগৃহ, নূতন শিল্পোদ্যোগের জন্য স্থান সংকুলান, রাস্তাঘাট, যানবাহন এবং সর্বোপরি উদ্বাস্তুর বাস্তবিধান কণ্টকিত নগরকে মজ্জমান দশা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। কলিকাতার বিকল্প কোন বন্দর নাই—ইহা স্মরণে রাখিলে সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। এইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনার যথোপযোগী রূপায়ণ প্রয়োজন, কলিকাতাকে বাঁচাইবার দায় ও দায়িত্ব ভারত সরকারের। আর যত শীঘ্র উহা লওয়া হয় ততই দেশের মঙ্গল। এইজন্য একদিকে গঙ্গাবাঁধ পরিকল্পনা সফল করিতে হইবে। অপর দিকে বৃহত্তর কলিকাতা গঠনের উপর জোর দিতে হইবে। এইজন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা The Calcutta Metropolitan Authority নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছেন। বজবজ হইতে কল্যাণী পর্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী পৌর অঞ্চল লইয়া এই বৃহত্তর কলিকাতা গঠিত হইবে: বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়নের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার সংস্থান করা কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় উদ্যমের উপরই নির্ভর করে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হন নাই। একটি ইস্পাত কারখানার মতই কলিকাতার উন্নতি যে দেশের অর্থনীতির জন্যই জরুরী—এ-কথা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য কাজ শুরু করিয়াছেন। লবণহ্রদ বুজাইয়া একটি উপনগরী পত্তনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহাদের উদ্যোগে কল্যাণীতেও একটি উপনগরী গড়িয়া উঠিয়াছে। এই উপনগরীগুলিতে বাস, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান ছাড়াও অন্যান্য নাগরিক সুবিধার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু কলিকাতার আশে-পাশে যে-সকল পৌর অঞ্চল ও উদ্বাস্তু উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের কি হইবে? মেট্রোপলিটান অথরিটির কাজ শুরু না হইতেই আভ্যন্তরীণ কোঁদলের জন্য এই পরিকল্পনা ফাঁসিয়া যাইতে বসিয়াছে।

এমতাবস্থায় কলিকাতা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে জাতীয় কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব ভারতের এই স্নায়ুকেন্দ্রটি নষ্ট হইয়া গেলে শুধু পশ্চিমবঙ্গই নহে সমগ্র ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। বহু জাতি ও সংস্কৃতির মিলনতীর্থ অগ্রগামী চিন্তার প্রসূতি কলিকাতা আমাদের গর্ব ও গৌরবের স্থল। দেশী-বিদেশী ভি. আই. পি-র জন্য ক্বচিৎ কখনো বিশেষ বিশেষ পথ মাজিয়া ঘষিয়া চকচকে করিলেই ইহার সমস্যার সমাধান

হইবে না। বস্তিতে আর কানাগলিতে অসূর্যম্পশ্য ঘরগুলিতে যাহারা রোগ ও মৃত্যুর সহজ শিকারে পরিণত হইয়াছে তাহারা যে দেশের জনসমাজকেই দুর্বল ও রিক্ত করিতেছে, অলিতে-গলিতে যে-যুবক অলস স্বপ্নবিলাসে কালাতিপাত করিতেছে সে দেশেরই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়া তুলিতেছে—এই কথা ভুলিলে চলিবে না। তাই সময় থাকিতে কলিকাতাকে বাঁচাইবার চেষ্টায় দৃঢ়ব্রত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

৯

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মধ্যবিত্ত সমাজ

বৃদ্ধ পিতামহ সেদিন তাঁহার পৌত্রীর স্কুলের বেতন দিতে গিয়া সখেদে স্কুলের কেরানীবাবুকে বলিয়া আসিলেন যে, তাঁহাদের সময়ে এফ. এ. ক্লাসে পড়িতেও কখনো এত টাকার বেতন দিতে হইত না। পুত্রের সহিত এই বৃদ্ধটির মতান্তর-মনান্তরের অবধি নাই। সঞ্চয় করা যে বিশেষ প্রয়োজন—এই সামান্য সত্যটুকু তিনি তাঁহার শিক্ষিত উপযুক্ত পুত্রকে বুঝাইতে পারেন না। প্রতি মাসেই তাহার নাকি খরচে টান পড়ে; অথচ মাসে তিনশত টাকা বেতন সে পায়। ব্যয় কমাইবার দিকে এ-যুগের মানুষের আগ্রহ নাই, সঞ্চয় হইবে কিরূপে! তিনি নিজে কখনও মাসে একশত টাকার বেশী উপার্জন করেন নাই, তথচ তিনি সংসার প্রতিপালন করিয়াও বাড়ি করিয়াছিলেন, জমি-জমা করিয়াছিলেন, দুই কন্যার বিবাহে যথেষ্ট ব্যয় করিয়াও পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দিয়াছিলেন। আজ তাঁহার সেই পুত্র তিনশত টাকা বেতন পাইয়াও প্রতি মাসের ২০।২৫ তারিখে হাত উল্টাইয়া বসিয়া থাকে। সঞ্চয় কর দূরের কথা, ঋণ করিবার কথা ভাবে। রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে বৃদ্ধের বাড়ি-ঘর জমি-জমা পররাষ্ট্রের অধীন হইয়াছে, তাই তাঁহাকে পুত্রের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। উপায় থাকিলে তিনি কখনও এই অমিতব্যয়ী পুত্রের সংস্পর্শে থাকিতেন না।

হায়, মধ্যবিত্ত সমাজের বিগত যুগ-প্রতিনিধি, তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে এ-যুগের মর্মজ্বালা! অশন-বসন, আয়াস-আবাস সকল কিছুরই মূল্য যে কতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা তোমাকে কে বুঝাইবে! যে-ধুতি তোমার পরিধানে—তোমাদের কালে তাহার মূল্য ছিল দুই টাকা, আজ দশটি মুদ্রা গুনিয়া দিতে হয়। তোমার পুত্রের শিক্ষাজীবনে তুমি যে ত্রিকক্ষ গৃহটির জন্য সাড়ে তিন টাকা ভাড়া দিতে আজ তাহার ভাড়া যে সত্তর টাকার কম নহে। পৌত্রীর দুধের বাটির দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছ যে এত অল্প দুগ্ধ পান করিয়া তোমার সাধের পৌত্রীর স্বাস্থ্য টিকিবে কিনা! কিন্তু, ঐ এক পোয়া দুধের যাহা মূল্য তোমাদের কালে তাহারা অনায়াসে পাঁচ পোয়া দুগ্ধ মিলিত। ভাত

খাইতে বসিয়া মৎস্যের টুকরাটির দিকে চাহিয়া মনে মনে পুত্রবধূর প্রতি অসন্তুষ্ট হও কি? হে শুভ্রকেশ, তুমি তো জান না, ঐ আয়তনের মৎস্যখণ্ড কখনও তোমার উপার্জক পুত্রের পাতে বধূমাতা দিতে পান না! অপেক্ষা কর, তোমার ঐ পৌত্রটি আরও একটু বড় হউক; তখন তাহার নিকটে যদি তোমার কালের মাছ-দুধ, তরি-তরকারি কেমন ছিল তাহার কথা বলিতে যাও সে নির্ঘাৎ শুনিয়া হাসিবে; বলিবে— 'ও সবই তোমার গপ্পো দাদু! মাছ কখনও অত সস্তা হয়!'

ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে বাঙ্গালার মধ্যবিত্ত সমাজ আজ উপনীত। মহাযুদ্ধ, মহামারী, বিপ্লব, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মুহুর্মুহু রণহুঙ্কার—বিগত দুই শতকের মধ্যে কত কাণ্ডই না ঘটিয়া গেল। সেই নানা কাণ্ডের তরঙ্গ-বিক্ষোভ মধ্যবিত্ত সমাজকেই সর্বাধিক মথিত করিয়াছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতে ইংরেজ সওদাগরের হৌসে হৌসে কর্মচারী-জীবন যাপন করিয়া এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে যে মধ্যবিত্ত সমাজ এই বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাঁধা-বেতনের কিংবা নিশ্চিন্ত অর্থাগমের সুখস্বাদে যাহারা দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, আজ সেই চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ ভাঙনের মুখে। বলা যাইতে পারে, সেই পুরাতন মধ্যবিত্ত সমাজ যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে তেমনি নূতন এক মধ্যবিত্ত সমাজ আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। বাঁধা-বেতনের চৌহদ্দি হইতে বাহির হইয়া অনিয়মিত বিত্তোচ্ছ্বাসে ভাসিয়া উঠিতেছে সামনের এক অংশ; আজ তাহারাই নূতন মধ্যবিত্ত।

এই নূতন মধ্যবিত্ত সমাজের পরিচয় নিহিত আছে সাম্প্রতিক পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ও তাহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে।

পুরাতন মধ্যবিত্তের সেদিন আজ বিগত। বাঁধা-বেতনের চৌহদ্দির মধ্যে থাকিয়াও যাহারা দোল-দুর্গোৎসব করিত, জামাই-বাড়িতে তত্ত্ব পাঠাইত, পাল-পার্বণে আনন্দ-উৎসবে অর্থব্যয় করিয়াও যাহারা কিছু সঞ্চয় করিতে পারিত, আজ তাহাদের অবর্ণনীয় দুর্দশা। তাহাদের জীবনে অর্থাগমের সেই সীমারেখা লঙ্ঘিত হইতেছে না, অথচ, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার পদে পদে অর্থব্যয়ের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে বাঙ্গালী-মধ্যবিত্তের সেই পুরাতন সংস্কৃতি আজ বিধ্বস্ত। অর্থার্জনের সন্ধানে সেই পুরাতন সমাজের উত্তরপুরুষগণ কেহ ছুটিয়াছে কল-কারখানায়, কেহ-বা বাণিজ্যের সন্ধানে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে মানুষের হাতে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু মুদ্রামূল্য হ্রাস পাওয়ায় তাহার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে। একদল মধ্যবিত্ত যেমন ক্রমাগত বিত্তহীন হইতেছে, সকল সামাজিকতা ও সংস্কৃতি-চর্চা পরিহার করিতে বাধ্য হইতেছে, তেমনি অন্যদিকে আরেকদল মধ্যবিত্তের ভাগ্যে কল-কারখানায় কর্ম জুটিয়াছে, যন্ত্রবিদ্যা-বিশারদ হওয়ার ফলে উচ্চহারের বেতন তাহারা পাইতেছে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের

দল অধিক অর্থ উপার্জন করিতেছে বটে, কিন্তু সনাতন বাঙালী সংস্কৃতির সেই আড়ম্বরপূর্ণ জীবন তাহারা যাপন করিতে অনিচ্ছুক। উচ্চ বেতনভোগী এই মধ্যবিত্তের দল পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণেই অধিক আগ্রহান্বিত। তাই, দেবসেবা, অতিথি-সৎকার, কুটুম্বিতায় তাহাদের বিশ্বাস নাই। এই নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের আরেক অংশ—যাহারা অপেক্ষাকৃত অল্পশিক্ষিত—মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্যমূল্যবৃদ্ধির দৌলতে তাহারা বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ করিতেছে। লাভ ও লোভ তাহাদের এমনভাবে তাড়না করিতেছে যে, পাল-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, অতিথি-সেবার ন্যায় পুরাতন মধ্যবিত্তের অভ্যাসগুলি পুনঃপ্রবর্তিত করিবার অবসর তাহাদের নাই। মুদ্রার যে-একটা উত্তাপ আছে তাহা ব্যবসায়জীবী মধ্যবিত্তের দলকে সর্বদা উত্তপ্ত রাখিয়াছে।

পণ্যমূল্যবৃদ্ধির আরও এক পরোক্ষ-প্রতিক্রিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে লক্ষ্য করা যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত সমাজ এতকাল গ্রাম হইতে টাকা আনিয়া শহরে বাস করিতেন। কৃষিকর্মের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কৃষকের নিকট জমি বণ্টন করিয়া দিয়া তাঁহারা চলিয়া আসিতেন নগরে। অর্থাৎ নগর ছিল মধ্যবিত্তের কৃষ্টিকেন্দ্র। আজ, বাণিজ্যজীবী ও চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত ছাড়াও এক কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত গ্রামে গ্রামে জাগিয়া উঠিয়াছে। পণ্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে গ্রামের কোন কোন কৃষক পরিবারের হাতে টাকা জমিয়াছে। কৃষক সন্তান আজ অধিক অর্থাগমের ফলে শহরে আসিতেছে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ করিতে, দূর নিভৃত পল্লীর কৃষকগৃহে আজ রেডিও বাজিতেছে, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছে, সংবাদপত্র-সাময়িক-পত্রের চাহিদা দেখা দিতেছে। এমনই করিয়া এক গ্রামীণ মধ্যবিত্ত সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে, কিন্তু গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সেই মনোবৃত্তি তাহাদের নাই। পুরুষপরম্পরায় কৃষিকর্মের সহিত যাহারা যুক্ত ছিল আজ আকস্মিক বিত্তোচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে তাহারা মধ্যবিত্তে পরিণত হইতেছে বটে, কিন্তু মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির সেই প্রাচীন রূপটি তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এক কথায়, যে বৃদ্ধ পিতামহ পৌত্রীর স্কুলের বেতন দিতে গিয়া খেদোক্তি করেন, পুত্রের সহিত অর্থ নৈতিক ব্যাপারে সর্বদা ভিন্নমত থাকেন এবং নিজের কালের মাছ-দুধ তরি-তরকারীর স্মৃতি রোমন্থন করিয়া বালিকা-পৌত্রীর কাছে উপহসিত হইবার সম্ভাবনা রাখেন, তাঁহার পুত্রের দল আজ আর মধ্যবিত্ত নাই। নিম্নবিত্ত-জীবনের সমস্ত অভাব-অভিযোগ, সমস্যা-সংকট আজ সেই সব ভূমিহীন, শ্রমহীন ও অব্যবসায়ী বেতনভুক মধ্যবিত্তের জীবনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। ঐতিহ্যের প্রসাধনটুকু তাহাদের দেহে লাগিয়া আছে, বর্তমানে সেই সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যকে জাগাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। পরিবর্তে, যে নূতন মধ্যবিত্ত সমাজ আজ দেশব্যাপী জাগিয়া

উঠিয়াছে সে-সমাজ ত্রিধাবিভক্ত—শ্রমিক, বণিক ও কৃষক। এই নূতন মধ্যবিত্তের একদল কল-কারখানায় উচ্চ বেতনভোগী শ্রমিক। একদল মুনাফার বাজারে পণ্য-বিক্রেতা বণিক ও তৃতীয় দল মুদ্রাস্ফীতির যুগে শস্যবিক্রেতা কৃষক। প্রাচীন মধ্যবিত্তের সেই সমাজ-সংস্কৃতির ঐতিহ্যটুকু রক্ষা করা ইহাদের কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

১০

ভারতের জনসমস্যা

বর্তমান ভারতে যে-সব সমস্যা তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা তাহাদের অন্যতম। বিগত দুইটি পরিকল্পনা ও বর্তমান পরিকল্পনাতে জন্মহার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলিয়াছে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে ইহার জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমানতা প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে পরিকল্পনা কমিশনকে প্রতি পদে তাঁহাদের হিসাব বদলাইতে হইতেছে। নিত্যনূতন সমস্যার উদ্ভব হওয়ায় তাহারা প্রতিকারের নূতন উপায় তাঁহারা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিবিড় এবং পরস্পর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশগুলিতে এই পারস্পরিক সম্পর্ক আরও স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয়। কোন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব দ্বিবিধ। প্রথমতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মৃত্যুর হার কমিয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে জন্মের হার বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ভারতেও ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। বিগত দুইটি পরিকল্পনার সমাজসেবা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিমূলক কার্যের জন্য মৃত্যুর হার কমিয়া গিয়াছে, এদিকে সামান্য স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারেরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আবার, জনসংখ্যা বৃদ্ধিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমতঃ বর্তমান কাঠামো স্থির থাকিয়া জনসংখ্যাতে কোন পরিবর্তন হইলে, জমির উপর চাপ বেশী পড়ে। ভারতে ইহা প্রকট। আবার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকৃতির অপূরণীয় উপকরণগুলি দ্রুত নিঃশেষ হইতে থাকে এবং মূলধন গঠনের হারও ত্বরান্বিত হইতে পারে না। ভারতে ইহাও স্পষ্টই প্রতীয়মান। ভারতীয় কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকারী বর্তমান। আবার যে-হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাব পরিকল্পনা কমিশন করিয়াছিলেন, প্রকৃত বৃদ্ধি তাহা অপেক্ষা বেশী হওয়ায় উৎপাদনের সমস্ত লক্ষ্যেরই পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছে ও ইহারই ফলে উপযুক্ত বিনিয়োগ না হওয়ায় জাতীয় আয়েরও দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে নাই।

এই বৃদ্ধির রূপ জানিতে হইলে কতকগুলি তথ্যের প্রয়োজন। ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ভারতের বর্তমান জনসংখ্যা ৪৩·৮ কোটির মত। লাল চীনের কথা বাদ দিলে ইহা পৃথিবীর প্রধান জনসমৃদ্ধ দেশ। গত দশকে প্রতি বৎসর জনসংখ্যা ২% এর কিছু বেশি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যু হার কমিয়া গিয়া প্রায় ১০% হইয়াছে, ও জন্মহার বাড়িয়া গিয়া প্রায় ২৭%এ দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে নীট্ প্রজননহারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনাধিক্য বিপুল হইলেও জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩৮৪তে দাঁড়াইয়াছে এবং প্রতি হাজার-করা পুরুষে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমিয়া গিয়া ৯৪০এ দাঁড়াইয়াছে। নগরাভিমুখীনতা বৃদ্ধি পাইলেও, এখনও শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক গ্রামে বাস করে। উন্নয়নের ফলে নানাধরনের কর্মসংস্থান হওয়া সত্ত্বেও জীবিকা নির্বাহের ধরনে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এখনও শতকরা প্রায় ৬৯ জন লোক কৃষিতে নিযুক্ত আছে।

জনসংখ্যার এই ভয়াবহ বৃদ্ধিতে সারা দেশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাইতেছে। অনেকে মনে করেন যে, পণ্ডিতপ্রবর ম্যালথাসের সেই ভয়াবহ ভবিষ্যদ্বাণী ফলিবার দিন আসিয়াছে। ভারতের এই জনাকীর্ণতার প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা উচ্চ জন্ম ও মৃত্যু হার, জমির উপর অতিরিক্ত চাপ, ক্রমবর্ধমান খাদ্যসমস্যা ও বেকারী ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন। আবার অনেকে এই জনাকীর্ণতাকে অস্বীকার না করিলেও, ইহার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেন না। তাঁহাদের মতে পৃথিবীর অনেক দেশেই বিগত কয়েক দশকে জনসংখ্যা ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত, যে-পরিমাণ জমি ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহৃত বা অর্ধ-অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহা ঠিকমত কাজে লাগাইলে বর্তমান জনসংখ্যাকে মোটেই ভয়াবহ বলিয়া মনে করা চলে না। এই দ্বিতীয় দলটির প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে অপেক্ষাকৃত কম জনাকীর্ণ দেশের বেশী অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা জনাকীর্ণ দেশের কম অনুপাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তীব্রতা অধিকতর অনুভূত হয়। আমরা কোনোমতেই আর বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পাইলেও জীবন-ধারনের মান এখনও অতি নিম্নস্তরে রহিয়া গিয়াছে। তাছাড়া প্রকৃত আয় মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। অব্যবহৃত বা অর্ধ-ব্যবহৃত সম্পদ হয়তো অনেক আছে, কিন্তু যে-হারে তাহাদের ব্যবহার হইতেছে তাহাতে জনাধিক্য ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে (১৯০১ হইতে ১৯৫১ পর্যন্ত) যেখানে জনসংখ্যার হার শতকরা ৪৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কর্ষণযোগ্য অতিরিক্ত জমি ৫%এর বেশী বৃদ্ধি পায় নাই। বর্তমানেও এই হারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। বর্তমান খাদ্যসমস্যা প্রধানতঃ উৎপাদনের। এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য যে-খাদ্য প্রয়োজন তাহার বেশ কিছু অংশই প্রতি বৎসর বাহির

হইতে আমদানি করিতে হইতেছে। বর্তমান কৃষি-কাঠামোতে, মন্ত্রীরা যতই বলুন, ইহার বেশী উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। বাস্তব অবস্থা বিচারে দেখা যায় যে, প্রকৃত ভূমি সংস্কার আজও আমাদের দেশে হইয়া উঠে নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না অধিক জমি উৎপাদনের আওতায় আনা যাইবে কিংবা বর্তমান জমির একক-পিছু আয়তন বাড়াইয়া যন্ত্র ব্যবহার অর্থাৎ নতুন উৎপাদন-পদ্ধতি অবলম্বন না করা হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই। ম্যালথাসের জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়মের প্রধান স্বীকার্য বিষয় খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমানতার নিয়মের প্রভাব। অন্ততঃ এইটিকে বর্তমান অবস্থায়-ভারতে মানিয়া লইতেই হয়। এবং ইহার অপর দিক অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কাজেই অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবেও ভারতে জনাধিক্য হইয়াছে ইহা স্বীকার করিতে হয়। কৃষিক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন বেকারির সমস্যাও বাড়িয়াই চলিয়াছে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা বিনা কৃষিক্ষেত্রে আয় বাড়ে না, অথচ উহা না হইলে শিল্প প্রসার ঘটিতে পারে না।

এই সমস্যার সমাধান খুবই দুরূহ, কারণ ইহার সঙ্গে সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বহু কারণই জড়িত আছে। বর্তমান অবস্থায় পরিবার পরিমিতায়ণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিগত দুইটি পরিকল্পনাতে ও বর্তমান পরিকল্পনাতেও ইহার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তবুও এই প্রচেষ্টা জনপ্রিয় ও ফলপ্রসূ হইতে পারে নাই। ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়াও সমাজব্যবস্থা এখনও এই প্রচেষ্টাকে মানিয়া লইতে পারে নাই। বিশেষ করিয়া দরিদ্র, অজ্ঞ গ্রামবাসীদের মধ্যে এই পরিকল্পনা উপযুক্তরূপে প্রচারও হয় নাই। অর্থনৈতিক কারণগুলি হইল, শ্রমিকশ্রেণীর নিকট অতিরিক্ত সন্তানের অর্থ অতিরিক্ত আয়, তাই তাহারা পরিবার পরিমিতি চাহে না। ইহা ব্যতীত জন্মনিরোধ সংক্রান্ত যে-সব উপায় আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞ জনসাধারণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না এবং এইসব উপায় ব্যয়সাধ্যও। এইসব কারণেই সরকারের প্রচার ও গ্রাম বা শহরাঞ্চলে ক্লিনিক স্থাপনা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই। তবুও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ইহারই উপর জোর দিতে হইবে।

মোটকথা, বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন না করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল আস্বাদন করিতে হইলে এই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার গতিরোধ করিতে হইবে। ইহার জন্য যে শুধু সরকারী সাহায্য চাই তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকেও সহযোগী হইতে হইবে। জনসাধারণের সামনে এক সুন্দর ও উজ্জ্বল জীবনের ছবি তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইতে হইবে যে এই ধরনের জীবনযাত্রা তখনই সম্ভব যখন পরিবার পরিমিত হয়। শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে, না হইলে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইবার নয়। অপরদিকে অকর্ষিত

জমিগুলিকে কৃষির আওতায় আনিতে হইবে। তাহা হইলে ম্যালথুসীয় নীতি দূর-ভবিষ্যতে যদি কোথাও কার্যকরী হয়, তাহা ভারতে হইবারই সম্ভাবনা।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন বিশেষভাবে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আজ যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমিয়াও যায়, তাহা হইলেই কি আমাদের মাথাপিছু আয় বিপুলবেগে বাড়িয়া যাইবে? ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনশন ও হতাশার হাত হইতে ভারতবাসী রক্ষা পাইবে? তাহা কিন্তু সত্য নয়। এই সকল দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী আমাদের অর্থনৈতিক অনুন্নতি ও অচলাবস্থা। তাই একমাত্র অতিদ্রুত এই অর্থ-নৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়াই উন্নয়নের হার বাড়ানো সম্ভব—জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার কমাইলে আপনা-আপনিই আমাদের উন্নয়নের হার বাড়িয়া যাইবে না। ভারতের আদমসুমারী কমিশনার ঠিকই বলিয়াছেন যে, ভারতের জনসাধারণ জৈবিক দিক হইতে অস্বাভাবিক নয়। দ্রুত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের উপযোগী নূতন অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে যাহারা অপারগ এবং জনবৃদ্ধি কমানোই সমাজতন্ত্র রোধের উপায় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন—বরং তাহাদেরই কিছুটা "অস্বাভাবিক" বলিয়া মনে করা চলে।

১১

"ভারতের খাদ্যসমস্যা"

বর্তমান ভারতবর্ষ বিচিত্র সমস্যাভারে বিজড়িত। তাহার মধ্যে আজ আমাদের প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সর্বদিকে অপ্রতুলতা। বস্তুতঃ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিমাণে মানুষের আয় বাড়িতেছে না; শিল্পায়নের ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই সম্পদের যোগ্য অংশ পাইতেছে না। সর্বোপরি, এক-একটি করিয়া পরিকল্পনার কাজ সম্পন্ন হইতেছে কিন্তু মানুষের বেকারি ঘুচিতেছে না, অন্নের সংস্থান হইতেছে না। ফলে দিকে দিকে যে শুধু দুর্ভিক্ষেরই পদধ্বনি শোনা যাইতেছে, তাহা নহে। আমাদের পরিকল্পিত অর্থনীতির উন্নয়নও এক কঠিন বাধার সম্মুখীন হইয়াছে।

ভারতের বর্তমান খাদ্যাবস্থা আলোচনা করার পূর্বে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে খাদ্যের ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাহা অনুধাবন করা দরকার। অপূর্ণোন্নত বা অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্পোন্নয়নের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায় কৃষির অনুন্নতি। এইসব দেশে মূলধনের অভাব সর্বজনবিদিত। তাই শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হইতে গেলে মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতি ছাড়িয়া, অন্ততঃ প্রাথমিক ভাবে কোন সূত্র হইতে প্রয়োজনীয় মূলধন না

পাওয়া গেলে, শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতি অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ এই সব দেশে জন-সংখ্যার অধিকাংশই কৃষিতে নিযুক্ত থাকে ও খুব অল্পসংখ্যক লোকই শিল্পে নিযুক্ত থাকে। যেমন, ভারতবর্ষে শতকরা ৬৯ জন লোক কৃষিতে ও শতকরা ১০ জন লোক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত আছে। কাজেই শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে শিল্পায়ন করিতে গেলে কৃষি হইতে লোক সরাইয়া আনিতে হইবে। এই সমস্ত লোক যাহারা শিল্পে নিযুক্ত হইবে, তাহাদের খাদ্য আর তাহারা নিজেরা উৎপাদন করিবে না। ইহা ব্যতীত, প্রদর্শন-প্রভাবে তাহাদের ভোগের ধরনেরও পরিবর্তন ঘটিবে। সেক্ষেত্রে এই বর্ধিত শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাইতে হইলে অধিকতর খাদ্যের প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করিতে পারিলে, উদ্বৃত্ত খাদ্য রপ্তানি করিয়া আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারি। ফল কথা, জীবনযাত্রার মান ও শ্রমিকশ্রেণীর কর্মক্ষমতা বাড়াইবার জন্য আরও অধিকতর খাদ্য প্রয়োজন।

কাজেই দেখা যাইতেছে উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে খাদ্যোৎপাদনের গুরুত্ব কতখানি। উদ্বৃত্ত খাদ্যের কথা বাদ দিলেও, প্রয়োজনীয় খাদ্য দেশে উৎপন্ন না হইলে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। ইহার ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় ঘটে এবং শিল্পায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আমাদের আমদানি করা সম্ভব হয় না, অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় যোজনার সময় হইতেই ভারতে এই অবস্থা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি।

ভারতীয় খাদ্যসমস্যাকে যোগান ও চাহিদার দিক হইতে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা পূর্ব অনুচ্ছেদে শেষোক্ত দিক হইতে খাদ্যের গুরুত্ব কতখানি তাহা আলোচনা করিয়াছি। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যও অধিকতর খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনাতে পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন যে, বাৎসরিক ১·২৫% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু জনসংখ্যা ২%হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ও মুদ্রাস্ফীতিজনিত অতিরিক্ত অর্থ প্রধানতঃ খাদ্যে ব্যয়িত হওয়ায় এই চাহিদা ৮ কোটি ৫ লক্ষ টনে গিয়া দাঁড়ায়। তৃতীয় যোজনা-কালে ১০ কোটি টন হইতে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দ্বিতীয় যোজনাকালের প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে লক্ষ্যের হিসাব বদলাইলেও এবং যাহাতে সেই লক্ষ্যে পৌছানো যায় তাহার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করিলেও মোট উৎপাদন আনুমানিক ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

যোগানের দিক দিয়াও এই সমস্যাকে আবার দুই ভাবে আলোচনা করা যায় —উৎপাদনের দিক হইতে ও বণ্টনের দিক হইতে। উৎপাদনের দিক দিয়া বলিতে

গেলে এই স্বল্প উৎপাদনের প্রথম কারণ জমির কম উর্বরাশক্তি। সুপ্রাচীন কৃষিব্যবস্থা, ক্ষুদ্রায়তন ও খণ্ডবিখণ্ড জমি, জনসংখ্যার চাপ, বিকল্প বৃত্তির অভাব, বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ও জলসেচ ব্যবস্থার ত্রুটি, কৃষকদের দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাব এবং সর্বোপরি জমিদারী প্রথার কুফল ইত্যাদি কারণগুলির ফলেই কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর হইতেছে না। প্রথম যোজনাকালে "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের ফলে খাদ্যোৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু আসল কারণ ছিল নিয়মিত মৌসুমী বৃষ্টিপাত। ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে দ্বিতীয় যোজনাকালে; বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উৎপাদন বাড়ানো যায় নাই। আমাদের দেশে প্রকৃত ভূমি-সংস্কার সাধন এখনও হইয়া উঠে নাই। বহু প্রদেশেই জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাস হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার ফলে সরকারের হাতে কর্ষণযোগ্য জমি বেশি আসে নাই এবং যাহা আসিয়াছে, তাহাও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হয় নাই। গ্রামীণ ঋণসমস্যারও সমাধান হয় নাই। বহু প্রচার সত্ত্বেও দেশের খুব সামান্য জমিই সমবায় চাষের আওতায় আসিয়াছে এবং কৃষির যন্ত্রীকরণ সম্ভবপর হয় নাই। জমির আয়তন যদি না বাড়ানো যায় কিংবা উন্নততর পদ্ধতি যদি অবলম্বন না করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাস-মান নিয়মের প্রভাবই পরিলক্ষিত হইবে। দ্বিতীয় যোজনাতে সরকারের শিল্পের উপর অধিক জোর এবং অপেক্ষাকৃতভাবে কৃষিকে অবহেলা করাকেও একটি কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে উৎপন্ন পণ্যের বণ্টন প্রক্রিয়া অনেকটা এইরূপ। গ্রাম্য মহাজন বা মিল-মালিকেরা প্রকৃত চাষীদের নিকট হইতে উদ্বৃত্ত শস্য লইয়া বাজারে বিক্রয় করে। প্রচুর মুনাফালাভের আশায় ইহারা বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত দিকটিকে দেখে না। সরকার বর্তমানে অবশ্য খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রাথমিক অবস্থাটিকে চালু করিয়াছেন। এই অবস্থায় সরকারের অনুমোদিত পাইকারী ব্যবসাদারেরা গ্রামাঞ্চল হইতে উদ্বৃত শস্য একটি নির্দিষ্ট দামে কিনিয়া শহরের ক্ষুদ্র বিক্রেতাদিগকে একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রয় করিবে। এই দুই দামের পার্থক্যের মধ্যে পরিবহণ ও অন্যান্য খরচ এবং ন্যায্য মুনাফাও পোষাইয়া যাইবে। খুচরা বিক্রেতারা আবার জনসাধারণকে বিক্রয় করিবে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ভালই কিন্তু খুচরা-বিক্রেতারা কি-দামে বিক্রয় করিবে তাহার কোন স্থিরতা না থাকায় ফাটকাবাজী ঠিকই চলিতেছে। অনেক সময় পাইকারী বিক্রেতারাই খুচরা-বিক্রেতা সাজিয়া মুনাফা লুটিতেছে। আবার গ্রামাঞ্চলে ধনী চাষীরা নিজেরাই মজুতদারী করায় উদ্বৃত্ত শস্য অধিক পরিমাণে বাজারে বিক্রয়ার্থ আসিতেছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না উৎপাদক-সমবায় হইতে খাদ্যশস্য সোজাসুজি ভোগকারীদের সমবায়ে আসি-

তেছে এবং ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত ঐ শস্য বণ্টন করা হইতেছে, ততক্ষণ সমস্যার সমাধান হইবার নহে। খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসার চূড়ান্ত ধরনে এই রকম ব্যবস্থার কথাই বলা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসার মধ্যবর্তীকালীন পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। ফাটকাবাজী রোধের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টাও ফলপ্রসূ হয় নাই।

ইদানীংকালে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য শ্রীঅশোক মেহতার নেতৃত্বে খাদ্য-অনুসন্ধান কমিটি যে-বিবরণী পেশ করে, প্রসঙ্গতঃ তাহাও উল্লেখযোগ্য। কমিটির মতে ভবিষ্যৎ চাহিদা, যোগান, দামের পরিবর্তনের পরিমাণ ও গতি সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা খুবই অসুবিধাজনক, বিশেষতঃ যখন দেশে-বিদেশে অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ এত বেশী পরিবর্তনশীল। কমিটির মতে উন্নয়ন-মূলক অর্থনৈতিক কাঠামোতে খাদ্যের দাম অস্থির থাকার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং মোটামুটি যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে দাম স্থির রাখাই বাঞ্ছনীয়। কমিটি দুইটি বোর্ড স্থাপনের কথা বলেন। একটি হইবে দাম-স্থিরতা সাধনকারী বোর্ড ও অপরটি হইবে খাদ্যশস্যের সুস্থিতি সাধনকারী সংগঠন। মজুত খাদ্যের বিক্রয় দ্বারা উচ্চ দাম কমানো যাইবে এবং দাম কম থাকিলে খাদ্য ক্রয় করিয়া উহা সুস্থির করা হইবে। প্রধানতঃ ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে খাদ্য বণ্টিত হওয়া উচিত। ক্ষেত্রবিশেষে বণ্টন বা ঘেরাটোপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে এমনভাবে 'অঞ্চল' ভাগ করিতে হইবে যাহাতে ঘাট্‌তি ও বাড়তি অঞ্চলে সামঞ্জস্য থাকে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ১০ কোটি ৫০লক্ষ টন, অর্থাৎ দ্বিতীয় যোজনার তুলনায় ৩২% বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সমস্যা আরও সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ভোগের ধরনের দ্রুত পরিবর্তনের ফলেই এই চাহিদার বৃদ্ধি হইবে। যোগান নির্ভর করিবে তৃতীয় যোজনায় কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচী কতখানি সাফল্যলাভ করিবে তাহার উপর। তৃতীয় যোজনার অন্যতম লক্ষ্যই হইল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং শিল্প ও রপ্তানির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি। কৃষি উন্নয়ন, জলসেচ ও সমষ্টি উন্নয়নে মোট ১৭১৮ কোটি টাকা খরচ হইবে। উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা, শুষ্ক চাষ প্রথা ও সারের ব্যবহার, উন্নত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রদক্ষ শ্রমিক, সমষ্টি উন্নয়নের প্রসার ও সর্বোপরি সমবায় ভিত্তিক কাজকর্মের মাধ্যমে এই কার্যসূচী সফল করিবার কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ যতক্ষণ না সমবায় প্রথায় চাষ ও কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহার না হইতেছে, ততক্ষণ উৎপাদন বৃদ্ধি হইবে কিনা সন্দেহ। ইহা ছাড়া বণ্টন ব্যবস্থাকে সুষম করিয়া তুলিবার জন্য খোলাবাজারী কার্যকলাপ, দামস্থিরতা বজায় রাখা, ফাটকাবাজীর উদ্দেশ্যে ঋণের পরিমান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থা

অবলম্বন করার কথাও বলা হইয়াছে। আশা করা যায়, এই কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত হইলে আমাদের খাদ্যসমস্যার সমাধান হইবে।

১২

সমবায়মুখী ভারত

দীর্ঘকাল ধরিয়া পরশাসনের ফলে ভারতের মেরুদণ্ড ভগ্নপ্রায় হইয়াছে। গ্রামে-গাঁথা এই দেশের গ্রাম আজও যুগ যুগ ব্যাপী সামাজিক ও অর্থনৈতিক জড়তার ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মান্ধাতার আমলের কৃষি-ব্যবস্থা এখনও এই দেশের অধিকাংশ লোকের জীবিকার অবলম্বন। আর কৃষি-ভারতের কাঠামো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জোতের মধ্যে জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়া ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাবোধ গ্রামের চাষীকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে, জমি ও শ্রমশক্তির অপচয় রোধ করিবার প্রয়োজনীয়তাও সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছে না। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অবহেলা তাহাকে ভাগ্যের ক্রীড়নক করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার, মহাজন ও পুঁজিপতির সহজ শিকারে সে পরিণত হইয়াছে। অথচ এই অবস্থা বেশিদিন চলিতে পারে না। দেশের জনসাধারণ একে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর না করিলে একক প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক. মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি ঘটাইতে পারে না। আত্মশক্তি ও স্বাবলম্বিতার উপর নির্ভর করিলে ধনীর চলিতে পারে, কিন্তু নিঃস্বের চলে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, পারস্পরিক সাহায্য ও সহানুভূতির ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংঘ বা সমিতি গড়িয়া তোলাই তাহার বাঁচিবার একমাত্র পথ। এক কথায় সমবায়ের মধ্যেই তাহার জীয়নকাঠি।

সমাজ-দেহের সংস্কার-সাধন ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠনের মধ্য দিয়া আধুনিক ভারতকে অপূর্ণোন্নতির অভিশাপ মোচন করিতে হইবে। উভয় ক্ষেত্রে যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইতে হইবে তাহা বিনা বিপ্লবে সাধন করিতে হইলে সমবায় প্রথার ব্যাপক এবং সার্থক প্রবর্তন করার দরকার। আমাদের অর্থনীতির শিকড়গুলি দূরবিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাই কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজকর্মের মধ্যে সমবায় প্রথাকে আবদ্ধ করিলে চলিবে না। মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজন সামগ্রিকভাবে সাধন করে এমন কোন সমষ্টিমূলক সমবায় সংগঠন উদ্ভাবন করিতে পারিলেই দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মুনাফার মোহ হইতে যতখানি সম্ভব মুক্ত হইয়া সমবায়ের মূল নীতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করায় মধ্যেই বিজ্ঞানসম্মত উন্নত স্তরের অর্থনীতি কৃষি-

ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা সম্ভব। কেননা, কৃষিপ্রধান দেশে কৃষকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানো, কৃষিকর্মে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োগ এবং কর্মসংস্থান প্রসারের সমস্যাই প্রধান সমস্যা। কায়েমী স্বার্থের মুষ্টি শিথিল করিয়া ঐ সমস্যার সমাধান সমবায়ের মধ্যেই নিহিত। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনে সমবায়ের দূরপ্রসারী তাৎপর্য তাই দেশের উন্নতিকামী চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা বজায় রাখিয়া বৃহৎ মাত্রায় পরিচালনা ও সংগঠনের সুবিধা ভোগ দরিদ্রজনের পক্ষে সমবায়ের মধ্য দিয়াই সম্ভবপর।

তাই আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সমবায় সমিতি কালক্রমে প্রধান স্থান অধিকার করিবে। কৃষিকার্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলসেচ এবং শস্য শোধন, বিক্রয় ও বণ্টন প্রক্রিয়া সমবায়ের সর্বজনস্বীকৃত ক্ষেত্র। পরিকল্পিত ভাবে অগ্রসর হইলে ইহার ক্ষেত্র অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মধ্যেও বিস্তৃত হইতে পারে। গ্রাম্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্থানীয় সুযোগ-সুবিধার যোগান ছাড়াও গৃহ নির্মাণ, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প পরিচালনা, এমন কি পরিবহন কার্যাদিও সমবায়ের ভিত্তিতে শুরু হইতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজে কৃষি, শিল্প এবং সেবা কার্যাদির ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের যে সুবিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার সার্থক রূপায়ণ সমবায় প্রথার সুষ্ঠু প্রয়োগের মধ্যেই নিহিত। নিবিড় ঐক্যবোধে ও বোঝাপড়ার উপর সমবায়ের সাফল্য নির্ভর করে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক হইতে সমসূত্রে গ্রথিত এবং আঞ্চলিক অথবা বৃত্তিগ ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ব্যক্তিবৃন্দই সমবায় সমিতির স্তম্ভ। ফলে স্থানীয় জনগণের ও সমাজের সক্রিয় সমর্থন ও শুভেচ্ছালাভ সমিতির পক্ষে সহজেই সম্ভব হয়। এইজন্য কৃষক, শ্রমিক এবং ক্রেতা সাধারণের প্রয়োজন-সাধনোপযোগী সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ সামাজিক স্থায়িত্বকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। শুধু তাহাই নহে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া ইহারাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীর পুঁজিপতির কার্যকলাপের পাশাপাশি সম্প্রসারণশীল সমবায় ক্ষেত্র সামাজিক কাঠামো ও জাতীয় অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া মানবিক আদর্শের সমুন্নত চিত্রকে প্রোজ্জ্বল রাখে। উৎপাদক ও ব্যবহারক সকলেই সর্বার্থসাধক সমিতির আশ্রয়পুষ্ট হইয়া হৃদয়হীন শোষণব্যবস্থার প্রতিস্পর্ধী হইয়া উঠিতে পারে।

সমষ্টি উন্নয়ন ও ব্যাপকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে সমবায় আন্দোলন বর্তমানে সবিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত হইয়াছে। গ্রামস্তরে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করার অমোঘ হাতিয়ার হইল সমবায় সমিতি ও পঞ্চায়েত সমিতি। এই প্রতিষ্ঠান দুইটি দেশের গ্রামাঞ্চলে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে মাটির মানুষের মধ্যে সর্বব্যাপী

হইবার সম্ভাবনা রাখে। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের এক বৈঠক স্থির হয় যে, গ্রামস্তরে গ্রামের সমবায় ও পঞ্চায়েতের হাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব ভার দেওয়া উচিত। গ্রামজীবনের উন্নয়ন বিধানের ভিত্তি হইবে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি। সমবায়ের কাজ ঋণদানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি, নূতন যন্ত্র ও কৃষি-পদ্ধতির প্রচলন, উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ, সার ও বীজের যোগান, ফসল গুদামজাত করিয়া সময়ে বিক্রয় করা—এই রকম সমস্ত কাজের ভার এই গ্রাম্য সেবাসমিতির উপর বর্তাইবে। সমবায় সমিতির ভিত্তি ছোট কি বড় হইবে, ইহা নির্ধারণ করার জন্য এবং সমবায়ী ঋণের প্রয়োজন ও অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে যে-কমিটি বসে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল তাহার রিপোর্ট ও প্রস্তাবগুলি বিচার করিয়া যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে! আত্মনির্ভরশীলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ও প্রকৃতিও বিশেষিত করা হইয়াছে। জন্মলগ্ন হইতেই যাহাতে এই সমিতিগুলি পরিচালনার ব্যয়ভারে জর্জরিত না হইয়া উন্নয়নমূলক কাজকর্মে হাত দিতে পারে সেইজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রাখা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালের মধ্যে যাহাতে মোট কৃষিজীবী জনসাধারণের ৬০% প্রাথমিক সমিতিগুলির ছত্রচ্ছায়ার নিরাপত্তার আশ্বাস পাইতে পারে সেই দিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হইলে খণ্ড ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন সমস্ত গ্রাম ব্যাপিয়া ২৩০,০০ সমিতি সর্বমোট ৫৩০ কোটি টাকা ঋণের বিলি-ব্যবস্থা করিবে। ইহা ছাড়া ১৫০ কোটি টাকার বকেয়া ঋণ ও সমিতিগুলির বহুমুখী কর্মকাণ্ডের পরিচয় বহন করিবে। এখন সবকিছুই নির্ভর করিতেছে, মৃতপ্রায় সমিতি-গুলির প্রাণসঞ্চার করিয়া নূতন নূতন ক্ষেত্রে সমবায়ী আন্দোলন সম্প্রসারণের উপর। সভ্য সংখ্যা বাড়ানো, স্থানীয় সঞ্চয় সংগ্রহ করা, পরিচালনার মান উন্নত করা এবং ঋণদানের সহিত বিক্রয় ও উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধনের মধ্য দিয়াই পরিকল্পনা সার্থকতার পথে অগ্রসর হইবে। উৎপাদনের চল্‌তি খরচার সুরাহার সঙ্গে সঙ্গে জমির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি মানসে দীর্ঘকালীন ঋণ যোগান যাহার লক্ষ্য তাহার কাজের ব্যাপকতা ও জটিলতা সহজেই অনুমেয়।

বলা বাহুল্য, এই বিপুল কর্মযজ্ঞের সাফল্য নির্ভর করে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং বাস্তববুদ্ধি-প্রণোদিত পরিচালনার উপর। সরকারী কাগজের লাল ফিতা ছিন্ন করিয়া দেশের জনমানসে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সকল সমস্যা সমাধানের মানবিক প্রয়াসের প্রয়োজন। আবার সততা ও আন্তরিকতা থাকিলেই চলে না। প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও ব্যবহারিক বুদ্ধিরও প্রয়োজন। গ্রামান্তরে নবজীবনের বাণী ঘোষণা করিতে গেলে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন। আর্থিক দায়িত্ব

যথাযথভাবে পালন করিতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক ও জীবন-বীমা কর্পোরেশনের ন্যায় জাতীয়প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাগ্রসর ভূমিকার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে হইবে। সমিতিসমূহের আর্থিক কাজকর্ম তদারক করিয়া, কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া, প্রয়োজনানুসারে ঋণ দিয়া, এমনকি সমবায় সমিতির সম্প্রসারণশীল কাজকর্মে রাজ্য সরকার যাহাতে আর্থিক দিক দিয়া সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় অর্থের সুরাহা করিয়া এই প্ররিষ্ঠানগুলি তাহাদের কর্তব্য সমাধা করিতে পারে। ইহাদের দৃষ্টিও গ্রামের দিকে ফিরাইতে হইবে। তবেই ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের জন্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করিয়াছে, সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে হইলেও, সমবায়ের মধ্য দিয়া তাহা সার্থক হইবে।

১৩

যন্ত্রশিল্পময় ভারতে কুটিরশিল্পের স্থান

কোন অপূর্ণোন্নত দেশে যতদিন শিল্প-বিপ্লবের ধারা সম্পূর্ণ না হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া বৃহৎ শিল্পকাঠামো গড়িয়া না উঠে ততদিন গ্রামীণ কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প দেশের ভোগ্য দ্রব্য যোগানের কাজে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে থাকে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হইলেও যতদিন দেশে বৃহৎ শিল্পের প্রসার না ঘটে ততদিন পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেও ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া চলে। ভারতে বৃহৎ শিল্পের প্রসার দ্রুতহারে ঘটিতেছে না, মিশ্র-অর্থনীতির ফলস্বরূপ ব্যক্তিউদ্যোগ ক্ষেত্রও অনেকাংশে বজায় রাখা হইতেছে। অপরিকল্পিত বেসরকারীক্ষেত্রে তাই এখনও কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পূর্ণ ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে অথবা পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর না হওয়ায় এখনও এইরূপ ব্যক্তিগত পরিবার-কেন্দ্রিক উৎপাদন সংগঠন বজায় থাকা সম্ভবপর হইতেছে। ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা সংস্থানের চাপে কুটিরশিল্পের গুরুত্ব এখনও রহিয়াছে—যতদিন না পূর্ণ মাত্রায় যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন ঘটে, ততদিন এই গুরুত্ব বজায় থাকিবে।

অনেকে অবশ্য এইরূপ আশা পোষণ করেন যে, সুদূর ভবিষ্যতেও যন্ত্রশিল্পে উন্নত ভারতে কুটিরশিল্পের স্থান অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাঁহাদের মতে, ভারতের চাষীরা সারা বৎসর ধরিয়া এমন কাজ খুঁজিয়া পায় না যাহাতে তাহাদের শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার হইতে পারে। ফলে তাহাদের একপ্রকার অনিচ্ছামূলক বেকারিতে ভুগিতে হয়। এই অবস্থায় কুটিরশিল্প তাহাদের কর্মের সংস্থান করিতে পারে; আয় বাড়াইতে পারে; প্রচ্ছন্ন,

মরসুমী ও আংশিক বেকারি দূর হয়। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কুটিরশিল্পে নিযুক্ত থাকিতে পারিলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস পাইতে পারে। বর্তমানের জীবিকা-কাঠামোতে ভারসাম্যহীনতা দূর হইতে পারে। মূলধন গঠনের বর্তমান হারে সুবৃহৎ যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী সঞ্চয়ের অভাব রহিয়াছে; কিন্তু এই সকল কুটিরশিল্প অল্প মূলধনের সাহায্যেই পরিচালিত হইতে পারে। পরিচিত গ্রাম্য পরিবেশে এবং পরিবার হইতে বিচ্যুত না হইয়া কুটিরশিল্পী উৎপাদনের কাজ চালাইতে পারিলে শ্রমিকের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত থাকে। জনসংখ্যাপীড়িত দেশে পরিবারের সকল ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়, পারিবারিক শ্রমবিভাগ হয় বলিয়া সৃষ্টির আনন্দ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয় না, দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। যন্ত্রশিল্পের পরিবেশ যান্ত্রিকতা ও শ্রেণী-সংঘর্ষে কলুষিত থাকে, কুটিরশিল্পে সামাজিক ঐক্যতান বজায় থাকে। ইহাতেই "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের" সমাজের ভিত্তি রচিত হয়, কারণ ইহাতে অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও শক্তি-সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে।

কিন্তু আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গী মানিয়া লইতে পারি না। উন্নয়নশীল অর্থনৈতিক কাঠামোতে কুটিরশিল্পের স্থানও দ্রুত পরিবর্তনশীল। দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেগ যত বাড়িতে থাকিবে ততই আমাদের প্রাচীন ও পুরাতন উৎপাদন-পদ্ধতি রীতিনীতি অপসারিত হইয়া উন্নত বিজ্ঞান ও শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিতে থাকিবে। ইতিহাসের এই অমোঘ নিয়ম নিশ্চয়ই ভারতেও কার্যকরীরূপে দেখা দিবে। ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে বিলাপ ও বোবা কান্নায় কোন লাভ নাই; এই দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে রুগ্ন ভাবালুতার দৃষ্টিতে কোন সমস্যার বিচার করা চলে না।

আমরা আমাদের দৃষ্টি আরও সুদূর ভবিষ্যতে নিক্ষেপ করিতে পারি। বর্তমান কালের গণ্ডী ডিঙাইয়া দূর ভবিষ্যৎ কালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে ভারতের কুটিরশিল্পের কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হয় না। সমাজতান্ত্রিক ভারতই ভবিষ্যতের ভারতীয় সমাজ-কাঠামো, ইহা ভুলিলে চলিবে না। সেই অনাগত যুগের প্রধান কথা হইবে পরিকল্পনার মাধ্যমে শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা। কুটিরশিল্পকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ একমাত্র বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের মাধ্যমেই সকল ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা পাওয়া যায়, শ্রমশক্তির পূর্ণতম ব্যবহার সম্ভব হয়, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে উন্নততর যন্ত্রকৌশল প্রয়োগ করা যায়, আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণার ফল লাভ করা যায়, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার, মাথা-পিছু আয়-বৃদ্ধির হার একমাত্র বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের মাধ্যমেই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে পারে। কুটিরশিল্প প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে হার হ্রাস পায়, শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উন্নয়নের গতিবেগ বাড়িতে পারে না।

উপসংহারে বলা চলে যে, যন্ত্রশিল্পময় ভারতে কুটিরশিল্পের স্থান আমরা তখনই মানিয়া লইতে পারি যখন বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের অভূতপূর্ব উন্নতি হইয়াছে। যখন বিজ্ঞান ও যন্ত্রদক্ষতার বৃদ্ধি এমন স্তরে পৌছিয়াছে যে পরিবারের লোকজনের সাহায্যে সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে শ্রমবিভাগের সকল সুবিধা লাভ করিয়া উৎপাদন সম্ভবপর হইতেছে, দেশময় ছড়ানো সকল শ্রমিকের বাড়িতে কাঁচামাল পৌছানো এবং পরিকল্পিত পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করার মত কেন্দ্রীয় সংগঠন স্থাপিত হইয়াছে—একমাত্র সমাজ-সংগঠনের এইরূপ সুউন্নত স্তরেই আমরা যন্ত্রশিল্পের পাশাপাশি কুটিরশিল্পের কথা কল্পনা করিতে পারি। সেইরূপ অবস্থা ভারতে সুদূর ভবিষ্যতেও আসিবে কি না বলা যায় না, বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে তাই যন্ত্রশিল্পময় ভারতে কুটিরশিল্পের স্থান আশাব্যঞ্জক নহে।

১৪

সমষ্টি-উন্নয়ন প৷রকল্পনা

অর্থনৈতিক অপূর্ণোন্নতির অভিশাপ খণ্ডন করিয়া ভারতবর্ষ ক্রমোন্নতির পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করিয়াছে। অগ্রগতির ধারা ও বেগ অব্যাহত রাখিতে হইলে একদিকে যেমন আশা উদ্দীপনা ও সঙ্কল্পের প্রয়োজন, অপরদিকে তেমনি বাস্তববুদ্ধি প্রণোদিত পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণও অপরিহার্য। অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং সামাজিক বিধিনিষেধের যে-বোঝা যুগ যুগ ধরিয়া দেশের কাঁধে চাপিয়াছে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। এইজন্য জনচিত্তকে প্রস্তুত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। তবেই ক্রমোন্নতি সম্ভব হইবে, দেশের শিল্পায়ন সফল হইবে। সেইজন্য আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে গ্রামের দিকে, কৃষির দিকে। দেশের কৃষি-কাঠামো অনুন্নত থাকায় দ্রুত এবং ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের উপযোগী খাদ্য, কাঁচামাল বা শ্রমিক কোন কিছুই যোগানো যাইতেছে না। এই অবস্থা বেশিদিন চলিলে দেশের সকল ক্ষেত্রেই এক অচলায়তন জাঁকিয়া বসিবে। এইজন্য পরিকল্পনা কমিশন যে-কর্মসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার সকল আয়োজন মাটি এবং মাটির কাছাকাছি যে-মানুষ তাহাকে ঘিরিয়া। এই কার্যসূচীতে কৃষির উন্নতিকল্পে পতিত জমির উদ্ধার, জলসেচ, সার, বীজ এবং ঋণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবার নূতন মানুষ গড়িয়া তুলিবার জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েত গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কেননা, একদিকে গ্রামাঞ্চলে যে-পরিবর্তন সূচিত হইবে তাহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, অপরদিকে দেশের গণতান্ত্রিক সংগঠনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে

হইবে। আর এই নেতৃত্ব উপর হইতে চাপাইলে চলিবে না। গ্রামের মানুষের মধ্য হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃত্বের উদ্ভব যাহাতে হয় সেইজন্য এমন লোক গড়িয়া তুলিতে হইবে যে সামগ্রিকভাবে উন্নততর উৎপাদন-পদ্ধতির তাগিদ অনুভব করিতে পারিবে এবং উহাকে সফল করিবার জন্য আগাইয়া আসিবে। এই ব্যাপারে ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের পথ না ধরিয়া ভারতবর্ষ এক স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছে। জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা ও সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা তাহার সাক্ষ্য বহন করে। এই পরিকল্পনার সার্থকতা শুধুমাত্র মাটি ও মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির মধ্যে নিহিত নহে। সাম্য ও মৈত্রীর ভিত্তিতে পঞ্চায়েত-রাজ প্রবর্তন করাই ইহার লক্ষ্য।

এই সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতি হইল গ্রামাঞ্চলে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করা। আর তাহা উপর হইতে চাপানো হইলে চলিবে না—এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। জনসাধারণ আত্মনির্ভরশীল হইবে। নেতৃত্বের জন্য, প্রেরণার জন্য তাহারা দূর আকাশের কোন দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিবে না। কলিকাতা বা দিল্লীর দিকে তাকাইয়াও কালক্ষেপ করিবে না। সমষ্টিগত উন্নয়নের জন্য তাহারাই পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবে। আবার, উহাকে সফল করাও হইবে তাহাদের কাজ। এইজন্য প্রতিটি গ্রামের কিংবা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত কোন সমাজে একটি সর্বার্থসাধক সংগঠন থাকিবে। এই সংগঠন ঘরে ঘরে কাজ চালাইয়া যাইবে। কৃষির সামগ্রিক উন্নতির জন্য যে-দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, যে-কাজকর্ম এবং শিক্ষা-সংস্কার অপরিহার্য তাহার সার্বিক উন্নতিবিধানই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। কৃষি ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মের উপর জোর দিয়া মূল প্রকল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্প ও ছোট ছোট নগর গঠনের কার্যসূচী গ্রহণ করিয়া আমাদের সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চলিতেছে।

প্রায় ৫০০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া, ৩০০ গ্রামের ২ লক্ষ অধিবাসী লইয়া প্রায় দেড় লক্ষ একর কর্ষিত ভূমি ব্যাপিয়া এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি অঞ্চল গঠিত হইবে। এই এলাকা তিনটি উন্নয়ন ব্লকে ভাগ করা হইবে। ঐ ব্লক আবার পাঁচটি গ্রাম লইয়া এক-একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত হইবে। এই সব অঞ্চলে কাজ চালাইয়া যাইবে এক একজন গ্রাম্যস্তরের কর্মী। ব্লক এবং প্রজেক্ট এলাকায় দায়িত্বশীল অফিসার থাকিবেন। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ কর্মচারীরা ব্লক এবং প্রজেক্ট অঞ্চলের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্ব লইবেন। প্রজেক্ট অফিসারকে সাহায্য করিবার জন্য প্রজেক্ট উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে। ইহাতে থাকিবেন রাজনৈতিক নেতা, জনকল্যাণকর্মী, প্রতিনিধিস্থানীয় চাষী, সংসদ ও আইন সভার স্থানীয় সদস্য, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রধান প্রধান সরকারী কর্মচারীবৃন্দ। জেলা স্তরে জেলা উন্নয়ন অফিসার জেলা উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় কাজকর্ম চালাইয়া যাইবেন। এইভাবে রাজ্য উন্নয়ন কমিশনার এবং

রাজ্য উন্নয়ন কমিটির কাজ চলিবে। সর্বোচ্চ স্তরে থাকিবে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি যাহার সদস্যরা পরিকল্পনা কমিশন হইতে আসিবেন। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে ৯০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই ব্যয়ের প্রায় ১১% আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রকৌশল প্রয়োগ-পরামর্শের আকারে ভারত-মার্কিন টেকনিক্যাল সহযোগিতা স্কীম অনুযায়ী। উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজকর্ম বহুধাবিস্তৃত। কৃষি এবং পথঘাট উন্নয়ন, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার, কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ, বৃত্তি-শিক্ষাদান এবং জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ প্রভৃতি সকল কিছুই ইহার এক্তিয়ারে। ঠিকমত কাজ করিলে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্য ইহার মধ্য দিয়াই বহিয়া গিয়া গ্রামের মানুষকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবে। এক কথায় আধুনিক কর্ম ও ভাবধারা হইতে গ্রামের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইবার জন্য নিরন্তর প্রয়াস পাওয়াই ইহার লক্ষ্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ ঠিকমত চলিতেছে না। কার্যসূচীর মূল্যায়ণ করিতে গিয়া দেখা যাইতেছে যে, কৃষির সামগ্রিক উন্নতির জন্য জমি উদ্ধার, জলসেচ, ভূমিক্ষয়-রোধ ও বিক্ষিপ্ত জোতের সংহতি সাধনের কাজ কমই হইয়াছে। শিক্ষার বিস্তার, কুটীরশিল্পের প্রসার এবং সমবায় প্রথার প্রবর্তন হয় নাই বলিলেই চলে। সর্বোপরি, জনসাধারণের মধ্যে কোন উৎসাহ সঞ্চারিত হয় নাই। আত্মনির্ভরশীলতা পথে তাহাদের বিন্দুমাত্র অগ্রগতি হয় নাই। ইহার সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু সকলই উপরের স্তরে আটকাইয়া গিয়াছে। কিভাবে অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায় তাহার জন্য সংসদীয় সদস্য বলবন্তরায় মেহতার নেতৃত্বে গঠিত স্টাডি টিম কতকগুলি সুপারিশ করেন। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ঐ টিম গ্রাম-পঞ্চায়েত, ব্লকস্তরে পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা স্তরে জিলা-পরিষদ স্থাপনের উপর জোর দেন। স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিবে সর্বার্থসাধক সমবায় সমিতি। কল্যাণমূলক কাজের ঝোঁক কমাইয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার দিতে হইবে। এই সুপারিশের ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যসূচী সংশোধিত হয়। ব্লক উন্নয়নসূচীর বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ গৃহীত হইল। পঞ্চায়েতের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইল। এবং ব্লক স্তরের কর্মীদের শিক্ষাদানের গুরুত্ব স্বীকৃত হইল।

বর্তমানে এই সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় একত্রিশ শতাধিক উন্নয়ন ব্লক আছে। প্রায় ৩,৭০,০০০ গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার মধ্যে ৮৮০টি ব্লক কার্যসূচীর দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ১৯৬৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে এই পরিকল্পনা দেশের সমস্ত গ্রামে পৌছিতে পারিবে। প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় পরিকল্পনায় প্রায় ২৪০ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। তৃতীয় যোজনার জন্য ২৯৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। ইহা

ছাড়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের জন্য ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা কার্যকে অঙ্গীভূত করিয়া সমষ্টি-উন্নয়নের কাজ চলিতেছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করিবার জন্য গ্রাম-পঞ্চায়েতের ন্যায় জিলা ও ব্লক স্তরেও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য লাভ করে। প্রতিটি রাজ্য নিজস্ব পরিবেশ অনুযায়ী ইহার রূপ নির্ধারণ করিবে। সর্বোপরি, প্রতিটি ব্লকও প্রজেক্টে পরিকল্পনার ব্যষ্টি হিসাবে কাজ করিবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যাহাতে কৃষি, কুটিরশিল্প, প্রাথমিক শিক্ষা, জলসরবরাহ, পথঘাট নির্মাণ এবং জনশক্তির সদ্ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় সেইদিকে কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের সংহতি সাধন কল্পে এবং গ্রাম্য-জীবনের কোন দিককেই বাদ না দিবার জন্য দূরপ্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষজ্ঞ লইয়া কর্মীদের সংগঠিত টিম প্রতিটি ব্লকে কাজ করিতেছে।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করিতে হইলে সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়াণ অপরিহার্য। প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক পটভূমিকায় পরিকল্পনার কাজ কতটা অগ্রসর হয় তাহা সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পরিকল্পনার গুরুত্ব শুধুমাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রেই অবদ্ধ নহে এক হিসাবে ইহা মনুষ্যত্ব বিকাশের এক অভিনব দর্শন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই দর্শন জনমনে কোন আবেগের আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাও সাধারণ মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। তাহাদের অবস্থারও কোন গুণগত পরিবর্তন হয় নাই। এই বাস্তব সত্যকে চোখের সামনে রাখিয়া অভীষ্ট পূরণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, এই সংকল্প সর্বসাধারণের না হইলে চলিবে না।

১৫

ভারতে পঞ্চায়েত-রাজ

মহাভারতে দেখা যায় যে, ভারতের অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য পরিচালিত হইত জনগণের দ্বারা ; প্রাচীন গ্রীক নগরীসমূহের মত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রচলন ভারতেও ছিল। কিন্তু যে-সকল রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানেও গ্রামাঞ্চলের সমাজবন্ধন তখনও ভাঙে নাই; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামাঞ্চলের মানুষ নিজেরা পঞ্চায়েৎ গঠন করিয়া নিজেদের শাসন করিয়াছে। রাজছত্র ভাঙিয়াছে, রণডঙ্কা শব্দ তুলিয়াছে, রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে বহু পটপরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন ভারতের গ্রাম্যসমাজ উহা হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়া নিজস্ব অনুশাসন-বিধি গড়িয়া তুলিয়া গণতান্ত্রিক

পদ্ধতিতে শাসন চালাইয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ঝড়ঝঞ্ঝা এই গ্রামসমাজের বাহ্যাবরণকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে মাত্র। মাটির গভীরে প্রবিষ্ট গাছের শিকড়ের মত এই পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় জনসমষ্টির সংঘচেতনা, ধর্মবোধ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজন হইতে নিজের জীবনরস আহরণ করিয়াছে। পরিশ্রমী মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও চেতনা, পূর্বপুরুষ ও বয়স্কদের নিকট হইতে পাওয়া প্রাচীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি ও লোকাচারের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্য—এই সকল মিলিয়া ভারতের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতগুলি উন্নত ধরনের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে এখনও অনেক অঞ্চলে কাজ চালাইতেছে।

যুগের হাওয়া বদলাইতেছে। হিন্দু, মোগল ও ব্রিটিশ আমলেও অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় শক্তি পঞ্চায়েতগুলিকে অস্বীকার করিয়া শাসন চালাইতে পারে নাই; কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী পঞ্চায়েতগুলির সহিত প্রয়োজনের অনুরূপ সম্পর্ক পাতাইয়া কাজ চালাইয়াছে। কিন্তু আজ কৃষি-প্রধান গ্রাম্য অর্থনীতির প্রাধান্য নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো উপচাইয়া কুটীরশিল্পজাত পণ্য ও বর্ধিত জনসংখ্যা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গোষ্ঠী-মন ভাঙিয়া মানুষ যুক্তিপ্রধান মন খুঁজিয়া পাইয়াছে, পরিবার ও বর্ণগত পরিচয়ের বাহিরে দাঁড়াইয়া ব্যক্তি নিজের গুণ ও বুদ্ধির পরিচয়ে বৃহত্তর জনসমাজে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। যন্ত্রশিল্পের তাগিদে সে ঘর ছাড়িয়াছে, বিভিন্ন মানুষের সহিত পরিচিত হইয়াছে, একে অন্যের ভাবধারায় নিজ মনকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। পুরাতন গ্রাম্য সমাজের কর্তৃত্বের প্রতি বাধ্যতামূলক বশ্যতা ও নতি স্বীকারের দিন আর নাই, ব্যক্তিমানস ও গোষ্ঠীমানসে দ্বন্দ্বই বর্তমানের প্রধান রূপ। পঞ্চায়েত-এর অনুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি সদম্ভে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।

কেবল অর্থনৈতিক ও ভাবগত কারণেই পঞ্চায়েতগুলি প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে তাহা নহে, ইহার জন্য রাজনৈতিক কারণও কম দায়ী নয়। আজিকার শাসনতান্ত্রিক কাঠামো মূলত কেন্দ্র-পরিচালিত। কেন্দ্রীয়ভাবে সারা দেশের জন্য আইন কানুন রচিত হইতেছে, এই আইনগুলি ব্যক্তিজীবনের সকল দিকে নাড়া দিতেছে, কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কর্মিবৃন্দ এই আইনকানুনের প্রতি আনুগত্য আদায় করিতেছে। গ্রাম্য অর্থনীতিতেও ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব প্রধানত ভূসম্পত্তির মালিকেরাই পরিচালিত করিতেছে। সাম্য ও মৈত্রীর যে মনোভাব গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ভিত্তি ছিল, বাস্তব জগতে সেই পটভূমি আর নাই, শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংঘর্ষের চাপে গ্রাম্য জনসমাজ নিজেই নিজের মধ্যে বহুধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এই অবস্থায় আজিকার ভারতে আবার পঞ্চায়েতগুলির লুপ্ত জীবনীশক্তি খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা চলিতেছে। কৃষি-উন্নয়নের ধারক, বাহক শক্তিরূপে এমন এক ধরনের গ্রাম্য নেতৃত্ব গড়িয়া উঠা দরকার যাহা আধুনিক বিজ্ঞানকে গ্রামের ক্ষেতে-খামারে টানিয়া লইতে পারে, গ্রামের সকল মাটি ও মানুষের পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারে, প্রতিটি মানুষের আত্মমর্যাদা জাগাইয়া তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা, আয় ও জীবন-যাত্রার মান বাড়াইতে সাহায্য করিতে পারে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত এই গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি জনজীবনের নিকটতম অভাব-অভিযোগ ও সমস্যাগুলি সমাধান করিবে, তাহাদের কর্মব্যস্ত জীবনে নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গী সঞ্চারিত করিবে, বহুকালের পুরাতন অচলায়তন ভাঙিয়া গতিশীলতার সঞ্চার করিবে। আত্ম-অবমাননায় অভ্যস্ত দরিদ্র ব্যক্তি স্বাবলম্বী হইয়া উঠিবে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরিয়া পাইবে, জাতীয় সংহতির ও গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা ও শাসন কাঠামোর গোড়াপত্তন হইবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গী স্মরণ রাখিয়া পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে, পঞ্চায়েতী রাজের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণের সম্মুখে সকলের স্বার্থে অবিচ্ছিন্ন ধারায় সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের সুযোগ আনিয়া দেওয়া। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যেন ইহাকে জনসেবার পরম সুযোগ বলিয়া মনে করেন, কর্তৃত্ব খাটাইবার পাদপীঠ বলিয়া ইহাকে মনে না করেন। সরকারী শাসন ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ইহা কাজ করিবে, জিলা ও ব্লকস্তরের সরকারী দক্ষ কর্মচারীদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ সাহায্য তাহারা পাইবে। পঞ্চায়েতগুলির সাফল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন নিম্নলিখিত মানদণ্ড প্রয়োগ করিবে :

(ক) তৃতীয় পরিকল্পনা কালে জাতির প্রধান লক্ষ্য কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি।

(খ) গ্রাম্য শিল্পের উন্নতি।

(গ) সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন।

(ঘ) স্থানীয় জনশক্তি ও অন্যান্য উপকরণের পূর্ণ ব্যবহার।

(ঙ) শিক্ষার প্রসার ও বয়স্কের নিরক্ষরতা দূর করা।

(চ) পঞ্চায়েতের হাতে ন্যস্ত সকল উপকরণ, যেমন টাকা, লোকজন, যন্ত্রের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি পূর্ণতম ব্যবহার এবং তাহার সাহায্যে নিজস্ব সম্বল বাড়াইবার চেষ্টা করা

(ছ) গ্রাম্য জনসমাজের দুর্বলতর অংশগুলিকে সাহায্য করা।

(জ) কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও উদ্যোগের ক্রমাগত বিকেন্দ্রীকরণ, স্বেচ্ছামূলক সংগঠন-গুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপণ।

(ঝ) নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে মানসিক ও কার্যগত ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং একে অপরের নিকট হইতে শিক্ষালাভ।

(ঞ) জনসমষ্টির মধ্যে সংহতিসাধন এবং পারস্পরিক সেবা-সাহায্য।

বিকেন্দ্রীকৃত গণতন্ত্রের যে মহৎ আদর্শের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত-রাজের প্রতিষ্ঠা, ভবিষ্যত ভারতে সেই আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা তাহা পূর্বেই বিচার করিয়া বলা যায় না। তবে দেখা যাইতেছে, বর্তমানের পঞ্চায়েতগুলি এই উচ্চতর আদর্শ রক্ষায় সক্ষম হইতেছে না। গ্রাম্য জনসমষ্টির মূল প্রাণকেন্দ্র গ্রাম্য অর্থনীতি, ভূসম্পত্তির মালিকানা এবং কৃষিজীবী শ্রমিকের স্থান। যে প্রচণ্ড শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসংঘর্ষ প্রতিটি গ্রামের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রাকে দিক্-নির্ণয় করিতেছে, তাহার কারণ অসাম্যমূলক ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা অটুট রাখিয়া রাম-রাজত্বের আদর্শ এবং সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করিলেই সংহতিমূলক গ্রাম্য পঞ্চায়েত গড়িয়া উঠিতে পারে না।

১৬

সমবায় চাষ

আবহমানকাল হইতে ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও একর প্রতি উৎপাদন এখানে খুবই কম। চাষী-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কৃষির যন্ত্রীকরণ ও আধুনিকতম উপায়ে মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে চাষ করা দরকার। বর্তমানে এই উপায়ে চাষের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডীকৃত জোত ও উহাদের অসম্বদ্ধতা। এই ত্রুটি দূর করার জন্য ভারতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত সমবায় চাষ-প্রথা গড়িয়া তোলার প্রস্তাব করা হইতেছে। সমবায় চাষ-ব্যবস্থার বিকল্প হইল দুইটি; (১) সকল জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লইয়া যৌথ খামার ব্যবস্থা গঠন করা এবং (২) বড় বড় জমিদারেরা মজুর খাটাইয়া বৃহৎ মাত্রায় চাষ করিয়া কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ করা। কিন্তু পূর্ণ সমাজতন্ত্র ও পূর্ণ ধনতন্ত্র —উভয় ব্যবস্থার ত্রুটি থাকায় মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর দর্শন অনুযায়ী সমবায় চাষ-প্রথা গড়িয়া তোলার কথা বলা হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি-কারণে ভারতবর্ষে উপরোক্ত দুইটি বিকল্প ব্যবস্থার একটিরও গ্রহণ করা সম্ভবপর হইতেছে না। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সম্পত্তির অধিকার এখানে শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারের তালিকাভুক্ত। কাজেই সকল জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া লওয়া সম্ভবপর নহে। কেরলের ভূমিসংস্কার বিল ও তজ্জনিত ঘটনাবলী, সবই আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে বলা হইয়া থাকে যে, রাষ্ট্রের হাতে মালিকানা চলিয়া গেলে উৎপাদনের

পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ও প্রেরণার অভাব ঘটিয়া থাকে। ফলে মোট উৎপাদন কমে বই বাড়ে না। অপর দিকে, বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানায় কৃষিজ উৎপাদনও বাড়ানো সম্ভবপর নয়। বহুদিন পূর্বেই উৎপাদক হিসাবে জমিদার শ্রেণীর সুনাম অপগত হইয়াছে। সেক্ষেত্রে এমন এক ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যাহাতে ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে অথচ সকলের সমবেত প্রচেষ্টার সুফলও সঙ্গে সঙ্গে লাভ করা যায়। এমনি এক ব্যবস্থা হিসাবেই ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে নাগপুর কংগ্রেসে সমবায় চাষের বিষয়ে প্রস্তাব লওয়া হয়।

এই প্রসঙ্গে পূর্বে সমবায় চাষের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এই প্রথায় খণ্ডবিখণ্ড জমিগুলি একত্রীকরণ করা হইবে, কিন্তু জমির মালিকানা বহাল থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, পরিচালন ব্যবস্থা যৌথভাবে থাকিবে। তৃতীয়তঃ, সদস্যগণ তাঁহাদের কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাইবেন। এবং চতুর্থতঃ, লাভের কিছু অংশ সংরক্ষিত তহবিলের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

সমবায় চাষের আবার চারিটি রূপ হইতে পারে। প্রথমটিকে বলা হয় সেবা সমবায়। এখানে চাষীরা তাহাদের জমি একত্রিত না করিয়া ব্যক্তিগত মালিকানায় চাষ করিতে পারে। অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন, বীজ ও সার ক্রয়, জলসেচের ব্যবস্থা, কৃষির জন্য সাধারণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও শস্য বিক্রয় ইত্যাদিগুলি সমবায় সমিতির মাধ্যমে পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাও বজায় থাকে এবং বৃহদায়তন উৎপাদনের সর্ববিধ সুযোগও পাওয়া যায়। উপরন্তু, ভবিষ্যতে ইহার মাধ্যমে সমবায়যুক্ত চাষ-পদ্ধতি, সাধারণত যাহা সমবায় চাষ নামে পরিচিত, গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, ইতিমধ্যেই সেবা সমবায়ের মাধ্যমে চাষীরা সমবায়ের সুফলগুলির সহিত পরিচিত হইবে। দ্বিতীয় রূপটিকে বলা হয় সমবায় কৃষক সমিতি (Co-operative Tenant Farming Society)। এখানে জমির মালিকানা সমিতির হাতেই থাকে। জমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিয়া চাষের ভার কৃষকদিগকে কয়েক বৎসরের জন্য দেওয়া যাইতে পারে। সর্ববিধ সুযোগ ও সুবিধা সমিতি হইতে দেওয়া হইবে; কিন্তু এই কৃষকদিগকে সমিতির নির্দেশমত শস্যাদি চাষ করিতে হইবে। এই প্রথায় কোন জমি কোন ফসলের পক্ষে উপযুক্ত ইহা ভালভাবে জানা যায়। সাধারণত, যাহার পূর্বে বণ্টন হয় নাই, এইরূপ নূতন জমি লইয়াই, এই ধরনের সমিতি গঠন করা হইয়া থাকে। দণ্ডকারণ্যেও এই ধরনের পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে ইহাকেই তৃতীয় রূপটিতে অর্থাৎ সমবায়যুক্ত চাষ বা সমবায় চাষ-প্রথায় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে। তৃতীয় রূপটি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। সমবায় চাষের চতুর্থ রূপটি হইল সমবায়

যৌথ চাষ-প্রথা, যাহা যৌথ চাষ-প্রথারই নামান্তর। বর্তমান অবস্থায় যৌথচাষ যে আমাদের দেশে সম্ভবপর নয়, তাহাও আলোচিত হইয়াছে।

আর একরূপ সমবায় সমিতির কথা প্রচারিত হইতেছে। তাহাকে বলা হয়, সমবায় গ্রাম পরিচালনা। এই অবস্থায় গ্রামের সকল জমি একত্রে মিলাইয়া উহার পরিচালনা গ্রাম্য সমিতি বা পঞ্চায়েতের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গ্রাম্য জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। সমবায় চাষ সমিতি হইতে যেমন চাষী জমি লইয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে, সমবায় গ্রাম ব্যবস্থায় তাহা পারে না। সেইদিক হইতে ইহা যৌথ-খামার প্রথার ন্যায়। বৃহদায়তন উৎপাদনের সর্ববিধ সুযোগ এবং গ্রাম্য জীবনে সামঞ্জস্য আনিলেও এই প্রথা এখনও গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে নাই। কারণ, আমাদের গ্রামাঞ্চল এত বড় বিপ্লব গ্রহণ ও ধারণের উপযোগী এখনও হইয়া উঠে নাই।

সমবায় চাষ-ব্যবস্থার উপকারিতা অনেক। কৃষি-জোতের আয়তন বড় হওয়ার ফলে বৃহৎ মাত্রায় চাষের সর্বপ্রকার ব্যয়সংকোচের সুবিধা পাওয়া যাইবে — কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহার সম্ভবপর হইবে, জলসেচ ব্যবস্থা উন্নত হইবে, বিক্রয় ব্যবস্থার ত্রুটি দূর হইবে এবং মরসুমী বেকারি ও প্রচ্ছন্ন বেকারি দূর করার উপযুক্ত কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন করা সম্ভবপর হইবে। এই ব্যবস্থার অসুবিধাগুলিও আলোচনা করা দরকার। অনেকে বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে ইহার প্রয়োগ সম্ভবপর না-ও হইতে পারে। তাঁহাদের মতে ইহার কারণ হইতেছে এই যে, চাষীদের মধ্যে উদ্যমহীনতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা প্রবল। সেক্ষেত্রে সমবায় চাষ-প্রথা সোজাসুজি গ্রহণ করিলে চাষের উৎসাহ ও প্রেরণার অভাব ঘটিবে। কিন্তু, আসল কারণ রহিয়াছে অন্যত্র। বস্তুত, আজও আমাদের দেশে সমবায়ের আদর্শ ভালোভাবে প্রচার করা হয় নাই। উপরন্তু, উপযুক্ত কর্মী ও নেতার অভাবে আমাদের দেশে সমবায় আন্দোলন বিফল হইয়াছে। প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধনের অভাবের কথাও অস্বীকার করা যায় না। সর্বোপরি কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহার হইলে যে-বেকারি দেখা দিবার সম্ভাবনা, তাহাতে বেকারি সমস্যা আরও তীব্র হইয়া উঠিবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত শিল্পায়ন হইলে এই সমস্যা বিশেষ অনুভূত হইবে না। চীনদেশে প্রেরিত এক প্রতিনিধিদল আমাদের দেশে সমবায় চাষ প্রথা অবিলম্বে গ্রহণের সুপারিশ করেন। কিন্তু চীনদেশে সমবায় চাষের সঙ্গে সঙ্গে সমবায় পদ্ধতিতে আরও অনেক কিছু, যেমন, ছোট ছোট গ্রামীণ শিল্প, বিদ্যালয়, হোটেল ইত্যাদির কথা বলা হইয়াছে। এইসব আনুষঙ্গিকগুলির অভাবে আমাদের দেশে এখনই সমবায় চাষ প্রথা গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া সমবায়ের স্বেচ্ছামূলক দিকটিও আছে। প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রীদের

সম্মেলনে বলা হইয়াছিল যে, যে-স্থানের ৩/৪ বা তার বেশী সংখ্যক কৃষক সমবায় প্রথায় যোগদান করিতে চাহিবে সেখানে আইনের সাহায্যে বাকী অংশকেও ঐ সমবায়ে যোগদান করিতে বাধ্য করা হইবে। পরে অবশ্য ইহা কার্যকরী করা হয় নাই।

এই সকল অসুবিধার কথা মনে করিয়াই প্রথমে সমবায় চাষ সমিতি গড়িয়া তোলার কথা বলা হইতেছে না। প্রথমে সেবা সমবায় ও পরে সমবায় চাষ-প্রথা ও সর্বশেষ স্তরে সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের হাতে গ্রামের সকল জমির ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে নাগপুর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে এই কথাই বলা হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে সমবায় চাষ সম্পর্কে অল্প কথায় আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল দেশে সমবায় চাষের ভিত্তি গড়িয়া তোলা, যাহাতে দেশের বেশকিছু পরিমাণ জমি এই চাষের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ কতকগুলি চলতি সমবায় চাষ-সমিতির কাজকর্ম অনুসন্ধান করে ও কতকগুলি 'পাইলট প্রোজেক্ট' গড়িয়া তোলার সুপারিশ করে। সমবায় চাষের কার্যসূচী সফল করার জন্য সমাজ উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তর একটি জাতীয় সমবায় চাষ উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ওয়ার্কিং গ্রুপের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতি জেলায় ১০টি হিসাবে মোট ৩২০০ 'পাইলট প্রোজেক্ট' স্থাপন করাই সমবায় চাষ-প্রথা প্রবর্তনের প্রথম ধাপ। এই স্তরে, যাহারা সত্যই জমিতে কাজ করে তাহাদের মধ্যে সভ্যপদ সীমাবদ্ধ রাখিবার কথা বলা হইয়াছে।

২২টি সমবায় চাষ সমিতির কাজকর্ম ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া পরিকল্পনা কমিশন যে-রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সমবায় চাষ-প্রচেষ্টা অনেকাংশে বিফল হইয়াছে। আমাদের দেশের ভূমির উপর যে উচ্চসীমা নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাকে ফাঁকি দিবার জন্য আমাদের দেশে ভূম্যধিকারীরা সমবায়ে যোগ দিয়াছেন। যাহারা প্রকৃতই জমিতে চাষ করে তাহাদের লইয়া আমাদের দেশে সমবায় সমিতি গঠিত হয় নাই। অথচ কথা ছিল যে, অনুপস্থিত মালিকদের সংখ্যা যেন মোট সভ্য সংখ্যার ১/৪ এর বেশী না হয়। ইহা ব্যতীত অনেক ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের শৈথিল্য ও দেরিতে অনেক প্রকৃত সমবায় সংস্থা উঠিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সর্বোপরি, আমাদের দেশের গরীব, অজ্ঞ কৃষকগণ এখনও সমবায়ের আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

এই প্রসঙ্গে আরও দুই-একটি দেশের কথা বলা দরকার যেখানে এই সমবায় প্রথা চালু হইয়াছে। মেক্সিকোতে এই প্রথা প্রাথমিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ, এই চাষের দায়িত্ব যাহাদের হাতে ছিল তাহাদের সকলেই সমবায়ের

আদর্শে শিক্ষিত কর্মী। অবশ্য এখন দেখা যায় যে, মেক্সিকোতে উৎপাদন পূর্বাপেক্ষা কম হইতেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়; কারণ হইল যে, একদলের হাতে ভার থাকিলে অন্যেরা কাজে উৎসাহ দেখাইবে না। বাস্তবে তাহাই হইয়াছে মেক্সিকোতে। ইস্রায়েলে সমবায় চাষের সাফল্যলাভের কারণ, ইস্রায়েলে যে-সব কৃষক সমবায়ে যোগ দেন তাঁহারা প্রকৃত কৃষক নহেন। তাঁহারা শিক্ষিত ও শহরবাসী। তাই সমবায়ের আদর্শ গ্রহণ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজই হইয়াছে। আমাদের দেশে শিক্ষিত কর্মীর অভাব এবং প্রকৃত চাষীরা আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে সমবায় প্রথাকে সাফল্যলাভ করিতে হইলে, যুগোস্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা বাঞ্ছনীয়। সেখানে যাহারা সমবায়ে যোগ দিতেছে, তাহারা চাষের সমস্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা খুবই সুবিধা দরে পায়। যাহারা যোগ দেয় নাই, তাহাদের খোলা বাজার হইতে বেশি দামে কিনিতে হইতেছে। তাই বাধ্যতামূলক না হইলে সমবায়ের সুবিধা বুঝিতে পারিয়া যাহারা এতদিন সমবায় হইতে দূরে ছিল, তাহারা সমবায়ে যোগ দিতেছে।

ভারতে সমবায় প্রথা সাফল্যলাভ করে নাই। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষিতে যন্ত্র ব্যবহার করিতে হইলে সমবায় চাষ-প্রথার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখিয়া বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল সুযোগ-সুবিধা ও সরকারী সাহায্যলাভ করিতে হইলে ইহারই উপর জোর দিতে হইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ আজ নির্ভর করিতেছে এই প্রথা সাফল্যলাভ করার উপর।

১৭

মিশ্র অর্থনীতি ও ভারত

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পবিপ্লবের ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সামাজিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আসে, সামন্ততান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক শিল্প ও কৃষি কাঠামো গড়িয়া উঠে। অর্থলিপ্সা এবং স্বার্থবোধের তাড়নায় প্রতিটি মানুষ পরিচালিত হয়, তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলিতে থাকে। সঞ্চয়, মূলধন গঠন, মূলধনের বিনিয়োগ, যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, বিজ্ঞানকে উৎপাদনের কাজে লাগাইয়া উহাকে টেক্‌নোলজিতে পরিণত করা, এই ধারায় দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বেগ বাড়িতে থাকে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এইরূপ অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল প্রকাশ পাইতে থাকে। ব্যক্তিগত মুনাফা আহরণ ও ব্যবসায়িক

স্বার্থবোধের দরুণ ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিপুল প্রভেদ দেখা দেয়, একদল সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। বেকারী, যন্ত্রের অব্যবহার, অর্থনৈতিক সংকট, একচেটিয়া শোষণ, রাষ্ট্রযন্ত্রের শ্রেণীগত অপব্যবহার—সকল কিছু মিলিয়া ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণের মনে বিপুল অসন্তোষ ধূমায়িত হইতে থাকে।

ছোটখাট এইরূপ শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য হইতে শ্রমিক দরদী চিন্তানায়কেরা সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন এবং এইরূপ ভাবাদর্শের প্রসার ঘটান। তাঁহাদের মতে উৎপাদনের উপকরণসমূহ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত না হইয়া সমগ্র সমাজের হাতে, অর্থাৎ সমাজের প্রতিভূ রাষ্ট্রের হাতে থাকা প্রয়োজন। ইহাতে ব্যক্তির উপর ব্যক্তির শোষণ অবলুপ্ত হইবে। পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ চলিতে পারিবে। ধনী-নির্ধনের বিরোধ দুরীভূত হইবে এবং সকল ব্যক্তির বিভিন্নমুখী প্রতিভার পূর্ণ স্ফুরণ ঘটিবে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু হইতে পৃথিবীর কোন কোন দেশে সমাজতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পাইয়াছে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গিয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে দোষমুক্ত নয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা অনেকাংশে সংকুচিত থাকে, তাহাদের প্রেরণা, কর্মশক্তি ও উদ্যম পূর্ণ মাত্রায় জাগরিত হয় না। রাষ্ট্রের হাতে সকল অর্থনৈতিক শক্তি করায়ত্ত থাকিলে, রাষ্ট্রনায়কেরা স্বেচ্ছাচারী ও আমলতান্ত্রিক হইয়া উঠিতে পারে।

এই সকল কারণে স্বাধীনতা-পাওয়া দেশগুলিতে আজকাল এক ধরনের মিশ্র-কাঠামো গড়িয়া উঠিতেছে। ইহারই নাম হইয়াছে মিশ্র অর্থনীতি। এই ব্যবস্থাতে, অবাধ বাণিজ্য ও পূর্ণ সমাজতন্ত্র, উভয় কাঠামোরই দোষগুলি বাদ দিয়া ইহাদের গুণগুলি লইয়া নূতন কাঠামো গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে। অবাধ বাণিজ্য-ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বার্থ ও সমাজস্বার্থে বিরোধ থাকে বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত মুনাফালাভের তাড়নায় তাহারা দ্রুত কলকারখানার প্রসার ঘটায় বলিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বেশি থাকে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি, অষ্ট্রেলিয়া, জার্মানী এবং জাপান সকল দেশেই ব্যক্তিক্ষেত্র দ্রুত উন্নয়নে সাহায্য করিয়াছে। তাই ব্যক্তিক্ষেত্রের পূর্ণ অবলুপ্তি না করিয়া উহার অসামাজিক কাজকর্ম রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী মুনাফা পাইবে বটে, কিন্তু বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে কাজ করিবে। সামাজিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটিবে। রাষ্ট্র বা পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন রূপ নীতি ও আইনকানুনের মধ্য দিয়া ব্যক্তিক্ষেত্রের যে-পরিধি নির্দেশ করিয়া দিবে, সেই সীমানার বেরাটোপে ব্যক্তিক্ষেত্র সক্রিয় থাকিবে। সর্বাধিক

মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ—এই মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তাহারা অগ্রসর হইবে। অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন কোন কম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর অবাধ অধিকার বজায় থাকিবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে উহার প্রবেশাধিকার ও কাজকর্ম বাধ্যতামূলকভাবে সংকুচিত থাকিবে, আবার অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে ইহার প্রবেশ কোনমতেই ঘটিতে দেওয়া হইবে না।

মিশ্র অর্থনীতিতে সরকারী শিল্প-ব্যবসায়িক কাজকর্মও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হইবে সরকার একা। আবার কোথাও বা অংশীদারী বা যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের রূপে বেসরকারী ব্যক্তিগত মালিকের সহিত সে সহযোগিতা করিবে। এইরূপ দেখা যায় মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোতে (ক) কোন কোন ক্ষেত্রের পূর্ণ রাষ্ট্রীকরণ ঘটে, (খ) কোন কোন ক্ষেত্রে অবাধ ব্যক্তিস্বাধীন ব্যবসায় বজায় থাকে; এবং (গ) অন্যান্য কতকগুলি ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের যুগ্ম মালিকানা ও পরিচালনা ঘটিতে থাকে। এই তিন খণ্ডে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক কাজকর্মকে বিভক্ত করা এবং প্রত্যেকের কার্যপরিধির সীমানা নির্দিষ্ট করা—ইহা প্রধানত কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। এইরূপ বিভাগ একেবারে সদা-নির্দিষ্ট, চুলচেরা ধরনের অনড় ও অচল নয়, সর্বাধিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কিছুকাল অন্তর ইহার সীমারেখায় প্রয়োজন মত সংকোচন-প্রসারণ ঘটানো চলে। কোন সময়ে ব্যক্তিস্বার্থে এবং বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে বিরোধ বাধিলে রাষ্ট্র সালিশের কাজ করে এবং জনকল্যাণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। প্রগতিশীল জাতীয় অর্থনৈতিক নীতির মূল কথা হইল যথাসম্ভব দ্রুত জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়াইয়া চলা এবং এই উৎপাদনের বৃদ্ধির প্রতি পদে আয়বণ্টনের বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। মিশ্র অর্থনীতিও তাই একই উন্নয়নশীল ও সাম্যভাবাপন্ন হইয়া উঠে।

ভারতে মিশ্র অর্থনীতির প্রয়োগ ঘটে ১৯৪৮ সালে, ভারত সরকারের শিল্পনীতির ঘোষণাই এই শিল্পনীতিতে সরকারী ও বেসরকারী কাজকর্মের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্ধারণের চেষ্টা হয়। সাধারণভাবে ভারতের শিল্পক্ষেত্রকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ, কোন কোন শিল্প জাতীয় স্বার্থের পক্ষে এমন গুরুত্বপূর্ণ যে উহা একমাত্র রাষ্ট্রেরই অধিকারভুক্ত থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী উভয়েই এককভাবে বা যুগ্মভাবে কাজ করিতে থাকিবে। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক কাঠামোর অবশিষ্ট অংশ সাধারণভাবে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। ১৯৫৬ সালে এক সংশোধনের দ্বারা এই শিল্পনীতির সামান্য রদবদল হয় মাত্র। আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রূপায়নের মধ্য দিয়া এইরূপ মিশ্র কাঠামোর আদর্শ ক্রমশঃ বাস্তবের আকার গ্রহণ করিতেছে।

খাঁটি ধনতন্ত্রবাদী এবং খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদী উভয়েই মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ পছন্দ করেন না। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে এই ব্যবস্থা ধনতন্ত্রেরই পরিবর্তিত রূপ; ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রমিক-শোষণ, মালিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক আভিজাত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা শ্রমিকশ্রেণীকে ভাঁওতা দেওয়া মাত্র। উৎপাদন-পদ্ধতি ও উৎপাদন-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া নিছক আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটাইলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর ঘটে না, সমাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা হয় না। দেশের কতকগুলি শিল্প বা ব্যবসায় কেবলমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় না। রাষ্ট্রের রূপ কি, ইহার পরিচালনভার প্রধানত কোন শ্রেণীর হাতে, তাহাদের রাজনৈতিক ভাবাদর্শ কিরূপ, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে পরিচালনা ও সংগঠনের ভার আসিল কি না, এই সকল বিষয়ের বিচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যবিত্ত-শ্রমিক-কৃষককে শোষণ করিয়া কিছু মুনাফা (সামাজিক বীমা প্রভৃতির দ্বারা) ছড়াইয়া দিলেই কোন অর্থনৈতিক কাঠামো প্রগতিশীল হইয়া উঠে না। স্যুম্‌পিটার ইহাকে তাই 'মুমূর্ষু ধনতন্ত্র' বলেন (Capitalism in the Oxygen tent)।

খাঁটি ধনতন্ত্রের সমর্থকেরা ইহাকে সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে, এই কাঠামোতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও কর্মোদ্যোগের উপর বাধা-নিষেধ আরোপিত থাকায় ধনতন্ত্রের কোন সুফল পাইবার আশা থাকে না। শুধু তাহাই নহে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা লুপ্ত হয়, অধ্যাপক হায়েকের ভাষায় বলা চলে যে 'দাসত্বের পথ' (Road to Serfdom) উন্মুক্ত হইয়া যায়।

১৮

ব্যক্তিক্ষেত্র বনাম রাষ্ট্রক্ষেত্র

অথবা

ভারতের শিল্পোন্নয়নে রাষ্ট্রক্ষেত্র প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রে ও রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন শাসকদল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রকে উহার লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করিয়াছে। বিগত দশকে পরিকল্পনার শুরু হইতেই ভারতের নূতন শিল্পনীতি ঘোষিত হইয়াছিল, ইহারও লক্ষ্য ছিল মিশ্র অর্থনীতি। এই সকল লক্ষ্য প্রচার করা ছাড়াও বিগত দশকে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বিমান কোম্পানিসমূহ,

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, বীমা ব্যবসায়, কোলার স্বর্ণখনি প্রভৃতির জাতীয়করণ ঘটিয়াছে। ইস্পাত শিল্পে সরকার নূতন তিনটি সুবৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বোকারোতে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা পরিকল্পনাটি স্থাপন করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, সরকারী উদ্যোগে তৈল শোধন শুরু হইয়াছে। সম্প্রতি খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সম্পর্কে গুরুতর চিন্তা করা হইতেছে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ লইয়াও আলোচনা শুরু হইয়াছে। অপরদিকে সরকারী শিল্প কলকারখানাগুলিতে অপব্যয়, পরিচালনার অযোগ্যতা, ব্যবসায়িক রীতি অনুসরণে অক্ষমতা এবং ফলে মুনাফা করিতে না-পারা— এই সকল মিলিয়া সরকারী শিল্পক্ষেত্রকে জনসাধারণের বহু বিমুখ মন্তব্যের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ব্যক্তিক্ষেত্র বনাম সরকারীক্ষেত্র—এই চিন্তা বর্তমানে আবার আলোচিত হইতেছে, রোজই কোন না কোন মন্ত্রী এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, ১৯৪৮ সালে গৃহীত ভারতের শিল্পনীতির ভিত্তিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, ইহার মূল কথা ছিল মিশ্র অর্থনীতি। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্পপ্রসারের দায়িত্ব সম্পূর্ণই বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্যক্তিক্ষেত্র সঙ্কোচনের কোন কথা উঠে নাই, মিশ্র অর্থনীতি বলিলে বুঝা গিয়াছে ব্যক্তিক্ষেত্র ও সরকারীক্ষেত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পরস্পর সহযোগিতা। ব্যক্তিক্ষেত্রের মুখপাত্রগণ তাই নূতন শিল্পনীতি এবং প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি করেন নাই, সরকারের সঙ্গে প্রাণ খোলা সহযোগিতা করিতে তাহাদের বাধে নাই।

কিন্তু রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা—এই কথা ঘোষিত হওয়ার পর সরকারের শিল্পনীতিতেই অনেক পরিবর্তন আসিয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাতে সরকারী ক্ষেত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে, ব্যক্তিক্ষেত্রের কোন কোন দিকে কিছু কিছু সঙ্কোচন করার কথা চিন্তা করা হইয়াছে, পরিকল্পনাতে তুলনামূলকভাবে সরকারীক্ষেত্রের প্রসারের হারই বেশি। শিল্পনীতির এই দিক্-পরিবর্তনের দরুন ব্যক্তিক্ষেত্রের মুখপাত্রগণ আর নীরব নাই, তাহারা সরাসরি ইহার বিরোধিতা করিতে উন্মুখর হইয়া উঠিয়াছেন।

তাঁহাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার গণতন্ত্রের কবর রচনা করিবে। গণতন্ত্রের মূল কথা ব্যক্তির স্বাধীনতা, তাহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অবাধ ব্যবসায় বাণিজ্যের অধিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ছোটখাটো নিয়ন্ত্রণ নিশ্চয় থাকিবে, কিন্তু এমন কোন শিল্প বা উৎপাদনের ক্ষেত্র থাকিবে না যাহাতে ব্যক্তি মূলধন খাটাইতে পারে না। সরকারী নিয়ন্ত্রণও বেশি থাকা উচিত নয় কারণ

তাহাতে অর্থনৈতিক দেহ উপযুক্তভাবে কাজ করিতে পারে না। অর্থনৈতিক কাঠামোর দক্ষতা বৃদ্ধি না করিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইহাকে প্রায় বিকল করিয়া তোলে, উৎসাহ উদ্দীপনা নষ্ট করিয়া শ্রমিক ও পরিচালকদের রুটিনে আবদ্ধ খাঁচার পাখিতে পরিণত করে, দলীয় স্বার্থের হাতিয়ার হিসাবে তাহারা ব্যবহৃত হয়। অবাধ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রথা প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার অর্থনৈতিক গণতন্ত্র। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে লোকেরা পাঁচ বৎসর অন্তর একবার করিয়া কয়েকজন প্রার্থীকে ভোট দেয়, কিন্তু, অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে লোকেরা প্রতি মুহূর্তে শত শত পণ্যসামগ্রীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতেছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রে তাহাদের পছন্দ চরম ধরনের, একেবারে হাঁ অথবা না। কিন্তু অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের পণ্য এবং প্রতিটি পণ্যের বহু বিভিন্ন ধরনের মধ্যে তাহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পছন্দ প্রকাশ করিতে হয়। প্রত্যেক সপ্তাহ, প্রতিদিন এবং প্রতিটি ঘণ্টায় তাহাদের পছন্দ বদলাইতে থাকে। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার এই অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করিবে, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রথা গড়িয়া উঠিবে। অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া বা অলিগোপলি উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে ঠিকই, কিন্তু উহাপেক্ষা অধিকতর বিপদ হইল রাষ্ট্রীয় মালিকানার ছত্রচ্ছায়ায় বিরাট কেন্দ্রীয় সরকারী আমলাতান্ত্রিক শ্রেণীর উদ্ভব। ব্যক্তির মালিকানায় একচেটিয়া খারাপ ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রের মালিকানায় একচেটিয়া আরও খারাপ। ব্যক্তি হউক বা রাষ্ট্র হউক, কোন একচেটিয়া সংগঠন যদি অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার অধিকার নিজের হাতে তুলিয়া লয়, তবে অবশ্যই সে ব্যক্তি-সাধারণের অধিকার সংকুচিত করিবে এবং গণতান্ত্রিক সামাজিক সংগঠনের ভিত্তি দুর্বল হইবে। গান্ধীজী বলিয়াছেন, "I look upon an increase in the power of the state with greatest fear, because while apparently doing good for the people by minimising exploitation, it does the greatest harm to mankind by destroying individuality, which lies at the root of progress. What I would personally prefer would be not a centralisation of power in the hands of the state, but an extension of the sense of trusteeship, as in my opinion, the violence of private ownership is less injurious than the violence of the State." অবাধ বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রথার দোষত্রুটি, যেমন আয়, সম্পদ ও সুযোগসুবিধার বৈষম্য, অপচয়, একচেটিয়া, বাণিজ্যচক্রজাত বেকারি ও দুঃখদুর্দশা ও মুদ্রাস্ফীতি—সকল কিছুই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইন করিয়া নিবারণ করিতে সক্ষম। বরং, যত বেশি গণতন্ত্রের প্রসার ঘটিবে, নাগরিকদের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইবে, ততই কল্যাণ-রাষ্ট্র এই সকল দোষত্রুটির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে। রাজনৈতিক

গণতন্ত্রের প্রসারই এই সকল ত্রুটির হাত হইতে আমাদের রক্ষা করিতে পারে; গণতন্ত্রকে সংকুচিত করিলে ইহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মানসিক শক্তি ও সুযোগ ব্যক্তি কোথায় পাইবে? ধনতন্ত্রকে রক্ষা করা গণতন্ত্রের কাজ নয়, উহার দোষত্রুটি অপসারণ করিয়া উহার সকল গুণাবলীর সার্থক নিয়োগ করিয়া কল্যাণ বাড়াইয়া তোলাই গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারের ফলে যে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও হৃদয়হীন আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ দেখা দিবে তাহার হাত হইতে রক্ষার কোন পথ থাকিবে না, কারণ এই অবস্থায় ব্যক্তি আর স্বাধীন থাকে না, সে রাষ্ট্রের দাসে পরিণত হয়।

যাঁহারা বলেন ভারতে সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার হউক, তাঁহারা সমস্যাটিকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করেন। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে, সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার সংরক্ষিত করিতে হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে, সকল নাগরিকের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা, সম্পদের ও উৎপাদনের উপায়গুলির কেন্দ্রীভবন রোধ করা—এই সকল রাষ্ট্রীয় পরিচালনার নীতি হিসাবে গৃহীত। পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে জাতীয়করণ অবশ্যম্ভাবী। বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। কিরূপে দ্রুত শিল্পপ্রসার ঘটাইয়া কর্মসংস্থানের পরিমাণ ও মাথাপিছু আয় বাড়ানো চলে, উহাই সরকারের একমাত্র বিবেচ্য। ব্যক্তিক্ষেত্রের উদ্যোগী পুরুষেরা টাকা খাটান লাভজনক ব্যবসায়ে, সমগ্র জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বার্থ তাহাদের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হয় না। মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি উদ্যোগী হন, তাহারা ধনী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, কিন্তু ইহাতে গণতন্ত্র রক্ষা পায় না। ধনীর টাকাতে রাজনৈতিক দল চলে, সেই ধনীর স্বার্থেই সরকারের নীতি নির্ধারিত হয়। বাঁশিওয়ালাকে যে টাকা দেয়, সে-ই স্থির করিয়া দেয় কোন্ সুর বাজাইতে হইবে। ধনতন্ত্র কখনই অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তি হইতে পারে না। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসারের ফলে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পাইবে, ইহার ফলে প্রকৃত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের ভিত্তি রচিত হইবে। ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার ব্যক্তিগত শোষণের পথ প্রশস্ত করিবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফললাভ করিবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলকে "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়" ব্যবহার করিবে। আয়, সম্পদ-বৈষম্য ও একচেটিয়া শোষণের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবে। ব্যক্তিক্ষেত্র-প্রধান অর্থনৈতিক দেহে প্রাচুর্যের মধ্যে অনটন; কলকারখানা আছে অথচ বেকারি। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক দেহে প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন এবং

সকলের সমান ত্যাগ স্বীকার। আয় ও সম্পদ-বৈষম্য হইতে শ্রেণীবিভেদের উৎপত্তি, সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার শ্রেণীসংঘর্ষের হাত হইতে সামাজিক কাঠামো ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবে। ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার ব্যক্তির অসামাজিক ও অন্যায় শোষণের ইচ্ছা ও প্রবণতাগুলি বাড়াইয়া তোলে, গণতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা দিবার কোন সম্ভাবনা ইহাতে নাই। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার প্রকৃত দক্ষ ও বৈজ্ঞানিকদের সম্মুখে সুযোগ সম্প্রসারিত করিবে। পণ্ডিত নেহরু ঠিকই বলিয়াছেন, পশ্চিমী দেশগুলির গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র নয়, উহারা ধনতন্ত্র। তাঁহার মতে অবাধ ব্যবসায় বাণিজ্য বা ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসার গণতন্ত্রকে সংকোচন করে।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি যে, ব্যক্তিক্ষেত্রের প্রসারকে আর আজকাল বাঞ্ছনীয় মনে করা যায় না। পৃথিবীর যে বিভিন্ন দেশ ব্যক্তিক্ষেত্রের উপর জোর দিয়া উন্নয়ন ঘটাইয়াছে তাহারাও আর এখন উচ্চ উন্নয়নের হার রক্ষা করিতে পারিতেছে না। বরং সরকারী ক্ষেত্রের ক্রমপ্রসার ঘটাইয়া যাহারা উন্নয়ন ঘটাইয়াছে তাহাদের উন্নয়নের হার অনেক বেশি। শুধু তাহাই নহে। যে গভীর অনুন্নতি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিক ঘিরিয়া রাখিয়াছে, তাহা দূর করার জন্য যে-পরিকল্পনার দরকার, উহা ব্যক্তিক্ষেত্রে সম্ভব নয়। পরিকল্পনার প্রসার এবং সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের জন্যই সরকারী ক্ষেত্র বাড়াইয়া চলা দরকার।

১৯

ঘাটতি ব্যয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

বিগত দশকে ভারতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে-কথাটি আমরা বার বার শুনিতে পাইয়াছি তাহা হইল ঘাটতি ব্যয়। বস্তুতঃ, বিগত কয়েক বৎসর ঘাটতি ব্যয় লইয়া এত আলোচনা ও সমালোচনা হইয়াছে যাহা আর কোন কিছু লইয়াই হয় নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার রূপায়ণের জন্যই ঘাটতি ব্যয়কে এতখানি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির জন্যও আবার ঘাটতি ব্যয়কেই দায়ী করা হইয়া থাকে। সাম্প্রতিক মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম ও পরিমাণ দেখিয়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনাতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কম করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই সমস্ত বিষয়ের কারণ পর্যালোচনা করিবার পূর্বে জানা দরকার, ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে? প্রতিটি সরকারের বাজেটে রাজস্বক্ষেত্রে যখনই আয় অপেক্ষা অধিক ব্যয় দেখানো হয়, তখনই ঘাটতির উদ্ভব হয়। এই ঘাটতির পরিমাণ মত অর্থ আসিবে কোথা হইতে? সাধারণত, দুইটি সূত্র হইতে এই অর্থ আসে। প্রথমতঃ, যদি কোন

সঞ্চিত তহবিল থাকে, তথা হইতে অর্থ লইয়া, যেমন, আমাদের যুদ্ধকালীন সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল হইতে এই ঘাটতি ব্যয় আমরা করিতে পারি। কিংবা, দ্বিতীয়তঃ, অন্য কোনও উপায় না থাকিলে, সরকার নোট ছাপাইয়া এই ঘাটতি পূরণ করেন। সাধারণত, এই দ্বিতীয় অর্থেই ঘাটতি ব্যয় কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অনুন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ঘাটতিব্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মূলধনের অভাবে এই সমস্ত দেশগুলির আর্থিক উন্নয়নের কার্যে অগ্রসর হইতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পাথেয় সংগ্রহের সাধারণত চারিটি স্বীকৃত সূত্র আছে। ইহারা হইল কর, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঘাটতি ব্যয়। প্রথমেই বলিয়া রাখা দরকার, উন্নত দেশগুলি হইতে অনুন্নত দেশগুলির কর-কাঠামো সম্পূর্ণ পৃথক। সাধারণত এইসব দেশে মোট জনসংখ্যার খুব কম অংশই কর-ব্যবহার আওতায় পড়ে। কারণ, আয় বণ্টনের বৈষম্য এইসব দেশে প্রকট। ইহা ব্যতীত, উন্নয়নের প্রাথমিক যুগে কর-কাঠামো সুদৃঢ় করিলে উৎপাদনের গতি ব্যাহত হইতে পারে। অথচ ঐ গতি বজায় রাখিয়া বা বাড়াইয়া ক্রমোন্নতির পথে যাওয়াই আর্থিক উন্নয়নের প্রধান লক্ষ্য। অনুন্নত দেশে ভোগের স্তরও যথেষ্ট নীচু। এমতক্ষেত্রে অধিকতর কর আরোপ করিলে মানবতার দিক হইতে বাধা আসিতে পারে। উন্নত না হউক, সুষ্ঠু জীবনযাপনের সুযোগ সৃষ্টি করাই পরিকল্পনার লক্ষ্য। অবশ্য পরিকল্পিত অর্থনীতিতে কর-ব্যবস্থার আরেকটি উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। তাহা আমরা যথাসময়েই আলোচনা করিব। দ্বিতীয়ত আসে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণের কথা। সঞ্চয় থাকিলেই ঋণদানের প্রশ্ন উঠে। যে-দেশে ব্যয় অপেক্ষা আয় কম, সেখানে সঞ্চয়ের পরিমাণও অতি অল্প। ইহা ব্যতীত অনুন্নত দেশে স্বল্প সঞ্চয়কে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর মত সুব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে নাই। ভাগ্য লইয়া জুয়া খেলার মাধ্যমেও এই স্বল্প সঞ্চয়কে কাজে লাগানোর চেষ্টা আমাদের দেশে হইয়াছে। কিন্তু সরকারের এই 'প্রাইজ বণ্ড' পরিকল্পনাও সার্থক হয় নাই। এখন বৈদেশিক মূলধনের কথা আলোচনা করা যাক। প্রতিটি অনুন্নত দেশই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাথমিক যুগে বৈদেশিক সাহায্য লইয়াছে। ইহাতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, বৈদেশিক সাহায্যের সহিত বৈদেশিক কর্তৃত্বও জড়িত থাকে। তাহা ছাড়া ইহার রাজনৈতিক দিকটিকেও উপেক্ষা করা যায় না। আভ্যন্তরিক কোন সুযোগ না থাকিলেই তবে বিদেশী সাহায্য লওয়ার কথা চিন্তা করা উচিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরিকল্পনার পাথেয় সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের গুরুত্ব কতখানি। ঘাটতি ব্যয়ের পথটিও সহজসাধ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সামান্য নির্দেশ দিলেই কাজ হইয়া যায়। কিন্তু ইহার অন্য দিকটাও আলোচনা করা দরকার।

ঘাটতি ব্যয়ের ফলে যে অতিরিক্ত মুদ্রা সংস্থান হয়, তাহা কোন-না-কোন উপায়ে জনসাধারণের হাতে চলিয়া আসে। এই বাড়তি অর্থ লইয়া তাহারা তাহাদের ভোগ বাড়াইবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিনিসপত্রের যোগান বাড়ে না কারণ, উৎপাদন সময়সাপেক্ষ। তাই জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায় এবং যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাকে বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি। ইহার ফলে শুধু যে জনসাধারণকে আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহা নয়। যে-পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্ম এই ঘাটতি ব্যয় হয়, তাহার কার্যও ব্যাহত হইয়া পড়ে। প্রতিটি বস্তুর দাম বাড়িয়া যায়। তাই, যে-কার্যে হয়তো ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল, তাহার স্থলে ১৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। সীমিত আর্থিক সংস্থান ও ব্যয়বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই ধরনের বাড়তি ব্যয় সমস্ত ব্যবস্থাকেই বিপর্যস্ত করিয়া তুলে। আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্ম ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয়ের কথা স্থির করা হইয়াছিল। অংশত ইহারই ফলে দেশে এক দারুণ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে এবং পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হইয়াছে। হিসাব করা হইয়াছে যে, এখন যদি দ্বিতীয় যোজনার মোট বরাদ্দ ৪৮০০ কোটি টাকাও খরচ করা হয়, তাহা হইলেও সমগ্র কার্যের ⅘ এর বেশি অংশ সাধিত হইবে না।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ঘাটতি ব্যয়ের পথ সহজ নয়। এখানে বলা দরকার যে, এই ক্ষেত্রে কর-ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে যে মুদ্রা সংস্থান হয়, তাহা ভোগের কাজে লাগানো বন্ধ করা যাইতে পারে, যদি কর আরোপ করিয়া ঐ অর্থ তুলিয়া লওয়া হয়। অনেকে অবশ্য বলেন যে, উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সামান্য মুদ্রাস্ফীতি বাঞ্ছনীয়। কারণ, ইহাতে উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং আয়ও বাড়ে। কিন্তু বিপদ হইল এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহাকে সীমিত করিয়া রাখা যায় না। ফলে পূর্বোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমতক্ষেত্রে উপায় কি? উপায় হইল, একদিকে কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিরিক্ত ক্রয়-ক্ষমতাকে নষ্ট করা ও অন্যদিকে এই অতিরিক্ত অর্থকে এমন সব কার্যে বিনিয়োগ করা যাহা সহজেই ফলবতী হয়। আসল সমস্যা হইল উৎপাদনের সমস্যা। উৎপাদন যদি দ্রুত বাড়ানো যায়, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠে না। তাই, অতিরিক্ত অর্থকে যদি স্বল্পকালে ফলপ্রসূ এমন সব পরিকল্পনার কার্যে বিনিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে, সমস্যা অনেকটা সহজসাধ্য হইবে। এই প্রসঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পগুলির কথাও চিন্তা করা যাইতে পারে। ইহাতে উৎপাদন-ব্যয় বেশি হইলেও অবস্থা আয়ত্তাধীনে আনার প্রচেষ্টা খানিকটা সম্ভব হয়।

ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ঘাটতি ব্যয়ের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় যোজনার মোট আর্থিক সংস্থানের শতকরা ২৫ ভাগই আসে ঘাটতি ব্যয়

হইতে। কিন্তু ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই দেশব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি এবং পরিকল্পনারই কার্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি। শুধু জনসাধারণই নহেন, এমন কি পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরাও ইহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তাই আমরা দেখি যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ৭,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা আসিবে ঘাটতি ব্যয় হইতে। তবে আমাদের মনে হয় যে, এতখানি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। ইহা সত্য যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আমাদিগকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কষ্টের ফলে এবং অনেকগুলি কার্যসূচী প্রায় সমাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়ায় দ্রুত উৎপাদন বাড়ানোর পথে সহজে আর কোন অন্তরায়ের সৃষ্টি হইবে না এইরূপ আমরা মনে করিতে পারি। তাই তৃতীয় পরিকল্পনাতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ আরও কিছু বাড়ানো যাইত।

২০

ভারতীয় কর-কাঠামো

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই রাজস্ব সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা প্রথম ও প্রধান উৎস হইল কর। সাধারণত কর আরোপ করিয়াই পূর্বে দেশের শাসনভার ইত্যাদি চালানো হইত। বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রূপটিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আগেকার সেই 'লেসে ফেয়ার' রাষ্ট্র আর নাই। কি ধনতান্ত্রিক, কি সমাজতান্ত্রিক, বর্তমানের প্রায় সব রাষ্ট্রই কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্যভারও পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইসব কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা শুধু মাত্র কর আরোপ করিয়া পাওয়া যায় না। তাই অন্যান্য উৎস হইতে রাজস্ব আদায়েরও ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, বর্তমানেও কর-ব্যবস্থার গুরুত্ব সেই আগের মতনই আছে। বরং উন্নয়নশীল অর্থনীতির পটভূমিকায় এই গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উন্নত দেশগুলিতে শুধুমাত্র রাজস্ব ও আভ্যন্তরিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কর-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিতে এই পদ্ধতির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই সমস্ত দেশে তীব্র আয়-বৈষম্যের জন্য খুব কম লোকই কর-ব্যবস্থার আওতায় পড়ে। অধিক আয়বিশিষ্ট লোকদের বিলাস-সামগ্রী সাধারণতঃ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ইহার ফলে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই যে শুধু অবস্থা প্রতিকূল থাকে তাহা নহে, উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রারও অপচয় ঘটে। ইহা ব্যতীত, ঐসব বিলাসব্যসনজনিত ভোগের প্রদর্শন প্রভাবে

সাধারণ মানুষের মনেও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া যায়। উন্নত কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সমস্ত দোষই দূরীভূত হয়।

আবার, অনুন্নত দেশগুলিতে যখন ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা হয় তখন প্রচলন-ধারায় অধিকতর অর্থ আসে বলিয়া দেশব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই ক্ষেত্রে কর আরোপের দ্বারা ঐ বাড়তি অর্থকে ভোগের উপর ব্যয়িত হওয়া হইতে নিবৃত্ত করা যায়। ইহার ফলে শুধু যে জনসাধারণ বা বেসরকারী ক্ষেত্রে উপকরণের অভাব ঘটে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ক্ষেত্রেরও অতি দ্রুত প্রসার ঘটে। অবশ্য লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সরকারের আয়ত্তাধীনে উন্নয়নের উপকরণগুলি আসার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বেসরকারী ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব না ঘটে। কারণ, উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগের প্রয়োজন খুবই বেশি। কাজেই বিনিয়োগের স্পৃহা যাহাতে না কমে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

ভারতীয় কর-ব্যবস্থা অতি সুপ্রাচীন। কিন্তু প্রগতিশীল কর-কাঠামোর যে-সব লক্ষণ থাকে, তাহার একটিও ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে কর-ব্যবস্থাকে কখনও কখনও উন্নয়নাভিমুখী করিয়া তোলা হয় নাই। বরং এমনভাবে করসমূহ আরোপ করা হইয়াছিল যে, জাতীয় উদ্যোগ ও উদ্যম দুইই নষ্ট হয় এবং ফলে শিল্পসমূহ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কৃষিরও কোন উন্নতি বা সংস্কার সাধন হয় নাই। তাই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতীয় কর-ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করিবার জন্য ও সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে সুপারিশ করিবার জন্য ডাঃ জন মাথাই-এর নেতৃত্বে ১৯৫৩ খৃঃ-এ এক কর-অনুসন্ধানী কমিশন বসে। তাঁহাদের অনুসন্ধান তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়—সামগ্রিক কর-কাঠামো, কেন্দ্রীয় কর, এবং রাজ্য ও স্থানীয় কর। কমিশন বলেন যে, যুদ্ধের সময় হইতে যে-হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই হারে করের অনুপাত বৃদ্ধি পায় নাই। প্রত্যক্ষ করের অনুপাত কমিয়া গিয়া পরোক্ষ করই প্রাধান্য পাইয়াছে। রাজ্যসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অধিক দায়িত্ব চাপাইতেছে। সরকারী ব্যয়ের গতিবিধি সম্বন্ধে বলেন যে, মোট সরকারী ব্যয়ের মধ্যে উৎপাদক ও সামাজিক কল্যাণমূলক ব্যয়ে অধিক অর্থ নিয়োজিত হওয়ায় কর সম্পর্কে অপ্রীতিকর মনোভাব হ্রাস পাইয়াছে এবং ভবিষ্যতের করবহন যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কমিশন আরও বলেন যে, সাধারণভাবে শহরে করের ভার গ্রামের সকল আয়স্তরের তুলনাতেই বেশি, যদিও মাঝারি ও নিম্নস্তরে এই পার্থক্য খুব বেশি নয়। গ্রামীণ অর্থনীতির এক বৃহৎ অংশ আর্থিক বাজারের বাহিরে থাকায় করবহন যোগ্যতাও কম। করনীতি সম্বন্ধে কমিশন বলেন যে, এমনভাবে কর বসাইতে হইবে যে বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগযোগ্য অর্থ হ্রাসের পরিমাণ

খুব কম হয়। সর্বোচ্চ আয় নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রগতিশীল কর-ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। ইহা ছাড়া কর আদায়ের পদ্ধতি সম্বন্ধেও কমিশন কয়েকটি সুপারিশ করেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা দরকার তাহার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ নিকোলাস ক্যালডরের উপর ভারত সরকার ভার দিয়াছিলেন। আয়-বৈষম্য হ্রাস এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা বৃদ্ধি—এই দুই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কিভাবে দ্বিতীয় যোজনাকালে কর আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়—ইহা নির্ধারণই ছিল তাঁহার বিশেষ কাজ। ১৯৫৬তে তিনি তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। তিনিও বলেন যে, তুলনামূলকভাবে ভারতের জাতীয় আয়ের সহিত করের অনুপাত খুবই কম। তিনি আয়করের হার কমাইবার সুপারিশ করেন ও অন্যান্য আরও কয়েকটি কর বসাইবার প্রস্তাব দেন। তাঁহার মতে এই সমস্ত কর একে অন্যের সহিত সংলগ্ন ও পরস্পর নির্ভরশীল। তিনি একত্রে যে পাঁচটি করের কথা বলেন, তাহারা হইল—আয়কর (যাহার সর্বোচ্চ হার ৯২% হইতে ৪৫% করার তিনি পক্ষপাতী), সম্পদের উপর বাৎসরিক কর, মূলধনী লাভের উপর কর, সাধারণ দান কর ও ব্যক্তিগত ব্যয় কর। তিনি আয় অপেক্ষা ব্যয়কেই করের বহনযোগ্যতার উত্তম নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। কোম্পানির উপরও একটি করর্পোরেশন কর আরোপের কথাও তিনি বলেন। ভারত সরকার ক্রমে ক্রমে তাঁহার প্রস্তাবিত সকল করগুলিই আরোপ করেন। শুধু ১৯৬১-৬৩'র বাজেটে ব্যয়-কর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

উপরে উল্লিখিত করগুলি সংবিধানগতভাবে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কখনো কেন্দ্রীয় সরকার কর আরোপ, আদায় ও তাহা হইতে ভোগ করেন। কখনো রাজ্য সরকারগুলি কর আরোপ, আদায় ও তাহা হইতে ভোগ করেন। কখনো বা কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ ও আদায় এবং রাজ্য সরকারগুলি ভোগ করেন অথবা কেন্দ্রীয় সরকার শুধু আরোপ এবং রাজ্য সরকারগুলি আদায় ও ভোগ করেন। ১৯৬২ সালে তৃতীয় ফিনান্স কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বাঁটোয়ারা চলিতেছে। এই কমিশন অনুন্নত রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বিশেষ সাহায্যের কথা বলিয়াছেন।

আমাদের কর-কাঠামোর বৈশিষ্ট্যগুলিকে মোটামুটি কয়েকভাবে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হইল যে, পরিকল্পনা কমিশনের মতে বর্তমানে জাতীয় আয়ের সহিত কর আদায়ের অনুপাত ৮'৯%, তৃতীয় যোজনার শেষে কর-হার বৃদ্ধির ফলে ইহা দাঁড়াইবে ১১'৪%। U. N. Reports (1954) দেখা যায় যে, এই অনুপাত ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের তুলনাতেও কম। উন্নত দেশগুলির কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ইহার

কারণ দুইটি : আয় বা উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ কম ও কর ফাঁকির পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। মহাবীর ত্যাগী কমিটির রিপোর্টেও এই কর ফাঁকির অভিযোগ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ ভারতের মোট জনসংখ্যার খুব কম অংশই কর দেয় (প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে ইহা ১% এর ⅓ ভাগ) যেখানে উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার ৩০% হইতে ৫০% ব্যক্তি প্রত্যক্ষ কর দেয়। তৃতীয়ত: পরোক্ষ করের প্রয়োগই বেশি। চতুর্থতঃ করের স্থিতিস্থাপকতাও নিতান্তই কম। ইহা কোন সুদক্ষ কর-কাঠামোর লক্ষণ নয়। উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এই স্থিতিস্থাপকতা ১ হইতে বেশি হওয়া দরকার যেখানে আমাদের দেশে ইহা ০·৮৩৩, তাহাও কেন্দ্রীয় ও রাজ্যগুলির একত্রে হিসাব লইয়া।

এখন দেখা যাক্, এই কর-কাঠামো উন্নয়নের কাজে অর্থ সংগ্রহ করার পক্ষে কতটা উপযোগী। সাধারণতঃ উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে সাহায্যকারী কর-কাঠামোর তিনটি প্রধান লক্ষণ থাকে। প্রথমত এই ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে সাহায্য করিবে। দ্বিতীয়তঃ সরকারের হাতে বেশী টাকা আনিবে অথচ বেসরকারী ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ স্পৃহা কমিবে না। তৃতীয়তঃ অনুৎপাদক শ্রেণীর আসল আয় ক্রমাগত কমাইয়া উৎপাদক শ্রেণীর আয় বাড়াইতে সাহায্য করিবে। আমাদের দেশে ইহার একটিও হইতেছে না। দ্বিতীয় যোজনাকালে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়াছে, তাহা রোধ করা সম্ভব হয় নাই। নানা রকম ছাড় ও ফাঁকির জন্য সরকারের হাতে বেশী অর্থ আসে নাই। অথচ পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমজীবি জনসাধারণের উপর করভার বেশী বর্তাইতেছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে যে দেশে সমাজ গড়িয়া তোলাই লক্ষণ, যেখানে তীব্র আয়-বৈষম্যকে দ্রুত হ্রাস করা ও সম্পদের সুদ বণ্টন জাতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য, সেখানে এই কর কাঠামো শুধু যে অক্ষম তাহা নহে, ইহা এই আয়-বৈষম্য আরও বাড়াইতে সাহায্য করিয়াছে।

এদিকে ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ ৭,৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ২,২৬০ কোটি টাকাই আসিবে কর হইতে। ইহার মধ্যে তৃতীয় যোজনাকালে নতুন কর বসান হইবে যাহা হইতে ১,৭১০ কোটি টাকার মত পাওয়া যাইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ১,১০০কোটি টাকা ও রাজ্য সরকারগুলি ৬১০ কোটি টাকার অতিরিক্ত কর বসাইবেন। পরিকল্পনা কমিশনের মতে ইহা সর্বাপেক্ষা কম করিয়া ধরা হইয়াছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ধরনের করই বাড়ানোর কথা বলা হইয়াছে। একাধারে ভোগের হ্রাস ও বিনিয়োগ হার বজায় রাখিয়া এই করগুলি বসানো হইবে। রাজ্যসরকারগুলিকে গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধিতে উদ্যোগী হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিক্রয় কর ইত্যাদি উৎসকে যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক ও কার্যকরী করিতে বলা হইয়াছে।

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে এই নতুন ব্যবস্থা কতখানি সাফল্যলাভ করিবে সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়াছে।

২১

বেকার সমস্যা ও উহার সমাধান

বর্তমান ভারতে যে সকল সমস্যা প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে, বেকার সমস্যা তাহাদের অন্যতম। দ্বিতীয় যোজনার সময় হইতেই ইহার তীব্রতা অনুভূত হয়, এবং পরস্পর দুইটি পরিকল্পনায় কর্মহীন ব্যক্তির কর্মসংস্থান করা অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য থাকিলেও অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই, বরং ক্রমাবনতির দিকে চলিয়াছে।

অন্যান্য সব বিষয়ের অভাবের মত অনুন্নত দেশগুলিতে বিনিয়োগের অভাব দেখা যায়। মানুষের কর্মসংস্থান অংশত নির্ভর করে বিনিয়োগের হারের উপর। কার্যকরী চাহিদার অভাবের ফলেও বেকারী দেখা দেয়। কিন্তু সেই ধরনের মূলধনের অচলাবস্থা উন্নত দেশগুলিতেই সচরাচর দেখা যায়। কাজেই অনুন্নত দেশগুলিতে দ্বিতীয়টির প্রভাব সামান্যই। বেকারী সাধারণতঃ দুই প্রকারের—ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত। এই দ্বিতীয় রূপটি তখনই দেখা দেয় যখন বর্তমান হারে কাজ চাহিয়াও কোন ব্যক্তি কাজ পায় না। এইরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারী কোন দেশে না থাকিলে, সেই দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান হইয়াছে বলা হয়। এই অনিচ্ছাকৃত বেকারীরও আবার বিভিন্ন রূপ আছে। সেই বহু বিচিত্ররূপ আজ ভারতবর্ষে দেখা যাইতেছে।

ইহার প্রথম রূপটির নাম হইল যন্ত্রজনিত বেকারী। অনুন্নত দেশগুলিতে যখন শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন-পদ্ধতি ছাড়িয়া মূলধন-প্রগাঢ় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তখনই এই ধরনের বেকারী দেখা দেয়। ভারত যন্ত্রশিল্প যুগে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের বেকারীও তীব্রতর হইয়া দেখা দিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এইসব দেশে মরসুমী বেকারী দেখা যায়। ইহাতে বৎসরে কোন এক বিশেষ সময় কাজ থাকে এবং বাকী সময় বেকার হইয়া কাটাইতে হয়। ভারতে কৃষিকর্মে ইহা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। কৃষিব্যবস্থার সম্পূর্ণ সংস্কার না হইলে ইহা দূর হইবার নয়। তৃতীয়তঃ, মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষের ফলে সংঘাতজনিত বেকারী দেখা দিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তাহাদের অন্যত্র নিয়োগের ব্যবস্থা হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা, বেকার ভাতা ও বেকারী বীমা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। ভারতে শিল্পের দ্রুত প্রসারের ফলে এই ধরনের সংঘাতজনিত বেকারীও দেখা দিতেছে। এমন কি সরকারী ক্ষেত্রেও ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। চতুর্থতঃ, অন্যান্য সব অনুন্নত দেশের মত ভারতেও প্রচ্ছন্ন

বেকারী বর্তমান। প্রচ্ছন্ন বেকারীকে আসলে আধা-বেকারী বলা যাইতে পারে। দেখা যায় যে উৎপাদনে নিযুক্ত আছে এমন কিছু লোককে সরাইয়া আনিলেও উৎপাদনের হ্রাস হয় না। ভারতীয় কৃষিতে ইহা তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থার মূল কারণ হইল অনমনীয় কাঠামোর মধ্যে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উত্তরাধিকার আইন। পঞ্চমতঃ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকায় ব্যবসায় চক্রজনিত বেকারীও ভারতে দেখা দিতেছে। সর্বোপরি, ভারতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অত্যধিক। মূলধনের দ্রুত সৃজন ও বিনিয়োগের অভাবের জন্য আনুষঙ্গিক কাজকর্মের সুযোগ বাড়ানো হয় নাই। তাই এই বেকারীর সৃষ্টি।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার যে ভারতে মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এতই কম যে বেকারী ও চাকরির মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা টানা চলে না। বস্তুতঃ ভারতের অধিকাংশ চাকরিই অর্ধ-বেকারীর আরেকটি রূপ। উপাদানগুলির পূর্ণ বিকাশ কখনও ঘটিয়া উঠে নাই।

কার্যকরী চাহিদার অভাবজনিত বেকারীর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অনুন্নত দেশে সাধারণতঃ মূলধনের এইরূপ অচলাবস্থা দেখা যায় না। কর্মসংস্থানের তত্ত্বে বলা হইয়া থাকে যে যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে বেকারী থাকে, ততক্ষণ বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানও হয়। একটি নির্দিষ্ট সীমার পর উহা আর সম্ভব হয় না। অবশ্য এই তত্ত্ব আংশিক সত্য। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, অনুন্নত দেশগুলিতে অন্যান্য নানা অসুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখার পূর্বেই বিনিয়োগের বৃদ্ধির সহিত কর্মসংস্থানের আর বৃদ্ধি হয় না। ভারতে এখনও সেই অবস্থা দেখা দেয় নাই। বিনিয়োগের অভাবই বেকারী দূরীকরণে প্রধান প্রতিবন্ধক।

ভারতে প্রথম উন্নয়ন পরিকল্পনা যখন গ্রহণ করা হয়, তখন পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ কর্মসংস্থানের দিকে নজর দেন নাই। প্রথম যোজনার দুই বৎসরের মধ্যেই সরকার ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ও এগারো দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচী কার্যকরী করিবার জন্য ১৫০ হইতে ১৭৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। এই কার্যসূচী সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ফলে বেকার সমস্যা হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

দ্বিতীয় যোজনার চারিটি লক্ষ্যের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগের বিপুল প্রসার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হইয়াছিল। বিনিয়োগের মাধ্যমেই কর্মসংস্থান বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন। শহর ও গ্রামাঞ্চলের বেকারদের জন্য ব্যবস্থা করা ছাড়াও, প্রতি বৎসর যে সম্ভাব্য ২০ লক্ষ নূতন শ্রমিকের ব্যবস্থা করা এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলে যে আধা-বেকারী রহিয়াছে, তাহার পুরাপুরি সংস্থান করার

কথা কমিশন বলেন। এইজন্য তাঁহারা শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতির উপর জোর দেন। এতদ্ভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের শিল্পে মূলধন প্রয়োগও তাঁহারা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন না। কৃষিক্ষেত্রের সংস্কার সাধন হইলে নূতন কর্মসংস্থান ঘটিবে। শিক্ষিত বেকারদের সম্বন্ধে কমিশনের অভিমত ছিল এই যে, দেশের শিক্ষাপ্রসার এমনভাবে হওয়া উচিত যাহা দেশের প্রয়োজনের সহিত জড়িত।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে অবস্থা ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তৃতীয় যোজনাতেও লক্ষ্যগুলির মধ্যে দেশের শ্রমসম্পদকে পূর্ণভাবে নিয়োগ করা একটি অন্যতম লক্ষ্য। বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে আমাদের শঙ্কিত হইয়া পড়িতে হয়। দ্বিতীয় যোজনাতে ৫৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হইবে না, ইহা হিসাব করা হইয়াছিল। তৃতীয় যোজনার প্রারম্ভে এই হিসাব দাঁড়ায় ৯০ লক্ষে।

আধা-বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৮০ লক্ষের মধ্যে। অনুমান করা হয় যে, তৃতীয় যোজনাতে শ্রমশক্তির নূতন বৃদ্ধি দাঁড়াইবে ১ কোটি ৭০ লক্ষে। ইহার এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইবে শহরাঞ্চলে। ফলে তৃতীয় যোজনাকালে আধা-বেকারদের কথা বাদ দিলেও মোট ২ কোটি ৬০ লক্ষ (১ কোটি ৭০ লক্ষ নতুন + ৯০ লক্ষ পুরাতন) লোকের কর্মসংস্থান করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় যোজনাতে মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করা যাইবে বলিয়া কমিশন অনুমান করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে তৃতীয় যোজনা কর্মসংস্থানাভিমুখী হইলেও বেকারের সংখ্যা কমিবে না বরং বাড়িয়াই যাইবে (৩য় যোজনার পূর্বে ৯০ লক্ষ, ৩য় যোজনার শেষে ১ কোটি ২০ লক্ষ)। কমিশন আশা করেন, এই ১ কোটি ৪০ লক্ষের মধ্যে কৃষির বাহিরে ১ কোটি ৫ লক্ষ লোক নিযুক্ত হইবে, অবশিষ্ট ৩৫ লক্ষ কৃষি-কাঠামোর মধ্যেই কাজ পাইবে।

কমিশনের মতে, বিভিন্ন কর্মসূচী হইতে কর্মসংস্থান কতটা হইবে তাহা সঠিক অনুমান করা অসুবিধাজনক। প্রতিটি ক্ষেত্রে দুইটি সম্ভাব্যতার কথা স্মরণে রাখিতে হয়। প্রথমতঃ বর্তমান উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের স্তর যাহাতে বজায় থাকে, দ্বিতীয়তঃ উৎপাদনের অবিচ্ছিন্নতা যাহাতে রক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, কৃষির উৎপাদন বাড়িলে তাহা নিয়োগ বাড়ায় না। প্রধানতঃ কর্মসংস্থানের অপূর্ণতা কমাইয়া দেয়। নূতন সুযোগের সামান্যই বৃদ্ধি ঘটে। ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাহাই। শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের কোন্ পদ্ধতি গৃহীত হইবে তাহার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বৃহৎ যন্ত্রশিল্পগুলি, বিশেষ করিয়া নূতনগুলি অধিক উৎপাদনক্ষম হইলেও সেই পরিমাণে কর্মসংস্থান করিতে পারে না। আবার অন্যদিকে শ্রম-প্রগাঢ়, মূলধন-সঞ্চয়ী এবং বৈদেশিক মুদ্রার কম প্রয়োজন হয়

এমন পদ্ধতিও অবলম্বন করিতে হয়। শুধু উৎপাদন নয়, উৎপাদন-কেন্দ্র যে স্থানে অবস্থিত তাহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিও লক্ষ্য রাখা দরকার। যে অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ বেশি, সেখানে জনশক্তির সর্বাধিক ব্যবহারই কাম্য। আবার সম্ভাব্য কর্মসংস্থানকে দুইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে—নির্মাণশীল স্তর এবং চলনশীল স্তর। পরিকল্পনাটি জন্য যে নির্মাণ কার্যের প্রয়োজন হয়, তাহাতে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু নির্মাণকার্য শেষ হইলে ইহাদের আর প্রয়োজন হয় না। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কতটা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা অনুধাবনযোগ্য, কারণ, ইহা মোটামুটি স্থায়ী ধরনের। আবার প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ফলে কতটা পরোক্ষ কর্মসংস্থান হইবে তাহারও হিসাব করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ফলে লোকের হাতে আয় বৃদ্ধি পায় এবং উহা ব্যয়িত হইলে জিনিসপত্রের লেন-দেন ইত্যাদির উপযোগী ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পরিবহণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তৃতীয় যোজনাতে পরোক্ষ কর্মসংস্থান প্রত্যক্ষের ৫৬% মত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

কর্মসংস্থান প্রসারের জন্য কমিশন তিনটি নীতি স্থির করিয়াছেন। প্রথমতঃ, বর্তমান কাঠামোর মধ্যেই যাহাতে বিস্তৃততর ও সুষম কর্মসংস্থান সম্ভব হয় তাহার চেষ্টা করা। দ্বিতীয়তঃ, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণের ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটাইবার প্রয়াস পাওয়া।

গ্রাম্য শিল্পোন্নয়নের কর্মসূচীর এক বৃহৎ অংশে আছে গ্রাম্য বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, গ্রাম্য শিল্প-তালুক প্রতিষ্ঠা, গ্রাম্য শিল্পের উন্নয়ন ও শ্রমশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার। প্রথম দিকে কম হইলেও দূর-ভবিষ্যতে ইহা বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়তঃ, একটি গ্রাম্য নির্মাণ-কার্যসূচী লওয়া হইয়াছে যাহাতে ক্ষুদ্রশিল্পের দ্বারা কর্মসংস্থানের প্রসারের কথা বলা হইয়াছে। ইহা বৎসরে গড়ে ১০০ দিন করিয়া ২৫ লক্ষ লোককে কাজ দিবে। ইহা শুধু সাধারণ মানুষের নয়, শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও কর্মের ব্যবস্থা করিবে। কমিশনের মতে, কারিগিরি শিক্ষা থাকিলে, শিক্ষিত বেকারদের শহরে কাজ মিলিবে নতুবা গ্রামাঞ্চলেও কাজ পাওয়া যাইবে। সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইহারাই শিক্ষিত বেকারী সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ।

এই কর্মসূচীর মাধ্যমে কতটুকু কার্যকরী ফল লাভ ঘটিবে, সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ঘটিয়াছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে, কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রের যে উল্লেখযোগ্য অংশ নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত হইবে (২৩ লক্ষ, ১ কোটি ৫ লক্ষের মধ্যে) তাহারা কিছুদিন পরেই বেকারত্ব প্রাপ্ত হইবে। ইহাদিগকে নূতন করিয়া কাজ দেওয়া কষ্টসাধ্য হইবে। এদিকে গ্রামাঞ্চলের উপযুক্ত সংস্কারসাধন ও সমবায় প্রথার

সাফল্যলাভ সম্ভবপর না হইলে, গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ বিদ্যমান। সর্বোপরি, এই ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের উপযোগী বিনিয়োগ সম্ভব হইবে কিনা, তাহাও সন্দেহের বিষয়। দ্বিতীয় যোজনার অভিজ্ঞতা হইতে ইহা সম্ভব নাও হইতে পারে। এমনকি তৃতীয় যোজনার কর্মসূচী পুরোপুরি সফল হইবে ধরিয়া লইলেও দেখা যায়, তৃতীয় যোজনার শেষে বেকারের সংখ্যা তৃতীয় যোজনার প্রারম্ভের বেকারের সংখ্যা হইতে বেশী। পরিকল্পনা রচয়িতাদের ও যাঁহারা ঐ সূচী কার্যকরী করিবেন, তাঁহাদের সম্মুখে ও জাতির সম্মুখে ইহা আজ এক বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার সামাজিক দিকটিকেও উপেক্ষা করা আর চলে না। শুধু যে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন তাহা নহে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধেরও উপায় খুঁজিতে হইবে। তাহা না হইলে ক্রমবর্ধমান বেকারির চাপে উন্নয়নশীল অর্থনীতির গতি রুদ্ধ হইবে। সামাজিক ব্যবস্থা তো বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেই, উপরন্তু উন্নয়নের অতি-আবশ্যকীয় উৎপাদন বৃদ্ধির পথেও বাধা পড়িতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনকে এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্য হইতেই মঙ্গলের ও কল্যাণের পথটি বাছিয়া লইতে হইবে।

২২

ভারতের মূলধন-গঠনের সমস্যা

আর্থার লুইস তাঁহার "The theory of Economic Growth" গ্রন্থে বলিয়াছেন, "Economic growth is associated with an increase in capital per head." সত্যই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে মাথাপিছু মূলধন বৃদ্ধির উপর। উন্নত দেশগুলি মূলধন-সমৃদ্ধ। তাই সেইসব দেশে এই সমস্যা প্রকট হইয়া দেখা দেয় নাই। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। চলতি আয়ের কতখানি অংশ মূলধন-গঠনের কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহারই উপর উন্নয়নের গতি নির্ভর করে।

ভারতীয় অর্থনীতিতে মূলধন-গঠনের সমস্যা আলোচনা করার পূর্বে মূলধন কাহাকে বলে এবং উহার গঠন সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলা প্রয়োজন। মূলধন বলিতে আমরা বুঝি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি, কারখানা, বাড়ি, পরিবহণ-ব্যবস্থা ইত্যাদি যাহা উৎপাদন বাড়াইতে সাহায্য করে। মূলধন গঠনের মূল কথাটি হইল, দেশের চলতি সম্পদের একটি অংশকে মূলধনী দ্রব্য গঠনের কার্যে বিনিয়োগ করা, যাহাতে অর্থনীতির সম্ভাব্য উৎপাদনক্ষমতা বর্ধিত হয় এবং ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভবপর হয়।

অনেক সময়, শ্রম-মূলধনের কথাও শোনা যায়। আমরা অবশ্য প্রথমোক্ত অর্থেই মূলধন-গঠন কথাটি ব্যবহার করিব।

মূলধন-গঠন সাধারণতঃ নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। প্রথমতঃ সেই দেশে সঞ্চয়-ক্ষমতা কতখানি। দ্বিতীয়তঃ সঞ্চয়-স্পৃহা বর্তমান কিনা এবং তৃতীয়তঃ ঐ সঞ্চয়কে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাইবার সুব্যবস্থা আছে কিনা। অনুন্নত দেশে আয় কম বলিয়া সঞ্চয়ও কম। ভোগের স্তর এতই নীচুতে থাকে যে, উহা আরও কমাইয়া সঞ্চয়ের কথা চিন্তাও করা যায় না। অল্প আয় বলিয়া আবার প্রান্তিক ভোগপ্রবণতাও বেশি এবং এই স্বল্প সঞ্চয়কে কাজে লাগানোর মত উপযুক্ত ব্যাঙ্ক বা বীমা ইত্যাদির ব্যবস্থা এইসব দেশে উপযুক্ত পরিমাণে গড়িয়া উঠে নাই। অধ্যাপক Nurkse তাঁহার "Problems of Capital formation in Uuder-developed Countries" গ্রন্থে বলিয়াছেন যে এইসব দেশে মূলধন-গঠন সমস্যা এক দুষ্টচক্রের (Vicious Circle) অন্তর্ভুক্ত। এইসব দেশে বিনিয়োগের হার কম। কারণ আয় কম বলিয়া সঞ্চয়ও কম। কম বিনিয়োগের হারের উপর আয়ের স্বল্পতা নির্ভরশীল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এক ধরনের দুষ্টচক্র এইসব দেশে বর্তমান এবং এই দুষ্টচক্র হইতে বাহির হওয়ার উপায়ও কষ্টসাধ্য। অনেকে বলেন যে, ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা এই ব্যূহ ভেদ করা যায়। কিন্তু এইসব দেশের ঘাটতি ব্যয়ের অর্থই হইল মুদ্রাস্ফীতি। অবশ্য পরোক্ষভাবে মুদ্রাস্ফীতি বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ে সাহায্য করে। কিন্তু Duessenberryর কথা অনুযায়ী, এইসব দেশে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা বেশি এবং সঞ্চয় কম। এই প্রসঙ্গে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পার্থক্য লক্ষ্য করিবার যোগ্য। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ভোগের একটা স্তর বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে যেখানে ভোগকারীকে রাজা ("Consumer is a King") আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, সেখানে ইহা অসম্ভব। কর আরোপ করিয়া হয়তো ভোগস্তর কমাইবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু তাহাতে উৎপাদন ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা এবং পরোক্ষভাবে ইহা সঞ্চয়ের বৃদ্ধিতেও বাধা দেয়।

অনেক সময় বলা হয়, বিদেশী সাহায্যের দ্বারা এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর। বিদেশী সাহায্যের সহিত অধিকাংশ সময়ই বিদেশী কর্তৃত্ব জড়িত থাকে। ইহার রাজনৈতিক দিকটিকে বাদ দিলেও বলা যায় যে, একদিক দিয়া বিদেশী সাহায্য দেশীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করিয়া তোলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ত্যাগের প্রয়োজন হয়। বর্তমানের এই ত্যাগ ভবিষ্যতে সমৃদ্ধি আনয়ন করে। যতক্ষণ না দেশের লোককে উন্নয়নের তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া যায়, ততক্ষণ ঘাটতি ব্যয় বা বৈদেশিক সাহায্যের

বিশেষ কোন ফল হয় না। এক ধরনের অবাঞ্ছিত প্রসার ও অবিবেচনাপ্রসূত কাজ এইসব ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

অধ্যাপক ভকিল ও ব্রহ্মানন্দ অধ্যাপক নার্কসের ধারা অনুসারে এই সমস্যা সমাধানের জন্য একটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। অনুন্নত দেশগুলির কৃষিতে সাধারণতঃ প্রচ্ছন্ন বেকারি (Disguised Unemployment) বর্তমান থাকে। অর্থাৎ উৎপাদন হইতে কিছু লোক সরাইয়া আনিলেও উৎপাদনের পরিমাণ কমে না। এই উদ্বৃত্ত লোককে উৎপাদনের কার্যে নিয়োগ করা যায় এবং ইহাদের জন্য ব্যয়ও বেশি হয় না। শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতিতে উৎপাদন করিলে উৎপাদনের গতি হয়তো দ্রুত হয় না, কিন্তু যে-দেশে মূলধনের সমস্যা রহিয়াছে, সেই দেশে মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন-ব্যবস্থা অবলম্বন করাও কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি বাস্তব অবস্থার কথা মনে রাখা দরকার। ড্যুয়েসেনবেরী কথিত প্রদর্শন-ভাব (Demonstration effect) এখানেও কার্যকরী হইতে পারে। নগরাভিমুখীনতার কুফলগুলি দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্ত উদ্দেশ্যই পণ্ড হইবে। কিন্তু যদি কোন উপায়ে ভোগস্তরকে বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে বর্তমান অবস্থায় ইহা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য।

এখন দেখা যাক্, এই সঞ্চয়কে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করিবার যোগ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে কিনা। আমাদের অর্থনীতির অধিকাংশই অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্রে (non-monetised sector) অন্তর্ভুক্ত। উপযুক্ত ব্যাঙ্ক বা বীমা-ব্যবস্থা, যাহার মাধ্যমে সাধারণতঃ সঞ্চয় কার্যকরী হয়, তাহাও আমাদের দেশে গড়িয়া ওঠে নাই। অবশ্য বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির জাতীয়করণ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় উহা যৎসামান্যই: এই প্রসঙ্গে সরকারের দায়িত্বের কথাও আলোচ্য। বিগত কয়েক বৎসরের জাতীয় স্বল্প সঞ্চয় লইয়া অনেক প্রচেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে যে সাড়া একেবারে পাওয়া যায় নাই, এমন নহে। তবে তাহা যথেষ্ট নহে এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সুপরিকল্পিত নীতির অভাব এই পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হয় নাই।

পরিশেষে অধ্যাপক Bauer এবং Yameyর ভাষায় বলা যায়: "It is often nearer the truth to say that Capital is created in the process of development than that development is a function of Capital accumulation," অনেক সময় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই মূলধনের সৃষ্টি হইতেছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ ও তাহার সদ্ব্যবহার এবং পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণের পথে অগ্রগতির কথা চিন্তা করিলে আমরা কিছুটা আশার আলোক দেখিতে পাই। দেখা যাইতেছে যে, প্রথম পরিকল্পনার আগে যে-হারে

বিনিয়োগ ও সঞ্চয় হইত তাহার এখন যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তখনকার ৫% বিনিয়োগ হার তৃতীয় যোজনার শেষে ১৪%এ দাঁড়াইবে এবং আভ্যন্তরিক সঞ্চয় ও ৬% হইতে ৯১$\frac{১}{২}$%এ দাঁড়াইবে। অধ্যাপক Rostow-এর মতে বাৎসরিক ১০% বিনিয়োগের হার বজায় রাখিলেই আমরা স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইব। তৃতীয় যোজনায় তাই মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য, কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেও নজর দেওয়া হইয়াছে। সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের সাহায্যেও আমরা গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় বাড়াইতে পারিব এবং উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইব।

২৩

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বৈদেশিক মূলধনের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশই বৈদেশিক সাহায্য লইয়াছে। সাধারণতঃ অনুন্নত, বা অপূর্ণোন্নত দেশগুলি এক দুষ্টচক্রের অন্তর্ভুক্ত। বিনিয়োগের হার এখানে কম, কারণ সঞ্চয় কম যেহেতু আয়ও কম। আবার সঞ্চয় কম যেহেতু আয় কম এবং এই কম আয় অংশতঃ কম বিনিয়োগের হারের উপর নির্ভরশীল। এই ব্যূহ ভেদ করিতে হইলে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না।

তীব্র আয়বৈষম্য বর্তমান থাকায় খুব অল্প লোকই এইসব দেশে কর-ব্যবস্থার আওতায় পড়ে এবং জাতীয় আয়ের খুব সামান্য অংশই কর হইতে আদায় হয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে ইহা সর্বাপেক্ষা কম। ভোগের স্তর এতই নীচে থাকে যে উহা আরও কমাইয়া দিয়া সঞ্চয় বাড়াইবার কথা প্রায় অচিন্ত্যনীয় হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্যা আরও প্রকট হইয়া দেখা দেয় তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে। সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলিতে ভোগের স্তর বাঁধিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মত দেশে এই অবস্থা আনিতে গেলে শুধু যে সামাজিক বিপ্লব ঘটিবে তাহা নহে, রাজনৈতিক বিপ্লবও অনিবার্য হইয়া পড়িবে। জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক পরিমাণ ঋণ গ্রহণের আশাও দুরাশা, কারণ তাহাদের নিজস্ব সঞ্চয়ই খুব কম। এদিকে ঘাটতি-ব্যয় পন্থা অবলম্বন করিলে দেশব্যাপী যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে, তাহাতে উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। একবারও যদি দেশের বাহির হইতে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধন আনা যায়, তাহা হইলে উন্নয়নের

সহিত সমান্তরাল ভাবে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে মূলধন সৃষ্টির কাজও ত্বরান্বিত হইবে।

এই বৈদেশিক সাহায্য দুইভাবে আসিতে পারে। এক, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করিয়া, ও অপরটি হইল উন্নয়নের জন্য যে বিশেষ ধরনের কারিগরী বিদ্যার প্রয়োজন হয় তাহা ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত কর্মীর সাহায্য লইয়া। দ্বিতীয় রূপটি সর্বতোভাবেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রথম রূপটি লইয়া অনেক রকমের তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, প্রথমোক্ত রূপটিও আবার দুই ধরনের হইতে পারে। একটি ক্ষেত্রে বিদেশী সরকারগুলি বা শিল্পপতিরা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র অর্থ সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না। তাহারা নিজেরাই কোন উদ্যোগ গড়িয়া তুলিতে চাহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে শিল্পায়নে অংশ গ্রহণ করে।

এমনতর ক্ষেত্রে শুধু যে তাহাদের কর্তৃত্বই থাকে না তাহা নহে, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইত্যাদি নিয়োগের ক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার দেখা যায়। ইহা ব্যতীত বহুপরিমাণ অর্থ নিজেদের দেশে পাঠানো হইয়া থাকে। দ্বিতীয় রূপটিতে তাহারা শুধুমাত্র বিনিয়োগ করিয়া ও তজ্জনিত সুদ বা লভ্যাংশ লইয়াই ক্ষান্ত থাকে। একথা বলাই বাহুল্য যে, দ্বিতীয় রূপটিই সর্বতোভাবে কাম্য। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, শুধু আমাদের দেশে কেন, যে দেশই বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য লইয়াছে, সেখানেই এই প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার ভাগই বেশী। শুধুমাত্র কাগজে-কলমে ঋণ বা সাহায্য দিয়াই তাহারা ক্ষান্ত থাকে না।

এই প্রসঙ্গে এই বৈদেশিক মূলধনঘটিত যে-ঋণ দেখা দেয়, তাহার পরিশোধের প্রশ্নও বিবেচ্য। যদি রপ্তানিমূলক শিল্পে এই ঋণকে কাজে লাগানো যায়, তাহা হইলে একদিকে বৈদেশিক ঋণও শোধ হয়, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিও উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়। এই মূলধন ঠিকমত কাজে না লাগাইলে একদিকে অপচয় বাড়ে, অন্যদিকে জাতিকে ঋণভারে জর্জরিত করিয়া তোলা হয়। কারণ প্রতি বৎসর বহু টাকা সুদ ও লভ্যাংশ হিসাবে আমাদের বাহিরে পাঠাইতে হয়। এক্ষেত্রে অর্থনীতির উপর আরও অধিক চাপ পড়ার সম্ভাবনা। সম্প্রতি অধ্যাপক গ্যালব্রেথও এই বৈদেশিক মূলধনের সম্ভাব্য অপচয় সম্বন্ধে অনুন্নত দেশগুলিকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে পূর্বে খুবই ভীতি ছিল। কারণ, এখানেই 'বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী দেখা দেয় রাজদণ্ড রূপে'। স্বাধীনতার পরবর্তী আমলে তাই বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে জোর প্রচার হয় এবং ১৯৪৮এর শিল্পনীতিতেও তাহারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। জাতীয়করণই ছিল সেই দশকের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া এক বৎসরের মধ্যেই সরকার জাতীয়করণের কথা

প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হন। বৈদেশিক মূলধনের গুরুত্ব বিশেষ করিয়া বোঝা যায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় হইতে। তিনটি বিদেশী রাষ্ট্রের সহায়তায় আমাদের দেশে তিনটি ইস্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। পরম পরিতাপের বিষয়, দ্বিতীয় যোজনাকালে যে চতুর্থ কারখানাটি ভারতীয় মূলধন ও অভিজ্ঞতা দ্বারা গড়িয়া উঠিবার কথা ছিল, তৃতীয় যোজনার এই দ্বিতীয় বৎসরেও তাহার ভিত্তিস্থাপন পর্যন্ত হয় নাই।

বর্তমানে ভারতে বৈদেশিক মূলধন সম্বন্ধে আর সেইরূপ গোঁড়ামি নাই। বস্তুতঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করিতেছে বৈদেশিক সাহায্যের উপর। তৃতীয় যোজনার মোট ৮০০০ কোটি টাকার মধ্যে ২২০০ কোটি টাকাই আসিবে বৈদেশিক সাহয্য রূপে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভারত সরকারের মন্ত্রিবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভারতে সাহায্য প্রেরণ বা ভারতে বিনিয়োগ করার কথা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন ও বেড়াইতেছেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। অতীতে বৈদেশিক মূলধন সংগ্রহ করা যেরূপ কষ্টসাধ্য ছিল, বর্তমানে পৃথিবী সর্বতোভাবে বিভিন্ন দুইটি রাজনৈতিক শিবিরে বিভক্ত হওয়ায়, ইহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে। কারণ এই দুই গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রগুলি তাহাদের নিজস্ব স্বার্থেই অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য দিবে। শুধু যে রাজনৈতিক কারণে, তাহা নহে। অনেক দেশেই এখন অধিক উৎপাদনের সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই যুগের যে যুদ্ধোন্মাদনা দেশগুলির অর্থনীতিকে অধিকতর উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে, তাহাই এখন সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে। অন্ততঃ দেশজ পণ্যের বাজার খুঁজিয়া লইবার জন্যেও তাহারা অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য করিবে। তবে ইহার অন্য দিকটি এখনও সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত হয় নাই। সম্প্রতি রাশিয়ার নিকট হইতে ভারত 'মিগ' বিমান ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমেরিকার সিনেটে ভারতকে সাহায্যদানের প্রশ্ন তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয় এবং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডির হস্তক্ষেপ না ঘটিলে এই সাহায্যের বরাদ্দ লোপ করি কমিয়া যাইত। ভারতকে সাহায্য করিবার জন্য যে "এড্ ইণ্ডিয়া" সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে, তাহারাও এর ব্যাপারে মার্কিন নেতৃত্বকেই অনুসরণ করিয়া চলে। কাজেই বৈদেশিক সাহায্যের রাজনৈতিক দিকটিকেও উপেক্ষা করা চলে না।

তবে বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে কতকগুলি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে যাহাদের কাজই হইল অনুন্নত বা অপূর্ণোন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা। এইসব সংস্থার মধ্যে International Bank for Reconstruction & Development সংক্ষেপে World Bank ও International Development Association -এর কার্য উল্লেখযোগ্য। World Bank হইতে আজ পর্যন্ত ভারতই

সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য পাইয়াছে। এই ব্যাঙ্ক হইতে এক কুশলী মিশনও (Expert mission) এই দেশে আসিয়া বৈদেশিক সাহায্য ও পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে।

ভারতের জাতীয় আয় এবং রপ্তানি বাণিজ্যের নীতি ও সম্ভাবনা বিচার করিয়া বলা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ করার ক্ষমতা এখনও ভারতের আছে। তবে সর্বদাই লক্ষ্য রাখা দরকার, এই সকল ঋণ যেন দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ্য হয় এবং সুদের হার কম থাকে। উপরন্তু, বৈদেশিক মূলধন দেশে আনিয়া জনসাধারণের ভোগের হার বাড়ানো চলে, ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার বাড়িল না এইরূপ অবস্থা দেখা দিতে পারে। অধ্যাপক গ্যালব্রেথের সাবধান বাণী এই প্রসঙ্গে সর্বদাই স্মরণীয়।

২৪

ভারতের রপ্তানি প্রসার

বিগত দশকে ভারতে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত আমদানীর পরিমাণও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেখানে বাৎসরিক ৭২৪ কোটি টাকার দ্রব্যাদি আমদানী করা হইত, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ৫০% বাড়িয়া গিয়া বাৎসরিক আমদানী দাঁড়ায় গড়ে ১০৭২ কোটি টাকার মত। তৃতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর বিনিয়োগ এবং মূল ও ভারী মূলধনী দ্রব্যের শিল্পের উপর জোর দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই আমদানীর পরিমাণ আরও অনেক বেশী দাঁড়াইবে। পি. এল. ৪৮০ ধারা অনুসারে ৬০০ কোটি টাকার মত আমদনী করা ব্যতিরেকেও তৃতীয় যোজনাতে মোট আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫৭৫০ কোটি টাকার মত। তুলনামূলকভাবে ভারতে রপ্তানির প্রসার আদৌ হয় নাই। প্রথম যোজনার বাৎসরিক রপ্তানি ৬০৯ কোটি টাকার স্থানে দ্বিতীয় যোজনায় ইহা বাড়িয়া গিয়া মাত্র ৬১৪ কোটি টাকার মত দাঁড়ায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যেখানে বিগত দশকে পৃথিবীর রপ্তানি বাণিজ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেখানে ভারতের অংশ ১৯৫০ সালের ২·১% হইতে নামিয়া গিয়া ১৯৬০ সালে ১·১%এ দাঁড়ায়। কৃষিজ দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি না পাইলেও নূতন শিল্প-দ্রব্যাদির রপ্তানি গত দশ বৎসরে বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মিটানো সম্ভবপর হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় হইতেই এই ঘাটতি এবং তজ্জনিত বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের ফলাফল আমরা সকলেই অবহিত আছি।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রাখাতে ঘাটতি পূরণের নানা পথ আছে; কোনও প্রযুক্ত

তহবিল হইতে ব্যয় করা, বৈদেশিক সাহায্য লওয়া, রপ্তানি প্রসার, আমদানী কমানো, অদৃশ্য উৎসসমূহ হইতে আয় বাড়ানো ইত্যাদি। বর্তমান অবস্থায় এইসব পথের অনেক-গুলিই গ্রহণযোগ্য নহে। আমদানীর স্তর আর নামানো যায় না। স্টার্লিং মজুতের পরিমাণও অত্যন্ত কম হইয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক সাহায্য সাধারণতঃ শর্তজড়িত এবং উহা পরিশোধের ও উহার উপর সুদ দিবারও প্রশ্ন আছে। কাজেই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পথ হইল রপ্তানির প্রসার।

বিগত কয়েক বৎসরে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় যোজনাকালের মধ্যবর্তী সময় হইতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য নানা প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। এই সবগুলির মধ্যে সংগঠনের দিক হইতে দ্রব্যবিশেষের জন্য রপ্তানি প্রসার সংস্থা গঠন, রপ্তানী ঝুঁকি বীমা কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচার, মেলা ও প্রদর্শনীর জন্য বিশেষ সুবিধা দান ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে রপ্তানি ও কোটা সংক্রান্ত বাধাগুলির অপসারণ-সূচক কার্যাবলী যেমন, অনেক ক্ষেত্রে রপ্তানি শুল্কের প্রত্যাহার বা ফেরৎ দেওয়া, রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিশেষ আমদানী লাইসেন্স দেওয়া, ও পরিবহণ-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তোলার চেষ্টা এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তোলা এইসব প্রচেষ্টার মধ্যে পড়ে।

এইসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেন ভারতের রপ্তানি বাড়ানো সম্ভবপর হয় নাই, তাহাই এখন আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দেশে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন দ্রব্যের যেমন চা, চিনি, কাপড় ইত্যাদির আভ্যন্তরিক চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ভারতীয় রপ্তানিকারকেরা বিদেশের বাজারে বিক্রয়ের ঝামেলা এড়াইয়া ভারতের আভ্যন্তরিক বাজারেই বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে। তৃতীয়তঃ এই মুদ্রাস্ফীতিরই ফলে আবার অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে আবার সরকার কাঁচামালের (যেমন কাঁচা পাট ও ইক্ষু) নিম্নতম দাম বাঁধিয়া দেওয়ায়ও একই ব্যাপার ঘটিয়াছে। এইসব কারণ ছাড়াও পৃথিবীর বাজারের যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতেও রপ্তানরি প্রসার হইতেছে না। প্রসঙ্গতঃ বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগাদানের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডই আমাদের দেশ হইতে সর্বাধিক পরিমাণ (৪০%) দ্রব্য আমদানী করে। ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ব্রিটেনের চতুষ্পার্শে এক আন্তঃ-শুল্ক-প্রাচীর গড়িয়া উঠিবে এবং ভারতীয় রপ্তানি পণ্য মার খাইবে। এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের সাধ্যাতীত। বর্তমানে এই সমস্যা আরও তীব্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাতে রপ্তানি প্রসারের জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা অনুসৃত হইবার কথা বলা হয়। প্রথমতঃ রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত সৃষ্টির নিমিত্ত আভ্যন্তরিক ভোগস্তরকে যতদূর সম্ভব সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ আভ্যন্তরিক মুনাফার সহিত তুল্যভাবে রপ্তানি হইতে অধিক মুনাফা সৃষ্টি করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ যতশীঘ্র সম্ভব ব্যয় ও উৎপাদনের দিক হইতে রপ্তানি শিল্পগুলিকে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। রপ্তানি বৃদ্ধির কথা মনে রাখিয়া শিল্পগুলির লাইসেন্সিং প্রথাও নূতন করিয়া করিতে হইবে। চতুর্থঃ জনমতকে রপ্তানির অনুকূলে গঠন করিতে হইবে, শিল্প ও ব্যবসায়ের মালিকদের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিতে হইবে, বিদেশের বাজার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাদির জন্য সরকারের নিজস্ব বাণিজ্যিক প্রতিনিধি সংস্থা গঠন করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে ঋণ, বীমা ইত্যাদির সুবিধার প্রসার করিতে হইবে।

বর্তমান তথ্যাদি হইতে অনুমান করা যায় যে, তৃতীয় যোজনাকালে মোট রপ্তানির পরিমাণ অন্ততঃ ৩৭০০ কোটি টাকা হইবে। ইহা যে যথেষ্ট তাহা নহে, তবে ইহার কম হইলে আর কোন পথই খোলা থাকিবে না। চতুর্থ যোজনাতে যাহাতে বাৎসরিক ১৩০০ হইতে ১৪০০ কোটি টাকার মত রপ্তানি করা যায় সেদিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। পঞ্চম যোজনাতে ভারতীয় অর্থনীতিকে স্বনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইলে এইগুলি অতি আবশ্যকীয়।

সাম্প্রতিক কালে স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে এক কমিশন রপ্তানি বৃদ্ধি সম্বন্ধে কয়েকটি সুপারিশ করেন। সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে এই সুপারিশগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রধানগুলি হইল যে-সমস্ত দ্রব্য রপ্তানিতে ভারত মোটামুটি সাফল্য লাভ করিয়াছে সেগুলিকে রপ্তানি শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া (যেমন চা-এর ক্ষেত্রে), আমদানীর জন্য যান্মাসিক নিয়মের পরিবর্তে বাৎসরিক লাইসেন্স-প্রথা চালু করা, রপ্তানি শিল্পগুলিকে কর্পোরেশন ও অন্যান্য কর হইতে রেহাই দেওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্য (subsidies) ইত্যাদি দেওয়া। ভারত সরকার এই কমিটির প্রায় সব সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছেন।

এইসব পথগুলি ছাড়াও আরও দু-একটি উপায়ের সন্ধান আমরা দিতে পারি। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য হওয়া উচিত। উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে অনেক সময় বিদেশের দাম হইতে দেশী দাম অধিক থাকে। ইহা হইলেও রপ্তানির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়, ইহা মনে রাখা দরকার। দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক মূলধনকে যদি রপ্তানি শিল্পে গড়িয়া তুলিতে নিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে দীর্ঘকালে দেশের পক্ষে মঙ্গলই হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটও দূর হইবে এবং স্থায়িভাবে দেশের শিল্পোন্নয়নও হইবে। তৃতীয়তঃ রপ্তানি শিল্পের যে

বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা আছে তাহার পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। চতুর্থতঃ পরিবহণের সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে। পঞ্চমতঃ রপ্তানি দ্রব্যাদিতে বৈচিত্র্য ও প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন আনিতে হইবে। পরিশেষে নূতন নূতন দেশগুলির সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ব্রিটেনের যোগদানের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, আফ্রিকার নবজাগ্রত দেশগুলি, দক্ষিণ আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সহিত ব্যপকতর বাণিজ্য সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে হইবে। আশা করা যায়, উপরোক্ত পথগুলি অনুসরণ করিলে আমাদের রপ্তানি প্রসার লাভ করিবে। পরিশেষে ভারতীয় ব্যবসায়ীদেও একটি দোষ অবশ্য সংশোধনের কথা বলা কর্তব্য। প্রায়ই দেখা যায়, নমুনার দ্রব্যের সহিত রপ্তানিকৃত দ্রব্যের পার্থক্য অনেক। এই বিষয়ে সুনাম রক্ষা করিতে হইলে দ্রব্যগুলির একটি নির্দিষ্ট মান বাজায় রাখা দরকার। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে এই কার্য সম্ভবপর। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা না দিয়া অবস্থা খারাপই হইতে পারে। বস্তুতঃ রপ্তানি প্রসারের উপরই বর্তমানে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। আশা করি, আবার একদিন অতীতের মতই ভারতের পণ্যদ্রব্য বোঝাই তরী বিদেশের বন্দরে বন্দরে সমাদৃত হইবে।

২৫
রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য

একদিন ছিল যেদিন সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তি হইতে ভারতে পণ্যতরী গ্রীক ও রোমক বন্দরগুলিতে গিয়া ভিড়িত ও ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সেইসব দেশের বাজারে বিশেষভাবে সমাদৃত হইত। ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যের সেই যুগ ছিল এক সুবর্ণ যুগ। কালক্রমে যুগের পরিবর্তনের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যেরও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দ্বিতীয় মহযুদ্ধকালীন ভারতের রপ্তানির যে স্ফীতিলাভ ঘটিয়াছিল, স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে তাহার সংকোচন দেখা দিয়াছে, এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অবস্থা সংকটের পর্যায়ে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিগত দশকে ভারতের শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমদানীর পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম যোজনাতে যেখানে,বাৎসরিক ৭২৪ কোটি টাকার মত আমদানী হইত, দ্বিতীয় যোজনায় ইহা দাঁড়ায় বাৎসরিক ১০৭২ কোটি ট্যকার মত। তৃতীয় যোজনায় অধিকতর বিনিয়োগ এবং মূল ও ভারী মূলধনী দ্রব্যের শিল্পায়নের উপর জোর দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া

দাঁড়াইবে ৬৩৫০ কোটি টাকার মত। তুলনামূলকভাবে জাতীয় রপ্তানি প্রথম যোজনার বাৎসরিক ৬০৯ কোটি টাকার স্থলে বাড়িয়া গিয়া দ্বিতীয় যোজনায় মাত্র ৬১৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। তৃতীয় যোজনাতে যে-সব পথ অবলম্বন করা হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় মোট রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৭০০ কোটি টাকার মত। ইহা প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নয়। তবু ইহারও কম হইলে সম্পূর্ণ ভরাডুবি হইবার সম্ভাবনা।

বস্তুতঃ ভারতীয় আমদানি-রপ্তানিতে দ্রব্যাদিরও বিচিত্র পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এক সময় অতীত ভারত শিল্পদ্রব্য পাঠাইত বিদেশের বাজারে। মহাযুদ্ধের সময় হইতেই ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত ভারতের রপ্তানিতে কাঁচামালের ও কৃষিজ দ্রব্যেরই প্রাধান্য ছিল। এখন ইহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভারত ক্রমশঃ নূতন পণ্য দ্রব্যাদি বিদেশের বাজারে পাঠাইতেছে এবং আমদানির ক্ষেত্রে শিল্পায়নের উপযোগী কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আনয়ন করিতেছে। দ্বিতীয় যোজনাকালে যে তীব্র বৈদেশিক মুদ্রাসংকট দেখা দেয় তাহার অন্যতম কারণই হইল আমাদের আমদানি-রপ্তানি সংস্থাগুলির বেহিসেবী আমদানি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পায়নের উপযোগী দ্রব্যাদি ও কাঁচামাল আমদানি না করিয়া বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যাদি আমদানি করা হয় এবং রপ্তানির ক্ষেত্রেও এই সংস্থাগুলি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই। অনেকদিন ধরিয়াই তাই একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অভাব অনুভূত হইতেছিল যাহা এই বিপুল পরিমাণ আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনিবে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমতঃ, পণ্যকর অপেক্ষা সহজতর ভাবে ইহা রাজস্ব বাড়াইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাস্ফীতির সময় কর-কাঠামোর পরিবর্তন অপেক্ষা সহজে ন্যায্য মূল্যে জনসাধারণকে পণ্য যোগান দিতে পারে। তৃতীয়তঃ আমদানি-রপ্তানির বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যয়বহুল। একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থাকিলে ব্যয়সঙ্কোচ হইবার সম্ভাবনা। চতুর্থতঃ, ঐসব সংস্থার নিকট স্বল্পকালীন লোকসানের মূল্য অপরিসীম। সেদিকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী প্রতিষ্ঠান স্বল্পকালীন লোকসানও মানিয়া লইতে পারিবে। পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য-সংস্থার সাহায্যে চাহিদা, মূল্য ও উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব। কারণ রাষ্ট্রকে মোট চাহিদা ও যোগানের হিসাব রাখিতে হয়। ফলে প্রয়োজনানুরূপ মূল্য পরিবর্তন করিয়া বাজার-মূল্য ও উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্য কমাইয়া আনা সম্ভব হয়। এবং লব্ধ-মুনাফা উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। সাধারণ সংস্থার পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয়। পরিশেষে, ভারতের সহিত সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি

পাইতেছে। ঐ সকল দেশে সরকারী পরিচালনায় আমদানি-রপ্তানির কাজ হয়। ভারতেও অনুরূপ সংস্থা গড়িয়া তোলা প্রয়োজন।

অবশ্য এইরূপ সংস্থা স্থাপনের বিপক্ষেও অনেক সময় যুক্তি প্রদর্শিত হয়। অধ্যাপক ভাইনার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের বিরোধী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং ইহার ফলে রাজনৈতিক সম্পর্কও তিক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ডাঃ পি. এস. দেশমুখের নেতৃত্বে এক কমিটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের পক্ষে মত দিলেও পরবর্তী কালে শ্রী এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাও-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় এক কমিটি ইহার বিপক্ষে মত দেয়। প্রথম কমিটিও মিলিতভাবে ইহার পরিচালনার সুপারিশ করেন। ভারতীয় কর অনুসন্ধান কমিটির মতেও অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য হইতে বিশেষ সুফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীর উপর। এই ধরনের অভিজ্ঞ পরিচালক আমাদের দেশে আছে কিনা সন্দেহের বিষয়।

যাহাই হউক, ১৯৫৬ সালের মে মাসে সম্পূর্ণ সরকারী পরিচালনায় ভারতের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা। কোম্পানির মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, আমদানি-রপ্তানি এবং আভ্যন্তরিক ব্যবসায়-বাণিজ্যের কাজকর্ম করা ইহার উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ইহা রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানি বাড়াইয়া সেখান হইতে ইস্পাত, সিমেণ্ট এবং শিল্পগত যন্ত্রপাতি আমদানির প্রচেষ্টা করিতেছে। পণ্য দ্রব্যাদিতে বৈচিত্র্য আনয়ন ও পুরানো এবং নূতন দ্রব্যের জন্য নূতন বাজার খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতেছে। রপ্তানির বিনিময়ে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আনার জন্য অনেক সময় ইহা চুক্তি করিয়াছে। আমদানি ও বণ্টনের সময় নির্ধারণ করার চেষ্টা করিয়াছে যাহাতে দেশে কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতা দেখা না দিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় যোজনাকালে রপ্তানি প্রসারের যে বিরাট পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, উহা কার্যকরী করিতে এই সংস্থাকে তাহাদের নিজ কাজকর্ম বিপুলভাবে প্রসারিত করিতে হইবে।

এই সংস্থার কার্যের বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমালোচনা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ইহা নূতন সুযোগ গড়িয়া তুলিতে তো পারেই নাই, উপরন্তু অনেক সময় ইহার কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছে। প্রত্যাশিত পরিমাণ অপেক্ষা পরিচালনগত ব্যয়ই হইয়াছে বেশী। পরিবর্তনশীল ব্যবসায় জগতে ইহা দ্রুত ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে পারে নাই।

এই প্রসঙ্গে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কথাও বলা প্রয়োজন।

খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়কে দুইটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। প্রাথমিক স্তরে, অনুমোদিত পাইকারী বিক্রেতারা নির্দিষ্ট মূল্যে গ্রামাঞ্চল হইতে উদ্বৃত্ত শস্য কিনিয়া অপর একটি নির্দিষ্ট দামে খুচরা বিক্রেতাদের নিকট যোগান দিবে। এই দুই দামের পার্থক্যের মধ্যে পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং ন্যায্য মুনাফা পোষাইয়া যাইবে। খুচরা বিক্রেতারা আবার জনসাধারণকে বিক্রয় করিবে। চূড়ান্ত স্তরে, এই সংস্থাই গ্রামাঞ্চল হইতে উদ্বৃত্ত শস্য যোগাড় করিয়া সোজাসুজি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে ভোগকারীদিগকে বিক্রয় করিবে। ভারতে প্রাথমিক স্তরে কয়েকটি খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু হইয়াছে। ইহার ফল কিন্তু শুভ হয় নাই। প্রথমতঃ গ্রামাঞ্চলে ধনী চাষীদের উদ্ভব হওয়ায় উদ্বৃত্ত শস্যের উল্লেখযোগ্য অংশ বাজারে নীত হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ খুচরা বিক্রেতারা কি-দামে খোলাবাজারে বিক্রয় করিবে তাহার কোন নির্দিষ্টতা না থাকায় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। অনেক সময় পাইকারী বিক্রেতারাই খুচরা বিক্রেতা সাজিয়া মুনাফা লুটিতেছে। অবস্থার মোটেই সমাধান হয় নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত না সোজাসুজি উৎপাদকের হাত হইতে ভোগকারীদের হাতে শস্য আসে ততক্ষণ এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আশা করা যায়, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের চূড়ান্ত স্তরে এই অবস্থা থাকিবে না। আদর্শ হিসাবে এই ব্যবস্থাকে আমরা গ্রহণ করিতে বাধ্য। উদ্বৃত্ত শস্য ক্রয় করিয়া মজুত রাখিয়া কম দামকে বাড়ানো যাইতে পারে। আবার প্রয়োজন মত বিক্রয় করিয়া বেশী দামকে কমাইয়া দিতে পারা যায়। রাষ্ট্রেরই এই দায়িত্ব লওয়া প্রয়োজন।

বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানারূপ সমালোচনা করা হইলেও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা যে ঠিকই হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাময়িক পরিচালনগত দোষগুলি দূর করিলে ইহা ভাল ফলই দর্শাইবে। তৃতীয় যোজনার বিপুল আমদানি ও রপ্তানি প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রীয় সংস্থা লক্ষ্য না দিলে দ্বিতীয় যোজনার প্রথম কয়েক বৎসরের মত বেহিসেবী আমদানি ইত্যাদির ফলে আবার বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ভোগের ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও শিল্পায়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সঠিক নীতি নির্ধারণ ও রপ্তানি প্রসার ইত্যাদির জন্য এই সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। অনেকগুলি রপ্তানিকারক অপেক্ষা একটি রপ্তানিকারক বেশী সুবিধা আদায় করিতে পারে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যাহাতে বিদেশের বাজারে সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে সেইজন্য রপ্তানির মান উন্নয়নের জন্যও এই সংস্থার খবরদারি প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চুক্তি হইলে ব্যবসায়িক সুবিধাও অনেক বেশী পাওয়া যায়। সরকারী ক্ষেত্রের প্রসার ও

বেসরকারী ক্ষেত্রের অনিয়মিত ও অবাঞ্ছিত স্ফীতি ঘটে না। নূতন দ্রব্যের জন্য বা পুরাতন দ্রব্যের জন্যই হউক, নূতন বাজার ও চাহিদার সৃষ্টি করা এই সংস্থার পক্ষেই সম্ভবপর। আশা করি, এই সংস্থা প্রচেষ্টার ফলে বাণিজ্য-হার অনুকূল হইয়া দেশকে উন্নতির পথে আগাইয়া লইয়া যাইবে।

২৬

ভারতে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন

বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক চিন্তা ও পরিকল্পনায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে। এতকাল ধরিয়া অবাধ ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রচলিত থাকায় ভারতের শিল্পকেন্দ্রগুলি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে; প্রাকৃতিক, আপেক্ষিক এবং তুলনামূলক বিভিন্ন সুবিধা তাহাদের এই বিশেষ অঞ্চলগুলিতে আকর্ষণ করিয়াছে। সারা ভারতের অর্থনৈতিক মানচিত্রে আমরা তাই শিল্পপ্রসারে আঞ্চলিক বিভিন্নতা দেখিতে পাই। পরিকল্পনাহীন বিভিন্ন শক্তির টানাপোড়েনের চাপে তুলনামূলকভাবে কোন কোন অঞ্চল অধিকতর উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, সেই অঞ্চলে বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচের প্রসার ঘটিয়াছে, ফলে আরও অধিকসংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠান ওই অঞ্চলে আকৃষ্ট হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই কারণে আয়, কর্মসংস্থান, জীবিকা-সংস্থানের ধরন ও বৈচিত্র্য এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিতে বিপুল তারতম্য দেখা দিয়াছে। ফলে বহুবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা ও আবেগ সৃষ্টি হইয়াছে। জাতীয় সংহতি বাধা পাইতেছে, জাতীয় ভাবমণ্ডলে ঐক্যবোধ প্রখরতর হইতেছে না।

পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই সকল ভারসাম্য-হীনতা দূর করা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পূর্বে শিল্পগুলি প্রধানত কেন্দ্রীভূত ছিল বোম্বাই ও কলিকাতায়। ১৯৫১ সালে দেখা যায় যে ভারতে মোট রেজেস্ট্রীকৃত কারখানার ৪২% এই দুই কেন্দ্রেই অবস্থিত। ইহারা একত্রে নিয়োগ করিত শিল্প শ্রমিকসংখ্যার ৬৩%। এই দুইটি অঞ্চলের জনঘনত্বও ছিল অতিরিক্ত, ফলে অপরিকল্পিত নগরায়ণের সকল ত্রুটি প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল।

এই আঞ্চলিক ভারবিচ্যুতি দূর করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে ও ভারতের প্রথম দুইটি পরিকল্পনাতে যথেষ্ট গুরত্ব আরোপ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শের বাস্তব রূপায়ণও এত গভীর আঞ্চলিক পার্থক্য দূর করার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। প্রথম পরিকল্পনায় ইহা মাত্র উল্লেখ ছিল,

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বিষয়ে অধিকতর গুরত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন এই বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। মনে হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিনিয়োগ যোগ্য অর্থ বা উপকরণ বণ্টনের সময়ে এই বিষয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দিতেছেন।

পরিকল্পনা কমিশনের মতে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনার সাধারণ কর্মসূচী সফল করিলেই ভারতে আঞ্চলিক পার্থক্য বহুলাংশে কমিয়া আসিবে। যেমন, (১) কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন, জলসেচ, গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি যত প্রসারিত হইবে. ততই অনুন্নত অঞ্চলগুলি উন্নত হইয়া উঠিবে। (২) শক্তি উৎপাদন, জলের ব্যবস্থা, পরিবহণ ও সংযোজনের ব্যবস্থা, কারিগরী বিদ্যার শিক্ষণ কেন্দ্রগুলির প্রতিষ্ঠা—এই সকল বিষয় মিলিয়া অনুন্নত অঞ্চলগুলি ক্রমে ক্রমে শিল্পস্থাপনের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। (৩) সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সময়ে অনুন্নত অঞ্চলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা চিন্তা করিতে হইবে। (৪) গ্রাম্য, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। (৫) ইহা ব্যতীত, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নূতন জনপদ স্থাপন করিয়া (যেমন দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা) শ্রমিকের চলনশীলতা বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

এই সকল কার্যসূচীর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আঞ্চলিক পার্থক্য অনেকটা দূর হইয়া যাইবে। কমিশন আশা করেন যে, শিল্প-কলকারখানা প্রতিষ্ঠার সময়ে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে অনুন্নত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠাকারীর ফার্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইলে এবং প্রতিটি রাজ্যের শিল্প প্রসার পরিকল্পনায় অনুন্নত অঞ্চলের উন্নয়ন স্থান পাইলে আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ সহজ হইয়া আসিবে।

সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করার বিরুদ্ধে ভারতের অনেক ধনবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের উপর অধিক জোর দিতে চান। উন্নত অঞ্চলগুলিতে উৎপাদনের হার দ্রুত বাড়াইলে অধিক হারে মূলধন সঞ্চয় হয়। সেই মূলধনের সাহায্য হইতেই পরবর্তীকালে অনুন্নত অঞ্চলে কলকারখানা গড়িয়া তোলা সম্ভব হয়। শিল্পোন্নত অঞ্চলগুলির পার্শ্ববর্তী এলাকাতে যানবাহন, বিদ্যুৎ ও বাহ্য ব্যয়সঙ্কোচের অন্যান্য সুবিধাগুলি ক্রমশ গড়িয়া উঠিতে থাকে, উহাদের অনুন্নতি দূর হইয়া যায়, ঐ সকল অঞ্চল শিল্পপ্রতিষ্ঠার উপযোগী ও সম্ভাবনাময় হইয়া উঠে। আমরা সকলেই জানি, ভারতের কোন কোন অঞ্চলে প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লা, লৌহ, মাটি, পথঘাট ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী। এই সকল অঞ্চলে মূলধন বিনিয়োগ করিলে উৎপাদন যে-হারে বৃদ্ধি পায়, অনুন্নত অঞ্চলে একই পরিমাণ মূলধনের বিনিয়োগ হইতে প্রতিদান তদপেক্ষা অনেক কম। অল্প

মূলধনশালী ভারতে মূলধন হইতে প্রতিদানের হার যেখানে বেশী, সেই স্থানেই মূলধনের নিয়োগ বাঞ্ছনীয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। সকল অঞ্চল প্রকৃতির দানে সমান সমৃদ্ধ নয়, এই বাস্তব অবস্থা উড়াইয়া দিতে পারি না। কোন কোন অঞ্চল তুলনামূলক ভাবে দ্রুততর অগ্রসর হইবে ইহাতে তাই কোন সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক ভাবালুতায় অর্থনৈতিক দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

এই বিষয়ে একটি প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করিতে পারি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে, ভবিষ্যতে, কখনও কি এমন দিন আসিবে যখন প্রতিটি রাজ্য ও অঞ্চলের অধিবাসীদের মাথা-পিছু আয় একেবারে সমান হইয়া আসিবে? ইহা কখনও সম্ভব নয় বলিয়াই মনে হয়। কারণ প্রকৃতি সকল অঞ্চলের মাটি ও মানুষকে সমান গুণে ভূষিত করেন নাই। আমরা তাই সকল অঞ্চলকে সমান করার লক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারি না। এইটুকু বলা যায়, যেন কোন একটি অঞ্চল জীবনযাত্রার মানের কোন একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে না পড়িয়া থাকে। উন্নয়নের যাত্রাপথে সকল অঞ্চলই উন্নত হয়, কিন্তু কোন কোন অঞ্চল তাহাদের উপকরণ ও অধিবাসীদের চরিত্র অনুসারে দ্রুততর আগাইয়া চলে। সকল অঞ্চলের সমতা সাধনের লক্ষ্য তাই ক্রমশই পিছাইতে থাকে। শিল্পোন্নয়নের বাহ্য পরিবেশ, যেমন রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা সকল অঞ্চলে সমানভাবে করিলেই সমান হারে উন্নয়ন ঘটিবে। কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাস্থ্যে অধিকতর শক্তিমান, বা তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি অন্যান্যদের তুলনায় উগ্রতর এবং অধিকতর আক্রমণাত্মক—ইহা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই। পরিকল্পনা কমিশন সকল অঞ্চলে সমান সুবিধা গড়িয়া দিলেও তাহারা দ্রুত হারে উন্নত হইয়া উঠিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অবশ্য এই মানবিক গুণগুলিও অপরিবর্তনীয় নয়। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে রুশ মহাদেশ সম্পর্কে অধ্যাপক অগ্‌ (Ogg) বলিয়াছিলেন, "জাতিবর্ণ ও ভাষার জগাখিচুরি।" আজ সেই দেশের অধিবাসীরা অক্লেশে মহাকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষাও বেশী টাকা বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার পিছনে ব্যয় করিতেছে। তাই সুষম আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য এখনই কেরলে লৌহ কারখানা এবং বাংলা দেশে দড়ির কারখানা খুলিয়া লাভ নাই বরং ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত করা উচিত। অনুন্নত অঞ্চলের অধিবাসীরা শিক্ষার আস্বাদ পাইলে নিজেদের কর্মশক্তি প্রস্ফুটিত করার উপায় নিজেরাই খুঁজিয়া পাইবে। জাপানী উন্নয়নের মূলে ছিল এই দেশব্যাপী শিক্ষাদান। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক উন্নয়নের মূল উৎস বোধ হয় এই পথেই লুকানো আছে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলন

চাকরির শর্তাদি অক্ষুণ্ণ রাখা এবং প্রাত্যহিক জীবনের মান উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে বেতনভোগী শ্রমিক সম্প্রদায়ের যে বিধিবদ্ধ স্থায়ী সংগঠন তাহাকেই আমরা শ্রমিক সংঘ নামে অভিহিত করি। শ্রমিকদের কোন উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত থাকে না, নিয়মিত শ্রমদান করিয়া তাহাদের জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। একটি দিন বসিয়া কাটাইলে সেই দিনের উপার্জন-সম্ভাবনা আর ফিরিয়া আসে না। এতদ্ভিন্ন, আপেক্ষিক অ-শিক্ষা শ্রমিকদের দুর্বল করিয়া রাখে। সংঘবদ্ধ মালিক শ্রেণীর সহিত দর কষাকষি করিবার মানসিক শক্তি পরস্পর বিচ্ছিন্ন শ্রমিকদের থাকে না। তাই, শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ হইয়া আপন স্বার্থে শ্রমিক-সংঘ স্থাপন করিতে হয়। অনুভব করিতে হয় যে, চাকরির শর্তাদি শ্রমিক-সংঘের মাধ্যমেই উন্নত করা সম্ভবপর।

শ্রমিক সংঘের কর্মপন্থা দ্বি-মুখী—একদিকে, শ্রমিক-কল্যাণমূলক কর্মসূচী, অন্যদিকে শ্রমিকের সংগ্রাম। কর্মহীন শ্রমিককে ভাতা দেওয়া, অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, আবাসিক আয়োজন পূর্ণ করা, কলাকেন্দ্রের মাধ্যমে আনন্দোৎসব ও সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করা—এইগুলি শ্রমিক-সংঘের কল্যাণমূলক কর্মসূচী। অন্যদিকে, মালিকপক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকের মজুরি-বৃদ্ধি বা চাকরিগত শর্তাদি সংরক্ষণের প্রয়াস, মালিকপক্ষের উপর সর্বদা চাপ সৃষ্টি করা এবং দাবী পূরণের জন্য ধর্মঘটের ব্যবস্থা করা—এইগুলি শ্রমিক-সংঘের সংগ্রামী কর্মসূচী।

শ্রমিক-সংঘ শ্রমিকের মন হইতে অসহায় বোধ বিদূরিত করিয়া আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে, অভাব-অভিযোগ মালিক পক্ষের গোচরীভূত করে, মালিক কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করিবার সুযোগ বিনষ্ট করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে, শ্রমিক-সংঘের উদার দৃষ্টির অভাব বাহির হইতে শ্রমিক নিয়োগে বাধার সৃষ্টিও অনেক সময় করে। একদল শ্রমিকের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য বহু সম্ভাব্য শ্রমিক বঞ্চিত হয়, জাতীয় আয় কমিয়া যায়।

পুঁজিপতি ও শ্রমজীবীদের মধ্যে যে শ্রেণীসংগ্রাম শিল্পবিপ্লবের সময় হইতে শুরু হইয়াছে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে এখনও তাহার অবসান ঘটে নাই। যদি-বা কোথাও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তবু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শিল্প-ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। অথচ, শিল্প-পরিচালন ব্যাপারে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের প্রতিনিধি পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যদি শিল্প পরিচালনা করিতে বসেন তবে তাহা অধিকতর গণতন্ত্রসম্মত ও সুফলপ্রসবী হইতে

পারে। ১৯১৭ সাল হইতে পৃথিবীর নানাদেশে ইহার সারবত্তা অনুভূত হইতে থাকে, এবং শ্রমিক-জীবনের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের দ্বারা শিল্প প্রসার সম্ভাবিত হইত আরম্ভ করে।'

পৃথিবীব্যাপী এই শ্রমজাগরণের তরঙ্গাঘাত ভারতবর্ষের শ্রমিক-জীবনেও আলোড়ন জাগায়। ১৯১৮ সালে মাদ্রাজে প্রথম শ্রমিক-সংঘ সংগঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ভারতের কারখানা-শিল্পের শ্রমিকেরা মালিকের সহানুভূতিহীন আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করিতে শুরু করেন। মজুরি-বৃদ্ধির দাবীতে ভারতের নানাস্থানে শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দেয়। তখনও পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন ভারতবর্ষে আইনের স্বীকৃতি পায় নাই। ১৯২৬ সালে ভারতে শ্রমিক-সংঘ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ফলে, কতকগুলি সুবিধা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে আসে—আন্দোলনের অপরাধে সহসা গ্রেপ্তার হওয়া বন্ধ হয়, সম্পত্তির উপর মালিকানা, উত্তরাধিকার ক্ষমতা ইত্যাদি নানা সুযোগ শ্রমিক-জীবনে বর্তায়। রেজিস্ট্রীকৃত শ্রমিক-সংঘের উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি ইহার পর হইতেই লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৮ সালে বিধিবদ্ধ অন্য এক আইনের ফলে শ্রমিক-আদালতের নির্দেশে মালিক পক্ষের শ্রমিক-সংঘকে স্বীকৃতিদান বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়ায়।

এমনতরো অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী পেষণে ভারতের শ্রমিক-জীবন তথা জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত পরিশ্রম, অধিক উৎপাদনে বাধ্যতা, অতিরিক্ত মুনাফার প্রতি মালিক পক্ষের লোভ, জীবনযাত্রার মানের নিম্নগামীতা, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ও জনমানসে অধিকতর শ্রেণী-সচেতনতা ইত্যাদি নানা কারণে সমস্ত দেশে শ্রমিক-সংঘের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যায়। যুদ্ধ শেষে, স্বাধীনতার যুগে রাজনৈতিক চেতনার আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৯৩৯ সালে যে ভারতবর্ষে শ্রমিক সংঘের সংখ্যা ছিল ৬৬৭ সেই ভারতে মাত্র ২০ বছরে ৮৭৬৩টি শ্রমিক সংঘ গঠিত হয়।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের আলোচনা করিতে গেলে স্বভাবতই কয়েকটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ইতিহাস মনে পড়িয়া যায়। ভারতে শ্রমিক-সংঘ স্থাপনার প্রথম যুগে সংঘগুলি ছিল বিক্ষিপ্ত, এবং তাহাদের কাজকর্মে কোন পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল না। ১৯২০ সালে প্রথম নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা A.I.T.U.C. স্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সংগঠনের আদর্শে এই কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থার সূত্রপাত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হইলে কংগ্রেস দল সরকার গঠন করে। শ্রমিক আন্দোলনকে সাম্যবাদী দলের প্রভাবমুক্ত রাখিবার প্রয়াস স্বরূপ কংগ্রেসী নেতৃত্বে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা I.N.T.U.C. প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুকাল মধ্যে সমাজতন্ত্রী দলের লোকেরা 'হিন্দ্ মজদুর সভা' নামে

তৃতীয় কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা গঠন করেন, এবং অপরাপর বামপন্থী দলসমূহ—কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট উভয় হইতে ভিন্নমত হইয়া সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বা U.T.U.C. স্থাপন করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ ভারতে শ্রমিক-সংঘ স্থাপনায় সাহায্য করিয়াছে। দ্রব্যমূল্যের আকস্মিক ঊর্ধ্বগতি ও জাতীয় চেতনায় প্রসার এই আন্দোলন জাগাইবার মূলে ক্রিয়াশীল। The great upheaval in Russia after the fall of the Czars and the establishment of the communist state in Soviet Russia gave a further filip of the workers' cause in India—শ্রীযুক্ত গিরির এই অভিমত প্রণিধানযোগ্য। রাশিয়ার জনজাগরণ ও সর্বহারার একনায়কত্ব স্থাপনার তরঙ্গাঘাত ভারতের মেহনতী জনতাকেও বহু শতাব্দীর নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

বিগত কয়েক বৎসরের ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস বলে যে, শুধু ধর্মঘটের কারণেই এখন আর শ্রমিক-সংঘের উদয় ও বিলয় ঘটে না, এখন তাহার কার্যাবলী বিভিন্নমুখী ও সুসংবদ্ধ। বহু গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও শ্রমিক কল্যাণমূলক কর্মসূচী তাহারা সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিয়াছে। কিন্তু এই সাফল্যের অন্তরালে নিহিত রহিয়াছে বৈফল্যের বীজ। এখনও পর্যন্ত বহু ইউনিয়ন সাংগঠনিক দিক হইতে দুর্বল; সভ্য সংখ্যা স্ফীত করিয়া দেখাইয়া প্রাধান্য অর্জনের চেষ্টা, নিয়মিত অর্থ সংগ্রহের অভাব, বহিরাগত ব্যক্তিদের নেতৃত্ব—শ্রমিকের প্রাত্যহিক জীবনের সকল প্রয়োজন মিটাইবার মতন সামর্থ্য সংঘগুলির করায়ত্ত হইবার অন্যতম প্রধান অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে বহিরাগত নেতৃত্বের ও মিথ্যা আত্মশক্তির প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ, শ্রমিক আন্দোলন ভারতবর্ষে এমন এক স্তরে আসিয়া গিয়াছে যে, জীবন দিয়া জীবনের দুঃখ অনুভব করা দরকার। মজুরের হাতেই মজুরের নেতৃত্ব আজ কাম্য।

এখনও ভারতবর্ষে শিল্পের সহিত বংশপরম্পরায় সংযুক্ত শিল্পনির্ভর শ্রমিক সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। শিল্পের দূরভবিষ্যতের সহিত নিজেদের ভবিষ্যৎ মিলাইয়া দেখিবার শক্তি আজও ভারতীয় শ্রমিক অর্জন করে নাই। বিভিন্ন ধরনের জাতি, বর্ণ ও ভাষাভাষী মানুষকে লইয়া শ্রমিকদল গড়িয়া উঠায় মালিক পক্ষ সেই বিভিন্নতাকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাইতেছে। এতদ্ভিন্ন বাহ্যতঃ আইন পাস করিয়াও সরকার পক্ষের আন্তরিক অসহযোগ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করিতেছে। অবিশ্বাস, অসহযোগিতা ও বিরোধিতা—যুগ যুগ সঞ্চিত এই কলুষ ভারতের শ্রমিক ও মালিক সম্পর্ককে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তবু বিশ্বাস করা যায়,

ইতিহাসের অমোঘ বিধানে মালিককে একদিন তাহার বঞ্চনার অস্ত্র পরিত্যাগ করিতেই হইবে, মানুষকে মানুষের যোগ্য মূল্য দিবার মতন মানসিক উদারতা তাহারা অর্জন করিবে এবং ভারতের শ্রমিক-সমাজ উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আপন হস্তে তাহাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে।

২৮

ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে শুরু করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার জীবনের ২৮টি বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া নিজস্ব সংগঠন ও কাজকর্মের সমন্বয়-সাধনের পর্ব চলিয়াছে, নোট প্রচলন ও সরকারের ব্যাঙ্ক রূপে কাজ করার মধ্যেই ইহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার পরই শুরু হইল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই আসিল দেশ বিভাগ। যুদ্ধকালীন সরকারী মুদ্রা ও ঋণনীতি, যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা, পুনর্বাসনের প্রয়োজনীতা, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব লোপ ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যার মধ্য দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলি কাটিয়াছে। বর্তমানে সেই সব ধরনের সমস্যা না দেখা দিলেও নূতন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। পরিকল্পিত অর্থনীতির পটভূমিকায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্বও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অন্যান্য সব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতই নোট প্রচলন, সরকারের আমানতী কর্ম, আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় হার বজায় রাখা ইত্যাদি কাজকর্ম করে। ইহা ছাড়া আর্থিক বাজার নিয়ন্ত্রণ, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহ, দেশীয় ব্যাঙ্কব্যবস্থাকে সুষ্ঠু করিয়া গড়িয়া তোলা এবং পরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও ঋণনীতি গ্রহণ ইত্যাদি করিয়া থাকে। অল্প সময়ের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বহু গুরুদায়িত্ব লইতে হইয়াছে এবং ইহার কার্যাবলীর মূল্যায়ন করার সময় ইহাও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ ভারতের আর্থিক বাজার অসংবদ্ধ এবং ইহার এক উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় যে-নীতি গৃহীত হয়, সেই নীতি অনুসারেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কাজকর্ম করিতে হয়। এই বিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা নাই। ইহা ছাড়া আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজারের অবস্থার পরিবর্তন প্রভাবে দেশীয় আর্থিক বাজারে যে-পরিবর্তন আসে, তাহার সামান্যই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন। শুধুমাত্র নগদ টাকার

পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে খুবই বেশি ; ইহার কারণ, মূলতঃ কৃষিজ অর্থনীতির জন্য ভারতে বিভিন্ন মরসুমে, যেমন তেজী ও মন্দার মরসুমে, টাকার চাহিদা উঠানামা করে। ১৯৪৯ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইনের ও ১৯৫৬ সালে তাহার পরিবর্তনের ফলে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে। ব্যাঙ্ক হারের গুরুত্ব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ঋণের সুদের হার এবং বিভিন্ন প্রকার সুদের হারে মরসুমী পার্থক্য—এই সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যের ফলেই সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য মুদ্রাস্ফীতি রোধে ব্যাঙ্ক হার নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। কারণ ভারতে সরকারী ঋণপত্রের গুরুত্ব অনেক বেশি। বাণিজ্যিক বিলের পরিমাণ ও গুরুত্ব এখানে খুবই কম। আবার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের ক্ষমতা বেশি থাকিলে সুদের হারের নীতি কার্যকরী হয় না। ইহা ছাড়া, উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থানে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খোলাবাজারী কার্যকলাপ নীতি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এখানেও এই নীতি বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। কারণ সরকারী ঋণপত্রের ক্রয়বিক্রয় সাধারণভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে, জনসাধারণের মধ্যে খুব বেশি ক্রয়বিক্রয় ঘটে নাই। ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইনে সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভের অনুপাত (চাহিদা আমানতের ক্ষেত্রে ৫% হইতে ২০% এবং মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে ২% হইতে ৮%) বাড়াইবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। ব্যাঙ্কগুলিতে ইহারও অতিরিক্ত আমানত জমিলে, একটি নির্দিষ্ট কোটা পর্যন্ত আরও ১% ও পরে ২% রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দাবী করিতে পারে। বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের ঋণদানকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া আছে। ১৯৫৬ সালে প্রথম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চাল ও ধানের ক্ষেত্রে ফাটকাবাজী করার উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়ার বিরুদ্ধে ও বন্ধকীর পরিমাণ বাড়াইতে নির্দেশ দেয়। পরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া নৈতিক প্রভাব, ব্যাঙ্কগুলির পরিদর্শন, হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতির মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর্থিক বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করিয়াছে ; অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যথাসময়ে কাজ করে নাই। যেমন বহু পূর্ব হইতে দাম ও ফাটকাবাজী বাড়িলেও ১৯৫৬-র মে মাসেই প্রথম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। জমার অনুপাতের পরিবর্তন ক্ষমতাকেও বিশেষ কাজে লাগানো হয় নাই।

কৃষি ঋণ সরবরাহ বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম দুইটি পরিকল্পনাকালে সমবায় আন্দোলন গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। বিভিন্ন সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকেও ঐ উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারকে ঋণ দানের

পরিমাণ ১৯৫৫-৫৬ সালের ১৪ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ১৯৫৯-৬০ সালে ৮৫ কোটি টাকায় গিয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কে দুইটি তহবিল খোলা হইয়াছে। ইহার একটি হইল দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় ঋণদান তহবিল ও অপরটি হইল অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপন এবং সুনিয়ন্ত্রণকল্পে একটি জাতীয় তহবিল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং তৃতীয় যোজনার কৃষিগত লক্ষ্য ও ঋণের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে ব্যাপকতর ভূমিকা অবলম্বন করিতে হইবে।

দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা ও সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইন ও ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইনে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রায় সর্বস্তরের ব্যাঙ্ক, যেমন যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক, জমি মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, পোস্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক, দেশীয় ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক-সমূহকে সাহায্য করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহুভাবে প্রচেষ্টা করিয়াছে। গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং কমিটি ও অখিল ভারত গ্রামীণ ঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ মতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া স্থাপিত হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রসার এবং ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পকে ঋণদানের উদ্দেশ্যে স্টেট ব্যাঙ্ক একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। যেখানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেখানে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। যোজনাকালে ব্যক্তিক্ষেত্র ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের পরিকল্পিত শিল্প ও কৃষি বিস্তারের সম্ভাবনার সম্মুখে স্টেট ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৯৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলবাজার পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও কার্যতঃ ইহা ভারতে বিলবাজার গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে নাই। শিল্প মূলধন সরবরাহ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষভাবে I.F.C., S.F.C., I.C.I.C.I., N.I.D.C., ও Re-finance Corporation ইত্যাদি সংস্থাগুলির প্রাথমিক মূলধন সরবরাহে অংশ গ্রহণ করিয়াছে ও অন্যান্য সব ব্যাঙ্ক ও বীমা-কোম্পানিগুলিকে অংশ গ্রহণ করিতে সাহায্য করিয়াছে। বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্প মূলধন সরবরাহ ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়োজিত শ্রফ কমিটির সুপারিশগুলির কথাও আমরা স্মরণ করিতে পারি। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা ও জনসাধারণের মনে এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভালো ধারণা গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালের আমানত বীমা কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতেও একটি আমানত বীমা কর্পোরেশন স্থাপনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু উদ্যোগীই হয় নাই, আদায়ীকৃত মূলধনের অংশও সরবরাহ করিয়াছে। কয়েকটি ভালো এবং একটি সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক ফেলের পরই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, এই ব্যবস্থা আরও আগে লওয়া উচিত ছিল এবং

সিডিউলড ব্যাঙ্ক ফেলের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। কারণ পরে দেখা যায় যে, উক্ত ব্যাঙ্কটির টাকায় ১২ আনা ফেরত দিবার ক্ষমতা ছিল। শুধু উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। আমানত-বীমা কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক ফেলের মূল কারণ দূর করিতে পারে না। ইহা আমানতকারীদের কিছু ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাই মাত্র করিতে পারে। আশা করা যায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে সুষ্ঠু ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়িয়া উঠিবে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে, গ্রাম্য মহাজনদের, যাহারা গ্রামীণ মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ সরবরাহ করে, আজও সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করিয়া সুষ্ঠু গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে কিরূপ সীমাবদ্ধতার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কাজ করিতে হয়। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, কোন দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা সাধারণভাবে সেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল কারণ ও শক্তিগুলিকে সৃষ্টি করিতে পারে না। ইহা সঞ্চয় বাড়াইতে ও তাহার উপযুক্ত ব্যবহারে সাহায্য করে মাত্র। উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমেই উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে ভারতের সাম্প্রতিক কালে অনুসৃত আর্থিক ও ঋণনীতির প্রধান রূপ হইল নিয়ন্ত্রণমূলক প্রসার। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে অতিরিক্ত পাথেয় সংগ্রহের প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য ঋণের প্রসার বাঞ্ছনীয়। অথচ খেয়াল রাখিতে হইবে যে, দেশে যেন মুদ্রাস্ফীতির আকার অতিরিক্ত তীব্র না হয়, বিশেষ করিয়া ফাটকাবাজী ইত্যাদি যেন না দেখা দেয়। তাই দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে একযোগে ক্ষেত্রবিশেষে ঋণের প্রসার ও ক্ষেত্রবিশেষে সঙ্কোচনের প্রয়োজন। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণ ভালোভাবে না হইতে পারায় মুদ্রাস্ফীতি তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। একই সঙ্গে দুই নৌকায় পা দিয়া চলা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। সুদের হারও অন্যান্য দেশের তুলনায় কম রাখায় মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা সম্ভবপর হয় নাই। তৃতীয় যোজনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস্ টাকার মূল্য রক্ষার জন্য যে-আবেদন জানাইয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। মুদ্রাস্ফীতি বিপজ্জনক রূপ লওয়ায় দ্বিতীয় যোজনার উন্নয়ন-হারও যদি তৃতীয় যোজনাতে বজায় রাখিতে হয় তবে অধিকতর বিনিয়োগের প্রয়োজন হইবে। উপযুক্ত আভ্যন্তরিক উপকরণ ও বৈদেশিক সাহায্য না আসিলে তৃতীয় যোজনার কার্যসূচী সফল করা সম্ভবপর হইবে না। উন্নয়ন-ধারার পথে আর্থিক স্থায়িত্ব রক্ষা করা তাই উন্নয়নের লক্ষ্য সফল করার উদ্দেশ্যেই প্রধান কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আশা করা যায়, অতি অল্প সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা গিয়াছে এবং যেভাবে সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে, সেই

পথেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথোপযুক্ত সাহায্য করিতে সক্ষম হইবে।

২৯

আমানত বীমা পরিকল্পনা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিসংস্কার বিভাগের কনিষ্ঠ কেরানী ধর্মদাসবাবু অফিসে যাইতে যাইতে কথাটি শুনিলেন। তাঁহার আর অফিস যাওয়া হইল না। ঘটনাস্থলে গিয়া দেখিলেন হাজার হাজার লোক দরজায় মাথা কুটিতেছে, কেহ বা পাগলের মত চীৎকার করিতেছে,—পুলিসের কর্তৃপক্ষও যতদূর সম্ভব শান্তিরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ধর্মদাস বাবু সবই বুঝিলেন। একটি মাত্র অদ্ভুত শব্দ করিয়া তাঁহার দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল। দেখা গেল সে-দেহে আর প্রাণ নাই। পত্নী, বিবাহযোগ্যা কন্যা ও এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো অথচ টালিগঞ্জের দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার স্বপ্ন দেখে এমন এক কুলতিলককে রাখিয়া তিনি ইহজগৎ ত্যাগ করিলেন। বস্তুতঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এমন একটি ব্যাঙ্ক ফেল ও এমন একটি দৃশ্য প্রায় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেশে নগদ টাকার পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় বহু ব্যাঙ্ক ছাতার গত গজাইয়া ওঠে ও পুরাতন ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে। অর্থনৈতিক দিক হইতে এই শাখাসমূহ আত্মনির্ভরশীল ছিল না, এবং ইহাদের ঝুঁকিও ছিল খুব বেশি। ১৯৪৮ হইতে ১৯৫২ সাল, এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৮৭টি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। ইহার মধ্যে সর্বাধিক ফেলের সংখ্যা ১১০টি দেখা দেয় পশ্চিমবঙ্গে। সম্প্রতি কেরলে পালাই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পরে এই সমস্যা আবার গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দেখা দিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, উন্নত দেশগুলির ব্যাঙ্ক ফেল ও ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের ব্যাঙ্ক ফেল এক জিনিস নয়। উন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্য-চক্রের অবনতি বা সঙ্কটের যুগে বেশ কিছু ব্যাঙ্ক তাহাদের ব্যবসা কমাইতে বা বন্ধ করিতে বাধ্য হইত এবং ব্যাঙ্কগুলির উপর আস্থাহীনতা সেই সঙ্কটকে তীব্রতর করিয়া তুলিত। ভারতের মত দেশগুলিতে ব্যাঙ্ক ফেলের প্রধানতম কারণ হইল ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার কাঠামোগত ত্রুটি-বিচ্যুতি। মোটামুটি ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ের কারণগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে-ব্যাঙ্কগুলি স্থাপিত হয়, তাহারা স্থায়ী আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পরিচালনার দৌর্বল্যের ফলে

অধিকাংশ সময়েই ব্যাঙ্কগুলি ফাটকাবাজীতে অংশ গ্রহণ করিত। এমন কি শেয়ার লইয়া ফাটকাবাজীও বাদ দেয় নাই। তৃতীয়তঃ উপযুক্ত বন্ধক না রাখিয়াই উচ্চ সুদের লোভে ঋণ দিত। চতুর্থতঃ বাণিজ্যমূলক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে অযথা শাখা-স্থাপনের প্রবণতা খুব বাড়িয়া যায়। তাছাড়া আমানত আকৃষ্ট করার জন্য অনেক সময় উচ্চ সুদ ঘোষণা করা হইত। ফলে খরচ খুবই বাড়িয়া যায়। পঞ্চমতঃ মূলধনের স্বল্পতাও ব্যাঙ্ক ফেলের অন্যতম কারণ। এবং সর্বোপরি ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টার ও ম্যানেজারেরা অনেক ক্ষেত্রেই অসাধু ছিলেন। ইহার মনস্তাত্ত্বিক দিকটিকেও অস্বীকার করা যায় না। অনেক সময় শুধু গুজবের ফলে বহু ভালো ব্যাঙ্ককেও অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়িতে হয়। যুদ্ধজনিত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের পরেও মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারের বিভিন্ন অর্ডিনান্স জারি জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আইনের ধারাগুলি কঠোর থাকায় উহা বিপদের সময় সাহায্য দিতে সক্ষম হয় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে অর্থ সাহায্যের উপর নয়, নির্ভর করে ব্যাঙ্কিং নীতি ও কৌশল সঠিকভাবে অবলম্বন করার উপর। ইহা ছাড়া, বাণিজ্যিক বিলের বাজার গড়িয়া না ওঠায় সাহায্যও সম্ভবপর হয় নাই। কেরলের পালাই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহা বোঝা যায়। পরে দেখা যায় যে, এই ব্যাঙ্কের আমানত-পিছু প্রতি টাকায় ১২ আনা ফেরত দিবার ক্ষমতা ছিল। শুধুমাত্র অক্ষম পরিচালনার অভাবে এই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানি আইন ও ১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইনের বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর যে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহারই ভিত্তিতে বলা যায় যে পালাই ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার কিছুটা দায়িত্ব নিশ্চয়ই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর পড়ে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙ্ক ফেলের পরবর্তী বিপর্যয় হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য এক বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় আমানত বীমা পরিকল্পনা। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমলে এই ব্যবস্থা আমেরিকায় চালু হয়। ১৯২৯ সালে যখন পৃথিবীব্যাপী যে-সঙ্কট (Great Depression) দেখা দেয়, তখন আমেরিকায় বহু ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে, এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহাতে ব্যাঙ্কগুলি ফেডারেল ডিপোজিট ইনসুরেন্স কর্পোরেশনের নিকট একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আমানত বীমা করিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে এই কর্পোরেশন ঐ পরিমাণ টাকা আমানতকারীদিগকে দিতে বাধ্য থাকে। পালাই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পর ভারতেও এই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলা হয়। অবশ্য ইতিপূর্বে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান কমিটি ও ব্লক কমিটি এই ধরনের প্রস্তাব দিয়াছিলেন। যাহাই হউক,

১৯৬১ সালের আমানত বীমা কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতেও এক আমানত বীমা কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকার মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১ কোটি টাকা সরবরাহ করিয়াছেন। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া ও তাহার শাখাগুলি বাদ দিয়া অন্যান্য সব ব্যাঙ্ককেই এই কর্পোরেশনের নিকট আমানতকারীদের আমানত বীমাবদ্ধ করিতে হইয়াছে। প্রাথমিক ভাবে অনধিক ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আমানত বীমাবদ্ধ হইয়াছে, পরে অবস্থা বুঝিয়া ইহা বাড়ানো যাইবে। প্রিমিয়ামের হার ঠিক হইয়াছে প্রতি তিনমাস অন্তর ১০০ টাকায় ৫ নয়া পয়সা মাত্র।

এই ব্যবস্থার ফলে কিছু লোকের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বাড়িবে ইহা সত্য। ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু যে-পরিমাণ আমানত বীমাবদ্ধ হইতে পারে, তাহা অত্যন্ত কম হওয়ায় ব্যাঙ্কগুলিতে যে আমানতের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, এমন মনে করার কোন যুক্তি নাই। ইহা ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কগুলির বিনিয়োগ ঐ অল্প আমানতের উপর নির্ভর করে না। অযথা প্রিমিয়ামের খরচও বাড়ানো হইয়াছে। শুধু আমানত বীমা করিলেই যে ব্যাঙ্ক ফেল পড়িবে না, এমন মনে করার কোন কারণ নাই। ইহা ছাড়া বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির সর্বদাই যে-পরিমাণ মজুত তহবিল থাকে, তাহাতে এই ব্যবস্থা শুধু বোঝার উপর শাকের আঁটি হইয়াই দেখা দিবে।

তবে একথা বলা যায় যে, এই ব্যবস্থা স্বল্প আমানতকারীদের মনে আস্থা আনিবে, এবং ভবিষ্যতে অল্প কিছু ক্ষতিপূরণও দিবে। আসল সমস্যার সমাধান করিতে হইলে ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন ব্যবস্থা সঠিক হওয়া দরকার। ভারতীয় ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাতেও যেরকম কেন্দ্রীভবন শুরু হইয়াছে, তাহার হাত হইতে ব্যাঙ্কগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে ইহাদের জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। অন্যথা, ভিখারীকে ঘোড়ার পিঠে চাপাইলে সে যেমন কাদায় নিয়া গিয়া ফেলে, সেই অবস্থা হইবে। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার পরিদর্শন ও পরিচালন ইত্যাদি দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করিলে এখনই জাতীয়করণের দরকার হইবে না।

৩০

বিগত দশকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলাফল

ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইবার সময়ে বিদেশী ইংরাজ সরকার ভারতকে দরিদ্র ও অনুন্নত রাখিয়া গিয়াছিল। তখন আমাদের শিল্প প্রসার লাভ করে নাই, চিরাচরিত

কৃষির চাপে কোটি কোটি অধিবাসী তখন জর্জরিত। দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থনৈতিক অনড় ও অচল অবস্থার মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদুপরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতি জনসাধারণের জীবনের ব্যয়ভার বিপুল পরিমাণে বর্ধিত করিয়াছে। দেশবিভাগের ফলে বহু কোটি লোক উদ্বাস্তু, অর্থনৈতিক জীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া তাহারা ভিক্ষুকে পরিণত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহাদের নিকট উপহাসের সামগ্রী এবং নিষ্ঠুর অট্টহাসের বিষয়। কৃষি ও শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য— সকল কিছুর সামগ্রিক উন্নয়নের তাগিদে ভারত সরকার তাই স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক উপকরণ ও জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা টেকনোলজির প্রসার ঘটাইয়া দেশের মাটি ও মানুষের উৎপাদন-ক্ষমতা, আয়, ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়াইয়া চলাই এই পরিকল্পনার মহৎ উদ্দেশ্য।

১৯৫১ সালের মার্চ মাসে প্রথম পরিকল্পনার সূত্রপাত এবং ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের সমাপ্তি ঘটিয়াছে। বিগত এই দশ বৎসর ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই দশকে ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত প্রসার হইয়াছে, দেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার উপযোগী উৎপাদন ও বণ্টন কাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে।

বিগত দশকের পরিকল্পনার ফলে দেশে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী হিসাব একত্রে ধরিলে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রথম পরিকল্পনার প্রথম দিকে বৎসরে ৫০০ কোটি টাকা, ইহার শেষের দিকে ৮৫০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইহা দাঁড়াইয়াছে বৎসরে ১৬০০ কোটি টাকা। কেবল বিনিয়োগের হার এইরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাই নহে, ইহার নিয়োগ-বিন্যাসের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। প্রথম পরিকল্পনায় তুলনামূলকভাবে কৃষির উপর গুরুত্ব ছিল অধিকতর, অপরপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন ও খনির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। উভয় পরিকল্পনাতেই পরিবহণ ও সংযোজনের উপর যথেষ্ট মনোযোগ রক্ষিত ছিল।

বিগত দশকের এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার সকল বৎসর বা সকল সময়ে সমান ছিল এমন মনে করা চলে না। কোন বৎসর জাতীয় আয় বাড়িয়াছে, কোন বৎসর বা কমিয়াছে—বৃদ্ধির হারও সকল বৎসরে সমান হয় নাই। এই পতন-অভ্যুদয়ের কারণ হইল প্রাকৃতিক কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক পটভূমিতে বিশেষ কোন পরিবর্তন। প্রথম পরিকল্পনায় মরসুমের মরজিতে কৃষির উৎপাদন বাড়ে, জাতীয়

আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ১২%, ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রকৃতি দেবীর কার্পণ্যে ২৫% বৃদ্ধির লক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয় আয় ২০%এর উপর বৃদ্ধি পায় নাই।

তবুও সমগ্রভাবে হিসাবে ধরিলে বিগত দশকটিতে আমরা মোটামুটি অগ্রগতির স্বাক্ষরই দেখিতে পাই। কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের উপযোগী যে মৌলিক ভিত্তি দরকার সেই জলসেচ, শক্তি এবং পরিবহণের ব্যবস্থা আমরা অনেকাংশে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছি। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বহু খনিজ দ্রব্য আমরা খুঁজিয়া পাইয়াছি। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব সত্ত্বেও আমরা উন্নয়নের বহু কার্যসূচী সফল করিয়া তুলিয়াছি। সেখানে ইতিমধ্যেই উৎপাদন শুরু হইয়াছে বা শীঘ্রই শুরু হইবে। কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় ৪১%, খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় ৪৬%। সংগঠিত কারখানা-শিল্পের নীট উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। বৃহৎ, মূল ও ভারি শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। ইস্পাত, কয়লা এবং ভারি রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে বিদ্যুৎশক্তির বিপুল প্রসার এবং দেশের পরিবহণ-ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নতি। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ দ্বিগুণের অধিক হইয়া উঠিয়াছে। গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হইয়াছে। হাসপাতাল, ঔষধালয় প্রভৃতির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, ম্যালেরিয়া রোগের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে, জনস্বাস্থ্যের আনুপাতিক উন্নতি ঘটিয়াছে। গড় আয়ুষ্কাল বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত দশকে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ৪১% কিন্তু বিপুল জনবৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটিয়াছে মাত্র ১৬%।

উপরের আলোচনা হইতে দেখিতে পাই যে, গত দশ বৎসরে জাতীয় জীবনের সকল শাখা-প্রশাখাতেই গতির সঞ্চার হইয়াছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছে। তবুও, আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে. এই অগ্রগতির পথে নানারূপ বাধাবিপত্তি ও টানাপোড়েনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল চাপ ও কষ্ট এড়াইবার উপায় নাই; সমাজ-দেহের সুগভীর অন্তঃস্থলে প্রবিষ্ট দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক অচলায়তনের শিকড় টানিয়া উপড়াইয়া ফেলিতে হইলে এই কষ্ট ও চাপ আমাদের অবশ্য মানিয়া লইতে হইবে। ইহা সৃজনের বেদনা, নূতন জন্মলগ্নের এই বেদনা না থাকিলে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? অনেক ত্রুটি হইয়াছে ইহা সত্য, অনেক ত্রুটি পরিহার করাও হয়তো সম্ভব ছিল। কিন্তু এই সকল বিষয়েই আমরা যে-বিপুল অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার লাভ করিয়াছি, তাহার বিগত দশকের পরিকল্পনার প্রকৃত সাফল্য। এখনও আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় বহু দুর্বলতা

ও ছিদ্র অরক্ষিত আছে। জাতির জীবনে সম্ভাবনার বিচিত্র পথগুলি এখনও আমাদের চক্ষে সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু ভারতের ভাগ্যাকাশে বিগত দশকটি এক উদ্দীপনাময় যুগ—আসমুদ্র হিমাচল ও আপামর জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করার সংগ্রামী প্রচেষ্টার নবযুগ।

৩১

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৪৭এ দীর্ঘ দুইশত বৎসরের রাজনৈতিক দাসত্ব মোচনের পর ১৯৫১ সাল হইতে ভারত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারা শুরু হইয়াছে। এই পরিকল্পনাগুলি ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের নিয়ামক। কৃষি, শিল্প, আভ্যন্তরিক বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্মই পরিকল্পনার গতি ও প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রভাবিত হয়। পরিকল্পনাগুলি ভারতের জনগণের জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ। বর্তমান পৃথিবীতে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ভিন্ন অন্য কোনও দেশেই জাতির অর্থনৈতিক জীবন ও ভবিষ্যৎ এমনতরো পরিকল্পনার সাফল্য বা বৈফল্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই।

১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬০ এই দশ বৎসরে প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রভাবে উন্নয়নের হার কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ-এ দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়াছে।

১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তৃতীয় পরিকল্পনার শুভযাত্রা। পরিকল্পনার ক্ষেত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া বিবেচনা করা হইলেও পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিয়া একটি অখণ্ড ভারত-সমাজ রূপায়িত হইতেছে বলিয়া, কোনো পরিকল্পনাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা চলে না। তবু পৃথকভাবে প্রতিটি পরিকল্পনায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রয়াস আছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে পাঁচটি বিষয় ধরা হইয়াছে—(১) বাৎসরিক ৬% হারে জাতীয় আয় বাড়ানো, (২) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা এবং শিল্প ও রপ্তানির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (৩) ইস্পাত, রাসায়নিক শিল্প, জ্বালানি প্রভৃতি মূল শিল্পের প্রসার—যাহাতে দেশের নিজস্ব উপকরণ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে অধিকতর শিল্পায়নের প্রয়োজন মিটানো যায়, (৪) দেশের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা, (৫) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার গঠনরীতি অনেকাংশে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল কৌশল ও

অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীত। যেমন দ্বিতীয় যোজনার 'বিষম উৎপাদন কৌশল' (unbalanced growth technique) এবং মূল ও ভারী শিল্পের উপর অগ্রাধিকার, এইগুলি তৃতীয় পরিকল্পনায়ও অনুসরণ করা হইয়াছে। তবে কতকগুলি বিষয়ে এই পরিকল্পনায় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, যেমন কৃষি। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান বাধা হইল কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির স্বল্পহার। কৃষি-উৎপাদনের সূচক (১৯৪৯-৫০ সালকে ১০০ ধরিলে) বর্তমানে আছে ১৩৫, তৃতীয় পরিকল্পনা কালের শেষে ইহা হইবে ১৭৬, অর্থাৎ শতকরা ৩০ ভাগ বাড়াইতে হইবে। খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ৭৬ মিলিয়ন টন হইতে ১০০ মিলিয়ন টন করিতে হইবে।

শিল্প উৎপাদনের সূচক বর্তমানে আছে ১৯৪, তৃতীয় পরিকল্পনা কালের শেষে ৩২৯, অর্থাৎ শতকরা ৭০ ভাগ বাড়াইতে হইবে। ইস্পাত ও পেট্রলজাত দ্রব্য, বস্ত্র, লৌহ, কয়লা, শক্তি, রেলপথ প্রভৃতি সর্বদিকেই উৎপাদনের সূচক বৃদ্ধির কথা তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে।

উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষার প্রসার না ঘটাইলে এত বড় পরিকল্পনা সফল করা যায় না। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা ৪৩'৫ মিলিয়ন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬৩'৯ মিলিয়ন করিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রও প্রসারিত করিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভোগের স্তরকে বাড়াইতে হইবে।

কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা তৃতীয় পরিকল্পনার একটি প্রধান লক্ষ্য। আগামী পাঁচ বৎসরে কর্মে যোগদানেচ্ছু লোকের সংখ্যা হইবে ১৭ মিলিয়ন—তন্মধ্যে মাত্র ১৪ মিলিয়ন ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

যদি সবগুলি প্রয়াস সিদ্ধ হয় তবে ভারতের জাতীয় আয় তৃতীয় পরিকল্পনা কালের মধ্যে ৩৪% বৃদ্ধি পাইবে। পরিক লর শেষে ১৪৫০০ হইতে বাড়িয়া ইহ ১৯০০০ কোটি টাকাতে দাঁড়াইবে। তবে ভারতের জনসংখ্যার হার যে-ভাবে দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে "পঞ্চম পরিকল্পনার" শেষে জাতীয় আয়কে দ্বিগুণিত করার যে-কল্পনা আমাদের মনে আছে তাহা কতদূর সফল হইবে বলা যায় না। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি আমাদের জাতীর অগ্রগতির আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে (ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, (খ) জনসাধারণের মনে ক্রমপ্রসারমান প্রত্যাশা এবং (গ) আগামী পরিকল্পনাগুলির কার্যকাল শেষ করার মধ্যে স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের স্তরে পৌছাইবার প্রয়োজনীয়তা—এই সকল কারণের দরুন উপরে বর্ণিত লক্ষ্যসমূহ অতি অবশ্যই আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে পূরণ করা

দরকার। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকেদের মাথাপিছু গড় আয়ও বাড়িবে। বর্তমানের ৩৩০্ টাকা হইতে ঐ অঙ্ক ৩৮৫-তে পৌঁছাইবে এবং পরবর্তী স্তরে মাথা-পিছু গড় আয় আরও বাড়িবে।

বর্তমানের বিনিয়োগের হার ১১% তে বাড়াইয়া উহা ১৪% করিতে হইবে। এবং পরবর্তী স্তরে উহাকে আরও বাড়াইতে হইবে। জাতিকে স্বনির্ভরশীল স্তরে পৌঁছাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে দেশের আভ্যন্তরিক সঞ্চয়কে বাড়ানো প্রয়োজন। ইহার কারণ এই যে, দেশ তখনি স্বনির্ভরশীল হইতে পারিবে যখন ইহাকে আর বৈদেশিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। বর্তমানের আভ্যন্তরিক সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের ৮·৫% হইতে এই পরিকল্পনা কালের শেষে দাঁড়াইবে ১১·৫%।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মুদ্রাস্ফীতি সংক্রান্ত বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনায় একটি সুস্পষ্ট 'দাম-নীতি' (Price Policy) গ্রহণ করা হইয়াছে। এই দাম-নীতির সাহায্যে দরিদ্র জনসাধারণের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির দামবৃদ্ধিকে ঠেকানো যাইবে।

অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাকে 'দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের' হিসাবে অথবা টাকার অঙ্কে হিসাব করা চলে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে, উভয় পদ্ধতির যেটিই আমরা গ্রহণ করি না কেন, সঠিকভাবে হিসাব করিলে উভয়ের ফলই সমান। প্রকৃত দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে উপকরণগুলি সারা দেশময় বিক্ষিপ্ত বলিয়া অসুবিধা হয়। তাই ঐ সকল উপকরণকে আমরা বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে ধরিয়া লইয়া উহাদের দাম নির্ধারণ করিয়া পরিকল্পনার ব্যয়ভার গণনা করি। তৃতীয় যোজনায় পরিকল্পনাকে অনেকটা নমনীয় রাখা হইয়াছে, কারণ আমরা যতই উৎপাদনের বিভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছাইব, পরিকল্পনার জন্য ততই বেশী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করার সম্ভাবনা বাড়িতে থাকিবে।

পাঁচ বৎসরে মোট যে ১০৪০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ হইবে তন্মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে ৬৩০০ এবং ব্যক্তিক্ষেত্রে ৪১০০০। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য এই টাকা ভিন্ন ১২০০ কোটি টাকার চলতি খরচা প্রয়োজন হইবে। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ টাকা হইতে ২০০ কোটি টাকা বেসরকারী ক্ষেত্রের ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য থাকিবে, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হইবে ৬১০০ কোটি টাকা

সরকারী ক্ষেত্রে কোন কোন খাতে কিভাবে ব্যয় হইবে, তাহাও বিশদভাবে অনুধাবনযোগ্য। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন খাতে ৬৬০ কোটি টাকা, প্রধান ও মাঝারি জলসেচে ৬৫০ কোটি টাকা, শক্তি উৎপাদনে ১০১২ কোটি টাকা, গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পে

১৫০ কোটি টাকা, সংগঠিত শিল্প ও খনিতে ১৫২০ কোটি টাকা, পরিবহণ ও সংযোজনে ১৪৮৬ কোটি টাকা, সামাজিক ও সেবাকর্মে ৬২২ কোটি টাকা, ইহা ছাড়া মজুতের উদ্দেশ্যে ২০০ কোটি টাকা।

সরকারী ক্ষেত্রে পরিকল্পনার ব্যয়ভার প্রকৃতপক্ষে ৮০০০ কোটি টাকা, কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে ৭৫০০ কোটি টাকা সংগ্রহের হিসাব দিয়াছেন। চল্‌তি কর হইতে উদ্বৃত্ত ৫৫০ কোটি টাকা, রেলপথ হইতে প্রাপ্ত ১৫০ কোটি টাকা, অন্যান্য সরকারী উদ্যোগের উদ্বৃত্ত ৪৫০ কোটি টাকা, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ ৮০০ কোটি টাকা, স্বল্প সঞ্চয় ৬০০ কোটি টাকা, প্রভিডেণ্ড ফণ্ড ইত্যাদি হইতে ৫৪০ কোটি টাকা, সরকারী উদ্যোগ হইতে অতিরিক্ত উদ্বৃত্তসহ কর আদায় ১৭১০ কোটি টাকা, বৈদেশিক সাহায্য ২২০০ কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় ৫৫০ কোটি টাকা। বিভিন্ন দিকে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা দেশকে স্বনির্ভরশীল স্তরে লইয়া যাইবার পথে তৃতীয় পরিকল্পনা একটি অন্যতম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। বহু দুর্বলতা ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ভারতবাসী আজ প্রগতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে; অর্থনৈতিক ও সামাজিক জড়ত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বনির্ভরশীলতার স্তরে পৌঁছাইবার দিন আজ আগতপ্রায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সেই উজ্জ্বল সোনালী দিনের বাণী বহন করিয়া সগৌরবে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে—

"আমাদের যাত্রা হল শুরু।"

৩২

ভারতের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি

আমরা সাধারণ লোকেরা একটি টাকাকে গোটা একটি টাকা বলিয়াই মনে করি। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর দাম-স্তরে পরিবর্তনের ফলে সেই টাকা কখনও বাড়ে, কখনও কমে; টাকারও সঙ্কোচন-প্রসারণের পালা চলে। জিনিসপত্রের দাম যখন সস্তা হয় টাকার কলেবর তখন প্রসারিত হইয়া পড়ে, ক্রয়ের সময়ে একটি টাকা পূর্বাপেক্ষা বেশী দ্রব্যকে নিজের ঘেরাটোপে আনিতে পারে, উহার মূল্য বাড়ে। আবার জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে টাকার কলেবর সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ক্রয়ের সময়ে সেই টাকাটির দ্রব্যসামগ্রী আয়ত্তে আনার ক্ষমতা হ্রাস পায়, উহার মূল্য কমে। বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরু হইতে ভারতে জিনিসপত্রের

দাম বাড়িয়াই চলিয়াছে, টাকার মূল্যক্ষয় ঘটিতেছে, বর্তমানের টাকা ক্রমে পুরাতন আমলের আধুলি, সিকি, দুয়ানিতে পরিণত হইতেছে। অমূল্য টাকা ক্রমেই নির্মূল্য হইয়া পড়িতেছে।

টাকার এই মূল্যক্ষয়ের অপর দাম মুদ্রাস্ফীতি। পরিকল্পনার কার্যসূচী সফল করার উদ্দেশ্যে সরকার কর চাপাইয়া ও ঋণ করিয়া আরও টাকা না তুলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতেছেন, তাহার নিকট হইতে ধার চাহিতেছেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কও নাসিকে ছাপাখানা খুলিয়া অর্থনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গৌরী সেনের ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছে। ইহাই ঘাটতি বাজেট বা ঘাটতি ব্যয় রূপে অভিহিত হইতেছে। এই টাকা সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির হাত ঘুরিয়া ব্যাঙ্কে পৌঁছিতেছে। ব্যাঙ্কগুলিও এই নগদ টাকা আলমারীতে জমা রাখিয়া উহার ভরসায় বাজারে ধার বাড়াইতেছে। নগদ টাকা ও ব্যাঙ্কের ধার উভয় প্রকার অর্থই বাড়িয়া চলিয়াছে। উন্নত দেশগুলিতে লোকের হাতে টাকা বাড়িলে তাহার সেই টাকা ধার দিতে চায়, কারণ প্রত্যেকেই মোটামুটি পেট ভরিয়া খাইতে পায়। কিন্তু ভারতের মতন অনুন্নত দেশে, লোকের আয় কম, বর্তমানের আয়ে তাহারা কুলাইয়া উঠিতে পারে না, হাতে কিছু টাকা বেশী আসিলে বেশীর ভাগ লোকই ভালমন্দ যা হয় কিছু ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে ছোটে। বর্ধিত টাকা সরাসরি দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে আসিয়া চাপ দিতে থাকে। এদিকে আমাদের পরিকল্পনায় খাদ্য-বস্ত্র-ঔষধের উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলা হইতেছে না, আমরা লগ্নী করিয়াছি ইস্পাত, সিমেণ্ট, ইট, কাঠ এবং খাল-খননে। ইহাদের প্রত্যক্ষভাবে ভোজন বা পরিধান করা চলে না, আর অতি শীঘ্র এইসকল লগ্নী হইতে জিনিসপত্র বাহির হইয়াও আসে না। টাকা লইয়া লোকে ক্রয়ের জন্য বাজারে উপস্থিত, কিন্তু পণ্যের দেখা নাই। জিনিস পাইবার লোভে লোকেরা দাম চড়াইয়া দিতেছে। যদি-বা পরিকল্পনার সকল অংশ সম্পূর্ণ সফল হইত, তবে এই সমস্যা অনেকাংশে মিটিতে পারিত। কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল-খুশিতে কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে, বিদেশী মুদ্রার অভাবে অনেক দরকারী কাঁচামাল আমরা আনিতে পারি নাই। কেবল চাহিদার দিকে নহে, যোগানের দিকেও ফাট্‌কাদাররা সুনজর দিয়াছেন। জিনিসের প্রকৃত ঘাটতি না থাকিলেও 'হিম-ঘর' বা 'গুদাম-ঘরের' কল্যাণে খুশিমত কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করার সুবিধা বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের বেশীর ভাগ অংশই এমন কতকগুলি দেশের সঙ্গে যেখানে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বেশী। ইংলণ্ড, আমেরিকার মুদ্রাস্ফীতি সপ্তসমুদ্র পার হইয়া আমদানি-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির আকারে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহারই মিলিত-মিশ্রিত ফলশ্রুতি মুদ্রাস্ফীতি।

ভারতে অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির জয়গানে মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। এই সকল বিজ্ঞজনের মতে দাম যত বাড়ে, মজুরি তত বাড়ে না; ব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। মুনাফা বাড়িলে আরও মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীরা লগ্নী ব্যয় বাড়াইয়া তোলে, দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারিত হয়। ব্যবসায়ীদের হাতে মূলধন-গঠনের বেগ দ্রুততর হইয়া উঠে; অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। অল্প একটু বিষ যেরূপ শরীরকে চাঙা রাখে, মৃদু পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঠিক সেইরূপ দেশের অর্থনৈতিক দেহের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, ইহাকে সতেজ ও বেগবন্ত করিয়া তোলে।

তবে ইহা নিতান্ত নিষ্ঠুর পদ্ধতি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক যেরূপ বলির পূর্বে ছাগশিশুকে স্নানাহারে পুষ্ট করিয়া তোলে, মুদ্রাস্ফীতি ঠিক সেইরূপ লোকের হাতে টাকা তুলিয়া দিয়া প্রতিটি টাকাকে কর্পূরের মত ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়। বাঁধা-মাহিনার ব্যক্তিরা প্রতি মাসে কম পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ঘরে আনিতে পারে, শ্রমিকেরা হরতালের পথে অগ্রসর হয়, বৃদ্ধ পেনশনভোগীরা সাংসারিক চিন্তার ভারে নুইয়া পড়ে। শুধু তাহাই নহে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন তো ঘটায়ই না, বরং এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্ন দিক হইতে উন্নয়নের বেগ কমাইতে থাকে। সকল উপকরণের দাম বাড়ে বলিয়া পরিকল্পনার যে-কর্মসূচী ১ লক্ষ টাকায় সম্পূর্ণ করার কথা ছিল উহাতে ১½ লক্ষ টাকা লাগিয়া যায়; পরিকল্পনার নির্দিষ্ট টাকাতে সকল কাজ শেষ হয় না। বিদেশে রপ্তানী করার সুযোগ হ্রাস পায়, কারণ বেশী দামের জিনিস তাহারা কেন কিনিতে চাহিবে? মুদ্রাস্ফীতিই এইরূপে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট গভীরতর করিয়া তোলে।

উন্নয়নের নাম করিয়া মুদ্রাস্ফীতির পদ্ধতি তাই প্রয়োগ না-করাই ভাল। কিন্তু বর্তমানে, যখন মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ ভারতে প্রকট হইয়া উঠিতেছে, তখন ইহার প্রতিরোধের উপায় কি? জিনিসপত্রের উৎপাদন বাড়ানো এবং লোকের হাত হইতে ছাঁকিয়া বাড়তি টাকা তুলিয়া লওয়া দরকার;—ভারতে সেইরূপ চেষ্টাও চলিতেছে। কিন্তু ফাট্‌কাদি রোধ করা, এবং সরকারী বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করাই বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খাদ্যশস্য লইয়া ফাট্‌কাদারি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ব্যাঙ্কের টাকা যাহাতে এই কাজে খাটিতে না পারে, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। রেশনিং চালু করা ও ন্যায্যমূল্যের দোকান খোলার কাজও আর ফেলিয়া রাখা চলে না। যে-কোন পথই গ্রহণ করা হউক না কেন, মুদ্রাস্ফীতির প্রতিরোধ আশু করণীয়। পরিকল্পনার শুভ ফল কতিপয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হইতেছে, অধিকাংশ জনসাধারণ আজ ভারবাহী

পশুর ন্যায় জীবনযাপন করিতেছে। সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার নীতির সহিত মুদ্রাস্ফীতি কিছুতেই খাপ খায় না, উন্নয়নের এই বিপদজনক পথ অবিলম্বে পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

৩৩

ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থা

পরিবহণের কথা আলাচনা করিতে গেলেই সর্বাগ্রে ইংরাজ কবি কিপ্‌লিঙ্‌-এর সেই অবিস্মরণীয় অভিমত মনে পড়ে—'পরিবহণই সভ্যতা'। বস্তুতঃ কোন দেশের সভ্যতার ধারক ও বাহক উহার পরিবহণ-ব্যবস্থা। উনবিংশ-বিংশ শতকে সমগ্র পৃথিবীতে আর্থনীতিক কাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং সর্বত্র যে দ্রুত শিল্পবিস্তার চোখে পড়ে তাহার মূলে রহিয়াছে পরিবহণ-ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি। একথা সর্বজনবিদিত যে, অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির গতিবেগ দ্রুততর করিতে হইলে দূরত্ব-অতিক্রমের গতিবেগও দ্রুততর করা প্রয়োজন। বিপুল পণ্যসামগ্রী ও ক্রেতা-বিক্রেতাদের যাতায়াত-ব্যবস্থার সুবিধা সৃষ্টির ভূমিকা পরিবহণের। একদিন ইংরেজ-রাজ ভারতের সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য এবং নিজেদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার জন্য, এক কথায় শাসন ও শোষণের পথ সুগম করিবার জন্য ভারতে পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন। আজ নবীন ভারতেও শিল্প সম্প্রসারণ, অনুন্নত অঞ্চলসমূহের উন্নতি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুলভ সুযোগ সন্ধানের প্রয়োজনে পরিবহণ-ব্যবস্থার ব্যাপকতা বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতে প্রচলিত পরিবহণ-ব্যবস্থার চারিটি প্রধান বিভাগ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। রেল-পরিবহণ, সড়ক-পরিবহণ, নৌ-পরিবহণ ও বিমান-পরিবহণ—এই চতুর্বিধ শাখায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কীভাবে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে তাহার পরিরহণ-ব্যবস্থার প্রসার ঘটাইতেছে ও জীবনযাত্রাকে ত্বরিত করিতেছে তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থায় রেলপথের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে মাল চলাচলের শতকরা আশি ভাগ এবং যাত্রী-চলাচলের শতকরা সত্তর ভাগ রেলের সহযোগে সম্পাদিত হয়। ১৮৫৩ সালে প্রথম বোম্বাই হইতে কল্যাণ পর্যন্ত ১৮ মাইল পথে ও ১৮৫৪-তে কলিকাতা ও হুগলীর মধ্যে ২৩ মাইল পথে রেল-চালনা শুরু হইয়াছিল। লর্ড ডালহৌসীর উদ্যোগে প্রথম আটটি বৃটিশ কোম্পানির সহিত

ভারত সরকার রেলপথ স্থাপনে চুক্তিবদ্ধ হয়। পরবর্তীকালে কোম্পানিসমূহের হাত হইতে রেলপথ ক্রয় করিয়া রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার পর হইতেই রেলের মুনাফা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। দেশ বিভাগের ফলে প্রায় ছয় হাজার মাইল রেলপথ যখন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং কোন কোন দূরাঞ্চলের সহিত ভারতের সংযোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তখন প্রায় এক হাজার মাইল নূতন রেলপথ স্থাপিত হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে কিছু উৎপাটিত রেলপথ পুনঃস্থাপিত হইয়াছে, কিছু নূতন রেলপথ নির্মিত হইয়াছে এবং প্রায় ৪৬ মাইল সঙ্কীর্ণ রেলপথকে বিস্তীর্ণ রেলপথে পরিবর্তিত করা হইয়াছে। চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা স্থাপন, গঙ্গায় পুল নির্মাণ এবং হাওড়ার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে রেলপথের বৈদ্যুতীকরণ প্রথম পরিকল্পনা-শেষের ফলশ্রুতি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সাজসরঞ্জাম ও রেলপথের পুনর্বিন্যাস, উন্নত সঙ্কেত-ব্যবস্থা, একক লাইনের পরিবর্তে দ্বৈত-লাইন স্থাপনা, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান ও বিদ্যুৎ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদি রেল-পরিবহণের নানা উন্নতির ব্যবস্থা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালেও এঞ্জিন-নির্মাণ, ওয়াগন ও যাত্রীবাহী গাড়ি নির্মিতির প্রয়াস প্রমুখ রেল-পরিবহণের নানাবিধ সম্প্রসারণের প্রতি সরকারের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

দেশ বিভাগের পূর্বে সারা ভারতবর্ষের রেলপথসমূহ ৩৫টি বিভিন্ন সংস্থায় নামাঙ্কিত ছিল। ১৯৫০ সালে ভারতের রেলপথ পরিচালনার পুনর্বিন্যাস সাধিত হয় ও ভারতীয় রেলবোর্ডের অধীনে ছয়টি অঞ্চলে উহা বিভক্ত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, এই সকল প্রয়াসের ফলস্বরূপ শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ ও যাতায়াত বিপুল-ভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

দেশ-গঠনের কাজে রেল-পরিবহণের পরেই সড়ক-পরিবহণের গুরুত্ব। ধীরগতি ও দ্রুতগতি নানাবিধ যানের সাহায্যে পাকা সড়ক ধরিয়া পণ্যদ্রব্য ও ক্রেতা-বিক্রেতা দেশের অভ্যন্তরে নিয়মিত যাতায়াত করে। সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ যত বেশী হয় মানুষের সভ্যতাও তত অগ্রসর হইতে থাকে। রেলের সহিত মোটর যানের প্রতিযোগিতার ফলে মানুষের যাতায়াতের সময়-সংক্ষেপ ও ব্যয় হ্রাস ত্বরিত হয়। রেলস্টেশন হইতে দূরবর্তী প্রত্যন্ত গ্রামে-উৎপন্ন সামগ্রী সহজে বাণিজ্য-কেন্দ্রে লরির সাহায্যে আনীত হয়; সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষ দেশের চলমান জীবনধারার সহিত সংযোগ-রক্ষায় সক্ষম হয়। রেলের সহিত বাস ও লরির প্রতিযোগিতার ফলে যাত্রীসাধারণের ব্যয় কমিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়, এবং স্বল্পবিরতিতে মোটর যান পাওয়া যায় বলিয়া অনেককে ট্রেনের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। সড়ক-পরিবহণে সবচেয়ে অসুবিধা অধিকসংখ্যক পাকা সড়কের অভাব। ভারতবর্ষে সড়ক

উন্নয়নের কাজ শুরু হয় ১৯১৯ সাল হইতে। ১৯৪৩ সালে নাগপুরে এঞ্জিনিয়ার সম্মেলনে দশ বৎসরের জন্য সড়ক উন্নয়নের এক কার্যসূচী গৃহীত হয়, ১৯৫২ সালে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পথ-গবেষণা সংস্থা স্থাপিত হয়। দুইটি পরিকল্পনার শেষে সমগ্র ভারতবর্ষে ১৪৪০০০ মাইল পাকা সড়ক এবং ২৫০০০০ মাইল কাঁচা সড়কের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে। এখনও সড়কগুলির প্রসার সর্বত্র পর্যাপ্ত নহে, বহু পুল নির্মিত না হওয়ায় সড়ক-পরিবহণ আজও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে নাই। পর্যাপ্ত পরিমাণ সড়ক ভারতবর্ষে নির্মিত হওয়ার পর যদি পরিবহণ-ব্যবস্থা রাষ্ট্রাধীন করা যায় তবে একদিকে যেমন বহু নাগরিকের জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা হইবে, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিবে।

ইহার পরেই নৌ-পরিবহণের কথা। ইহার দুইটি অংশ—একটি আভ্যন্তরিক নদীপথে পরিবহণ, অন্যটি সমুদ্রপথে বহির্জগতের সহিত সংযোগ সাধন। দেশের পরিবহণ-ক্ষেত্রে আভ্যন্তরিক জলপথে পোত চলাচলের ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি। যুদ্ধ ও অন্যান্য বিপদ-আপদের সময় রেলপথ ও সড়কের সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা যখন বিঘ্নসঙ্কুল, জলপথ তখনও রাষ্ট্রকে সাহায্যে সক্ষম। স্বল্পব্যয়ে দেশের সুদূর অভ্যন্তরে, গ্রাম্য ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচলনযোগ্য পদ্ধতিতে বিপুল আয়তনের গুরুভার বস্তু বহন-যোগ্যতার বিচারে আভ্যন্তরিক নৌ-পরিবহণের অনেক মূল্য। ভারতে প্রায় ৫০০০ মাইল জলপথ স্টীমার চলাচলের উপযোগী। উপর্যুপরি তিনটি পরিকল্পনার মাধ্যমে জলপথের উন্নতিবিধানের প্রয়াস চলিয়াছে। নদীতল হইতে পলিমাটি উদ্ধার, নদীতটে উপযুক্ত আভ্যন্তরিক বন্দর স্থাপন, টেলিফোন বা স্বয়ংক্রিয় সঙ্কেত-ব্যবস্থা স্থাপন করিয়া নৌ-চলাচলের সাহায্য করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। সমুদ্রপথে বহির্জগতের সহিত সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারেও আজ ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। ১৯৫৬ সালে সিন্ধিয়াদের হাত হইতে জাহাজী-বাণিজ্যের এক পূর্বাঞ্চলীয় সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। সোভিয়েট, পোলাণ্ড ইত্যাদি নানাদেশের সহিত মালবহন ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। নিকট-প্রাচ্য ও দূর-প্রাচ্য দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতীয় জাহাজের মালবহনক্ষমতা ১৯৪৭ সালে ২০ লক্ষ টন করিতে ভারত বদ্ধপরিকর ছিল। সে-কারণে জাহাজ নিমাণ ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হইয়াছিল। আজ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে ভারতীয় জাহাজসমূহের মালবহন ক্ষমতা দাঁড়াইয়াছে ৪ লক্ষ ২০ হাজার টন। তৈলবাহী জাহাজ নির্মাণেও ভারত অগ্রণী হইয়াছে।

সর্বশেষে আমরা বিমান-পরিবহণের বিষয় আলোচনা করিব। বৎসরের অধিকাংশ সময় ভারতবর্ষের আকাশ থাকে পরিষ্কার। এশিয়ার প্রায় মধ্যস্থলে ইহার অবস্থান,

বিমান-বন্দর নির্মাণের উপযোগী প্রচুর প্রশস্ত ভূমি ভারতে বিদ্যমান এবং এই দেশটির আয়তনগত বিপুলতা—এইসব কারণ ভারত বিমান-পরিবহণের অনুকূল। তথাপি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব-পর্যন্ত ভারতে বিমান-পরিবহণের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। অবশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশরক্ষা ও পরিবহণ এই দুই প্রয়োজনে ভারত সরকার বিমান-শক্তি বর্ধনে সচেষ্ট হন। আজ বিমানপোতের সাহায্যে ডাক-চলাচল নিয়মিত হইয়াছে, যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। Indian Air Lines Corporation, Air India International ও Air Transport Council ভারতে বিমান-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য স্থাপিত তিনটি উল্লেখযোগ্য সংস্থা। নানাস্থানে নূতন বিমান-ঘাটি স্থাপন করিয়া ভারত ক্রমেই অগ্রগত হইতেছে।

৩৪
ভারতের শর্করা-শিল্প

বহুকাল ধরিয়াই ভারতে চিনির উৎপাদন হইতেছে। কিন্তু ভারতীয় জনজীবনে ইহা এখনও যথাযোগ্য স্থান পায় নাই। ক্রিয়া-কর্মে মধু অভাবে গুড়ের বিধান আজ পর্যন্ত বলবৎ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের জন্য ইহা জনসাধারণের নিকট বিলাসীর ভোগ্য বলিয়া পরিগণিত। অথচ ভারতের অর্থনীতিতে, বিশেষতঃ বিহার ও উত্তর প্রদেশের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে শর্করা শিল্পের স্থান নগণ্য নহে। ঐ রাজ্য দুইটিতেই এই শিল্প এতদিন কেন্দ্রীভূত ছিল। কলের সাহায্যে চিনির উৎপাদন শুরুও হয় ঐ রাজ্য দুইটিতে। ১৯৩২ সালে সংরক্ষণ পাইয়া এই শিল্পটি দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। ১৯৩১ সালে যেখানে ৩১টি কারখানায় ১,৫৮,০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইত সেখানে সংরক্ষণের চার বৎসরের মধ্যে ১৩৫টি কারখানায় ৯,১৯,০০০ টন চিনির উৎপাদন হইয়াছে। ফলত, ১৯৩৬-৩৭ সালের মধ্যেই ভারত চিনির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু শীঘ্রই শিল্পে অতি-উৎপাদনের সঙ্কট দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাইতে সমর্থ হইয়া শিল্পটি শীঘ্রই এই সঙ্কট কাটাইয়া উঠে। কিন্তু আভ্যন্তরিক বাজারে দেখা দেয় চিনির দুর্ভিক্ষ। ভোগ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার চিনি-শিল্পে মুনাফাবাজি রোধ করিবার প্রয়াস পান। ১৯৫২ সালে চিনি নিয়ন্ত্রণের আওতা হইতে বাহিরে আসে। তখন চিনির চাহিদাও বাড়িয়া যায়। বহুদিন পরে এই অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইবার জন্য বাহির হইতে চিনি আমদানিও করিতে হয়।

আসলে শর্করা-শিল্পের উঠানামা নির্ভর করে প্রধানতঃ—ইক্ষুর সরবরাহ, উৎপা

মাড়াইবার কালের দীর্ঘতা এবং উহা হইতে যে-পরিমাণ চিনি উদ্ধার করা যায় তাহার উপর। চিনি উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে ৫০% হইল ইক্ষুর জন্য। ইক্ষুর সহজ-লভ্যতার উপর এই শিল্পটি নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের দেশে একরপ্রতি ইক্ষুর উৎপাদনের হার অত্যন্ত কম। যেখানে একরপ্রতি মিশরে ৩০, জাপান ও ফরমোসায় ২৮, ফিলিপাইনে ২৭, জাভাতে ২৬ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০ টন উৎপন্ন হয় সেখানে আমাদের দেশে গত কুড়ি বৎসর ধরিয়া প্রতি একরে গড়ে ১৪ হইতে ১৫½ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে। এই হিসাব হইতে প্রতি একরে ৬২ টন ইক্ষু উৎপাদনকারী হাওয়াই দ্বীপের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। ভারতেরও কোন কোন অংশে যে প্রতি একরে ৩০ হইতে ৪০ টন উৎপন্ন হইতেছে না এমন নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐসব অঞ্চল দক্ষিণ ভারতে নিবদ্ধ, এবং উত্তর ভারতের শিল্পাঞ্চল হইতে অত্যন্ত দূরবর্তী। এদিকে ইক্ষু হইতে যে-পরিমাণ চিনি আহরণ করা হয় তাহার হারও ভারতে অত্যন্ত কম। অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ ইক্ষু হইতে ১২%-এর উপর চিনি উদ্ধার করা হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে মোটামুটি ভাবে ১০·৩১% চিনি উদ্ধৃত হইতেছে। চিনির মত মরসুমী শিল্প যদি গোড়াতেই এইরূপ প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হয় তবে উহার অগ্রগতি যে ব্যাহত হইবে এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। কার্যক্ষেত্রে হইয়াছেও তাই। যাহার জন্য সংরক্ষণের এই শিশুটি রক্ষাকবচ পরিয়াও বড়-সড় হইতে পারে নাই। বিদেশী প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করিবার শক্তি এখনও ইহা অর্জন করে নাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিনির উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয় নাই। ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে বাৎসরিক উৎপাদন ১৫ লক্ষ টনে গিয়া দাঁড়াইলে কাজ চলিবে এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া ঐ পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ১৯৫৪-৫৫ সালেই চিনির উৎপাদন হইয়াছে ১৩ লক্ষ টন। তখন পরিকল্পনার লক্ষ্য পরিবর্তিত করা হয়। চিনির উৎপাদনের লক্ষ্য নূতন করিয়া ধার্য হয় ১৮ লক্ষ টনে। এই উদ্দেশ্যে ৩৭টি নূতন কারখানার এবং ৪০টি বর্তমান কারখানার উৎপাদন-শক্তি বৃদ্ধির অনুমতি দান করা হয়। শিল্পনীতির সংশোধন অনুযায়ী ১৯৫৪ সালে একটি উন্নয়ন পরিষদও গঠিত হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য বাৎসরিক ২২·৫ লক্ষ টনে ধার্য হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ টন চিনির উৎপন্ন হইয়াছে। এইভাবে চিনি শিল্প পরিকল্পনার লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহার পিছনে দুইটি ভিন্নমুখী শক্তি কার্য করিয়াছে। প্রথমতঃ চাষীরা অধিক পরিমাণে ইক্ষুর চাষ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ

কিউবা হইতে আমেরিকায় চিনির রপ্তানি নিষিদ্ধ হওয়ায় আমেরিকার বাজার ভারতীয় শর্করা-শিল্পের নিকট উন্মুক্ত হয়। উৎপাদন বাড়িলে শুল্ক হইতে কিয়ৎ পরিমাণ অব্যাহতি দেওয়ার সরকারী নীতিও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছে। ফলে অনেক নূতন মিল স্থাপিত হইয়াছে এবং পুরাতন মিলগুলি সম্প্রসারিত হইয়াছে। অপরপক্ষে ইক্ষুর নিম্নতম দর বাড়াইয়া সরকার চাষীদেরও উৎসাহিত করিয়াছেন। আগে যেখানে ইক্ষুর মণ-করা দাম ছিল ১.৪৪ টাকা এখন সেখানে হইয়াছে ১.৬২ টাকা। কাজে কাজেই চাষীদের দৃষ্টি এই অর্থকরী ফসলটির উপর পড়িয়াছে। আবার গুড় তৈয়ারী করিয়া যথেষ্ট দাম পাওয়া যায় না বলিয়া চাষীরা মিলের নিকট অধিক পরিমাণে ইক্ষু বিক্রয় করিতেছে।

চিনির বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে ভারতীয় চিনি সিণ্ডিকেট। বিহার ও যুক্তপ্রদেশের রাজ্য সরকার আইন জারি করিয়া সকল মিলকে উক্ত সিণ্ডিকেটের সভ্য হইতে বাধ্য করে। চিনির দামকে ঊর্ধ্বমুখী রাখাই এই সিণ্ডিকেটের উদ্দেশ্য। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট দুইটি রাজ্য সরকার ইক্ষুর দাম উচ্চহারে বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছুক। এই টানা-পোড়েনে পড়িয়া ভারতে চিনির ব্যবহার বাড়িতে পারিতেছে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অনুযায়ী দেশের মধ্যে চিনির কাটতি হইতেছে না। রপ্তানির অপ্রত্যাশিত সুযোগ না পাওয়া গেলে এই শিল্প অতি-উৎপাদনের সঙ্কটের আবর্তে পড়িয়া যাইত। উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দাম ও চিনি-চালানের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তবুও চিনির আভ্যন্তরিক বাজারে কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এই সমস্ত কারণে ১৯৬১ সালের অক্টোবর মাসে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া প্রতিটি মিলের উৎপাদনের কোটা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬১-৬২ সালের জন্য যে-কোটা দেওয়া হইয়াছে তাহা পূর্ববর্তী বৎসরের ১০% কম। উৎপাদন বেশী হইলে বাজারে মন্দা আসিতে পারে আশঙ্কা করিয়া শিল্পটির উৎপাদন-শক্তির ১০% অব্যবহৃত রাখা হইতেছে। বেসরকারী এবং সরকারী এবং সমবায়ী ক্ষেত্রে নূতন মিল খোলার অনুমতি দানও স্থগিত রাখা হইয়াছে।

আভ্যন্তরিক বাজার উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা না করিয়া শর্করা-শিল্পটিকে বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল করা হইতেছে। এইজন্য সরকার বিদেশে বাজার খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। আন্তর্জাতিক বাজারে চিনির যে-সংস্থা খবরদারি করে ভারত উহার সভ্য হইয়াছে। তাহার আশা, এইভাবে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২,২৫,০০০ টন চিনি রপ্তানি করার সুযোগ পাইয়া আন্তর্জাতিক মূল্য হার অপেক্ষা ৫০% বেশী উপার্জন করা যাইবে। অবশ্য আমাদের দেশে এমনিতেই আন্তর্জাতিক মূল্যহারের তুলনায় চিনির দাম বেশী। ফলে বহির্বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে গেলে এই শিল্পটিকে

যথাসম্ভব উচ্চহারে আভ্যন্তরিক বাজার লুণ্ঠন করিতে হইবে। যুগজীর্ণ যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা শক্তি হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন-মূল্য এখানে সর্বদাই বেশী থাকিয়া যাইবে। এজন্য ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থে শিল্পটির আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাঞ্চলের স্থানান্তরীকরণের উপযোগিতা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি শিল্প কাঠামোতে কোন রদবদল না করা হয় তবে এই শিল্পটি কখনও আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না। দেশের লোক চিনি পাইবে না অথচ শিল্পে অতি-উৎপাদনের সঙ্কট বিদ্যমান থাকিবে—ইহা পরিকল্পিত অর্থনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের নহে।

৩৫

ভারতের পাটশিল্প

ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এককালে যে-পাট ভারতের শুচিতা-বিধান এবং বিলাসীর অঙ্গশোভা বর্ধন করিত আজ তাহা দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিয়া বৈষয়িক জগতেও কৌলিন্য অর্জন করিয়াছে। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পাটের ভূমিকা তাৎপর্যমণ্ডিত। আবার ভারতীয় শ্রম ও ইউরোপীয় মূলধনের সমন্বয় ঘটাইয়া এই শিল্পটি কোন প্রকার রক্ষাকবচের আশ্রয় না লইয়া সহজেই সংগঠিত হইয়াছে। রিষড়াতে জর্জ অকল্যাণ্ড যাহার সূত্রপাত করেন অচিরেই তাহা ভাগীরথীর দুই তীর ছাইয়া কলিকাতার বন্দর ও বাংলাদেশের দূরবর্তী প্রান্তরকেও কর্মচঞ্চল করিয়া তোলে। প্রধানতঃ ইউরোপীয় মূলধন ও পরিচালনায় ইহার দ্রুত প্রসার ঘটে। আজ এই শিল্পে প্রায় নব্বই কোটি টাকা খাটিতেছে। সাড়ে তিন লক্ষাধিক শ্রমিক এই শিল্পে কাজ করিতেছে। পশ্চিম বাংলায় শিল্পটি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সারা ভারতের ১১২টি পাটকলের মধ্যে ১০১টিই এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এই সমস্ত কলের ৭৫% মাত্র বারটি ম্যানেজিং এজেন্সীর এক্তিয়ারে রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই শিল্পের মালিক-সমিতি ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মালিক-সংগঠন। শিল্পটির গতি ও প্রকৃতি বুঝিতে হইলে এই তথ্যগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে।

অবিভক্ত ভারতে পাট ছিল দেশের একচেটিয়া সম্পদ। দেশবিভাগের অভিশাপ ভারতীয় অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতিসাধন করিয়াছে। ফলে পাটশিল্পের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নানাবিধ সমস্যার চাপে ইহার অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যে-শিল্পের সমস্যা ছিল মাত্র দুইটি—অধিক উৎপাদনের ক্ষমতা এবং বিকল্প দ্রব্যের প্রতিযোগিতা, আজ তাহা পুরাতনের জের টানিয়াও কূল পাইতেছে

না। কাঁচামাল সরবরাহের সমস্যার সহিত দেখা দিয়াছে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা। পাটের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র আজ পাকিস্তান। বিভিন্ন দেশেও আধুনিক যন্ত্রপাতি-সমৃদ্ধ পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ফলে অসপত্ন অধিকার হারাইয়া ভারতের এই সু-সংগঠিত শিল্পটির পাটে উঠিবার উপক্রম হইয়াছে।

সমস্যার গভীরে গেলে দেখা যাইবে, চাহিদার তুলনায় শিল্পটির উৎপাদন-ক্ষমতা অধিক হওয়াতেই যত গণ্ডগোল দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় ভারতীয় পাটকল মালিক-সমিতি দাম পড়িয়া যাইবার ভয়ে খুবই শঙ্কিত হইয়া পড়েন। শেষ পর্যন্ত কাজের সময় কমাইয়া এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক তাঁত বন্ধ রাখিয়া তাঁহারা সঙ্কট কাটাইয়া উঠিবার প্রয়াস পান। এদিকে চটের থলির কদর কমিয়া যাইতেছে। দামে সস্তা এবং বহু ব্যবহারের উপযোগী হইলেও তাহার পক্ষে কাপড়ের ও কাগজের থলির সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায় হইয়া উঠিয়াছে। আবার একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ মালপত্র আদান-প্রদান চলায় উহার উপযোগিতাও কমিয়া যাইতেছে। ইহার উপর যোগ দিয়াছে কাঁচামাল সরবরাহের অপ্রতুলতা। উৎপাদন-ক্ষমতার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করিলে বৎসরে প্রায় ৭৫ লক্ষ বেল কাঁচা পাটের প্রয়োজন। সেখানে ভারতে ৪০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ১৯৬০-৬১ সালে ৫০ লক্ষ বেল উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল। কিন্তু সে লক্ষ্য পূরণ হয় নাই। একমাত্র ভরসা পাকিস্তান হইতে কাঁচামালের আমদানি। কিন্তু উহার উপর নির্ভর করিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। এইজন্য তৃতীয় পরিকল্পনা-কালে পাটের উৎপাদনের লক্ষ্য উচ্চেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। এখন পরিকল্পনার সাফল্যের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। এদিকে আবার পাকিস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রেজিল, ফিলিপাইন এবং জাপান প্রভৃতি দেশে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ পাটশিল্প দেখা দিয়াছে। তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি সস্তায় বিকাইতে পারে বলিয়া ভারতীয় পাটশিল্প নিদারুণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়াছে। পাট অনুসন্ধানী কমিশন তাই ভারতীয় পাট-শিল্পের আধুনিকীকরণের উপর জোর দিয়াছেন।

অন্যদিকে, এই শিল্পের সঙ্গে অসংখ্য পাট-চাষীর ভাগ্য বিজড়িত থাকায় সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। মিল-মালিকরা বলিতেছেন, কাঁচা পাটের দাম খুব বেশী। পক্ষান্তরে চাষীদের তরফ হইতে বলা হইতেছে, দালাল শ্রেণীর লোকেরাই ফাটকা বাজি করিয়া দাম বাড়াইতেছে। বর্ধিত মূল্য চাষীদের ভোগে আসিতেছে না। বাজারে ৫৫।৬০৲ মণ দরে পাট বিক্রয় হয়। কিন্তু মালিক-সমিতির মতে মণ-করা ৩০।৩২৲ টাকাই ন্যায্য দর। ফলে যে অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে তাহাতে পাটশিল্পের উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে। উপরন্তু দাম চড়া থাকায় পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার

পাশাপাশি বিকল্প দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার, কিছু তাঁত অলস থাকায় শিল্প-শ্রমিককেও বাধ্যতামূলক বেকারি বরণ করিতে হইতেছে। সকল কিছু মিলিয়া দেশের অর্থনীতির উপর তীব্র আঘাত পড়িয়াছে। শিল্প-মালিকেরা কম দরে পাট কিনিতে বদ্ধপরিকর হইয়া পাটের চাষে সঙ্কট ডাকিয়া আনিয়া পরিত্রাণের পথ খুঁজিতেছেন।

পাটশিল্পের সঙ্কট কাটাইবার জন্য সকলে আধুনিকীকরণের উপর জোর দিয়াছেন। যে-শিল্প মূলতঃ রপ্তানির উপর নির্ভরশীল, আভ্যন্তরিক বাজার নগণ্য তাহার পক্ষে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত হওয়া ভিন্ন তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য যত শীঘ্র আধুনিকীকরণ হয় ততই শুধু শিল্পের পক্ষেই নহে, দেশের পক্ষেও মঙ্গল। প্রধান প্রধান পাটকলগুলি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নিজেদের জোরেই আধুনিকীকরণের কর্মসূচী অনুসরণ করিতেছিল। তাহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১৯৫৫ সালে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন সাহায্যের আশ্বাস লইয়া আগাইয়া আসে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত উক্ত কর্পোরেশন ২২টি পাটকলকে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার জন্য ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মত ধার দিয়াছে। অন্যদিকে যন্ত্রপতি ক্রয় করিবার জন্যও পাটকলকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত স্বল্প মেয়াদী ধারের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ১৯৫৪ সালে যে পাট অনুসন্ধানী কমিশন বসে তাহার সুপারিশ অনুযায়ী কয়েকটি কার্যপন্থা অবলম্বনও করা হইয়াছে। নূতন কল বসাইবার অনুমতি সাধারণভাবে আর দেওয়া হইতেছে না, বর্তমান ক্ষমতার যাহাতে পূর্ণ ব্যবহার হয় সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা হইতেছে। উৎপাদনের মানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সঙ্গে চাষের ক্ষেত্রে প্রগাঢ় কৃষিকর্মের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ধার্য হইতেছে।

পাট চাষ এবং অন্যান্য অনেক আনুষঙ্গিক ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল বলিয়া এই শিল্পটির গতিবেগ কখনও সুষম হইতেছে না। কখনও সমৃদ্ধির কখনও বা মন্দগতির মধ্য দিয়া শিল্পটিকে অগ্রসর হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সাড়া পড়িয়া যাওয়ায় এবং আভ্যন্তরিক বাজার উন্নত হওয়ায় ও চাষের ফলন ভাল হওয়াতে ১৯৫৯ সালে শিল্পটির কাজকর্ম ভালই চলিয়া ছিল। বয়ন বিভাগে আধুনিকীকরণের কাজও বেশ চলিতেছিল। শিল্পটির মুনাফাও প্রচুর হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৬০ সালেই চাকা ঘুরিয়া গেল। ফাটকাবাজদের কার্যকলাপে দামও বাড়িয়া গেল। ফাটকাবাজির কবল হইতে শিল্পটিকে উদ্ধার করিবার জন্য সরকার অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিক-সংখ্যক তাঁত বন্ধ রাখিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হইল। এইরূপ অনিশ্চিত উত্থান-পতন শিল্পটির ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে।

ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে একদিকে আভ্যন্তরিক বাজার গড়িয়া তুলিবার জন্য সামগ্রিক প্রয়াসের প্রয়োজন। ইহার জন্য উপযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। অপরদিকে রপ্তানির ক্ষেত্রে পুরাতন বাজারের উপর নির্ভর না করিয়া নূতন নূতন দেশে বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩৬
ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

একলালের নীতিবাগীশ কবিরা সোনার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন। লোহার কালিমাই তাঁহাদের নিকট ছিল অবাঞ্ছিত। সোনার চোখ ধাঁধাঁনো রূপ তাঁহাদের মনে মোহের সঞ্চার করিত। লোহা অলঙ্কার হইয়া নারীদেহকে ঘিরিতে পারিত না। তাই লোহা তাঁহাদের মানসলোক হইতে নির্বাসিত ছিল। কিন্তু সেদিন আর নাই। আধুনিক জনমানস সংস্কৃতির যে বহুবর্ণ ফুলের ন্যায় শোভা পাইতেছে তাহার ভিত্তিভূমি লোহা ও ইস্পাতে মোড়া। আধুনিক যুগ লোহা ও ইস্পাতের সুবর্ণ যুগ। মৃত্তিকার গর্ভে যেদিন মানুষ লোহার সন্ধান পাইয়াছিল সেদিন হইতে তাহার বিজয় অভিযান শুরু হইল। আজ লোহা মানুষের শুধু হাতিয়ারই নয়, যানবাহনের কিংবা প্রয়োজন সাধনের প্রধান অঙ্গ নয়, এমনকি তাহার ঐশ্বর্যেরও পরিমাপক মাত্র নয়। ইহা তাহার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে তাহার সামগ্রিক জীবন-বিচার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহার কোন প্রকার মূল্যায়ণই সম্ভব নয়।

তাই আজ আজিকার পৃথিবীতে সেই দেশের স্থানই উচ্চে যে-দেশ লৌহ ও ইস্পাতে সমৃদ্ধ। ক্রমোন্নতির পথে ভারত যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করিয়াছে উহাতে শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য সকলের দৃষ্টি লোহার দিকে পড়িয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এদিক দিয়া ভারতকে একেবারে শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করিতে হইতেছে না। পরাধীনতার অভিশপ্ত যুগেও ভারতের উদ্যোগী শিল্পপতিগণ লৌহ ও ইস্পাতকে একেবারে উপেক্ষা করেন নাই। ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সত্যকারের সূত্রপাত হয় টাটা লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হইতে। ১৯০৭ সালে বিহারের সাকৃচীতে প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়। একে একে ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানি এবং মহীশূর রাষ্ট্রীয় লৌহ কারখানার কাজ শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীতেও বরাকর লৌহ কারখানা, বঙ্গীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মহাযুদ্ধের দামামাধ্বনির মধ্যেই ইহার জয়যাত্রা ঘোষিত হয়। ঐ সময় এই শিল্প প্রচুর মুনাফাও

লুটিতে থাকে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় ইহার শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হয়। ফলে ১৯২৪ সালে সংরক্ষণের রক্ষাকবচে আবৃত হইয়া ইহাকে অগ্রসর হইতে হয়। ১৯২২-২৩ সালে ইহার উৎপাদন ছিল মাত্র ১,৩১,০০০ টন। ধাপে ধাপে উৎপাদন বাড়াইয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার অব্যবহিত পূর্বে ১৯৩৯-৪০ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,৭০০০০ টনে। যুদ্ধের বাজারে এই শিল্পের দ্রুত ভাগ্যোন্নতি ঘটে। ইহাতে নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। নূতন দ্রব্যেরও উৎপাদন সুরু হয়। শ্রমিকরা নূতন নূতন প্রয়োগ-বিদ্যায় কুশলী হইয়া উঠে। এই সকল কারণে ১৯৪৭ সালে আর এই শিল্পটি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। নিজের শক্তিতেই ইহা এখন যে-কোন বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখোমুখী দাঁড়াইতে পারে।

১৯৫৩ সালে যন্ত্রশিল্পের একটি হিসাব লওয়া হয়। উহাতে দেখা যায় যে, ভারতে ছোট বড় ১২২টি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে। গুরুত্বে ও কার্যকারিতায় উহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত তিনটিই প্রধান। কিন্তু গোটা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এই শিল্পের সম্মিলিত উৎপাদন এখনও যথেষ্ট নহে। ইকাফের হিসাবে ভারতের মাথাপিছু লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহার হইল বৎসরে ৮ পাউণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রে উহার পরিমাণ ৮৬০ পাউণ্ড, ইংলণ্ডে ২৫০ পাউণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ায় ৪৭০ পাউণ্ড। লৌহ ও ইস্পাতই আধুনিক সভ্যতার মানদণ্ড। উহার বিচারে আমরা আজ কোথায় আছি! আমাদের এই অনগ্রসরতা দূর করিবার জন্য স্বাধীন দেশের কল্যাণকামী সরকার অবহিত হইলেন। তাঁহারা ঠিক করিলেন বর্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়াইয়া প্রকৃত উৎপাদন বাড়াইতে হইবে এবং সরকারী মালিকানায় নূতন নূতন কারখানার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ইস্পাতের উৎপাদন-ক্ষমতা ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে যাহাতে উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়। প্রথমোক্ত বৎসরের ১১,১৫,০০০ টন উৎপাদন বাড়িয়া যাহাতে পরিকল্পনার অন্তিম বৎসরে ১৭,৫০,০০০ টন হয় সেই অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে রাষ্ট্রের উদ্যোগে তিনটি কারখানা বসাইবার কাজ সুরু হয়। এই সকল কারখানা সম্পূর্ণ চালু হইলে একমাত্র সরকারী ক্ষেত্রেই বৎসরে ১২০ কোটি টাকার মত মাল উৎপন্ন হইবে। জার্মানীর কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কোম্পানির সহযোগিতায় উড়িষ্যার রাউরকেল্লায়, বৃটিশ আনুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে এবং রুশ সরকারের সাহায্যে মধ্যপ্রদেশের ভিলাইতে যে কারখানা তিনটি গড়িয়া উঠিয়াছে উহাতে ইস্পাত নির্মাণ-কার্য সুরু হইয়াছে। শিল্পক্ষেত্রে সরকার যতটা বিনিয়োগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহার কিঞ্চিদধিক ৩০% লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। ৪২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতাকে ৬০ লক্ষ টনে এবং

প্রকৃত উৎপাদনকে ৫০ লক্ষ টনে উন্নীত করিবার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনা চলা-কালে পাঁচ বৎসরে মোট উৎপাদন যাহাতে ৪'১১ কোটি টন হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরকারী ক্ষেত্রে সম্প্রতি বোকারোতে চতুর্থ ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বহু টালবাহানার পর আমেরিকা সাহায্য করিতে অরাজী হইয়াছে। সোভিয়েত রুশিয়া দরাজ হস্তে এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতীয় অর্থনীতির এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটি আজও সমস্যামুক্ত নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইস্পাতের জন্য ভারত এখনও পরমুখাপেক্ষী। বিদেশী ইস্পাতের তুলনায় ভারতীয় ইস্পাতের দাম অনেক কম। উভয় প্রকার দামের মধ্যে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে সরকার মূল্যরক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। উহার পাশাপাশি মূল্য-নিয়ন্ত্রণও চলিবে। ১৯৫৪ সালের ১লা জুলাই ইস্পাত-শিল্পের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়। সংশোধিত আকারে উহা আজিও বিদ্যমান। টাটা এবং ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা সরকার নির্ধারিত রক্ষা-মূল্যে ইস্পাতের যোগান দেয়। পণ্যব্যবহারকারীর নিকট যে-দরে উহা বিক্রয় হয় তাহার হার 'রক্ষা-মূল্য' অপেক্ষা অনেক অধিক। এইভাবে যে-বাড়তি টাকা পাওয়া যায় উহাকে শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং বিদেশী ইস্পাত-মূল্যের সহায়কের কাজে লাগানো হয়। শুল্ক কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ রক্ষা-মূল্যের হার টন প্রতি ৩৯৩ টাকা ধার্য হয়। বর্তমানে উপজ শুল্ক লইয়া উহার হার হইয়াছে টন প্রতি ৪৭০ টাকা। এইরূপ বর্ধিত মূল্যের জন্য টাটা ও ভারতীয় লৌহ এবং ইস্পাত কারখানা যে অতিরিক্ত লাভের মুখ দেখিবে সরকারের বিনা অনুমতিতে উহার যেমতেন ব্যবহার চলিবে না। সরকারের সহিত চুক্তি অনুযায়ী ঐ বাড়তি টাকা দিয়া শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করিতে হইবে। এইখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৫২ সাল হইতে ইস্পাতের দাম ক্রমাগতভাবে বাড়িয়াই চলিয়াছে। সমস্যার আরও একটি দিক আছে। উহা হইল ধাতুশিল্পে ব্যবহারোপযোগী কয়লার অপচয়। বৎসরে যেখানে প্রায় ১ কোটি টন ঐ-জাতীয় কয়লা উত্তোলিত হয় সেখানে ইস্পাত-শিল্পে মাত্র ৫০ লক্ষ টনের ব্যবহার হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যেভাবে ইস্পাত-শিল্পের সম্প্রসারণ হইতেছে তাহাতে এই অপচয় রোধ করা একান্ত দরকার। সুখের বিষয়, এদিকেও সকলের নজর পড়িয়াছে। অবশ্য ক্রমোন্নতির পথ কখনই কুসুমাস্তীর্ণ নহে—। সমস্যা থাকিবেই, উহার—। সমাধানও করিতে হইবে। কিন্তু সকল কিছু বলা হইলেও শিল্পের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণের কথা না বলিলেই নয়। উহা হইতেছে শিল্পের নিযুক্ত শ্রমিক। শ্রমিকশ্রেণী অসন্তুষ্ট থাকিলে বা সংক্ষুব্ধ হইলে যে শিল্পের প্রগতি অব্যাহত থাকে না উহা জামশেদপুর এবং বার্ণপুরের শ্রমিক-ধর্মঘটে প্রমাণিত হইয়াছে। তাই, কল্যাণ-

কামী রাষ্ট্রে তাহারা যাহাতে যথোচিত মর্যাদা পায়, জাতির গঠন কার্যে তাহারাও যাহাতে অনুপ্রেরিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দারিদ্র্য অশিক্ষা ও কুসংস্কার যে ঘুণ ধরাইয়াছে উহাকে অপসারিত করিতে হইলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের গুরুত্বের পরিমাপ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক মানদণ্ডে করিলেই চলিবে-না উহার সহিত প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রয়োজন।

৩৭
ভারতের চা-শিল্প

এককালে বাড়িতে অতিথি-অভ্যাগত কেহ আসিলে পান-তামাক দিলেই তাহার আপ্যায়ন সমাধা হইত। আজকাল কিন্তু এক পেয়ালা চা না হইলে আপ্যায়নে কোথায় যেন ত্রুটি থাকিয়া যায়। সভ্যতায় ভদ্রতা রক্ষার এই পানীয়টির আবেদন বিশ্বজনীন। বিদেশী মনীষীরা ইহার গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ। যাহা নেশাগ্রস্ত করে না অথচ মনকে প্রফুল্ল করে তাহার তুলনা কোথায়? ভারতীয় কবিও চা-পিয়াসীদের চঞ্চলতার কথা স্মরণ করিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। চায়ের কদর কিন্তু আমাদের সমাজ-জীবনের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ নহে, আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনে চা-ই ভারতের মুখ রক্ষা করিয়া থাকে। এই ব্যাপারে পাট-শিল্পের উপরেও ইহার স্থান। ১৯৫৭-৫৮ সালে যেখানে পাট-শিল্প ২৩৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিয়াছিল সেখানে চা-শিল্পের উপার্জনের পরিমাণ হইল ২৪৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। হিসাবের খাতাই সুনিশ্চিত ভাবে চা-শিল্পের গুরুত্ব প্রকাশ করিতেছে।

অথচ এই শিল্পটির ভাগ্য নির্ভর করে খেয়ালী আবহাওয়া এবং বিদেশের বাজারের উপর। লণ্ডনের নীলাম-বাজারের সঙ্গে ইহার নাড়ীর যোগ। কলিকাতা এবং কোচিনের বাজার এখনও যথেষ্ট সঞ্জীবনী শক্তির অধিকারী হয় নাই। এইজন্য চায়ের মূল্য নিরূপণে এখনও লণ্ডনেরই একাধিপত্য। লণ্ডনের বাজারে আর যাহাই হউক ভারতীয় উৎপাদক এবং ব্যবহারকের গুরুত্ব একেবারেই গ্রাহ্য করা হয় না। এদিকে আমাদের দেশে চায়ের উৎপাদন-মূল্যও অত্যধিক। এই শিল্পের উপযোগী যন্ত্রপাতির দাম চড়িয়া গিয়াছে। শ্রমিককে অবাধ শোষণ ও বঞ্চনার নীতিও ক্রমে ক্রমে পরিত্যক্ত হইতেছে। প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের দামও ইদানিং অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। এই সকল অজুহাতে শিল্পমালিকেরা চায়ের বিক্রয়-মূল্য অত্যন্ত উচ্চহারে বাঁধিতে চাহেন। আবার রপ্তানি শুল্কের দরুন বৈদেশিক বাজারেও ভারতীয় চায়ের দাম বেশী।

ফলে ভারতীয় চা-কে সিংহল, ইন্দোনেশিয়া এবং জাপানের চায়ের সঙ্গে কঠোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে।

এইভাবে 'চা-শিল্পেও সঙ্কট দেখা দিতেছে। অত্যন্ত সাধারণ এবং নিম্নমানের চায়ের অত্যধিক উৎপাদন এই সঙ্কটকে ঘনীভূত করিয়াছে। আমাদের দেশের জমি এবং আবহাওয়াই এই সমস্ত নিকৃষ্ট চায়ের উৎপাদনের জন্য দায়ী। এদিকে আবার পূর্ব আফ্রিকা, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়ায় নিম্ন পর্যায়ের চায়েয় সঙ্গে ইহা প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ফলে, কি ঘরে, কি বাহিরে সর্বত্রই ভারতীয় চা-শিল্প মার খাইতেছে। উচ্চমূল্য এবং শুল্কাদির জন্য আভ্যন্তরিক বাজার সম্প্রসারিত হইতেছে না। যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বীর অভ্যাগমে বিদেশেও ইহা ঠাঁই পাইতেছে না। অনেকেই অভ্যাসের ঘোর কাটাইয়া বিকল্প পানীয়ের সন্ধান করিতেছে। এমতবস্থায় সকলের দৃষ্টি এখন স্বর্ণপ্রসূ এই শিল্পটির দিকে পড়িয়াছে।

সরকার বাগিচা শিল্পের সমস্যা অনুসন্ধান করিবার জন্য ১৯৫৬ সালে একটি কমিশন বসান। ঐ কমিশন ভারতীয় মালিকানায় পরিচালিত চা-শিল্প হইতে 'ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা তুলিয়া দিবার সুপারিশ করেন। সংরক্ষিত তহবিল হইতে টাকা তুলিয়া দিবার সুপারিশ করেন। সংরক্ষিত তহবিল হইতে টাকা তুলিয়া ডিভিডেণ্ড দিবার প্রথাও তাঁহারা তুলিয়া দিতে বলেন। পশ্চিম বাংলা ও আসাম সরকার এই শিল্পের উপর যে-সমস্ত কর-ভার আরোপ করিয়াছেন তাঁহাদের মতে সেগুলি হইতে শিল্পটিকে অব্যাহতি দেওয়া দরকার। শিল্পটিতে ভারতীয়করণ এবং বেতন-বৈষম্য দূরীকরণের দিকেও তাঁহারা জোর দেন। কিন্তু সরকার তাহাদের অধিকাংশ সুপারিশই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দাম যাহাতে খুব বেশী চড়িয়া না যায় এইজন্য তাঁহারা এইটুকুই মানিয়া লইয়াছেন যে, চা-বোর্ড খুচরা চায়ের দামের কাঠামো সম্পর্কে মাঝে মাঝে খোঁজখবর লইবে। ছোট ছোট বাগিচার অসুবিধা সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালাইবার গুরুত্বও তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন।

চায়ের চড়ামূল্য সম্পর্কে শিল্প-মালিকেরা অবহিত হইয়াছেন। লণ্ডন, কলিকাতা এবং কোচিনের নীলাম বাজারে ভারতীয় চায়ের দরের গড় কষিয়া ইহার মূল্য নির্ধারণ করার উপযোগিতার কথা তাঁহারা বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন। চা-শিল্পকে বাঁচাইতে হইলে একদিকে যেমন চায়ের ন্যায্য-মূল্য স্থির করিতে হইবে অপর দিকে তেমনি ইহাকে লণ্ডনের নাগপাশ হইতেও মুক্ত করিতে হইবে। চা-নীলাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার সেইজন্য কি পরিমাণ চা নীলামের জন্য সরাসরি লণ্ডনে পাঠানো যাইতে পারে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে চায়ের বাজারে কলিকাতা ও কোচিন তাহাদের যথাযোগ্য স্থান পাইবে। রপ্তানি শুল্ক কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিয়া সরকার

শিল্পটিকে উৎসাহিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এখন তাঁহারা নিকৃষ্ট চায়ের জন্যও ভিন্ন হারে মাশুল ধার্য করিতেছেন। কিন্তু শিল্পটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এই ব্যবস্থাগুলিই যথেষ্ট নহে। গোড়ায় যদি গলদ থাকিয়া যায় তবে সংশোধন করিয়া কতদিন আর কাজ চালানো যায়। মাথাভারী পরিচালনা-ব্যবস্থা এবং উৎপাদনের সাবেকী পদ্ধতির সংস্কার সাধিত না হইলে ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না।

প্রসঙ্গক্রমে চা-শিল্পের হাল-আমলের কথা পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। ভারতীয় চা যাহাতে বিদেশের বাজারে ভালভাবে কাটিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা এবং আয়ারে চা পরিষদ কাজকর্ম সুরু করিয়াছেন। কিন্তু ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে যেভাবে চায়ের রপ্তানি বাণিজ্য সিংহলের প্রতিযোগিতার চাপে নামিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, প্রয়োজনের তুলনায় এখনও এদিকে যথেষ্ট কাজ হইতেছে না। ১৯৬০ সালে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য চায়ের উৎপাদন ভাল হয় নাই। কাজে কাজেই বহির্বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহাতে সরকার ও শিল্প-মালিক, উভয়েই সচকিত হইয়াছেন। রপ্তানি শুল্কের হার কমাইয়া যাহাতে চায়ের দাম প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইবার উপযোগী করা যায় সেইজন্য উৎপাদকের তরফ হইতে সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রচার কার্য তীব্রতর হওয়া প্রয়োজন বলিয়াও তাঁহারা মনে করেন। চায়ের বাজার সম্প্রসারিত করিবার জন্য বাজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাও দরকার।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৬৫ সালের মধ্যে চায়ের উৎপাদন এবং রপ্তানির লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে যথাক্রমে ৯০ কোটি এবং ৬১ কোটি পাউণ্ড। উৎপাদনের লক্ষ্যই উচ্চ হইলে চলিবে না, উৎপাদনের মানের দিকে অর্থাৎ উহার গুণগত উৎকর্ষের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে বাজার সম্প্রসারিত করিবার জন্য নিরন্তর প্রচার কার্য চালাইয়া যাইতে হইবে। সারা বিশ্বে যেভাবে চায়ের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে আন্তর্জাতিক চা-চুক্তির পুনরুজ্জীবনও দরকার। এই বিষয়ে প্রয়োজন হইলে ভারতকেই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চায়ের যে-স্থান উহা বিপর্যস্ত হইলে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় অর্থনীতিতেই সঙ্কট ঘনাইয়া আসিবে। তাই সরকারী শম্বুক নীতি পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

৩৮

ভারতের বস্ত্র-শিল্প

জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল মানুষের মনে সর্বপ্রথম যে অভাব-বোধের সৃষ্টি করে তাহা লজ্জা নিবারণের। সেই আদিমকাল হইতেই এইজন্য সে উপযুক্ত আচ্ছাদনের সন্ধান করিয়াছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া প্রয়োজনের বস্তুতে সৌন্দর্যের জাল বুনিয়া সে আধুনিক বেশভূষার প্রবর্তন করিয়াছে। ফলে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিপুল কলেবর বস্ত্র-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতেরও নিজস্ব একটি স্থান আছে। সাবেকী উৎপাদন-ব্যবস্থায় এককালে ভারতের বস্ত্রের চাহিদা ছিল সভ্য জগতের প্রায় সর্বত্র। প্রতিযোগিতার চাপে পিষ্ট হইলেও আজও তাঁহাতে ভাঁটা পড়ে নাই। তাই বস্ত্রশিল্পের মধ্য দিয়াই ভারতে যন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। ক্রমোন্নতির পথে ভারতের যে পরিকল্পিত অভিযান সুরু হইয়াছে তাহার ক্ষীণ সূত্রপাত হয় ১৮১৮ সালে কলিকাতায় প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার মধ্যে। কিন্তু যথার্থভাবে এই শিল্পের পত্তন হয় ১৮৫৪ সালে বোম্বাইতে। তারপর হইতে উত্থানপতনের বন্ধুর পথ বাহিয়া ইহার অগ্রগতির রথ ছুটিয়া চলিয়াছে। পরশাসনের নিষ্ক্রিয়তা ও বিরোধিতার বিষ-বাষ্পেও ইহার শ্বাসরোধ হয় নাই। ভারতীয় মূলধন ও পরিচালনা শক্তির পরাকাষ্ঠা ঘটিয়াছে এই শিল্পে।

তাই ভারতীয় শিল্পজগতে ইহার স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শিল্পে আজ প্রায় ১২২ কোটি টাকা খাটিতেছে। টাকার হিসাবে উহার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার শত কোটি টাকা। কিঞ্চিন্ন্যূণ নয় লক্ষ লোক এই শিল্পে নিযুক্ত। সারা পৃথিবীর মিলজাত বস্ত্রের প্রায় সপ্তমাংশ ভারতের দান। দেশ বিভাগের আঘাতও এই শিল্পের গতিবেগকে শ্লথ করিতে পারে নাই। ১৯৬২ সালে সংরক্ষণ লাভ করিয়া যে বিশেষ সুবিধার অধিকারী হইয়াছিল তাহার পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করিয়া ইহা আজ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। প্রাথমিক দুর্বলতার চিহ্ন এই সংরক্ষণের কবচে সে ১৯৪৭ সালেই অপসারিত করে। ক্রমবর্ধমান রপ্তানির ফলে ইহাতে প্রাচুর্যের জোয়ার বহিয়া যায়। বহির্বাণিজ্যের নানা বিধিনিষেধ কাটাইয়া, ১৯৫৯ সালে ভারত ৬১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার কাপড় রপ্তানি করিয়াছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই কাপড়ের মিল ছড়াইয়া আছে। তবে বস্ত্র-শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে বোম্বাই-আমেদাবাদ অঞ্চলে। আর উহা অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ীই হইয়াছে। কারণ দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণমৃত্তিকা তুলা চাষের বিশেষ উপযোগী। কাঁচামালের প্রাচুর্যের সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যোগী বণিক

ও কর্মকুশল শ্রমিকেরও অভাব ঐ অঞ্চলে নাই। তাই এককালে ঐ অঞ্চলকে ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার বলা হইত।

কিন্তু এই শিল্প আজ বয়োভারে প্রাচীন হইয়াছে। নানা সমস্যার চাপে ইহা ন্যুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। প্রায় ১২৫টি অযোগ্য মিল ইহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। কয়েকটি মিলের তো উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। অর্থনীতি-সম্মত পরিচালনার আশু ব্যবস্থা না করিলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য পূরণের আশা সুদূর পরাহত হইবে। আবার যুগজীর্ণ যন্ত্রপাতি আধুনিক উৎপাদন-পদ্ধতির সহিত তাল রাখিতে পারিতেছে না। ক্রমক্ষীয়মান উৎপাদন হার এই ভারতীয় শিল্পটিকে পশ্চাতের দিকে টানিতেছে। নূতন নূতন প্রয়োগবিদ্যা এবং যন্ত্রশক্তি তাহার প্রতিযোগীদের হাতে যে-অস্ত্র তুলিয়া দিয়াছে উহার আঘাত আর যেন আমরা কাটাইতে পারিতেছি না। গড়পড়তা খরচ বেশী পড়ায় সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। বিদেশী মুদ্রা অর্জনে উহার কার্যকারিতা খর্ব হইতেছে। আভ্যন্তরিক বাজারে হস্তচালিত তাঁত-শিল্পকে সুবিধাদানের নীতি গ্রহণ করিয়া ভারত সরকার মিলজাত বস্ত্রকে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারণে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যয়স্ফীতির জন্য উহা আর সম্ভব হইতেছে না। ১৯৫৯ সালে যেখানে ৮১'৫ কোটি গজ মিলজাত বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছিল ১৯৬০ সালে সেখানে বিদেশে কিঞ্চিদধিক ৭০ কোটি গজের কাটতি হইয়াছে। অন্যদিকে আবার নূতন নূতন প্রতিযোগীর আবির্ভাব হইতেছে। পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, স্পেন, চীন ও জাপান, এমন কি পাকিস্তানও প্রতিযোগিতার আসরে নামিয়া পড়িয়াছে। আমাদের মান্ধাতা আমলের যন্ত্রপাতি আর তাল সামলাইতে পারিতেছে না।

এমতাবস্থায় আমাদের পঞ্চবার্ষিক যোজনার উপর রীতিমত গুরুভার চাপিয়াছে। আভ্যন্তরিক বাজার হইতে দৃষ্টি না ফিরাইয়া উহাকে বহির্বাণিজ্য প্রসারের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাইতে হইবে। একদিকে দেশের লোকসংখ্যা বাড়িতেছে। অন্যদিকে নানাবিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলে ভোগের চাহিদাও বাড়িতেছে। অথচ কাপড়ের দাম অত্যধিক চড়িয়া যাওয়ায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বস্ত্রের ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। আগে যেখানে মাথাপিছু ১৬ গজ কাপড় ব্যবহৃত হইত আজ সেখানে মাত্র ১৫ গজের ব্যবহার হইতেছে। তৃতীয় যোজনার লক্ষ্য হইল যাহাতে ১৯৬৫-৬৬ সালে মাথাপিছু কাপড়ের ব্যবহার ১৭'২ গজে দাঁড়ায়। ২২৫ কোটি পাউণ্ড সূতা এবং ৫৮০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপাদন উহার অভীষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূর্ণ করিবার জন্য সকলেই অবহিত হইয়াছেন। বোম্বাই মিল মালিক সমিতি সমস্যার সমাধানকল্পে সরকারকে আগাইয়া আসিতে বলিয়াছেন। উৎকৃষ্ট তুলা আমদানির

ব্যবস্থা করিয়া, মিলের পূর্ণ উৎপাদন-ক্ষমতাকে কার্যকরী করিয়া, রপ্তানি বাড়াইবার জন্য যথোপযুক্ত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সরকারকে অগ্রসর হইতে হইবে। উপজ শুল্ক, মজুরি ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সমস্যা সমাধানেও তাহাদিগকে তৎপর হইতে হইবে। সর্বোপরি শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্য মুক্ত হস্তে সাহায্য করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তর মিশনও আধুনিকীকরণ করিয়া উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ১৯৫৪ সালে কানুনগো কমিটি রপ্তানির স্বার্থে এই শিল্পকে উন্নত করার প্রয়োনীয়তার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ১৯৫৮ সালে তুলাবস্ত্র অনুসন্ধান কমিটিও (যোশী কমিটি) এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শুল্কভার হ্রাস করিবার জন্য ঐ কমিটি সুপারিশ করেন। কিঞ্চিদধিক কুড়ি কোটি টাকার করভার হইতে রেহাই পাইলেও এই শিল্পের উপর এখনও যে-বোঝা চাপিয়া আছে তাহা কম নহে। জাতীয় স্বার্থে এবং শিল্পের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নূতন নূতন যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করিয়া আধুনিকীকরণের উপর তাঁহারা গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পরীক্ষামূলকভাবে কয়েক হাজার স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসাইবার সুপারিশও তাঁহারা করিয়াছেন। এই উৎপাদনের সবটাই রপ্তানি করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে সরকারও নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমতি দিয়াছেন। ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় মজুরী বোর্ড বস্ত্র-শিল্পের উপর জোর দিয়াছেন। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন সংস্থাও শিল্পপতি-গণকে ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১১·২৩ কোটি টাকা ঋণদান করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বস্ত্র-শিল্পে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত হইতেছে না। দেশে মূলধনের স্বল্পতা এবং বিদেশী মুদ্রার অভাব অনুভব করিয়া বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে সরকার কোনরূপ বলিষ্ঠ কার্যসূচী গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না।

আসলে সমস্যার মূল আমাদের জাতীয় জীবনের আরও গভীরে নিহিত। উন্নয়নের কার্যকলাপ একশ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর অর্থ দান করিলেও দেশের অধিকসংখ্যক লোকের দারিদ্র্য দূর করিতে সক্ষম হয় নাই। ভূমি-ব্যবস্থার চাপে দেশের কৃষককুল এখনও পর্যুদস্ত। ফলে আভ্যন্তরিক বাজার যথাপরিমাণে বাড়িতে পারিতেছে না। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার লোকের ক্রয়-ক্ষমতাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। এইজন্য দেশের ন্যূণতম চাহিদা মিটাইতে না পারিলেও এই শিল্পকে বাহিরে বাজার খুঁজিতে হইতেছে। সেখানেওসে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহার উৎপাদন-পদ্ধতির যুগোপযোগী রূপান্তর না হওয়ায় সে বিসদৃশ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। এদিকে শিল্পের নিযুক্ত শ্রমিকদের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মূলধন ও যন্ত্রপাতির সমস্যাকে প্রধান করিয়া দেখার ফলে সমস্যা সমাধানের সকল প্রচেষ্টা সুরুতেই পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। মানবিক উপাদান যতক্ষণ না তাহার যথাযোগ্য স্থান পাইতেছে ততক্ষণ শিল্পের সর্বাঙ্গীণ

সমৃদ্ধিসাধন কোন মতেই সম্ভব নহে। এই কথা স্মরণ রাখিয়া পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হইলেই লক্ষ্য পূর্ণ হইবে। ভারতের বস্ত্র-শিল্পও দেশের অর্থনীতিতে নূতন মর্যাদা লাভ করিবে।

৩৯

কলিকাতা বন্দর

অতীতকালের কলিকাতা ও উহার ঐতিহাসিক উন্নয়নের গল্পকথা আজ আর আমাদের আকর্ষণ করে না। কলিকাতা বন্দরের আশেপাশে প্রতি ইট কাঠে, বাঙালীর প্রতি নাড়িতে সেই ইতিহাস সজীব থাকিবে। কারণ কলিকাতা বন্দরই বাঙালীকে কৃষির মায়া কাটাইয়া বিদেশীর পণ্য ও ভাবধারার সহিত যুক্ত করিয়া আজিকার অভিমানী মধ্যবিত্তে পরিণত করিয়াছে। আমরা বর্তমান কলিকাতা বন্দরের কথাই বলিব।

পূর্ব ভারতের শিল্পব্যবসায় প্রসার করিতে কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব মোটেই কম নয়। ভারতের মোট আমদানি-পণ্যের শতকরা ২৫ ভাগ এবং রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৪০ ভাগের বেশি এই বন্দরের মধ্য দিয়া আদান প্রদান করা হয়।

১৯৬১-৬২ সালে কলিকাতার শুল্কাঞ্চলে আমদানি কর আয় হয় ৫৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, রপ্তানি শুল্ক হইতে ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, এবং আবগারি হইতে ৭৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। ভারতের বন্দরগুলিতে বৎসরে ১০,০০০টি জাহাজ ভিড়িলে উহার মধ্যে ২০০০-এর বেশি কলিকাতার ঘাটে পৌঁছিবে। কলিকাতা হইতে কেবল চা ও পাট রপ্তানি হয় পাঁচশত কোটি টাকার অধিক। বৈদেশিক মুদ্রার বেশির ভাগ আমদানি করে কলিকাতাই। কলিকাতা বন্দর তাহার পার্শ্ববর্তী সমগ্র অঞ্চলের ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান ভরসাস্থল। ঐ সকল অঞ্চলের শিল্প ব্যবসায়ের উপরও কলিকাতা বন্দরটি নির্ভরশীল। কিন্তু পাট-শিল্প ভিন্ন কলিকাতা নগরের অন্যান্য শিল্পগুলি কলিকাতা বন্দরের সহিত প্রত্যক্ষভাবে ততটা যুক্ত নহে। ইহার তাৎপর্য এই যে কলিকাতা বন্দরের উন্নয়ন মানে কোনো বিশেষ শিল্পের বিকাশ নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতের বৈষয়িক কর্ম ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারের সাথে জড়িত। কলিকাতা বন্দরের উন্নতি না করিলে বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলের আর্থিক ব্যবস্থা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িবে।*

ইদানীং কালে কয়েক বৎসর যাবৎ পলি জমিয়া হুগলী নদীর গভীরতা নষ্ট হওয়ায় কলিকাতা বন্দরের কাজকর্ম ব্যাহত হইতেছে। নদীটিকে পরিষ্কার ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও স্থায়ী কোনো সমাধান করা যায় নাই, কেবলমাত্র উত্তরোত্তর অবনতিকে রোধ করা হইয়াছে।

হুগলী নদীতে ক্রমে পলিমাটি জমিয়া উঠায় কলিকাতা বন্দরের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ঐ বন্দর দিয়া যে জাহাজ প্রবেশ করে বা বিদেশে যায় তাহার বোঝা কিছু লাঘব করার জন্য এবং খাদ্যশস্য, কয়লা ও খনিজ ধাতু আদান-প্রদানের নিমিত্ত কলিকাতার দক্ষিণে হলদিয়ায় একটি উপবন্দর স্থাপন করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কলিকাতা বন্দরে এখন যে সব সুযোগ সুবিধা আছে, পরিপূরক বন্দর নির্মাণ করিলে তাহাদের সম্প্রসারণ সম্ভব হইবে। কালক্রমে হলদিয়ায় শিল্পোন্নয়নের একটি দৃঢ় ভিত্তি রচনা করা যাইবে যাহাতে নূতন কর্মপ্রার্থীদের কলিকাতার পরিবর্তে ঐ অঞ্চলে কাজের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। ইহার দ্বারা কলিকাতার উপর চাপ লাঘব করা যাইবে। বৃহত্তর কলিকাতায় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাই হলদিয়ার উন্নয়নের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার মধ্যেই যাহাতে হলদিয়া বন্দর অন্তত আংশিকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য ১৯৬০ সালে বিশ্ব ব্যাঙ্ক যে সুপারিশ করিয়াছিল তাহা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

পলিমাটি দ্বারা হুগলী-বক্ষ বুঁজিয়া যাওয়ায় ইহা কলিকাতা বন্দরের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি ঘটাইতেছে। কারণ এই বাবদ বাড়তি ব্যয়ের হিসাব মোটামুটি এইরূপ: (১) নদী ব্যবহার্য রাখার জন্য ব্যয়; (২) বন্দরের পণ্য আদান-প্রদানের জন্য সংখ্যায় বেশী জাহাজের দরুণ ব্যয়; (৩) জোয়ারের আশায় জাহাজগুলির অধিকতর সময় অপেক্ষা করিতে হয়। (৪) বোঝা হালকা করিবার জন্য অনেক জায়গায় জাহাজগুলিকে থামিতে হয়; (৫) নির্ধারিত কর্মসূচী পালন করিতে না পারা, অন্যান্য বন্দরে পণ্য না পাওয়া অথবা কলিকাতায় অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো কারণে দেরী-হওয়া; (৬) দ্রব্য আদানপ্রদানের ব্যয় বৃদ্ধি জনিত রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাণিজ্যের হ্রাস।

১৯৫৫ হইতে ১৯৬১ সালের ভিতর প্রতি বৎসর প্রায় দুই ফুট করিয়া নদীর নাব্যতা কমিয়া গিয়াছে। নাব্যতা যদি এক ইঞ্চি হ্রাস পায় তাহা হইলেই জাহাজকে ৫০ হইতে ৬০ টন বোঝা কমাইতে হয়। ১৯৫০ সাল হইতে হুগলীর অবনতির ফলে ঐ নদীতে জাহাজের মাল বহনের পূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই।

নদীর পলি পরিষ্কার করিবার বাৎসরিক ব্যয় ১৯৪৪-৪৫ সালে ৫৩ লক্ষ হইতে বাড়িয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৮৮ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে। জিনিসপত্রের সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি ব্যতীত ঐ ৩৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য নদীর অবনতিকে দায়ী করা চলে।

নদী ব্যবহারের জন্য যে কর বা মূল্য আদায় করা হয় তাহা ঐ সময়ের মধ্যে ২৪০

লক্ষ হইতে বাড়িয়া ৩৫১ লক্ষ হইয়াছে অর্থাৎ ১১২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হুগলীর নাব্যতা বজায় রাখার জন্ত ও তার উন্নতির জন্ত এই টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ৩৫ লক্ষ সরাসরিভাবে নদীর পলি পরিষ্কার করিবার কাজে লাগিয়াছে। বাকী ৭৭ লক্ষ টাকার কিছু অংশ পারোক্ষভাবে এই কাজে লাগিয়াছে।

যে সকল পণ্য কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানি হয় ইহার মধ্যে কয়লা প্রধান। ১৯৬০-৬১ সালে ১৪ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানি করা হয়। ভবিষ্যতে ২০ লক্ষ টন কয়লা কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে ভারতের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে পাঠাইবার প্রস্তাব হইয়াছে।

১৯৫৬-৫৭ সালে কলিকাতা হইতে ২০ লক্ষ টন কয়লা পাঠাইবার জন্য মোট ৩২৫ বার জাহাজ ছাড়ে। ঐ বৎসরের পরে নদীর অবনতির জন্য প্রতিটি জাহাজের মাল বহনের ক্ষমতা যদি শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া থাকে তাহা হইলে একই পরিমাণ কয়লা প্রেরণ করিতে সবশুদ্ধ ৩০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। বন্দরে আসিয়া একবার ঘুরিয়া যাইবার সময় যদি কমাইয়া ১৫ দিন হইতে ৭½ দিন করা যায় তবুও প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার মত অতিরিক্ত ব্যয় হইবে।

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে পাট ও চা, আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে যন্ত্রপাতি ও রাসয়নিক দ্রব্য। ১৯৫৭-৫৮ সালে কলিকাতা বন্দরে, ৩৯ লক্ষ টন আমদানি মাল সহ ১,০৬১টি জাহাজ প্রবেশ করে, ২৬ লক্ষ টন রপ্তানি নিয়া ৮২৬টি জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া যায়। ১৯৬০-৬১ সালে জাহাজে সামান্য পরিমাণ মাল আনয়নের ও পাঠানোর জন্য ১,২৬৮ বার বন্দরে প্রবেশও ১,০৫৩ বার বন্দর ত্যাগ করিয়া যাইত। হুগলী নদীর অবনতির জন্য ঐ অতিরিক্ত ব্যয় হইত। পূর্বোক্ত পাট, চা, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি করিতে বৎসেরে ৭০ হইতে ৮০ লক্ষ টাকার মতো অতিরিক্ত ব্যয় হইত। ইহার কারণ জাহাজ চালু রাখিতে দৈনিক ৬০০০ হইতে ৮০০০ টাকা ব্যয় হয় এবং প্রায় ১০ দিনে জাহাজটি বন্দরে আসিয়া ঘুরিয়া যায়। হিসাবের একই ভিত্তিতে পেট্রোলের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইত।

নদীর তলদেশ বুজিয়া যাওয়ার জন্য একই পরিমাণ মাল বহনের জন্য ১০৮ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় হইবে। পলির জন্য বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকা মোট ১৩৮ লক্ষ টাকা নদীর অবনতির জন্য বাড়তি ব্যয় হইবে এইরূপ ধরা যায়। কলিকাতা বন্দরের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশেষত ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের দ্বারা ঐ অপচয় রোধ করা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত হইবে। কলিকাতা বন্দরের পরিপূরক হিসাবে ঐ নগর হইতে ৭০ মাইল দূরে হলদিয়ায় একটি গভীর সমুদ্রের বন্দর গড়িয়া তোলাও সমান জরুরী।

কলিকাতা মেট্রোপলিটন পরিকল্পনা সংস্থার এক হিসাবে আগামী পঁচিশ বৎসরে কলিকাতা মেট্রোপলিটান জিলা অর্থাৎ প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল ব্যাপী হুগলী নদীর দু'পাশের শহরাঞ্চলে শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। বৎসরে শতকরা ৬ ভাগ হারে জনবহুল এই জেলার আর্থিক উন্নয়ন করিতে হইলে, এমন কি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের এখানকার মান বজায় রাখিতে হইলে সমগ্র অঞ্চলের পানীয় জল, রাস্তাঘাট, যানবাহন, জল নিষ্কাশন, স্বাস্থ্য বিধান প্রভৃতি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কলিকাতা বন্দরকেও প্রতি বৎসর আরো ৪৫ লক্ষ টন দ্রব্য আদান-প্রদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই সমস্ত কারণে কলিকাতা বন্দরের দ্রুত উন্নয়ন বিশেষ মনোযোগ ও প্রচেষ্টার অপেক্ষা রাখে।

৪০

ভারতের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ

সম্প্রতি ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতি শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে একটি প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছেঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যক্তিগত মালিকানার হাত থেকে সরিয়ে সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা উচিত্ কি না। অনেকে মনে করেন এর কোন অর্থনৈতিক প্রয়োজন নেই, এটা নিছক তত্ত্বকে চোখ বুঁজে অনুসরণ করা। এই প্রবন্ধে আমরা দেখতে পাব যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ একেবারেই তত্ত্বের ব্যাপার নয়, এর অর্থনৈতিক প্রয়োজন বর্তমানে খুবই বেশি।

অর্থনীতি শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই কথা স্বীকার করেন যে যখন ব্যক্তি ক্ষেত্রের কোন শিল্পে প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, যখন সেই শিল্প একজন বা কয়েকজন মাত্র একচেটিয়াদারে কুক্ষিগত হ'য়ে পড়ে, যখন সেই অবস্থা থেকে আবার প্রতি-যোগিতা গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা বা পথই আর দেখা যায় না, তখন শিল্পকে জাতীয়করণ করতে হয়। ভারতের ব্যাঙ্কিং শিল্পে ঠিক সেই অবস্থা ঘটছে।

১৯৪৯ সালে ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৪৭০। সেই সময় থেকে কোনো ব্যাঙ্ক উঠে গিয়েছে, আর কয়েকটি মিলে গিয়েছে। ১৯৬৩ সালের সুরুতে এর সংখ্যা দাঁড়াল ২৭৬। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে মোট আমানতের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে, বর্তমানে এটা ২৩০০ কোটি টাকার বেশি। আমানতের পরিমাণ দ্বিগুণ হ'ল আর ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমে গেল—এ থেকেই কেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

তত্ত্বের দৃষ্টিতে বলা হয় বড় ব্যাঙ্কগুলির মালিকানা লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট শেয়ার

ক্রেতাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু একথা আজ সকলেই জানেন যে প্রতিটি ব্যাঙ্কের মালিকানাই পরিচালিত হয় বড় বড় শিল্প ব্যবসায় গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় প্রতিনিধি দ্বারা। এই শক্তিশালী ব্যাঙ্কগুলিকে এঁরাই কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যেমন বিড়লারা চালান 'ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক' আর জৈন পরিবার চালান 'পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক', বাকী তিনটে দখল করে আছেন টাটা এবং মফৎলালেরা। পার্শী, গুজরাতী ও মাড়োয়ারী এই পরিবার কটি ঠিক যেমন ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান খুঁটিগুলি আগলে আছেন ঠিক তেমনি ব্যাঙ্ক ব্যবসায় গড়ে তুলে দেশের লোকের আমানতী টাকার একটি বড় অংশের উপর মালিকানা বজায় রেখেছেন।

শিল্প ব্যবসায় এবং ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সংযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ। ডাঃ রাজ. কে. নিগম হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ২০টি ব্যাঙ্কের মোট পরিচালক হ'ল ১৮৮ জন। এই ১৮৮ জন ব্যক্তির হাতে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কোম্পানীর সংখ্যা হোল ১৬৪০। এদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি কোন একটি কোম্পানীর পরিচালক হ'তে পারেন, সেই রকম ডবল্ গণনা বাদ দিয়ে এদের হাতে ১১০০টি কোম্পানী রয়েছে। এই ১১০০টি কোম্পানীর হাতে ভারতের ব্যক্তি ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত আছে বলে আমরা মনে করতে পারি, কার্যত এই ১৮৮ জন ব্যক্তিই ভারতের ব্যক্তি ক্ষেত্রের নীতি ও কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ কর্তা। ডাঃ নিগম বলছেন যে, "কোন কোন প্রধান ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর নিজেদের মালিকানায় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী বা বিনিয়োগকারী ট্রাস্ট আছে, এদের মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন অংশের কাছ থেকে পাওয়া টাকা তারা নিজেদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করতে পারে।"

ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসায়ের সৎ ও প্রকৃত পথ ছেড়ে দিয়ে নিজ, নিজ মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় কতদূর এগিয়ে যায় সে সম্পর্কে সকল তথ্য স্পষ্ট করে জানা যায় না, ব্যাঙ্কের কাজকর্ম গোপনতার আড়ালে ঢাকা থাকে। আমাদের দেশের আইন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এরূপ গোপনতা রক্ষার প্রতি একান্তভাবে সহানুভূতিশীল, আইনের রক্ষা কবচের আড়ালে থেকে ব্যাঙ্কেরা এই গোপন কাজকর্মগুলি চালাতে থাকে। তবে কখনও কখনও কোন অনুসন্ধানী কমিশন এই কাজকর্মের রূপ জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করে দেন, যেমন ভিভিয়ান বোস অনুসন্ধানী কমিশন করেছিলেন। নিজেদের ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ডালমিয়া কিনে নিলেন 'বেনেট্ কোলম্যান এণ্ড কোম্পানী' এবং মালিক হওয়ার পর কোম্পানীর রিজার্ভ টাকা এবং চলতি মুলধন নিজেদের ব্যাঙ্কে জমা রাখার ব্যবস্থা করে নিয়ে ব্যাঙ্কের টাকার প্রয়োজন মিটিয়ে ফেললেন্। এইভাবে জনসাধারণের সঞ্চয় ব্যাঙ্কের আমানতের আকারে ডালমিয়ার হাতে পৌঁছে তার নিজস্ব একচেটিয়া অধিকার বাড়িয়ে দিচ্ছে।

শুধু তাই নয়। ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মালিকেদের অত্যন্ত কম সুদে প্রভূত টাকা ধার দেয়।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে সিডিউল ভুক্ত বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি নিজেদের মধ্যে পরস্পর প্রায় ৫% হারে ধার নিচ্ছিলেন। এবং অনেক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৬২/৪% হারে টাকা আনছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ঋণ গ্রহণকারীদের ধার দিচ্ছিলেন তাঁরা ৬২/৪% হারে, আর অন্যদের ৯% হারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তাঁরা যে হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে এই ব্যাঙ্কগুলি এই সময়েই ১৩২ কোটি টাকা ধার দিয়েছেন ৫% বা তারও কম হারে। আর এর মধ্যে ৯ কোটি টাকা ধার দিয়েছেন ২% হারে এমন কি তারও কমে। কেমন করে এটা সম্ভব হ'ল আর কোথায়ই বা গেল বিশুদ্ধ ব্যাঙ্কিং নীতি!

ব্যাঙ্কগুলি তাদের কাজকর্ম এমন কৌশলে ঢেকে রাখতে পারে যে ব্যালান্স সীট দেখে তাদের প্রকৃত কাজকর্ম কিছুই বোঝা যায় না। কেরালার পালাই ও লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক ফেল পড়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে ব্যালান্স সীট পাঠিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞ চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়াও ব্যাঙ্কটির পক্ষে অসম্ভব হয়নি। প্রত্যেক বছরে ৩১শে ডিসেম্বর তাদের হিসাব সাজানোর ধুম পড়ে। আমাদের গল্পের শিয়াল পণ্ডিত যেমন কুমীর মাকে তাদের বাচ্চাদের হিসেব বুঝিয়েছিলেন সেই রকম উইন্‌ডো-ড্রেসিং (window dressing) চলতে থাকে।

ভারতীয় কোম্পানী বিধি অনুযায়ী আমাদের দেশের প্রতিটি কোম্পানীকে প্রকৃত লাভ ক্ষতির হিসেব দাখিল করতে হয়। ব্যাঙ্কদের কিন্তু প্রকৃত হিসেব দাখিল করার নিয়ম নেই, তাদের উপর এই বিধি প্রযুক্ত হয় না। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনেই বলা আছে যে, তারা গোপন রিজার্ভে (secret reserves) টাকা সরিয়ে রেখে লাভের পরিমাণ ঘোষণা করতে পারেন। একটি ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ আয় করছে তার প্রকৃত তথ্য জনসাধারণের কাছে এই জন্য পৌঁছয়ই না। মজুরি নিয়ে যতবার শ্রম ট্রাইবুনাল স্থাপিত হয়েছে ততবারই তারা নিজেদের লাভ গোপন করার উদ্দেশ্যে এই "গোপনীয়তার অধিকার" (Right of Secrecy) প্রয়োগ করেছে। এই বিষয়ে সরকার আইন রক্ষার নাম করে ব্যাঙ্কগুলির এই কাজকেই সমর্থন করে এসেছেন। ব্যাঙ্কগুলির গোপনীয়তার আর একটি উদাহরণ হোল বেনামী শেয়ার হাতে রাখা। এই বেশির ভাগ বেনামী শেয়ারই কেনা হয় কর ফাঁকি দেওয়া "কালো টাকায়।" এই অপরাধী মালিকেরা নিজেদের লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হন এই ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে। এই ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের নামে শেয়ারগুলি কেনেন না, ব্যাঙ্কদের বলেন তাদের পক্ষ থেকে শেয়ারগুলি কিনতে। এই ব্যবস্থাকে বাধা দেবার মত আইন

আমাদের দেশে নেই, এমন কি আয়কর কর্তৃপক্ষের কোন "অধিকার" নেই বেনামী শেয়ারের মালিকদের নাম জানার। ব্যাঙ্করা এই বেনামী শেয়ারগুলির উপর ডিভিডেণ্ড আদায় করেন এবং শেয়ারের মালিকদের নামে জমা করেন। ডিভিডেণ্ড আদায় করার জন্য এই মালিকদের উপস্থিতও হ'তে হয় না।

ব্যাঙ্কগুলির দুর্নীতির আর একটি উদাহরণ হোল রপ্তানির সময়ে 'আণ্ডার-ইনভয়েসিং' ও আমদানির সময়ে 'ওভার-ইন্‌ভয়েসিং' করা। রপ্তানিকারী 'রামবাবু' ইংলণ্ডের মিঃ টমের সঙ্গে আগে থেকে কথা বলে ব্যবস্থা করে যে মাল পাঠালেন, ধরা যাক্, তার দাম ১০,০০০ হাজার পাউণ্ড। বিলের ওপরে কিন্তু দাম লেখা হল ৬,০০০ পাউণ্ড। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ৬০০০ পাউণ্ড টাকায় পরিণত হ'য়ে রামবাবুর হাতে পৌছাল, আর বাকিটা রামবাবুর নিজস্ব নামে ঐ ব্যাঙ্কের বিলাতের শাখায় জমা রইল। দেশের জিনিস রপ্তানি ক'রে যে বিদেশী মুদ্রা (পাউণ্ড) আয় হ'ল দেশ তার প্রয়োজনে সেই মুদ্রা ব্যবহার করতে পারল না। আমদানিকারী শ্যামবাবু ১৫,০০০ পাউণ্ডের মাল আমদানি করেছেন, কিন্তু মিঃ ডিক্‌কে দিয়ে ২০,০০০ পাউণ্ডের বিল করালেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ২০,০০০ পাউণ্ডের অনুমতি নিয়ে নিজের নামে বিলাতের ব্যাঙ্কে ৫,০০০ পাউণ্ড সরিয়ে ফেললেন। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অপহরণের সঙ্গী হ'ল এই ব্যাঙ্কগুলি।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সবচেয়ে বিপদজনক কাজ হ'ল তারা বেশ কয়েক শত কোটি টাকা শেয়ারের এবং দ্রব্যসামগ্রীর ফাটকাবাজদের হাতে তুলে দেয়। কেবল মাত্র শেয়ারের ফাট্‌কা ব্যবসায়ে প্রায় ৯০ থেকে ৯২ কোটি টাকা তারা খাটাচ্ছে। দ্রব্য সামগ্রীর ফাট্‌কাতে টাকা দেওয়া আরও অন্যায়, এখানে তারা প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খাটাচ্ছে। কোন দ্রব্যের উৎপাদন এবং যোগান প্রাকৃতিক বা অর্থনৈতিক কারণে হঠাৎ একটু কম পড়ে গেলেই এই পরিমাণ টাকা দামের ওপর কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করে তা আমরা অনেকবার দেখেছি। এই পরিমাণ টাকার উপর ব্যাঙ্কগুলি আবার ২০০ কোটি টাকার বেশি বিনা-বন্ধকী ধার (clear advance) দিয়ে থাকে, সেটা বেশির ভাগই ফাট্‌কা বাজারে যায়। মনে রাখা দরকার ব্যাঙ্কের এই আগাম ছাড়াও ফাট্‌কা বাজারে খাটাবার মত কালো টাকা এমনিতেই প্রচুর রয়েছে। ফাট্‌কাদারদের প্রতি ব্যাঙ্কের আকর্ষণের প্রধান কারণ হ'ল এরা বেশি সুদ দিতে পারে। যারা বেশি সুদ দেবে, ব্যাঙ্ক তাদেরই ধার দেবে, কারণ ব্যাঙ্কগুলি ব্যক্তিক্ষেত্রে অবস্থিত, লাভই তাদের লক্ষ্য, এবং লাভের পরিমাণই তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের মাপকাঠি।

আমাদের দেশে একমাত্র ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ই প্রকাশ্যভাবে একচেটিয়া কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কথাটা একটু ভাল করে বোঝা দরকার। সাধারণত প্রতিযোগিতা-

মূলক ধনতন্ত্রে কোন দ্রব্যের দাম বাজারী শক্তি সমূহের অবাধ কার্যকারিতার ফলে নির্ধারিত হয়, বলা হয় যে অবাধ ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়ের এটাই প্রধান উপকারিতা। কিন্তু ভারতের ব্যবসায়ে ধনতন্ত্রের এই "উপকারিতা"টুকুও আমরা পাই না। বর্তমান ভারতবর্ষে "টাকায় টাকা আনে" একথা অতীব সত্য। চতুর্দিকের দ্রব্যসামগ্রীর স্বল্পতা অথচ আর্থিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি সারা দেশে আজ এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে কাঁচা টাকা কেবল মাত্র দ্রব্যের ফাটকা বাজারে খাটিয়েই অতি উঁচু হারে মুনাফা পাওয়া সম্ভবপর। ব্যবসায়ীরা এবং ফাটকাদারগণ তাই খুব বেশি সুদ দিয়েও টাকা ধার করতে প্রস্তুত। ব্যাঙ্কগুলিও এই সুযোগ নিচ্ছে এবং লিখিতভাবে কাগজে পত্রে এবং তার বাইরে অতি উচ্চ সুদ আদায় করতে পারছে। বাজারে টাকার চাহিদা যখন এত বেশি, তখনও ব্যাঙ্কগুলি কিন্তু জনসাধারণকে তাদের আমানতের উপর নগণ্য হারে সুদ দেওয়ার নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রকাশ্যে চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে নিজেরা কি সুদে আমানত নেবে সেটা স্থির করছে, আমানতের উপর দেয় সুদের হার যাতে কোনমতে বাড়তে না পারে সেই ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে প্রকাশ্যে এই রকম একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগের উদাহরণ আর দেখা যায় না।

এই কারণেই ভারতের ব্যাঙ্কশিল্প বর্তমানে বিপুল লাভজনক কারবারে পরিণত হ'য়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত হিসেবে দেখা যায় যে (ছোট ব্যাঙ্ক বাদে) ভারতের ৬৫টি সিডিউলভুক্ত ব্যাঙ্ক মিলে ১৯৬১ এবং ১৯৬২ সালে যথাক্রমে ৯·৫২ এবং ৮·৮৮ কোটি টাকা লাভ করছে। দু'বছরে গড়পড়তা লাভের হার হিসেব করলে দেখা যায় যে বৎসরে তারা মোট আদায়ীকৃত মূলধনের ২৯ ভাগ তুলে নিতে পারছে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি প্রতি বৎসর আরও ২ কোটি টাকা পাচ্ছে বিদেশী মুদ্রার লেন দেন করে এবং এই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা দেশের লোকসান হচ্ছে। এদের গড়পড়তা লাভের হার হিসেব করা অসুবিধে কারণ এদের আদায়ীকৃত মূলধন এ দেশে নাই।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের এই লাভ থেকে দেশ উপকৃত হ'চ্ছে কি? এই মুনাফা কি দেশের উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হ'চ্ছে? তা কিন্তু নয়। তাদের চকমকে বাড়ি আর আসবাব পত্র, পরিচালক বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রভূত মাইনে প্রভৃতি এই দরিদ্র দেশের পক্ষে এক প্রকার অপব্যয়ে পরিণত হ'য়েছে। এই ধরনের বিলাস ও অপব্যয় আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারকে ক্রমাগত কমিয়ে দিচ্ছে।

মূল কথা কিন্তু আরও গভীরে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক উন্নতির ভবিষ্যৎ হোল পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বাড়ানো, অর্থাৎ পরিকল্পনার কার্যসূচী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সফল করা। ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ না হোলে এটা কোন মতেই সম্ভব নয়। তার কারণ ভাল করে বোঝা দরকার।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি হ'ল সব কিছুকে বাজারের শক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া। আমরা ভারতে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি তার কারণ অন্যান্য দেশ এবং আমাদের নিজেদের দেশ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা। *এই অভিজ্ঞতা হোল: দেশের সব অর্থনৈতিক কাজকর্মকে মুনাফা-বাড়ানোর নীতির উপর যদি আমরা ছেড়ে দিই তবে দেশে অপ্রয়োজনীয় দিকে ও অনিয়মিত পরিমাণে বিনিয়োগ ঘটতে থাকে। এর দরুণ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বাড়বে না, অপরদিকে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল সুষমভাবে বণ্টিত হবে না। এই জন্যই আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করেছি। প্রতি পাঁচ বছরে দেশের বিনিয়োগযোগ্য উপকরণগুলি ঠিক কোন কোন দিকে নিযুক্ত হবে সেটা আগে থেকে জানা, বোঝা এবং কল্পনা করাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির কাজ।

দেশে আসল উপকরণগুলি (জমি, শ্রম, মূলধন, কাঁচামাল, যেমন লৌহ, কয়লা সিমেণ্ট প্রভৃতি) বিশেষ কোন একটি দিকে নিযুক্ত হ'তে পারে না, যদি না সেই দিকে কিছু টাকা ধাবিত হয়। যেদিকে অর্থস্রোত বইছে, উপকরণের স্রোতধারাও সেদিকে বইতে সুরু করবে। কারণ যেখানে টাকা দিয়ে উপকরণ কেনা হচ্ছে উপকরণগুলিও বিক্রীর জন্য সেখানে উপস্থিত হবে, অন্য দিকে নয়। আমাদের দেশে ব্যাঙ্কগুলি বৎসরে প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ধার দিয়ে থাকেন। এই পরিমাণ অর্থস্রোত কোন দিকে যাবে সেটা স্থির করেন ব্যাঙ্কের মালিকবৃন্দ এবং তাদের নীতি হোল সর্বাধিক মুনাফা করা। দেশের পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করলেন এবং আশা প্রকাশ করলেন উপকরণগুলি কোন কোন দিকে নিযুক্ত হওয়া দরকার। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাঙ্কগুলির মালিকেরা কোন দিকে অর্থস্রোত বইবে, অর্থাৎ উপকরণের নিয়োগ ঘটবে, সেইটে স্থির করে চলেছেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন ইচ্ছা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত, কিন্তু এই উপকরণগুলির নিয়োগের দিক্‌নির্ণয় করার ক্ষমতা রয়েছে ব্যাঙ্ক মালিকবৃন্দের হাতে। দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন করতে হলে উন্নয়নের প্রতিটি আসল কর্মসূচীর (Real Plan) সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি একটা অর্থ ঋণের কর্মসূচী (Credit Plan) রচনা করতে হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যক্তিক্ষেত্রে রেখে দিয়ে এইরূপ অর্থঋণের কর্মসূচী তৈরী করা যাচ্ছে না, সেটা সম্ভবও নয়। কথায় বলে, মানুষ কেবল আশা করেই ক্ষান্ত, পাবে কি পাবে না ভগবানই সেটা স্থির করেন। ভারতেও তাই, পরিকল্পনা কমিশন চাইছেন মাত্র, আর দেওয়া হবে কি হবে না সেটা ব্যাঙ্কগুলি স্থির করছেন। পরিকল্পনা বাঁচাতে হলে এমন অবস্থা বেশিদিন চলতে দেওয়া সম্ভব কি? ব্যাঙ্কগুলির এই রকম জাতি-স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি ভাল করে বোঝা

যাবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুরুর কথা ভাবুন। ভারতে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে, খাদ্যদ্রব্যের দাম ভয়ানক হারে বাড়তে সুরু করেছে। আমাদের পরিকল্পনা একটি জটিল আবর্তের মধ্যে পড়ে গেছে, দাম কমাবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা একান্ত ভাবে দরকার হ'য়ে পড়েছে। জাতির এই দুর্দিনে এই সংকটের সময়ে ব্যাঙ্কগুলি বেশ কয়েক কোটি টাকা খাদ্যের ফাট্‌কাদারদের ধার দিলেন এবং আরও বেশি খাদ্যশস্য গুদামজাত করার এবং দাম বাড়াবার সুযোগ করে দিলেন। এদিকে অসহায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশের পর নির্দেশ দিয়ে চলেছেন, কে কার কথা শোনে। ব্যাঙ্কগুলি এবং মজুতদার ও ফাট্‌কাদারেরা অবাধে প্রভূত লাভ করে নিলেন। জাতির কথা দেশের কথা পরিকল্পনার কথা তাঁরা চিন্তাই করলেন না। পরিকল্পনার চাকা জোরে ঘুরবে কি করে, সেই চাকা ফুটো করে দেওয়ার ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের যখন অভাব নেই?

আমরা আজ সকলেই জানি যে পরিকল্পনার প্রধান সমস্যা হ'ল কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায় কেমন করে। গ্রামাঞ্চলে কেবল বিদ্যালয় বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র খুললেই এই সমস্যার সমাধান হয় না। সমবায়ের মাধ্যমে চাষযোগ্য কৃষিক্ষেত্রের সীমানা সম্প্রসারিত করে জল, যন্ত্র, কৃষি-কৌশল, বীজ ও উৎসাহ একযোগে প্রয়োগ করা দরকার! তবেই খাদ্যশস্য এবং শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎপাদন এতটা বাড়ানো যাবে যে আমাদের মত জনাকীর্ণ দেশের উপযোগী বিপুলসংখ্যক কল কারখানা গ'ড়ে তোলা সম্ভবপর। ছোট খাট কৃষির উন্নতি দিয়ে এই কাজ কখনই সম্ভব নয়। সোভিয়েট, চীন, আমেরিকা, ইংলণ্ড সব দেশের অভিজ্ঞতাই আজ আমাদের চোখের সামনে আছে। সমবায় চাষ সমিতি তৈরী করো, আল ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষেতের আয়তন বড় করো, যন্ত্রের সাহায্যে সারা বৎসর জলের ব্যবস্থা করো, দুবার তিন বার ফসল তোলো, নির্দিষ্ট দামে শিল্প-সহরগুলির সরকারী গুদামে ও দোকানে চালান দাও—এই হোল পথ। এই পথের কোনো বিকল্প নেই, এর কোনো শর্টকাটও হয় না। অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ সমস্ত দেশের মত এই পথে আমাদের যেতেই হবে। যত দেরি হবে, জনসংখ্যার চাপ ততই বাড়বে; "লাল জুতো-পরা রূপকথার রাণীর" মত ক্রমাগত জোরে ছুটেও আমরা সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকব। পঁচিশ বৎসর পরেও আমরা শিল্প-সমৃদ্ধ হবো মনে করলে আজই কৃষিতে এই আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। হাজার মাইল যদি আমাকে যেতেই হয় তবে প্রথমে অন্তত একটি পদক্ষেপ দিয়েই তার সূত্রপাত করতে হবে।

এই যখন আমাদের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত, তখন দেশের ব্যাঙ্কগুলি কিন্তু কৃষিতে টাকা খাটাবার কোন চিন্তাই করছেন না। যেহেতু কৃষিক্ষেত্রে টাকা খাটানোতে ঝুঁকি বেশি, লাভ কম, তাঁরা তাই কৃষিতে অর্থ বিনিয়োগের কথা মনেও আনেন না।

একই কারণে তাঁরা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকেন। আজ যখন সারা দেশ "সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণ কল্যাণ" নীতি সামনে রেখে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার পদ্ধতি কি হ'তে পারে তাই নিয়ে আলোচনায় মগ্ন, তখন এই ব্যাঙ্কগুলি জাতীয় উপকরণের একটা বড় অংশকে সংকীর্ণ এক গোষ্ঠীর মুনাফা বাড়াবার কাজে নিয়োগ করতে চাইছে।

এদের জাতীয়করণ আজ তাই অগ্রগতির পক্ষে প্রাথমিক কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর তত্ত্বের ভিতরে আর এটা আবদ্ধ নেই।

৪১
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রাদর্শ

মধ্যযুগে এবং প্রাচীন যুগে ধর্ম ছিল জীবনের সবক্ষেত্রেই আচরণীয় একটি ব্যাপার তাই সাহিত্য শিল্পে ছিল ধর্মের প্রতিফলন এবং জীবনের শুভ-উৎসবে, আনন্দে, শোকে, দুঃখে সব সময়েই ধর্মীয় আচার আচরণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। বলা বাহুল্য এই কারণেই রাজার কর্তব্য, প্রজার কর্তব্য, রাজ্যের আদর্শ মন্ত্রীর কর্তব্য সবই ছিল ধর্মনীতি শাসিত। রাজাকে কেবল বিবেকবুদ্ধির নিকট জবাবদিহি করিতে হইত না। ধর্মের দোহাই মানিয়া, ধর্মের নিকট কৈফিয়ৎ দিবার ভয়কে স্বীকার করিয়া চলিতে হইত। প্রজাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ছিল। ফলত জীবনের সবক্ষেত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের আদর্শও বিশেষ ধর্মীয় অনুশাসনকে স্বীকার করিত।

এইরূপ ব্যাপারে কোনও বিরোধ সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব থাকিবার কথা নহে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রানুমোদিত ধর্মাদর্শ উদারমানবতন্ত্রী নীতিনিয়মকে অনুসরণ করিত। ধর্মীয় অনুশাসনে হয়তো কোথাও গোঁড়ামী ছিল, নিষ্ঠুরতাও হয়তো বা ছিল কোনও কোনও ক্ষেত্রে। কিন্তু লক্ষণীয় এই যে আধুনিক দৃষ্টিতে যাহা নিছক গোঁড়ামী বা নিষ্ঠুরতা বা মনুষ্যমহিমার অবমাননাকারী রীতি তাহা প্রাচীন দৃষ্টিতে সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার বলিয়া প্রতিবাদ ছিল না। অন্তত প্রতিবাদ পরিস্ফুট ছিল না। সবাই সবই ধর্মের কঠোর অনুশাসন বলিয়া, ধর্মের সূত্র নিহিতং গুহায়াং, এবং ধর্মের পথ ক্ষুরস্যধারার মত বলিয়া সব সময়ই মোটামুটিভাবে অবশ্য পালনীয় বিধানরূপে মানিয়া লইত।

রামায়ণে দেখি রাম কর্তব্যানুরোধে শূদ্রক রাজাকে হত্যা করিয়াছিলেন। শূদ্রক রাজা শূদ্র হইয়াও বেদপাঠ করিতেন এই তার অপরাধ। ধর্মের অনুশাসন এই

যে ব্রাহ্মণ ছাড়া বেদপাঠের অধিকার কাহারও নাই। শূদ্রক রাজার এই অশাস্ত্রোচিত আচরণে নাকি রাজ্য জুড়িয়া অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক প্রাপ্তবয়স্কের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটিতেছিল। আজিকার দিনে বেদ পাঠের অপরাধে শূদ্রের মৃত্যুদণ্ড অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু শূদ্রককে দেখি তাহার অপরাধ তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। শূদ্রক বধের এই ঘটনাটি তাই নানা দিক হইতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ধর্মের বিধান লইয়া বিবাদ উপস্থিত না হইলে এই সব ক্ষেত্রে কোনও বিরোধ ছিল না অন্তত রাষ্ট্রাদর্শ ও ধর্মাদর্শ পৃথক বলিয়া সন্দেহ করিবার অবকাশ ও এই জন্য বিতর্ক বিরোধ কোনও দিনও ওঠে নাই। এই বিতর্ক বিরোধের অবকাশ ঘটিল আধুনিক যুগে। যখন একাধিক ধর্মীয় আদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তি একই রাজশক্তির ছত্রছায়ায় আসিল। প্রথম প্রথম বিরোধ উপস্থিত হইত রাজার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস এবং প্রজাসাধারণের বিশ্বাসে পার্থক্য থাকিলে। রাজা চেষ্টা করিতেন রাজধর্মাবলম্বীদের সুযোগ সুবিধা বেশি দিতে। যদি কেহ রাজধর্মের বিরুদ্ধাচারণ করিত তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত। অন্তত তাহাকে যথাসম্ভব কম সুবিধা ও সুযোগ প্রদান—দরকার হইলে অত্যাচার ও উৎপীড়ন। মধ্যযুগ ছিল ধর্মান্ধতার যুগ। প্রাচীন যুগে অন্তত ধর্ম এবং মানবিকগুণে কোনও বিরোধ ছিল না। সহিষ্ণুতা এবং মানবিকতা ও সহানুভূতি ধর্মীয় গুণরূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু মধ্যযুগে ধর্ম ব্যাপারটাই এমন প্রাধান্য লাভ করে যে—মানবিকতা করুণা ও সহানুভূতি এই গুণগুলি গৌণ ব্যাপার হইয়া যায়। কোথাও বা ওই জিনিষগুলির অভাবই বড় গুণ বলিয়া দাঁড়ায়।

মধ্যযুগের ইংলণ্ডের ইতিহাসের দিকে তাকাইলে এমনি প্রোটেস্টাণ্ট জনতা এবং রোমান ক্যাথলিক রাণীর আমলে অত্যাচার উৎপীড়নের চুড়ান্ত দেখিতে পাই। অষ্টম হেনরী যখন সম্রাট ছিলেন তখন ব্যক্তিগত কারণে তিনি প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমতের আনুকূল্যে ধর্মসংস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ষষ্ঠ এডোওয়ার্ডের আমলে এই সংস্কারকার্যের মধ্যে অত্যুৎসাহ দেখা দিয়াছিল। তাঁহার পরে রাণী মেরী। তিনি ক্যাথলিক গোঁড়ামীর ঘাটি যে স্পেন সেই স্পেনের রাজা ফিলিপকে বিবাহ করিয়াছিলেন। স্বামীর মতাদর্শে বিশ্বাসী হইয়া রাণী মেরী প্রোটেস্টাণ্টদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন সুরু করিলেন—। কয়েকজন বিশপ ও যাজককে এবং আরও চৌদ্দ জনকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মমত বিশ্বাস করিয়া পাপ করিয়াছে এই মর্মে যেন তাহারা স্বীকারোক্তি দেয়। একজন ছাড়া কেহই এই স্বীকারোক্তি দেয় নাই। ফলে তাঁহাদের আগুনে জীবন্ত অবস্থায় পোড়াইয়া মারা হইল। —অবশ্য এই সব অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ায় ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমতের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। কিন্তু

আমাদের বক্তব্য এই যে রাজার ধর্মবিশ্বাস এবং রাজ্যের সকলের ধর্মবিশ্বাস এক না হইলে এইরূপ অত্যাচারের ব্যাপারই হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেও এইরূপ অত্যাচারের ব্যাপার সর্ব সময়ে পরিলক্ষিত না হইলেও অনেক সময়েই ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য রাজ্য জুড়িয়া অশান্তি আনিয়াছে। এই অশান্তি হইতে পরিত্রাণের জন্য—সৎমানবিক বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হইয়া আকবর আমলে আকবর দেশ জুড়িয়া সর্বধর্মের মূলকথাগুলিকে সমন্বিত করিয়া দীন-এলাহী ধর্মমতের প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল—কিন্তু ইহার পশ্চাতে যে শুভবুদ্ধি সক্রিয় ছিল, যে আন্তরিক মানব-প্রীতির প্রকাশ ছিল তাহাতো উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের বিভিন্নতা হইতে জাত এই যে গোঁড়ামী ও অসহিষ্ণুতা ইহার চরম তিক্ত প্রকাশ দেখি মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজীবের আমলে। তাঁহার জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তন হিন্দু জাতির উপর অত্যাচার বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইংরাজ আমলেও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীরা যে কোথাও কোথাও বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ পান নাই এমন নহে। সাধারণভাবে এই ব্যবসায়িক জাত নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই বিশেষ কোন ধর্মকে রাষ্ট্রের ধর্ম বলিয়া ও প্রজাসাধারণের পালনীয় বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু শাসনযন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্য তাহারা এদেশের মুসলমান এবং হিন্দু এই দুই জাতির মধ্যে নানাভাবে বিরোধের বীজকে উপ্ত করিয়া দিয়া গেলেন। এই বীজ ক্রমশ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া যে বিষবৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করিল তাহার রূপই অত্যন্ত ভয়াবহ। তাহার ফল অত্যন্ত বিষাক্ত। ধর্মবিদ্বেষ, সংকীর্ণ রাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ, পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, সন্দেহ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সমস্ত মানবিক বিশ্বাসের অবলুপ্তি, এই সমস্তই এই বিষবৃক্ষের ফল। আমরা সেই ফল খাইয়াছি। তাহার ফলে দেখা দিল দ্বি-জাতিতত্ত্ব। দেখা দিল ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের দাবী। উপমহাদেশের বিভক্তিকরণের দাবী।

যাহারা ধর্মসহিষ্ণুতার কথা বলিলেন—তাহাদের বিরুদ্ধে সুরু হইয়াছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সমগ্র বিশ্ব শিহরিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল কীভাবে কয়েকটি দিন এদেশে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননা হইয়াছিল।

মানুষের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বিশ্বাস এবং রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক আদর্শ ইহার মধ্যে কি কোন সামঞ্জস্য আনা যায় না? পৃথিবী আজ বহুতর ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের বাস। প্রত্যেকের জন্য কি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তাই গড়িয়া তোলা দরকার? এ রকম অনৈক্য ও বহুধাবিভক্তির কামনা কি এই নিত্য অশান্তির হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিতে পারিবে? এক রাষ্ট্রের পতাকাতলে কি ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও বন্ধনে জাতীয়তার বোধ গড়িয়া উঠিতে পারে না? ভাষাভিত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক সূত্রে, সাধারণ

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পোষকতায়, একই ভৌগোলিক বেষ্টনীতে বসবাসের ভিত্তিতে জাতীয়তার বোধ গড়িয়া উঠার কথা . তাহা হইলে কি অসম্ভব? ধর্মবিশ্বাস ভাল হয়তো, কিন্তু তাহা যখন স্বার্থান্বেষীদের হাতের অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়—তখন যে অন্ধ অসহিষ্ণুতা ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া বারে বারে ইতিহাসের নির্মম ধর্মসংগ্রামকে ডাকিয়া আনে তাহাই মানব জাতির পরবর্তী রাষ্ট্রাদর্শের নিয়ামক হইয়া উঠিবে?

আমরা এ কথায় বিশ্বাস করি না। আমরা ইতিহাসের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে বর্ণের ভিত্তিতে যেমন মনুষ্যত্বের পরিমাপ হয় না—সংকীর্ণ ধর্মের ভিত্তিতেও তেমনি হয় না। সত্যিকারের ধর্ম হয়তো মানুষের নৈতিক শক্তি বাড়াইয়া দেয়। কিন্তু এক বিশিষ্ট গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস, যাহা নানান প্রকার আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া রূপ গ্রহণ করে—তাহার মূলকথা নানা দিক হইতে ভাল হইলেও হইতে পারে—কিন্তু সবচেয়ে বড়ো জিনিষ হইল মানুষের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতা। আর রাষ্ট্রকে তাই হইতে হইবে জাতি, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ, উন্নত-অনুন্নত, ধর্ম ভেদ নির্বিশেষে সমদর্শী। ধর্মের দিক দিয়া তাই চাই অন্তত রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে একটি কঠোর নিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতাই সেইজন্য রাষ্ট্রের আদর্শ হওয়া উচিত।

ভারতরাষ্ট্রের জন্মলগ্ন হইতে তাই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আস্থার বাণী ঘোষিত হইয়াছে। যে ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ মুসলমান পার্সী, খ্রীষ্টান এবং নানা আদিম ধর্মবিশ্বাসীদের বাসভূমি—যে ভারতভূমির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সকলের মিলিত দান রহিয়াছে—সেখানে ধর্মমতের পার্থক্যের জন্য নাগরিকগণের মধ্যে কোনও বৈষম্য-মূলক আচরণ না করিবার এই যে সংকল্প তাহা অপেক্ষা প্রশংসনীয় আর কিছুই নাই। এই ধর্মনিরপেক্ষতার দুইটি দিক আছে। একটি উহার ইতিবাচক দিক: রাষ্ট্রের শান্তিশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থ ও নীতিজ্ঞানের বিরোধী না হইলে প্রত্যেকে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তাহার স্ব স্ব ধর্মাচরণ করিতে পারিবে—। ধর্ম-প্রচার করিতে পারিবে। আর একটি ইহার নেতিবাচক দিক: রাষ্ট্র নিজে কোনও ধর্ম প্রচার করিবে না। সরকার কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত, বা সরকার পরিচালিত কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষাদান করা চলিবে না। সরকারের বিনা অনুমতিতে সরকার কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা কোনও প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষার ব্যাপারে যোগদান করিতে কাহাকেও বাধ্য করা চলিবে না।

অনেকেই এই উদার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে ভাল চক্ষে দেখে না। তাহারা ধর্মবিশেষকে সরকারী ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে সমান সুযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু ইহাতে সরকারী ধর্ম-ই শ্রেষ্ঠতার

সম্মান প্রকারান্তরে পাইয়া থাকে। কারণ সরকারী অনুষ্ঠানে সরকারী ধর্মের আচার ও অনুষ্ঠান পালিত হইবে। অন্য ধর্মবিশ্বাসের স্থান থাকিবে না। ইহার মানসিক প্রভাবও মারাত্মক। অনেকে মনে করেন যে আজকাল অনেক ক্ষেত্রে সরকারী অনুষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষতার উদাহরণ দেখাইতে গিয়া কয়েকটি বিশেষ ধর্মের প্রার্থনা বা আচার অনুষ্ঠান একসঙ্গে করিবার যে প্রথা রহিয়াছে তাহাও উঠিয়া যাওয়া উচিত। কারণ এই সব অনুষ্ঠানে মাত্র কয়েকটি প্রভাবশালী ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু আরও যে বহু ধর্মমত রহিয়াছে সেইগুলির ব্যাপারে কি করা হইবে? তাহা ছাড়া জাতিসংঘের নিকট নাস্তিকতাকেও বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের ক্ষেত্রে কি অবিচার প্রদর্শিত হইতেছে না। আসল কথা ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের পর্যায়ে রাখিতে হইবে। যে রাষ্ট্র মানবতাবাদী—যে রাষ্ট্র মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—যে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলকতার কামনায় কোনও জাতি, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক ভেদ, স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই সেই রাষ্ট্রে ধর্ম সম্বন্ধে কোনও রকম পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শিত হইলে তাহা মানবতাবাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই আপন আপন ধর্মবিশ্বাসে সকলে অবিচলিত থাকুক—কিন্তু সরকার নিজে ধর্ম-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকুন এই যে রাষ্ট্রাদর্শ ইহাতেই মানবতান্ত্রিকতার প্রতি বেশি আস্থা প্রকাশ পাইবে।

দীর্ঘকালের ইতিহাস হইতে যদি কোন শিক্ষা আমরা লাভ করিতে চাই, যদি রাষ্ট্রীকে মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করিবার উপায় বা means হিসাবে মনে করি তবে ধর্মনিরপেক্ষতার এই যে রাষ্ট্রাদর্শ তাহাই একমাত্র হিতকর পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইবে। বস্তুত ধর্মবিদ্বেষজাত অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৪২
ভারতে পর্যটন ব্যবসায়

যাহাকে Tourism বা পর্যটন ব্যবসায় বলে—তাহার সম্বন্ধে ভারতবর্ষ পূর্বে সচেতন ছিল না। শুধু ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর অনেক দেশ সম্বন্ধেই এই কথা বলা যায়। পর্যটককের দল বহু প্রাচীন যুগ হইতেই পৃথিবীর বহু বিচিত্র দেশে পর্যটন করিয়াছে—আজও করিতেছে। মার্কো পোলো, কিংবা ফা হিয়েন কিংবা হিউয়েন সাং ইঁহারা প্রাচীন যুগের পর্যটক। উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, কোনও বিদেশীর ভ্রমণ বা পর্যটন যে কোনও জাতির জাতীয় আয়বৃদ্ধির সহায়ক হইতে পারে

এ কথা আমরা পূর্বে চিন্তা করিতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে সমগ্র চিন্তাই আধুনিক যুগের উন্নততর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-লব্ধ অর্থনৈতিক জ্ঞানের অবদান।

দেশ বিদেশ হইতে আগত পর্যটক বা ভ্রমণকারীরা স্বল্পকালের অতিথি। এই স্বল্পকাল মধ্যে তাহারা যে দেশে আসিয়াছে সেই দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য, পুরাকীর্তি, শিল্পকীর্তি, স্থাপত্য এবং সেই দেশের খাদ্য, সামাজিক অবস্থা ও অভ্যাস, সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় সমস্তই লইতে চায়। এজন্য সঙ্গে তাহারা সাধারণভাবে প্রচুর অর্থ লইয়া আসে। যে দেশে তাহারা আসিল সেই দেশের হোটেলে খাইয়া, সেই দেশের যানবাহন ব্যবহার করিয়া পরিবহনের খাতে প্রচুর ব্যয় করিয়া সেই দেশের বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, শৈল্পিক গুণসম্পন্ন বস্তু সংগ্রহ করিয়া অদৃশ্যভাবে সেই দেশের আর্থিক সম্পদ বাড়াইয়া দিয়া যায়। জাতীয় আয়ের হিসাব লইবার সময় এই অদৃশ্য উপার্জনেরও হিসাব আজকাল লওয়া হইয়া থাকে। এইভাবে পর্যটকদের ভ্রমণের নেশাকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পর্যটন-ব্যবসায় বা Tourism এর প্রসার হইতেছে এবং বিভিন্ন দেশ এই পর্যটকের আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য সচেতনভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে।

ভ্রমণের নেশা মানুষের চিরকালের মজ্জাগত। মানুষের অন্তর-নিবাসী এক চিরন্তন পথিক কেবলই বাহির হইয়া পড়িতে চায়। ঘর হইতে বাহিরে, দেশ হইতে বিদেশে কেবলই হাতছানি ও ডাক আসিতেছে। যে স্থানকে দেখি নাই সেই স্থানে না জানি কত আকর্ষণ, কত কৌতূহলের বিষয় রহিয়া গিয়াছে। তাহা দেখিতে হইবে—তাহাকে জানিতে হইবে। এই ইচ্ছা মানুষের মনে কেবলই তোলপাড় করিতে থাকে। সে বলে :

> বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি
> দেশে দেশে কত নগর রাজধানী
> মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু
> কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
> রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন।
> মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।

আগেকার দিনে না ছিল ট্রেণ, না ছিল এ্যারোপ্লেন, কিংবা বাষ্পীয় অর্ণবপোত। তবুও দুর্গম পথে মানুষ ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু সেই দেখিবার আকর্ষণে সব কিছুকে উপেক্ষা করিয়া বাহির হইয়া পড়িবার ইচ্ছাটা সর্বজনীন হইলেও যে বাহির হইতে পারে এমন নয়। আর কিছু সুযোগ সুবিধা না থাকিলেও যে মানুষ চলিয়া আসিবে দেখিতে এই ভরসায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহায়ক এই

পর্যটন-ব্যবসায়কে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে ইহাও কিছু কাজের কথা নহে। মানুষের মনে আকর্ষণ আছে, নেশা আছে, ইচ্ছা আছে। সুকৌশলে এই ইচ্ছাকে আমাদের স্বার্থের অনুকূলে দোহন করিতে হইবে এই কথা মনে রাখিয়া সরকার এবং দেশবাসীর সহায়তায় পর্যটন ব্যবসায়কে প্রসারিত করিতে হইবে। সকল ব্যবসায়ে যেমন ক্রেতা ও ভোক্তার আকর্ষণ বাড়াইতে একটা চেষ্টা দেখা যায় এ ক্ষেত্রেও তেমনি চেষ্টা করিতে হইবে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্যেরও কতগুলি দেশে এই চেষ্টা অত্যন্ত প্রকট। সুইজারল্যাণ্ডের মত দেশ তো মূলত পর্যটন ব্যবসায়ের দ্বারাই সমৃদ্ধ। অন্যান্য দেশেও প্রায় তাহাই। সব দেশে যে প্রচণ্ড একটা কিছু দর্শনীয় বস্তু রহিয়াছে এমন নহে। কিন্তু যাহা আছে তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া সহজেই দর্শনের যোগ্য করিয়া পুরাকালীন ইতিবৃত্তকে পুস্তিকাকারে লিখিয়া প্রচার করিয়া তাহারা সবাইকে টানে। ভারতবর্ষের পক্ষে সুবিধা এই যে এই দেশের মত বিচিত্র দর্শনীয় বস্তুতে সমৃদ্ধ দেশ পৃথিবীতে কমই আছে। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর কন্যাকুমারিকার সমুদ্রতরঙ্গবন্দিত তটভূমি পর্যন্ত—সৌরাষ্ট্র হইতে আরম্ভ করিয়া নাগাপ্রদেশের পার্বত্য ও আরণ্য ভূভাগ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দর্শনীয় বস্তুর এক সংগ্রহশালার উপকরণ ছড়ানো রহিয়াছে।

কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়া নহে। এদেশে পুরাকীর্তি, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় আশ্চর্য স্থাপত্যকলা, ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক ভগ্নস্তূপ ইহাই কি কম! এদেশের প্রাচীন মন্দির স্থাপত্য, মধ্যযুগের মসজিদ ও মকবারা বা কবরের উপর গড়িয়া তোলা সৌধ ইহা কি কম আকর্ষণের বস্তু! দ্রষ্টব্য হিসাবে এইগুলির মূল্য চিরকালীন। সমগ্র উত্তর ভারতে, প্রাচীন দিল্লী, মিরাট, লখ্‌নউ, কানপুর, ফতেপুর সিক্রি, আগ্রা সেকেন্দ্রা, চুণার, রাজগীর, নালন্দা, পাটলীপুত্র বা পাটনা —এই সব স্থানে মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন কালের ইতিহাসের যে কত শত উপাদান ছড়াইয়া আছে তাহা বলার নয়। দক্ষিণ ভারতেও তেমনি আছে গুহা-গাত্রের বিচিত্র শিল্পকলায় অজন্তা ইলোরার আশ্চর্য কালজয়ী মহিমা, সমুন্নতশীর্ষ মন্দির, বহু নৃপতির বহু অবদান। বাংলাদেশের শৈলাবাসের রাণী দার্জিলিং আর কার্সিয়াং, কালিম্পং, নীলসমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ মুখরিত দীঘা, মহানগর কলিকাতা —আসামের আশ্চর্য সুন্দর শৈলাবাস শিলঙ হইতে কাজীডাঙ্গার Sanctuary বা সংরক্ষিত অরণ্যের (গণ্ডার এখানকার আকর্ষণ) শোভা! কি না আছে ভারতবর্ষে! রাজোয়ারায় রাণাদের কীর্তি, আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর শোভা, মরুভূমির ধূসর শোভা এ সমস্তই খুঁটিয়া দেখিতে গেলে প্রচুর সময় লাগিয়া যায়।

দেশে বিদেশে পর্যটকদের কাছে এই কথাই জানাইতে হইবে। এই বিশাল দেশের সুপ্রচুর দ্রষ্টব্য, অসংখ্য দর্শনীয় স্থান; অসংখ্য পুরাকীর্তি স্থাপত্য, শিল্প দ্রব্যাদির তালিকা চিত্র সহযোগে আকর্ষণীয় এবং সুন্দর বিবরণী সহ পুস্তিকা যোগে তুলিয়া ধরিতে হইবে। কেবল বিদেশে নহে, স্বদেশেও। দেশের অভ্যন্তরের যাতায়াত ভ্রমণ কেবলই আনন্দদায়ক, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের সহায়ক তাহাই নহে —অর্থনৈতিক দিক দিয়াও ইহাতে একটা সুফল দেখিতে পাওয়া যায়।

খুব আনন্দের কথা এই যে ভারত সরকার স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এই দিকে নজর দিয়াছেন। Department of Tourism স্থাপিত হইয়াছে। এই বিভাগটি সামগ্রিকভাবে পর্যটন ব্যবসায়কে আকর্ষণীয় করিয়া অধিক সংখ্যক পর্যটকদের আগমনকে সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সঙ্গে দর্শনীয়বস্তুর দর্শনও সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই টুরিস্ট বা পর্যটকদের আগমনের সঙ্গে স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়, টুরিস্ট গাইড, দর্শনীয় স্থানের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে নানান পুস্তিকা, সেই স্থানের প্রচুর হস্ত ও কুটির শিল্প সামগ্রী, ছবি বা Picture Postcard-এর ব্যবসা এবং পরিবহন প্রতিষ্ঠানের উন্নতিও যুক্ত। এই জন্য এই বিভাগের তরফ হইতে গাইড্‌দের ট্রেনিং দিয়া লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট দিয়া নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ভাল পরিবহন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইতেছে, কিছু কিছু সুন্দর আকর্ষণীয় পুস্তিকাও প্রকাশিত হইতেছে। বিভিন্ন রাজ্যের এই Departmant of Tourism বিভিন্ন উপায়ে তাহাদের কার্যক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে।

কিন্তু যাহারা একবার এদেশের বিভিন্ন দর্শণীয় স্থান দেখিতে বাহির হইয়াছে তাহারাই জানে যে এই Departmentএর কাজ যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই তো বটেই—অনেক সময়ে প্রয়োজনের পরিধিও স্পর্শ করিতে অক্ষম হইয়াছে। কয়েকটি বাছাই করা জায়গা ছাড়া অধিকাংশ জায়গা সম্পর্কে কোনও পুস্তিকা নাই। সচিত্র পুস্তিকার মধ্য দিয়া বিদেশাগত পর্যটকদের সব কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ না করা হইলে তাহারা কিভাবে আকর্ষণ বোধ করিবে বা কিভাবে আদৌ কোন ধারণা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে? বহু জায়গায় যাতায়াতের ব্যবস্থাও একেবারে সন্তোষ-জনক নহে। কোনও কোনও জায়গার অবস্থান সম্বন্ধেও যথেষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এই জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত ম্যাপ দরকার। আসল কথা Tourist Information Centre বা পর্যটকদের তথ্যানুসন্ধান কেন্দ্রকে আরও বেশি পরিমাণে সক্রিয় সহ-যোগিতা প্রকাশ ও তথ্য পরিবেশন করিতে হইবে। খাদ্য, স্থান বা আশ্রয় ভাল পরিবহন ব্যবস্থা এই তিনটির উপরে পর্যটকদের আগমন এবং পর্যটনের হার অত্যন্ত নির্ভরশীল।

এই প্রাচীন দেশ ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃতি সমাজ জীবন সম্পর্কে আগ্রহী প্রচুর ব্যক্তি আছেন। কাহারও বা নিছক কৌতূহল কাহারও বা অনুসন্ধান স্পৃহা। কিন্তু দুইশত বৎসর ইংরেজাধীনে থাকিয়া আমাদের মধ্যে এমন এক শ্বেতাঙ্গভীতি রহিয়াছে যে আমাদের দেশের মানুষ কখনই কোনও শ্বেতাঙ্গের সহিত হৃদ্যতা স্থাপন করিয়া তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে না। অথচ ভারতীয়রা বিদেশে গেলে বিদেশীয়দের নিকট হইতে উচ্চ আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা লাভ করিয়া থাকেন। এই অভ্যর্থনা আন্তরিক হইলে বহু বিদেশী ব্যক্তি আরও বেশি সংখ্যায় এদেশে আসিবে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বিদেশী tourist দের খাদ্য এবং পাণীয়ের অভ্যাসের কথা মনে রাখিয়া এদেশে তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য-পূর্ণ আবহাওয়া তৈয়ারী করিতে হইবে। দেখা যায় যে এদেশের অতিরিক্ত নীতিবাগীশের দল পাণীয় মদ্যকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিবার জন্য অত্যুৎসাহী। অথচ বিদেশীর ক্ষেত্রে এই মদ্য সম্পূর্ণভাবে অপরিহার্য। তাহারা অনেকে সাদা জল জীবনে কখনও পানই করেন নাই। এই ক্ষেত্রে মদ্যপান নিরোধক আইন সম্পূর্ণভাবে আরোপিত করা অত্যাচারের সামিল এবং বিরক্তিকর। সমাজের বহু অহিতকর ব্যাপার মদ্যপানের জন্য সংঘটিত হইলেও বিদেশাগত Touist বা পর্যটকের জন্য এই আইন শিথিল করা দরকার। এইরকম নানা দিকে দৃষ্টি দিয়া সরকারের পর্যটন ব্যবসায়কে আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এই যে তাহার প্রচার যন্ত্র যথেষ্ট সরব নহে। এই প্রচার-বিমুখতা দূর করিতে হইবে। বিদেশে প্রচার করিয়া এদেশের প্রকৃতির ঐশ্বর্য ও অন্যান্য নানা বিষয়ের আকর্ষণকে জানাইতে হইবে। যথেষ্ট দূরদৃষ্টি, আন্তরিক আমন্ত্রণ, বিদেশীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর, যথেষ্ট তথ্য-প্রচার, এই সব দিকে দৃষ্টি দিলেই ভারতের পর্যটন-ব্যবসায় দিনের পর সমৃদ্ধতর হইয়া এদেশের জাতীয় সমৃদ্ধির পথও প্রশস্ততর করিয়া দিবে।

৪৩

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার উপর বাণিজ্যের প্রভাব

আজিকার দিনে কোনও শিক্ষিত চিন্তাশীল মানুষকে একথা বলিয়া দেওয়া অত্যন্ত বাহুল্য যে মানুষের সভ্যতা এবং অগ্রগতি, তাহার সামাজিক স্বরূপ এবং সাংস্কৃতিক রূপটি সম্পূর্ণভাবে সমকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সূক্ষ্ম তাত্ত্বিক বিতর্কের ধূলিঝড় উড়াইবার, বহু সূক্ষ্ম তথ্যের

প্রামাণিকতা প্রতিপাদনের প্রয়োজন নাই। একটু চোখ মেলিয়া ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ধরা পড়িবে গুহবাসী ও পশু মাংসের উপর নির্ভরশীল পশুচারণ-কারী মানুষের, এবং কৃষিজীবি মানুষের সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য কত বেশি। এই পার্থক্য আসিয়াছে তাহাদের অর্থনৈতিক কাঠামো, বা উৎপাদন-বন্টন ব্যবস্থার পার্থক্যের জন্য। আরও একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে এ কথাও স্পষ্টত প্রতীয়মান হইবে যে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিনির্ভর যুগের সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক চিন্তার সহিত বণিকযুগ বা আজিকার ধনতান্ত্রিক যুগের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দুস্তর ব্যবধান।

যদি উপরি-উক্ত সত্যের মর্মগ্রহণে আমাদের বিলম্ব না হয় তাহা হইলে সংস্কৃতি এবং সভ্যতার উপর বাণিজ্যের প্রভাব কতখানি গভীর এবং দূরাতিশায়ী তাহা অনুধাবন করিতেও আমাদের বিলম্ব হইবে না। তবে এই অনুধাবন কার্যের পূর্বেই মানুষের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির স্বরূপটি কি সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটি স্পষ্ট করিয়া লইতে হইবে।

মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের মধ্যে প্রধান লক্ষ্য হইতেছে স্বাচ্ছন্দ্য। প্রতিকূল প্রকৃতির বাধাকে জয় করিয়া মানুষ ক্রমেই উন্নততর ও স্বচ্ছন্দতর জীবনমানকে অর্জন করিতে প্রয়াসী। জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন ও অনুভব করিয়া সে ক্রমশ পূর্ণতার ও বিকাশমুখীনতার দিকে অগ্রসর হয়। এই বিকাশের পথে অগ্রগতিকেই সভ্যতা বলিয়া আমরা অভিহিত করি। সভ্য মানুষের মানসিক অগ্রগতি ও বিকাশের পরিচয়ই তাহার সংস্কৃতি। মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ ও সংস্কার যাহার দ্বারা সাধিত হইত তাহাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির ও সভ্যতার অন্য সংজ্ঞা অন্য দৃষ্টিভঙ্গি হইতেও দেওয়া যায় বটে কিন্তু মোটামুটিভাবে কাজ চালাইবার ও বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী ইহা প্রাচীন প্রবাদ হইলেও ইহার মূলগত সত্যতা আজ পর্যন্ত অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় নাই। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্য এবং শ্রী। ঐশ্বর্যের বৃদ্ধিতে দেশের সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধ দেশে সভ্যতার উপাদান ও উপকরণের সংখ্যাও বেশি। উপকরণের সংখ্যাধিক্যেই সভ্যতার অগ্রগতির পরিমাপ ইহা যদিও ঠিক নহে। চিৎপ্রকর্ষের পরিমাপও অবশ্যই করা প্রয়োজনীয়। তবু উপাদান-উপকরণ—যাঁহা বাস্তব ও পরিমাপযোগ্য তাহার আধিক্য শুভময়ই এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইলে সভ্যতারও অগ্রগতি তাই স্বতঃসিদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়িবে।

দেশের সংস্কৃতি তাহার ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। বাণিজ্যের মধ্য দিয়া ঐতিহ্যের রূপান্তর হয়না সত্য—কিন্তু পরোক্ষে দেশের জনসাধারণের মানসিকতার উপর প্রভাব

পড়ে বলিয়া সেই বহুদিনাগত ঐতিহ্যরও পরিবর্তন হয়। দেশে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হইলে—শিল্পের ও উৎপন্ন দ্রব্যেরও সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বাড়ে। ইহাতে সামগ্রিক ভাবে দেশের শ্রীবৃদ্ধি তথা সভ্যতা প্রভাবিত হয়। তখন পুরাতন, ঐতিহ্যাগত ধারণারও পরিবর্তন হইতে থাকে। —কারণ বাণিজ্য সূত্রে আন্তর্জাতিক সংস্পর্শে আসিতে হয় বলিয়া বহু জাতির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত হইতে হয় বলিয়া দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে উদারতা আসে, পুরাতন সংস্কারের বন্ধন আর আচ্ছন্ন ও মোহমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। তখন দেখা যায় কৃষিনির্ভর সভ্যতার সঙ্গে, এই নূতন বাণিজ্য-কেন্দ্রিক সভ্যতার মধ্যে কত পার্থক্য। সভ্যতার উপর বাণিজ্যের সামগ্রিক প্রভাব যে কতটা গভীর তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ ভারত ইতিহাসের দিকে আমরা তাকাইতে পারি। ভারতবর্ষ প্রাচীন আমলে যখন অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী ছিল—বিশেষ করিয়া বৌদ্ধ আমলে, ধরা যাক মৌর্য আমলের পরে গুপ্ত আমলেও—তখন তাহার সভ্যতার স্বর্ণযুগ চলিতেছে। বাণিজ্যে দেশ ঐশ্বর্যশালী, সমৃদ্ধশালী। সভ্যতারও চরম উৎকর্ষ। শিল্পে কলায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, উদারতর মতবাদের আশ্রয়ে। দার্শনিকতায় স্থাপত্যে ভারতীয় জীবনের এমন বহুমুখী বিকাশ—ভারতীয় সংস্কৃতির এমন স্বর্ণোজ্জ্বল যুগ আর আমরা দেখি নাই।

মুসলমান আমলে ভারত স্বভাবতই নিজেকে গুটাইয়া লইয়াছিল। সামুদ্রিক বাণিজ্য উঠিয়া যাইতেছিল—। ফলত হিন্দুদের মধ্যে কঠোর, অনমনীয়, রক্ষণশীল মনোভাবের জন্ম হইতে থাকে। বাংলাদেশে বা অন্যত্রও গোঁড়ামীর ভাব, অকারণ শ্রেষ্ঠম্মণ্যতার ভাব দেখা যাইতে থাকে। এই আমলে তাহার চারিত্রিক অবক্ষয়, মানসিক অবনতি ঘটিয়াছিল। নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করিবার মত উদার-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল। ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে আবার নূতন করিয়া বাংলা দেশে এক চিন্তার ও আদর্শের সংঘাত দেখা দিয়াছিল। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিককে, উদারতর মানবিকতাকে, মোহমুক্ত সংস্কারকে, যুক্তিকে বরণ করিবার আগ্রহ এক শ্রেণীর মধ্যে যেমন দেখা যায়—অন্য শ্রেণীর মধ্যে তেমনি এইগুলিকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা দেখা যায়। সংঘাত এই কারণেই।

যদি উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে আমাদের আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষিনির্ভর বাণিজ্য বিমুখ সভ্যতা না থাকিত তাহা হইলে এই সংঘাত আসিত না—অতি সহজেই ক্রম-বিকাশের সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্যজাতির ন্যায় আমরাও আধুনিক যুগের উদার মনোভঙ্গিকে গ্রহণ করিতে পারিতাম। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে চিন্তার ক্ষেত্রে এক আলোড়ন এবং একটি সুপ্তিভঙ্গের ব্যাপার দেখা যায় তাহার মূলে নূতন পাশ্চাত্য চিন্তার

সংস্পর্শ হইলেও—সমগ্র ঘটনায় ভিত্তিভূমিতে নূতন শিল্প বাণিজ্যের বিস্তৃতিকে কি লক্ষ্য করা যায় না ? বস্তুত যদি উনবিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আরও বেশি ঘটিত—যদি শিল্প এবং বাণিজ্যের বিস্তৃতি আরও বেশি পরিমাণে হইত তাহা হইলে সেই সময়কার উৎসাহ-উদ্দীপনা আরও বহুকালাবধি চলিতে পারিত—একথা অস্বীকার করা যায় না।

বাণিজ্য ব্যাপারটি এই রকম নিগূঢ় ভাবে মানসিকতার উপর সূক্ষ্ম প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া দেশের সাংস্কৃতিক অবস্থাতেও উনবিংশ শতাব্দী হইতে এক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। এই পরিবর্তন সূক্ষ্ম তাই হিসাব লওয়া কষ্টকর। বাণিজ্য সূত্রে ইংরেজ বণিকদের সংস্পর্শে যে দালাল, মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান আসিয়াছিল তাহাদের হঠাৎ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে এদেশে কবিগান, খেউড়, আখড়াই ইত্যাদি নূতন জিনিসের চর্চা ও উপভোগের প্রবণতা যেমন দেখা যায়—অন্যদিকে তেমনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য হইতে এবং শিল্প বাণিজ্যের কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি সূত্রে নূতন শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে চিত্রপ্রকর্ষের প্রভাবে সাহিত্যে, ধর্মচিন্তায়, সমাজ সংস্কারের আগ্রহে, নবীন বরণের উৎসাহে, স্বাদেশিকতায় জাতীয়তাবোধে সর্বপ্রকারে জাতীয় সংস্কৃতির রূপে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

যাহা বলা হইল তাহা বাংলাদেশ সম্পর্কে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি সমাজবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলিকে আমরা অস্বীকার না করি—যদি সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতিকে মানুষের চিন্তার, কার্যের পরিণতি বলিয়া মনে করি তাহা হইলে—বাণিজ্য যাহা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানসিকতা ও চিন্তাকে পরিবর্তিত ও প্রভাবিত করে—তাহা যে সভ্যতার রূপ পরিবর্তিত করে, সংস্কৃতির কাঠামোকে প্রভাবিত করিবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুত এ ব্যাপারে সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার অবকাশ আছে কিন্তু আশ্চর্য হইবার মত কোনও ব্যাপার নাই।

৪৪
গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনাকালে কেবল উপকরণ ও কার্যসূচীর তালিকা তৈয়ার করিলেই চলে না। জাতীয় জীবনের উপযোগী কোন এক দর্শন ভবিষ্যৎ সমাজের কোন এক কল্পরূপ পরিকল্পনা রচয়িতাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত থাকা প্রয়োজন। কোটি কোটি মানুষ তাহাদের নিজের জীবনের নূতন অর্থ খুঁজিয়া পাইবে, এক মহত্তর উদ্দেশ্যের অভিমুখে মনপ্রাণ ঢালিয়া কাজ করিবে, এমন এক

নির্দিষ্ট ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করিবে যাহাতে আমরা আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছিতে পারি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল নীতিরই গভীরতর কোন এক লক্ষ্য ও তাৎপর্য থাকা দরকার।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুভারম্ভে ভারতের পরিকল্পনা রচয়িতাদের মনে এইরূপ চিন্তা দেখা দেয়। সুস্পষ্ট কোন আদর্শ না থাকিলে নোঙরহীন নৌকার মত পরিকল্পনা রচয়িতাগণ নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে পৌছিতে পারিবে না। এইজন্য সর্বজনস্বীকৃত কোন মূল্যমান বৃহত্তর গণমানস কর্তৃক স্বীকৃত থাকা দরকার। সামাজিক বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে চেতনা স্পষ্টতর হওয়া দরকার, তাহা না হইলে শাসনকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যের তাৎপর্য হারাইয়া ফেলিবে, যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী নেতৃত্বের ভার বহন করিতে পারিবে না। প্রতিদিন সরকারের কর্মচারিগণ এবং নেতৃবৃন্দ খুঁটিনাটি সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে যে অসংখ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্য সকলের চিন্তা ও ভাবজগতে এক সদাজাগ্রত চেতনা বজায় রাখা দরকার। এই সকল কারণের দরুনই ভারতে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজব্যবস্থা" উপস্থিত করা হইয়াছিল।

এই লক্ষ্য বা আদর্শ বিশেষ কোন তত্ত্বের বা অপর কোন দেশের গৃহীত মতবাদের নিছক অনুকরণ নয়। ভারতের জাতীয় প্রয়োজন, ঐতিহ্য ও পরিবেশ হইতে ইহার উদ্ভব। অনড় অচল কোন এক তত্ত্বের গণ্ডীতে ইহা আবদ্ধ নয়, পরিবর্তনশীল অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলার মত প্রসারতা ইহার আছে। বিশুদ্ধ সমাজতন্ত্রের মূল নীতি হইল, উৎপাদনের সকল উপকরণ সমূহের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূতভাবে থাকা প্রয়োজন। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক কাঠামোতেই বিজ্ঞানসম্মত এবং সুপরিকল্পিত উপকরণের নিয়োগ-বিন্যাস সম্ভবপর; একমাত্র এই পরিবেশেই সামাজিক কল্যাণ সর্বাধিক মাত্রায় বিধৃত হইতে পারে, প্রতিযোগিতা মূলক কাজকর্মের অপচয় বন্ধ হইয়া যায়, বাণিজ্য-সংকটজনিত অর্থনৈতিক ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজতন্ত্রের সকল কিছুই গ্রহণযোগ্য মনে না হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ইহাতে কিছুটা বাধ্যতামূলক জবরদস্তির দিক থাকে, ব্যক্তির স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রেরণা ও কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। অর্থনৈতিক ও শাসন ক্ষমতা মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত থাকিলে জটিলতা বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্কোচন ঘটে। তাই গণতান্ত্রিক পথে, গণতন্ত্রের উপযুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও কাঠামো বজায় রাখিয়া সমাজতন্ত্র গড়িতে পারিলে উহা আদর্শ সমাজব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ব্যক্তির মুক্তির জন্য

সমাজতন্ত্র চাই কিন্তু গণতান্ত্রিক ভাবধারা বজায় না থাকিলে ব্যক্তির মুক্তি হয় না। তাই গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র একই সঙ্গে ব্যক্তির স্বাধীনতা বজায় রাখে এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তাই সুস্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে ভারতের রাষ্ট্রাদর্শ হইল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের তিনটি সমস্যা লইয়া দেশে নানা চিন্তাভাবনা সুরু হইয়া গিয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখনও এই আদর্শের রূপ এবং ইহাতে পৌঁছিবার পথ সম্পর্কে দ্বিধাহীন হন নাই। প্রথমত, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বলিলে বোঝা যায় পার্লামেণ্টারী প্রথায় সমাজতন্ত্র গড়িয়া তোলা। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া এবং উহার রীতিনীতি ও ভাবাদর্শ দেশের মধ্যে প্রসার করিয়া স্তরে স্তরে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটাইতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে কোন শ্রেণী লাভবান হয় পুরাতন কোন শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অথবা আর্থিক ক্ষতি না-হইলেও তাহার সামাজিক পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। পার্লামেণ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে যতটুকু পরিবর্তন করা সম্ভব, এই পদ্ধতিতে ঠিক তখনই তাহার বেশি পরিবর্তন করা হইবে না। এই প্রসঙ্গে নানা সমস্যা আলোচিত হইতেছে। যেমন, দেশের পার্লামেণ্টে যে শ্রেণী হইতে বেশি প্রতিনিধি যাইবে সেই শ্রেণীর ইচ্ছানুসারে পরিবর্তন ঘটিবে। অপরাপর শ্রেণীসমূহের কম প্রতিনিধিত্বের দরুন খুবই অসুবিধা হইবে, তাহাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটান এই পদ্ধতিতে সম্ভব হইবে না। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এই সমস্যা মিটাইবার কোন পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় সমস্যা হইল বর্তমানের সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন করা যায় কি উপায়ে? সমাজতন্ত্রের জন্য পুরানো প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি দরকার এবং নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার। যেমন, শিল্পক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা ভাঙিয়া দেওয়া প্রয়োজন এবং এন্‌জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ্‌, সমাজবিজ্ঞানী ও শ্রমিকদের লইয়া গঠিত পরিচালকমণ্ডলী গঠন করা দরকার। যেমন কৃষিক্ষেত্রে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানার অবলোপ দরকার এবং নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় বা স্বেচ্ছামূলক সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন করা দরকার। গণতান্ত্রিক পথে যাঁহারা সমাজতন্ত্র গঠন করিতে চান তাঁহারা বলেন যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির অবলুপ্তি এখনই এবং দ্রুত না ঘটাইয়া কিছুদিন যাবৎ চেষ্টা করা উচিত—যদি পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকেই সংস্কার করিয়া এবং উহাদের মধ্যে নূতন ভাবাদর্শ প্রবেশ করাইয়া উহাদের সমাজতন্ত্রের পক্ষে উপযোগী করিয়া তোলা যায়।

এই প্রসঙ্গে কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলেন যে ভারতের বর্তমান দারিদ্র্য এত গভীর এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত বেশি যে আমাদের অগ্রগতির হার অনেক বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু পুরানো প্রতিষ্ঠানের ক্রমসংস্কার করিলে উঁহারা বিভিন্ন-দিকে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ও বাধা পাইয়া পূর্ণবেগে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন আনিতে পারে না। পদে পদে এই দ্বিধা ও বাধার জালে তাহাদের চলার গতি রুদ্ধ হইতে থাকে। এই কারণে আমরা পুরানো প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংস্কার করিয়া কাজ চালাইতে পারি না। ইহা সম্ভব হয় যে—দেশে জীবনযাত্রার মান এখনই উঁচুতে। বেশি তাড়াতাড়ির কোন দরকার নাই, যেমন ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। সেই সকল দেশে সমাজতন্ত্রে 'উত্তরণ' গণতন্ত্রের পথে নিশ্চয় ঘটিতে পারে। কিন্তু ভারতের অবস্থা ভিন্নরূপ বলিয়া প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে প্রতিষ্ঠানগত কোনো পরিবর্তন ঘটিলেই উহাতে গণতন্ত্রের ক্ষতি হয় না, বরং অনেক-ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রসারই ঘটে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আর একটি সমস্যা হইল, এই ব্যবস্থায় সরকারের অর্থ-নৈতিক ও প্রশাসনিক নীতিসমূহ প্রকৃতক্ষেত্রে সঠিকভাবে কার্যকরী হয় না। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের অন্যতম একটি প্রধান ভিত্তি হইল এইরূপ সমাজে প্রশাসনিক বিভাগের কর্মী ও পরিচালকেরা কোনো দল মত বা শ্রেণীগত স্বার্থের উর্ধ্বে থাকিয়া পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া কাজ চালাইবেন। তথাকথিত নিরপেক্ষতা এবং সংকীর্ণ প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দীর্ঘসূত্রতা তাই পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার অঙ্গলগ্ন বিষয়। দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আইনগুলিকে সচেতনভাবে কার্যকরী করিতে হয়। সরকারী কর্মচারীদের প্রতিটি আইন প্রয়োগের সময়েই শ্রেণী-বিরোধ ও সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি স্মরণ রাখিতে হয়, নিরপেক্ষতার ভাণ না করিয়া জনকল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করিতে হয়। তাহাদের সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকামী সচেতন সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। পণ্ডিত নেহরুর ভাষায় বলা চলে: "Planning is a continuous movement towards desired goals and because of this, all major decisions have to be made by agencies informed of these goals and the social purpose behind them." পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ঐতিহ্য বা ভাবধারা এইরূপ প্রাশনিক নবরূপায়ণে সর্বদা বাধা দিতে থাকে।

ভারতে লোকগণনা বা আদমসুমারী

আধুনিক রাষ্ট্রে লোকগণনার গুরুত্ব অনেক বেশী। প্রাচীনকালে ও মধ্য যুগে নানা কারণে লোকগণনা করা হইত বটে, কিন্তু তাহা এত ব্যাপক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইতিহাস হইতে যতদুর জানা যায়, প্রাচীন যুগে ইহুদী, রোমান ও অন্যান্য অধিবাসীদের সংখ্যা গণনা করা হইত। আমাদের ভারতবর্ষেও তাহার ব্যতিক্রম ছিল না। গুপ্ত যুগে লোকগণার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে একথা বলা যায়, ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নির্ভরযোগ্য ভাবে লোকগণনার কাজ হয় নাই। পূর্বেকার লোকগণনার পদ্ধতিতে যথেষ্ট ত্রুটি ও গলদ ছিল। গ্রেট বৃটেনে নিয়মিতভাবে প্রতি দশ বৎসর অন্তর লোকগণনার প্রথা চালু হয় ১৮০১ সাল হইতে। ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে প্রথম লোকগণনা হইয়াছিল ১৮৭০ সালে। তারপর নিয়মিতভাবে দশ বৎসর অন্তর ভারতে লোকগণনা চলিয়া আসিতেছে। উহার গুরুত্বও যেমন বাড়িতেছে, তেমনি নানা বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের দ্বারা জাতীয় জীবনের নিখুঁত চিত্রও উদ্‌ঘাটিত হইতেছে।

লোকগণনা বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় নরনারী শিশুদের সংখ্যা এবং তাহাদের বয়স ও জাতি, বৃত্তি, শিক্ষা, বিবাহ প্রভৃতির বিবরণ। আধুনিক যুগে কল-কারখানা শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে আরও বহু বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সমাজ-বিজ্ঞানের প্রয়োজনেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। তাই আধুনিক লোকগণনা দস্তুরমত জটিল বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র শুধু পুলিসী শাসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; তাহাকে কল্যাণ-রাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া অনেক সমস্যার সমাধান করিতে হইতেছে। সুতরাং দেশের নিখুঁত চিত্রটি সম্মুখে রাখিতে না পারিলে কোনো কাজেই আধুনিক রাষ্ট্র অগ্রসর হইতে পারিবে না। পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য নানা তথ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাই লোকগণনার গুরুত্ব ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। 'সেন্সাস' বা 'লোকগণনা' বলিতে এখন শুধু মাথাগুণতি বোঝায় না, বোঝায় রাষ্ট্রের নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ। আমরা স্বাধীন ভারতের ১৯৬১ সালের লোকগণনার তথ্য সংগ্রহের বহর দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, ব্যাপারটির গুরুত্বও কতখানি বাড়িয়া গিয়াছে। বয়স, নর-নারীর সংখ্যা, জাতি, জন্মস্থান, শিক্ষা, বৃত্তি ও বৃত্তির ধরন প্রভৃতি নিয়মিত তথ্য ছাড়াও বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সিনেমা, ইমারৎ প্রভৃতিরও বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। শেষোক্ত তথ্যগুলির দ্বারা বুঝা যাইবে, দেশ উন্নতির পথে কতদুর অগ্রসর হইয়াছে

এবং এখনও উন্নতির লক্ষ্যে পৌছিতে কত বাকী। ১৯৬১ সালের লোকগণনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হইতেছে কর্মনিয়োগ ও গ্রাম হইতে শহরে লোকাগম।

পূর্বেই বলিয়াছি লোকগণনার কাজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হওয়া উচিত। তাহা না হইলে, নানা প্রকার ত্রুটি তথ্যগুলিকে বিকৃত করিয়া দিয়া রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেয়। লোকগণনার একদিকে থাকে শাসক সম্প্রদায় বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, অপর দিকে থাকে জনসাধারণ। এই দুই পক্ষের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা থাকিলে লোকগণনার কাজ নিরাপদে নির্বিঘ্নে ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে হইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি হইতে যথার্থ ফল পাওয়া যায়। ভারতের ইতিহাস হইতেই কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইয়া দিতে পারি, অ-বৈজ্ঞানিক, ত্রুটিপূর্ণ লোকগণনা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে কত ক্ষতি আনিয়াছে। ইংরেজ শাসকেরা ভেদনীতি কায়েম করিবার জন্য লোকগণনায় ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। তাই তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শাসনযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভারতের রাষ্ট্রদেহে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া পড়ে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন হইতে শুরু করিয়া র‍্যাড্‌ক্লিফ রোয়েদাদ পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক অনুপাতেই কাজ করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত আর এই প্রশ্নের উপর তেমন জোর দেয় নাই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রশ্ন এখন বড় হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় লোকগণনার তথ্যকে বিকৃত করা হইয়া থাকে। স্বাধীনতার পূর্বে অখণ্ড বাংলায় লোকগণনা-বর্জনের পরিণাম নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি অস্বীকার করিবার জন্যই লোকগণনা বর্জন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় এই নির্দেশ মানিয়া লইলেও অন্য সম্প্রদায় মানিয়া লয় নাই। তাই লোকগণনায় বিকৃত তথ্যই প্রকাশ পাইল। বাংলা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত হইয়া গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের উদগ্র বাসনা হইতে লোক-গণনার তথ্য কিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে তাহার দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। জনসাধারণের দিক হইতে অসহযোগিতা, সঙ্কোচ ও তথ্য গোপনের ফলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লোকগণনায় ত্রুটি দেখা দেয়। বিশেষ করিয়া যেখানে নিরক্ষর অধিবাসীর সংখ্যা বেশী, সেখানেই মারাত্মক ত্রুটি ঘটিবার সম্ভাবনা। তাহারা লোকগণনাকে সংস্কারের দৃষ্টি লইয়া দেখিয়া থাকে। মনে করে সরকার ট্যাক্স বসাইবার অভিপ্রায় লইয়া হয়তো সব সংবাদ জানিতে চান। তাই, অনেক ক্ষেত্রে নিরক্ষর জনগণ প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিয়া বিকৃত তথ্য জানাইয়া থাকে। সুতরাং সরকারকে এইসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা

অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাই আমরা লোকগণনার রিপোর্টে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইয়াছি।

১৮৭০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৬১ সাল পর্যন্ত প্রতি দশ বৎসর অন্তর লোকগণনা করা হইয়াছে। এইবার লইয়া সর্বসমেত দশবার লোকগণনা হইল। প্রথমবারের লোকগণনায় তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না; কিন্তু ১৯৬১ সালের লোকগণনা নানা কারণে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত,—ইহার তথ্যাদি যেমন বিচিত্র, তেমনি বিপুল। এখানে আমরা অন্যান্য বৎসরের সহিত ১৯৬১ সালের লোকগণনার তুলনা করিয়া তথ্যাদির আলোচনা করিব। ইহাতে ভারতের চিত্র কিছুটা তুলিয়া ধরা যাইতে পারা যাইবে। প্রথমেই বলিয়া রাখি, ১৯৬১ সালের লোকগণনায় জম্মু-কাশ্মীর ও তুষারাবৃত অঞ্চলকে প্রথম ধরা হইল, ইতিপূর্বে এই অঞ্চলগুলির লোকগণনা করা হয় নাই। ১৮৯১ সালে ভারতের (অখণ্ড ভারতের) লোকসংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৫৯ লক্ষ, আজ সেখানে দাঁড়াইয়াছে (কেবল খণ্ডিত ভারতেই) ৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ। সাক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা ১৯০১ সালে ছিল শতকরা ৭ জন, আজ সেখানে শতকরা ২৩·৭ জন। বৃটিশ আমলে সাক্ষর ব্যক্তিদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ে নাই। স্বাধীন ভারতেই বৃদ্ধিটা চোখে পড়ে—যেমন, ১৯৫১ সালে ১৬·৭% এবং ১৯৬১ ২৩·৭%। তবুও বলা যায়, সাক্ষরতার দিক দিয়া ভারত অনেক পশ্চাৎপদ। ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য তথ্য হইতেছে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের অধিবাসীদের অনুপাত—আজও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশী। ১৯২১ সালে গ্রামবাসীর ও শহরবাসীর অনুপাত ছিল শতকরা ৮৮·৬ ও ১১·৪ জন; এখন সেক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে ৮২·১৬ ও ১৭·৮৪ জন। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের ফলে শহরগুলি বাড়িয়া উঠিতেছে, নূতন নূতন শহর নির্মিত হইতেছে। ১৯৫১ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে লক্ষাধিক লোকসংখ্যাবিশিষ্ট শহরের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। লোকগণনার আর একটি বিশেষ দিক—নরনারীর অনুপাত। ১৯০১ সাল হইতে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ৬০ বৎসর কালে ভারতে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ১৯৬১ সালে হাজার পুরুষে ৯৪০ জন নারী। রাজ্যগুলির নারী-পুরুষের অনুপাতে হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২২ ডিগ্রী অক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত রাজ্যগুলিতে নারীদের সংখ্যা দক্ষিণ দিকের চেয়ে কম, উত্তর দিকে ৮৫০—৯০০ এবং দক্ষিণ দিকে ৯৫০—১০০০-এর মধ্যে। ভারতে বিভিন্ন রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতও (১৯৫১—১৯৬১) বিশেষভাবে বিবেচ্য। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১০ হইতে ২৬ পর্যন্ত; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৩২·৯৪ জন এবং আসামে ৩৪·৩০ জন।

উদ্বাস্তুই এইরূপ অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ, তাহা সহজেই অনুমেয়। সমগ্র ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে ২১·৪৯%।

ভারত সরকার লোকগণনার এই বিরাট দায়িত্ব নির্বিঘ্নে ও সার্থকভাবেই পালন করিয়াছেন। দশ লক্ষ কর্মচারী—ইহাদের মধ্যে শত শত মহিলাও ছিলেন—প্রায় ৮ কোটি পরিবারের নিকট গিয়া তাহাদের তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পূর্বে এইরূপ লোকগণনার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সৌধ নির্মিত হইবে।

৪৬

ভারতের জাতীয় সংহতি

আত্মিক ঐক্যবোধ হইতেই জাতীয়তাবোধের জন্ম। পুরুষপরম্পরায় যাহারা একই রকম চিন্তা করিয়াছে, সম-সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে, সমান ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া জীবন বহন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের একতাবোধ দেখা দেয়। তাহারা অনুভব করে যে, তাহাদের ইতিহাস এক, একই অভিজ্ঞতার তাহারা উত্তরাধিকারী। একই বেদনা তাহারা ভাগ করিয়া ভোগ করিয়াছে, একই আনন্দে তাহারা উল্লসিত হইয়াছে, একই সভ্যতা ও সংস্কৃতির তাহারা ধারক ও বাহক—এই ভাবনা যাহাদের মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল তাহারা এক ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া সৃষ্টি করে জাতীয়তার। অতীতের কথা, পূর্বপুরুষগণের কথা স্মরণ করিলে তাহাদের মনে আবেগ ও অনুভূতির তরঙ্গ জাগে, গর্ব-বেদনা-আনন্দের ঐকতান ধ্বনিত হয়। নিজেদের ভৌগোলিক সীমা ও পরিবেশ, অতীত ঐতিহ্য ও সভ্যতার উত্তরাধিকার, আচার-ব্যবহার, চিন্তা ও চেতনার বৈশিষ্ট্য তাহাদিগকে এক বিশিষ্ট রূপে মণ্ডিত করে,—তাহারা তখন পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তা অনুভব করে, এবং অপরকে অনাত্মীয় ভাবিয়া অপছন্দ করিয়া দূরে সরাইয়া দিতে থাকে। একদিকে নিজেদের মধ্যে সার্বিক ঐক্যবোধ, অন্যদিকে অপরের হইতে বিচ্ছিন্নতা—এই দুই বিপরীত প্রবণতা জাতীয়তাবোধের মধ্যে সর্বদাই জড়িত থাকে। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভারতবর্ষের অগণিত নরনারী যে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া একদিন ইংরাজ-রাজ বিতাড়নে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের সেই জাতীয়তাবোধ আজ অন্তর্হিতপ্রায়। জাতীয়-সংহতির অভাব আজ ভারতের ইতিহাসে এক অনপনেয় কলঙ্কপ্রায়।

আজিকার সদ্য-স্বাধীন ভারতবর্ষের দিকে তাকাইয়া আমরা কি দেখিতেছি, সেখানে মানুষে মানুষে বর্ণগত বিভেদ: ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয় সমুদ্রমধ্যে দ্বীপের

মতন একে অপরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। দেখিতেছি, সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগাইয়া রাখিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অবাধ সুযোগ অব্যাহত রাখা হইতেছে। ভারতের এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আঞ্চলিকতার তীব্র বিষ গোপনে গোপনে কাজ করিয়া চলিয়াছে; আসামে বাঙালী মার খাইতেছে, আলীগড়ে, জব্বলপুরে সাম্প্রদারিক দাঙ্গা দেখা দিতেছে। বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যা-আসাম, বোম্বাই-গুজরাট প্রভৃতি বিভিন্ন নামাঙ্কিত ভারতের অঞ্চলগুলি নিজ নিজ প্রাদেশিকতাকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। ইহা ছাড়াও বহুভাষী ভারতবাসীর মধ্যে ভাষাগত ভিন্নতা নিত্যবিরোধ জাগাইয়া রাখিতেছে। মাতৃভাষার প্রতি প্রীতিই ভারতবর্ষের জাতীয়-সংহতির অন্তরায় রূপে দেখা দিতেছে। ভারতের উত্তর-প্রহরী হিমাচলের ওপার হইতে প্রতিবেশী চীন যখন ভারতের উপর বাহুবিস্তার করিতে উদ্যত, সদ্যোজাত পাকিস্তান যখন অকারণ উষ্মায় সর্বক্ষণ বিরোধ সৃষ্টিতে সচেষ্ট, তখন ভারতীয় জনগণ সংহতিহীন, আত্মকলহে নিমগ্ন। স্বাধীন ভারতের মানুষ সামগ্রিকভাবে এক নবজাগ্রত চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যদি নিজেদের মধ্যে সংহতি সাধন করিতে পারে তবেই আমাদের কল্যাণ; আমাদের নূতন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তবেই রচিত হওয়া সম্ভবপর।

অবশ্য পরিপূর্ণ সংহতি ভারতের ইতিহাসে দুর্লভ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই নানা বিভিন্নতায় ভারতবর্ষ আকীর্ণ। বৈদিক যুগে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব, রামায়ণের যুগে আর্যাবর্ত-দাক্ষিণাত্যের বিভেদ, মহাভারতের ভ্রাতৃ-কলহ, কুরুক্ষেত্রের কোলাহল—ভারত তখন কোনও সংহত ঐক্যে বিধৃত থাকে নাই। সামন্ত যুগে রাজন্যবর্গ পরস্পরের সহিত সর্বদাই দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়াছে—চোল রাজবংশ, গুর্জর-প্রতিহারগণ ও পালরাজাদের ইতিহাস সেই ভারতীয় অনৈক্যেরই সাক্ষ্য দেয়। মোগল যুগে আসিয়াই হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভারত-ভূখণ্ডের সকল মানুষকে এক ভারত-বোধে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ সংহতি অর্জিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্য মোগলশাসনপাশে আনত হয় নাই। রাজপুত বশ্যতা স্বীকার করে নাই, এবং হিন্দুশক্তির মনের কোণে অসন্তোষের বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলিয়াছে। অর্থাৎ, কিছুটা রাষ্ট্রীক ঐক্য মোগল যুগে লব্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সামাজিক ঐক্য বা ভাবগত ঐক্য তখনও ভারতে দেখা দেয় নাই। তারপর সুদূর সমুদ্রপার হইতে আসিয়াছে ইংরাজশক্তি। বোধকরি এই ইংরাজশাসনেই সমগ্র ভারতব্যাপী এক অনাস্বাদিত সংহতি সাধিত হইয়াছে, দুঃশাসনের প্রবল পীড়নে পীড়িত ভারতের অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেই পরশাসন হইতে মুক্ত হইবার প্রবল আকাঙ্খা যে ঐক্য জাগ্রত করিয়াছিল তাহার মধ্য হইতে আবার দ্বি-জাতি তত্ত্ব জন্ম নিয়াছে, জন্ম দিয়াছে পাকিস্তানের। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সংহতির এক ক্ষীণ সূত্র ছিল

বহুর মধ্যে একের সাধনা ; ভারতের নবীন ইতিহাসে বাহ্যসংহতির অন্তরালে আর এক নূতন সূত্র দেখা দিল,—ঐক্যের মধ্যে ভেদের সাধনা। দেশভাগ হইয়া গেল, স্বাধীনতা আসিল—ঐক্যবোধ ও বিচ্ছিন্নতা, দুই প্রবণতারই পাকা পথ নির্মিত হইয়া গেল জাতির ইতিহাসে তাই আজ ভারতীয় সংহতির সাধনায় অনুকূল ও প্রতিকূল দুই প্রবণতাই সমশক্তিতে শক্তিমান।

ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতা আজ বিভেদকে জাগাইয়া রাখিতেছে। ভিন্ন মতাবলম্বী রাজনৈতিক দলসমূহ প্রয়োজনমত ইহাকে পুঁজি করিতেছে। একদিকে, বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষার প্রতি অপার প্রীতি, অন্যদিকে হিন্দী ভাষার সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস আজ জাতীয়-সংহতির অন্তরায়। অর্থনৈতিক বিচারে অনুন্নত অঞ্চলসমূহ অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলগুলির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। নূতন শিল্পসমূহকে নিজ নিজ এলাকাধীন করিবার চেষ্টা, নিজ প্রদেশে অন্য প্রদেশীয় নিয়োগের বিরোধিতা—এবম্বিধ বহু বিভেদমূলক মনোবৃত্তি আজ নূতন যুগপ্রভাতে ভারতের সম্ভাব্য-সংহতিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিতেছে। এই প্রতিকূল বাতাস প্রতিরোধ করিবে কে ?

অনুকূল বায়ু ইহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন। সংহতি-সম্ভাবনার মূল নিহিত রহিয়াছে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অধিক অধিকার, রাজ্য সরকারের অধিকার খর্ব করিয়া প্রাদেশিকতার বিষ বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে এই শাসনতন্ত্রে। যে বিচার-ব্যবস্থা এই শাসনতন্ত্রে গৃহীত আছে তাহা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শাসনতন্ত্রে এই ঔদার্য ভারতীয় সংহতি সাধনায় সর্বাধিক অনুকূল। এতদ্ভিন্ন, নানা আর্থনীতিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়া ভারতবাসীর সামগ্রিক সুযোগ-সুবিধার বিধান ও উন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহারই মাধ্যমে সকল ভারতবাসী এক প্রচ্ছন্ন ঐক্য অনুভব করিতেছে। ইংরেজী ভাষার সর্বত্রগামিতা ভারতের সুদূরতম অঞ্চলের সহিত কেন্দ্রকে বিজড়িত রাখিতেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য আজও ভারতবাসীর মনে ক্রিয়াশীল। সর্বোপরি, পুরুষ-পরম্পরায় অর্জিত ভারতীয় ভাবসাধনার বিশিষ্টতাটুকু সকল ভারতবাসীর মজ্জায় লিপ্ত থাকিয়া জাতীয়-সংহতির আনুকূল্য করিতেছে।

সংহতি-সাধনার প্রতিকূল বায়ু ও অনুকূল শক্তি—এই দুই-এর মধ্যে পরিণামে কাহার জয় হইবে—এক মহারাজ্য পাশে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত দৃঢ়বদ্ধ কায়ায় জাগিয়া উঠিবে কি না তাহা আজ সুনিশ্চয় নহে। শক, হুন, পাঠান, মোগলের ন্যায় অন্য কোন বহিরাগত শক্তি আভ্যন্তরিক সংহতিহীনতার সুযোগ লইয়া পুনর্বার ভারত-রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত যেন না হয় সেই প্রার্থনা আমাদের প্রত্যেকের মনে জাগ্রত হউক। বহু শতাব্দীর পরশাসনের পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া যে নবীন ভারত আজ জাগিয়া উঠিতেছে 'কে বলিতে পারে তার ললাটের লিখা, কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টীকা' !

জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ

মানুষের সেই বীভৎস রূপ মনে পড়িলে আজ আমরা আতঙ্কে শিহরিত হই: মনে পড়িয়া যায় আণবিক বোমার সেই আকস্মিক ও নীরব আক্রমণে হিরোশিমার অগণিত অসহায় নরনারীর বিকৃত-করুণ মুখচ্ছবি: শক্তিমানের সেই সদম্ভ-আঘাতে মানবতার কি করুণ অপমৃত্যু! একই শতকে পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধে সারা পৃথিবীর মানুষ যখন রণক্লান্ত, মারণাস্ত্র আবিষ্কারের উদগ্র নেশায় যুদ্ধবিলাসী জাতিসমূহ যখন উন্মত্ত, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি যখন শিবিরে শিবিরে চলিতেছে, তখন শান্তির প্রার্থনায় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূরে সরাইবার জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিরাট ধ্বংসের ভয়াবহ মূর্তি মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে; বহু নিরীহ নরনারীর প্রাণনাশ হইয়াছে, বহু সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রতিকারের প্রার্থনায় মানবজাতিকে সমূহ ধ্বংসের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিয়া জগতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের আশায় পৃথিবীর ৮২টি রাষ্ট্রের সমবায়ে এই জাতিসংঘের স্থাপনা। কে বলিতে পারে সত্যই জাতিসংঘ মানুষের স্থায়ী শান্তিবিধান করিতে পারিবে কি না! মানুষের অতীত-অভিজ্ঞতা খুব আশাব্যঞ্জক নহে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও বহু রাষ্ট্রের সমবায়ে লীগ অব নেশন্‌স্ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে: মানুষের ইতিহাসে নাগাসিকি-হিরোশিমার কলঙ্কময় অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে।

সমগ্র পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যখন বিশ্বশান্তির জন্য উন্মুখ তখন আবার মানুষেরই অশুভপ্রবৃত্তি শান্তি স্থাপনায় সচেষ্ট জাতিসংঘের প্রতিবন্ধক রূপে ক্রিয়াশীল। সাম্রাজ্য বিস্তারের উদগ্র প্রলোভন আজ প্রতি মুহূর্তে দুর্বল রাষ্ট্রের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সুযোগ খুঁজিতেছে; যুদ্ধবিশ্বাসী শক্তিসমূহ, যাহারা যুদ্ধকেই মানুষের শক্তি ও বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের ও সার্থকতা লাভের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করে তাহারা, প্রতি-মুহূর্তে পৃথিবীর সম্ভাব্য শান্তিকে বিঘ্নিত করিতেছে। আবার, সহসা পররাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভীতিতে একদল মানুষ নিজেকে নানাভাবে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিতেছে। এক কথায়, সাম্রাজ্যবাদ, সামরিকবাদ ও ভয়—এই তিনের অস্তিত্বের জন্যই পৃথিবীর শান্তি-বিধায়ক জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে।

কিন্তু এই নৈরাশ্যের অন্ধকারেও আশার আলোর ঝল্‌কানি দেখিতেছে পৃথিবীর মানুষ। আণবিক বোমা, রকেট আবিষ্কার, মহাকাশ অভিযান—বিজ্ঞানের এই

জয়যাত্রা শান্তির পথ সুগম করিতেছে। পৃথিবীর প্রতিটি বৃহৎ শক্তি আজ ভাবিতেছে বিজ্ঞান-সাধনার বলে অন্যতম শক্তির হাতে না জানি কোন্ অমোঘ অস্ত্র বিদ্যমান। চূড়ান্ত জয় যে সম্ভব নহে—দুই বিবদমান পক্ষই সেকথা আজ মনেপ্রাণে বুঝিয়াছে। তাই, সহসা আক্রমণ করিবার প্রলোভন আজ দমন করিতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, জাতিসংঘ শুধু এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেই পর্যবসিত থাকে নাই—তাহার অ-রাজনৈতিক মানবহিতৈষী ক্রিয়াকর্মের পরিচয় পৃথিবী আজ পাইতেছে। ILO, FAO, UNESCO প্রমুখ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে পৃথিবী জাতিসংঘের উদারতার পরিচয় পাইতেছে। শ্রমিককল্যাণ, খাদ্য ও কৃষির উন্নতি বিধান, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি নানা জনকল্যাণমূলক কর্মে পৃথিবীর সকল জাতিকে সাহায্য করিবার জন্য জাতিসংঘ তাহার প্রসন্ন দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়াছে। কতকগুলি রাজনৈতিক কলহে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করিয়া ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে—কঙ্গোতে ও কোরিয়ায় তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। এবম্বিধ পরিবেশে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী শান্তিস্থাপনায় জাতিসংঘের সক্ষমতার প্রতি মানুষের বিশ্বাস জাগ্রত হইতেছে। মানুষ মূলতঃ শান্তিকামী—মানুষের সেই প্রবৃত্তিই জাতিসংঘের স্থায়িত্ব দীর্ঘতর করিবে, এই আশা করা যায়।

একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, সামরিকবাদের উদগ্র-লোলুপতায় জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় দোদুল্যমান,—অন্যদিকে বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি, মানবকল্যাণে জাতিসংঘের আত্মনিয়োগ, চূড়ান্ত জয়লাভে সকল শক্তির ব্যর্থতা ও মানব মনের মৌলিক শান্তিকামনায় জাতিসংঘের সফল ভূমিকা—এই দুই বিপরীত অবস্থার কোন্‌টি যে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করিবে তাহা আজ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাই মনে হয়, জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার আলো-আঁধারে আচ্ছন্ন।

বিপুলা এই ধরিত্রীর বহুবিচিত্র মানবসম্প্রদায় আজ মনের দিক দিয়া পরস্পরের সন্নিকটে আসিয়া গিয়াছে। আজ জাতীয়তা অপেক্ষা আন্তর্জাতিকতার জয়গান উচ্চারিত হইবার দিন আসিয়াছে। কি অর্থনীতিক, কি সামাজিক, কি সাংস্কৃতিক—সর্বদিক দিয়া এক দেশের মানুষ আজ অপর এক দেশের মানুষের সন্নিহিত হইয়া পড়িতেছে। মানুষ আজ ভাবিতেছে অবিলম্বে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনার প্রয়োজন, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিভক্ত এই পৃথিবী পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, রাষ্ট্রচিন্তার ঊর্ধ্বে আজ মানবতার চিন্তা ; এক মহামানবজাতির ভিত্তিতে পৃথিবীময় একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত কবে হইবে তাহারই জিজ্ঞাসা আজ সর্বজনের অন্তরে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই শুভবোধে পৃথিবীর আপামর জনসাধারণ যেদিন উদ্বুদ্ধ হইবে সেদিন জাতিসংঘই হইবে পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ামক, মানুষের আইনসভা। পৃথিবী আজ ছোট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভৌগোলিক দূরত্ব ডিঙ্গাইয়া এক দেশের মানুষ অপর

দেশের মানুষের সন্নিহিত হইতেছে, মানুষে মানুষে ভাবগত ঐক্য স্থাপিত হইতেছে, সাহিত্যে সান্নিধ্য ঘটিতেছে, এক দেশের ব্যবসায় অপর দেশের ব্যবসায়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতেছে। জাতীয়তার দিন বিগত হইয়া আন্তর্জাতিকতার দিন সমাগত : এমন দিনে জাতিসংঘের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশ হওয়া বুঝি আর যায় না। ইংরেজ কাব টেনিসনের সেই Parliament of Man and Federation of the World-এর স্বপ্ন বুঝি সার্থক হইবার দিন আসিয়াছে। জাতিসংঘ তাহারই নিদর্শন।

৪৮
ইরোপীয় সাধারণ বাজার

১৯৪৫ সালের পর হইতেই ইউরোপ একটি 'ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ' গড়িয়া তুলিবার প্রবল প্রয়াস ও তীব্র আন্দোলন দেখা দিতে থাকে। এই আন্দোলনের মূলে ছিল ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির সীমাবদ্ধ শক্তির উপর ইউরোপীয়দিগের আস্থার অভাব। পরমাণুর যুগে পশ্চিম ইউরোপের কোনো রাষ্ট্রই আর বিচ্ছিন্নভাবে 'আণবিক' শক্তি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম নহে। উপরন্তু একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই বৃহৎ শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা ইউরোপীয় দেশগুলির লুপ্ত হইয়াছে—এবিষয়েও ইউরোপীয়েরা ১৯৪৫ হইতেই সচেতন। যদিও এই দুই বৃহৎ শক্তির একটি সোভিয়েত ইউনিয়ন সাম্যবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত, তথাপি 'ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ আন্দোলনের মুখপাত্ররা, প্রধানত ফরাসী মন্ত্রীরা ঘোরতর সোভিয়েত বিরোধী। ইউরোপে মার্কিন শক্তি ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশেও তাঁহাদের সম্মতি নাই। অতএব তাঁহারা এই দুই শক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া একটি তৃতীয় শক্তি (Third force) গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর। ফরাসী ও জার্মান জাতির মধ্যে দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কলহের অবসান ঘটানোও এই আন্দোলনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

(এই গোষ্ঠীজাতিক আন্দোলন রূপ পাইয়াছে কতকগুলি ইউরোপীয় সংগঠন পরিকল্পনার মাধ্যমে। যেমন, কাউন্সিল অব ইউরোপ (Council of Europe), নাটো (NATO), মার্শাল প্ল্যান (Marshall plan), শুমান প্ল্যান (Schuman plan), প্লীভেন প্ল্যান (Pleven plan), বোনেফাস প্ল্যান (Bonefous plan), ফ্লিমলিন প্ল্যান, (Flimlin plan) ইত্যাদি। এইরূপ আন্দোলনের মধ্যে সর্বাধিক তাৎপর্যময় বিষয় হইল ইউরেটম (Euratom) ও ইউরোপীয় সাধারণ বাজার (European Common Market)।

১৯৫৭ সালের ২৫ শে মার্চ রোম শহরে ফ্রান্স, ইটালী, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং লুক্সেমবুর্গ—এই ছয়টি দেশ নিজেদের মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তিতে আবদ্ধ হয়। একদিকে পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সকল প্রকার শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া এবং বাধানিষেধ অপসারণ করা, অন্যদিকে এই চুক্তিভুক্ত দেশগুলির চতুষ্পার্শ্বে অপরাপর দেশের সহিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক-প্রাচীর গড়িয়া তোলা—ইহাই ছিল 'বারোয়ারী বাজারের' প্রধান উদ্দেশ্য। নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের সমান সুযোগের পথ উন্মুক্ত করা, সমস্ত রকম শুল্কের বাধা ১২ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে কয়েকটি দফায় দূরীভূত করা এবং বারোয়ারী বাজারের অন্তর্ভুক্ত সকল অঞ্চলে পূর্ণ প্রতিযোগিতা গড়িয়া তোলা—এইগুলিও এই পরিকল্পনার অংশবিশেষ। শুধু পণ্যের অবাধ চলাচলই নহে, ইহার ফলে ক্রমশ মূলধন এবং শ্রমিকের যাতায়াতও অবাধ চলিতে পারিবে। ১৭ কোটি অধিবাসীর একটি বিরাট জনসংখ্যা এইরূপে কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নকল্পে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবে। সাধারণ বাজারের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার জন্য ইহার অপর এক নাম 'ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি' (European Economic Community) করা হইয়াছে।

প্রথম হইতেই ইংলণ্ড এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছে। প্রথমে ইহারা পশ্চিম ইউরোপের ১৭টি দেশ লইয়া এইরূপ একটি 'বাণিজ্য শুল্ক মুক্ত এলাকা' গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে, কারণ ইহাতে কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পক্ষে পণ্য আমদানীর সুবিধা হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকরী না হওয়াতে ইংলণ্ড ইউরোপীয়ান ফ্রি ট্রেড এসোসিয়েশন (European Free Trade Association) নামে একটি পাল্টা সংগঠন গড়িয়া তোলে। ১৯৫৯ সালে সাতটি দেশ লইয়া গঠিত এই সংস্থার বাণিজ্যিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বারোয়ারী বাজারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুরূপ। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিরোধের জন্য উহা বিফল হওয়ায়, কিছুদিন পূর্বে ইংলণ্ডের সাধারণ বাজারে যোগদানের প্রস্তাবনা ঘটিয়াছে। এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল এই যে, পশ্চিম ইউরোপে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বাণিজ্য-গোষ্ঠী থাকার ফলে পশ্চিমী শক্তিসমূহের, বিশেষতঃ উত্তর অতলান্তিক চুক্তির (NATO) অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের ঐক্য ব্যাহত হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, এই বাজারের বাহিরে থাকার জন্য ইংলণ্ড সাধারণ বাজারের বাহিরে শুল্ক-প্রাচীর এবং ভিতরে শুল্ক-মুক্তির দ্বারা বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হইতেছে। তৃতীয়তঃ, ১৭ কোটি অধিবাসী লইয়া গঠিত এই বাজারে প্রবেশ করিলে ইংলণ্ডের কলকারখানাগুলি অধিকতর প্রসার লাভ করিবে, বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদনের সুবিধাগুলি পাইতে পারিবে।

ইংলণ্ডের 'বারোয়ারী বাজারে' যোগদানের এই প্রস্তাবের বিরূপ সমালোচনা ইংলণ্ডের বহু ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, ইহার ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক আধিপত্য নষ্ট হইবে এবং ইংলণ্ডের ঘরোয়া ব্যাপারে অপরের কর্তৃত্বের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইবে। সাধারণ বাজারের গোষ্ঠীজাতিক প্রকৃতির দরুণ ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হইবে। ইংলণ্ডের 'কমনওয়েলথ' দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং জগৎসভায় ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলিয়া যাইবে। সাধারণ বাজারে যোগদানের ফলে একটি চিরস্থায়ী বিবাদ ও স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হইবে বিভক্ত ইউরোপের মধ্যে—যাহার ফল ইংলণ্ডের পক্ষে সুফলদায়ী না-ও হইতে পারে। সর্বোপরি 'বারোয়ারী বাজারের' বাহিরে কমনওয়েলথ দেশগুলি, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলিও দ্রুত প্রসারিত হইতেছে—অতএব শুধু 'সাধারণ বাজারে' যোগদান সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করিলেই চলিবে না।

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের যোগদানের ব্যাপারে পৃথিবীর দুইটি সর্ববৃহৎ দেশের অভিমত জানিয়া রাখা ভাল। আমেরিকা 'ইউরোপের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি'র খাতিরে এই ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী, এমন কি, ইংলণ্ড যোগদানের ফলে আমেরিকার যেটুকু বাড়তি ক্ষতি হইবে তাহাও সে সানন্দে মানিয়া লইতে প্রস্তুত। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধী। কারণ এইরূপ পক্ষপাতমূলক আচরণ অবাধ বৈদেশিক বাণিজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, এবং এইজন্য তাহার পাল্টা প্রস্তাব হইল একটি 'ইউরোপীয় আঞ্চলিক বাণিজ্য-সংস্থা' (European Regional Trading Organisation) গড়িয়া তোলা।

কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ভারত ও অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলির দ্রুত শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কমনওয়েলথের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যিক নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইতে চলিয়াছে। কাঁচামাল উৎপাদনকারী অবস্থা হইতে এই দেশগুলি বর্তমানে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের যোগ্যতা অর্জন করিতেছে। ১৯৬০ সালে ভারত ইংলণ্ডে ১৭৫ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করিয়াছিল যাহার মধ্যে ৭৫ কোটি টাকার চা, ১৬ কোটি টাকার সুতাবস্ত্র এবং ৬·৩৭ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য ছিল। কমনওয়েলথের সভ্য হিসাবে তামাক ব্যতীত আর সকল দ্রব্যই ভারত বিনা শুল্কে ইংলণ্ডে পাঠাইতে পারে, কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ বাজারে যোগ দিবার ফলে ভারত এই সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। ভারতের সর্বপ্রকার রপ্তানিদ্রব্য ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে চাহিলে অধিক হারে শুল্ক দিতে হইবে, ফলে আমাদের রপ্তানি হইতে আয় কমিয়া যাইবে, বৈদেশিক মুদ্রা হইতে আয় হ্রাস পাইবে, বৃহৎ শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত

হইবে, বৈদেশিক মুদ্রা বা সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর হইয়া পড়িবে। ভারতের এই সম্ভাব্য সমস্তার সমাধান কোথায়? ইংলণ্ডের নিকট হইতে ভারত এই ব্যাপারে কতদূর নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাইবে তাহা অনিশ্চিত। কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, জীবজগতের প্রথম নীতি হইল আত্মরক্ষা; ইহা ব্যক্তি ও জাতি উভয় ক্ষেত্রেই সত্য। এবং সেইজন্যই আমাদের উচিত ভারতের অর্থনীতি এবং বৈদেশিক বাণিজ্যকে একটি দীর্ঘমেয়াদী (Long-term view) ভিত্তিতে গড়িয়া তোলা। যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ অবাঞ্ছিত চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ইহার থাকে।

এই উদ্দেশ্যে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন,—এই দুই ধরনের নীতির কথা বলা যাইতে পারে। স্বল্পকালীন নীতি হইল, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা। কারণ ইহারা প্রসারশীল বাজার এবং কোনোরূপ পক্ষপাত দোষ দুষ্ট নহে।

দীর্ঘকালীন নীতি হইবে আভ্যন্তরিক মূলধন-গঠনের হারকে বাড়াইয়া তুলিয়া নিজের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। কারণ ইহারই উপর নির্ভর করে আমাদের অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব। স্বাধীনচেতা, স্ব-নির্ভর ও উন্নয়নশীল ভারতবর্ষই নিজের চারিপাশে নিরপেক্ষ বন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং ক্রমে আফ্রো-এশীয়ান দেশগুলিকে লইয়া পৃথিবীতে একটি নূতন সাধারণ বাজার গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। অবশ্য মনে রাখা দরকার আজ ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের আর বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই, কারণ ফ্রান্স কৌশলে এই বারোয়ারী বাজারে ইংলণ্ডের প্রবেশ রোধ করিয়াছে। নিজেদের মধ্যে অন্ত-র্দ্বন্দ্বে এই দেশগুলি ক্রমশ দীন ও হতাশ হইয়া উঠিতেছে।

৪৯

ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

সুদীর্ঘ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে সামন্ততন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ভাঙিয়া মূল-ধনের মালিকদের যে জয়যাত্রা শুরু হইয়াছিল, আজও সেই যাত্রা থামে নাই। পৃথিবীর দেশে দেশে ভূমির মালিক সামন্তরাজা ও মহারাজাদের প্রভুত্ব নাশ করিয়া ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা মূলধনের মালিকানার ভিত্তিতে এই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছে। দেশের উৎপাদন বাড়িয়াছে, বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, ইহার প্রয়োগে দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছে,

মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছে। কিন্তু ইহারই পাশাপাশি নিয়মিত কয়েক বৎসর অন্তর ব্যবসায়-বাণিজ্যের জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়াছে, বেকারি দেখা দিয়াছে, একচেটিয়া শিল্প-সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্র রূপান্তরিত হইয়াছে একচেটিয়া ধনতন্ত্রে। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা দেখা দিয়াছে। সেখানে পরিকল্পনার সাহায্যে দেশের উপকরণের বহু অপচয় রোধ করা হইয়াছে, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ স্মরণে রাখিয়া সকলের স্বার্থে কৃষি, শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটানো হইয়াছে, বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত জীবনযাত্রার মান বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে। বেকারি, অনশন ও অনাহার দূর হইয়াছে, সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছে, নিয়মিত বাণিজ্যসঙ্কট ও তৎসংক্রান্ত অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছে। আজ তাই ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা সকলেই আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

ইহার প্রয়োজন আজ আরও বেশি, কারণ অনেক পণ্ডিতের মতে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উপস্থিত। ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে শিল্পপতিদের সম্মুখে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অজস্র সুযোগ উন্মুক্ত ছিল, বিনিয়োগের সুবিধা কোন দিক হইতে বাধা পাইত না। আজ পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয় ব্যবসায়ীশ্রেণী অপর দেশের ব্যবসায়ীদের বাধা দিতেছে। অর্থনৈতিক অসাম্য বজায় থাকায় দরিদ্র শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা বাড়িতেছে না, কলকারখানার উৎপাদন-শক্তি অব্যবহৃত থাকিয়া যাইতেছে। মূলধনের বিনিয়োগ-ক্ষেত্র আজ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত। যে-হারে উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কার হইয়াছে, নিত্য নূতন যন্ত্রোৎপাদন ও দ্রব্যোৎপাদনের প্রয়োজন মূলধন নিজের ঠাঁই খুজিয়া পাইয়াছে, আজ সেই হারে যন্ত্র ও দ্রব্যের আবির্ভাব হয় না। রেলপথ, স্টিম, বিদ্যুৎ—সবাই মানুষের করায়ত্ত হইয়াছে, প্রকৃতি বশ মানিয়াছে, মুনাফাপ্রাপ্তির উপযোগী বিনিযোগ-ক্ষেত্র আর নাই। মূলধন অলস হইয়া পড়িলে তাহা অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহার এই দুর্বলতাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার শ্লথ করিয়া তুলিয়াছে। অনেকে তাই বলিতেছেন যে, পরিকল্পনার সাহায্যে, অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করিলে এবং ব্যক্তিভিত্তিক, বিনিয়োগ দূর করিয়া বিনিয়োগের উপর সমাজ বা রাষ্ট্রের খবরদারি মানিয়া না-লইলে এই ব্যবস্থা আর টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে ধনতন্ত্র আর খাঁটি ধনতন্ত্র থাকে না, উহাতে ভেজাল আসিয়া পড়ে। বিশুদ্ধ ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তাই ইঁহারা বিশেষ শুভকর বলিয়া মনে করেন না।

আরও একটু গভীর আলোচনা করা যাউক। আজিকার পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আমরা তাই উহার পরিপ্রেক্ষিতেই ইহার ভবিষ্যৎ বিচার করিতে পারি। দেখা যাইতেছে, গত ১৯২৯-৩০ সালের অর্থনৈতিক

সঙ্কটের পর হইতে মার্কিন অর্থনীতি মোটামুটি দ্রুত হারে অগ্রসর হইয়াছে, উল্লেখযোগ্য কোনরূপ সঙ্কটে পড়ে নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও এই সমৃদ্ধি ধূলিস্মাৎ হয় নাই, বরং ইহা প্রসারিত হইতেছে বলিলেই চলে। যাঁহারা ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলিয়া মনে করেন, এবং ইহার স্থায়িত্বে আস্থাবান তাঁহারা প্রধানতঃ তিনটি বিষয়কে ইহার কারণ বলিয়া মনে করেন। ইহারা হইল : (ক) যন্ত্রকৌশলগত নূতন আবিষ্কারের মাত্রা বা হার; (খ) বিবিধ অর্থনৈতিক নীতির প্রবর্তন : এবং (গ) ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের দিক। ইহাদের প্রতিটি অল্পবিস্তর আলোচনাসাপেক্ষ।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, টেক্‌নোলজিগত নবপ্রবর্তনের (Technological Innovations) ঢেউ সাধারণত একসঙ্গে বা পুঞ্জীভূত ভাবে আসে। ধনতন্ত্রের গোড়ার যুগে শিল্পবিপ্লবের যুগ ছিল ইহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৪০-৪৫ সালে রেলপথের প্রসারকে কেন্দ্র করিয়া এবং আবার ১৮৯৭-১৯০০ সালে বিদ্যুৎ, রাসায়নিক ও মোটর-শিল্প মিলিয়া টেক্‌নোলজিগত নবপ্রবর্তনের এই তরঙ্গ দেখা দিয়াছিল। এইরূপ প্রতিটি তরঙ্গ ধনতন্ত্রের স্বর্ণযুগ আনিয়াছে, সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিনিয়োগ, উৎপাদন ও মুনাফা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, সমৃদ্ধির বেগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালেও এইরূপ নবপ্রবর্তনের গতিবেগ কম ছিল না। অনেকে এই বর্তমান যুগের নামই দিয়াছেন "বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পবিপ্লব" (Scientific-Industrial Revolution), অর্থাৎ শিল্পোৎপাদনের সহিত বিজ্ঞানকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়াইয়া ফেলা। এই আবিষ্কারপুঞ্জের মধ্যে আছে আণবিক শক্তি, স্বয়ংচালিত যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎচালিত বৃহৎ যন্ত্রাদি, আকাশযান সংক্রান্ত শিল্পদ্রব্যাদি এবং রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী। বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পবিপ্লবের সবেমাত্র সূত্রপাত, এখনও দীর্ঘকাল এই আবিষ্কারপুঞ্জের তরঙ্গাঘাত ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধি ধারণ করিবে বলিয়া মনে করা চলে।

ধনতান্ত্রিক সমৃদ্ধি বজায় থাকার অপর কারণ হইল ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলি নূতন নীতির আবির্ভাব। যেমন ১৯৪৬ সালে মার্কিন দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অধ্যাপক আলভিন্ হ্যানসেনের মতে এই আইন ধনতন্ত্রের বাঁচিয়া থাকার ক্ষেত্রে অক্সিজেনের মত কাজ করিয়াছে। বর্তমানে এই আইনের মাধ্যমে মার্কিন সরকার বহুবিধ অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিজের হাতে লইতে পারিতেছে। দরকার হইলেই সরকারী কোষাগার হইতে টাকা ঢালিয়া জিনিস কিনিয়া বিশেষ কোন পণ্যের বাজারের মন্দা প্রতিরোধ করিতেছে, দাম নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, মজুরী নির্ধারণ করিতেছে, নিজে বিনিয়োগ করিতেছে, বাণিজ্য

সঙ্কট-বিরোধী আর্থিক ও কর-নীতি গ্রহণ করিতেছে, ফাট্‌কা ব্যবসায়ের প্রসার রোধ করিতেছে, আমানত-বীমা, শস্য-বীমা ও কৃষিপণ্যের মূল্য স্থির রাখার ব্যবস্থা করিতেছে।

ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধি বজায় থাকার তৃতীয় কারণ হইল ধনতন্ত্রের প্রকৃতিতে আংশিক পরিবর্তন। দুই দিক হইতে এই আংশিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়: (ক) অলিগোপলির উদ্ভব এবং উন্নত ধরনের বাজার পর্যবেক্ষণ-বিজ্ঞানের ফলে ধনতন্ত্রের "বিশৃংখল" চরিত্র অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, এবং (খ) আয়ের বণ্টন পূর্বাপেক্ষা সমান হওয়ায় সারা দেশে ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথম কারণটি সহজেই বোঝা যাইতেছে। ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে অসংখ্য ফার্ম থাকে, স্বয়ংস্বাধীন রূপে মুনাফার লোভে প্রত্যেকে নিজ নিজ উৎপাদন ও বিনিয়োগ নির্ধারণ করে। বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা কাহারও সাধ্য নয়, অথচ প্রত্যেক বাজারের প্রভাবগুলির চাপেই নিজ নিজ কাজের গতি নির্ধারণ করে। বাজারের সমগ্র অবস্থা তাহার জানা সম্ভব নয়, সে কেবল নিজের মুনাফাটুকু সামলাইতে এবং বাড়াইতে ব্যস্ত। ইহাই ধনতান্ত্রিক বিশৃংখলতার মূল সূত্র। কিন্তু আজকাল বেশীর ভাগ শিল্পেই অধিকসংখ্যক ফার্ম নাই, প্রতিযোগিতার ততটা তীব্রতা নাই, কয়েকটি ফার্ম মিলিয়া বাজারে অলিগোপলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ইহারা মোট বাজারের অবস্থা জানে, নিজেরা দাম স্থির করে, চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন কমাইয়া বা বাড়াইয়া বাজারকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া রাখে। এইরূপেই ধনতন্ত্রে অধিকোৎপাদন ও সঙ্কটের সম্ভাবনা হ্রাস পাইয়াছে, তাহার "বিশৃংখল" চরিত্রে রূপান্তর আসিয়াছে, ইহাই অনেকে মনে করেন। দ্বিতীয় কারণটি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান যুগে আয়ের বণ্টন পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সমান হইয়া আসিয়াছে। করদানের পরে আয়-বৈষম্য পূর্বাপেক্ষা অনেক কম ইহা ঠিকই, এমনকি করদানের পূর্বেও এই আয়-বৈষম্যের পরিধি কয়েক বৎসর ধরিয়া হ্রাস পাইতেছে। ইহার অনেক কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি, যেমন, সম্পত্তি হইতে আয়ের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা কম, অধিকসংখ্যক ব্যক্তির হাতে কিছু কিছু শেয়ারের মালিকানা, মালিকানা ও পরিচালনায় ক্রমাগত পার্থক্যের বৃদ্ধি, শ্রমিকসংঘ প্রভৃতির হাতে শক্তির প্রসার (strength of countervailing power) এবং বিভিন্ন রূপ সরকারী কল্যাণমূলক কাজকর্মের বৃদ্ধি। এই পরিবর্তনের প্রধান ফল সমাজের ভোগপ্রবণতা বা মোট ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি—ধনতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

মিঃ জন্ স্ট্র্যাচি তাঁহার 'সমসাময়িক ধনতন্ত্র' নামক বইখানিতে ধনতন্ত্রের এই রূপান্তরণকে বিশেষ অভিনন্দন জানাইতে পারেন নাই। এই পরিবর্তনকে তিনি

প্রগতিশীল বলিয়া মনে করেন না। তিনি এইরূপ অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিরুদ্ধে। কারণ ইহারই মধ্যে রাজনৈতিক জীবনে ফ্যাসিবাদের বীজ লুকানো আছে বলিয়া তিনি মনে করেন। এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার পথ হিসাবে তিনি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের উপর ভরসা করেন, ইহার প্রসারই ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক কেন্দ্রিকতাজাত দোষত্রুটি অনেকাংশে দূর করিতে পারিবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

আধুনিক ধনতন্ত্রের এই স্থায়িত্বের মূলে আর একটি কারণ অনেক পণ্ডিত দেখাইতে চান। ধনতান্ত্রিক কাঠামো প্রধানতঃ বাঁচিয়া আছে অপচয়ের উপর, প্রভূত অপচয় আজ স্বাভাবিক ব্যয় বলিয়া গণ্য হইতেছে। অপচয়কে এই কাঠামোর অঙ্গীভূত করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া ধনতন্ত্রের এই সাফল্য ঘটিতেছে। অপচয়ের আত্মীকরণ বা স্বাভাবিকীকরণ এ-যুগের ধনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যয় বহু পূর্ব হইতেই রহিয়াছে বটে, কিন্তু আধুনিক কালে এই ব্যয়ের পরিমাণ বিপুল, ইহার প্রকৃতিও পৃথক। ইহা কেবল আর বিক্রয়ের ব্যয় নয়, ইহার কাজ হইল ক্রেতার অভাববোধকে সুসংহত করা, উদ্দীপ্ত করা, সমন্বিত করা, লোভের ও প্রয়োজন-বোধের স্তর হইতে মানুষকে তুলিয়া লইয়া তথাকথিত ব্যয়শীলতার আভিজাত্যে প্রতিষ্ঠা করা। বিজ্ঞাপনের চাপে সাধারণ মানুষ একধরনের ছাঁচে পরিণত হইয়াছে; নিজস্ব প্রয়োজন, পছন্দ, রুচি, চিন্তা ও মনন-ক্ষমতা লুপ্ত হইয়াছে। ধনতন্ত্রের পরিণত বয়সে এই বিজ্ঞাপন ব্যয় "বাজার" রক্ষা করিতে সাহায্য করিতেছে, মুনাফা বাড়াইবার উদ্দেশ্যেই মুনাফার একাংশ উৎপাদক মূলধনে পরিণত না হইয়া লোকের হাতে পৌঁছিয়া ভোগপ্রবণতা, অর্থাৎ লোকের ক্রয়শক্তি বা বাজার বাড়াইয়া তুলিতেছে। অপচয়ের অঙ্গীভবনের আর একটি দিক হইল এ-যুগের বিপুল সামরিক ব্যয়। ১৯৫৬ সালে মার্কিন সরকার সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়াছিলেন ৪২·৪ মিলিয়ন ডলার বা আমেরিকার জাতীয় আয়ের ১০·২%। সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা ও ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে যে-ফাঁক ধনতন্ত্রে অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দেয়, এইরূপেই তাহার পূরণ হইতেছে। এই ব্যয় তাই আধুনিক ধনতন্ত্রের অঙ্গীভূত, অতি প্রয়োজনীয় এই অপচয় চলিতে না-থাকিলে ধনতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠিবে, ইহাই ধনতন্ত্রের সঞ্জীবনী রস।

কথা হইল, সামরিক ব্যয়ের নামে এই বিপুল অপচয় না করিয়া মার্কিন সরকার সমৃদ্ধি বজায় রাখিতে পারে কি? রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, স্কুল, কলেজ, হাসপাতালে ব্যয় বাড়াইয়া ইহা সম্ভব কি? ইউরোপীয় ফ্রণ্টে যুদ্ধরত এক মার্কিন সেনা অনেক তত্ত্ববিদ্ ধনবিজ্ঞানীকে একটি সাধারণ প্রশ্ন করিয়া হতচকিত করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। উহা হইল "যদি মারণাস্ত্র উৎপাদন করিয়া আমেরিকা তাহার সমৃদ্ধি রক্ষা করিতে

পারে, তবে মানুষের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করিয়াই বা সে ইহা পারিবে না কেন ?" এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ লুকানো আছে।

মনে করা যাক, ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহাওয়া দূর হইয়া শান্তির মধুর বাতাস বহিতে শুরু করিল। মার্কিন সরকার এই অবস্থায় যদি ২৫ মিলিয়ন ডলার "মারণাস্ত্র" ব্যয় কমাইয়া দেন, তবে দেশের কার্যকরী চাহিদা সমান রাখার জন্য এই পরিমাণ মূলধনের সাহায্যে জীবনধারণের দ্রব্যাদি বা "জীবনাস্ত্র" তৈয়ারী করিতে পারেন কিনা। এই মূলধনের বিনিয়োগে কি-বিপুল জীবনাস্ত্র তৈয়ারী হইতে পারে, আমরা তাহা পূর্ব-প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের একটি বিবৃতি হইতে জানিতে পারি। এই বিবৃতিতে একটি সহজ সত্য ধরা পড়ে যে, "মারণাস্ত্রের" তুলনায় "জীবনাস্ত্রের" ব্যয় নিতান্ত কম। "আধুনিক একটি ভারি বোমারু বিমানের খরচা হইল : ত্রিশটির অধিক শহরে আধুনিক ধরনের ইঁটের তৈয়ারী এক একটি বিদ্যালয় ; দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ; প্রত্যেকে ৬০০০০ জনসংখ্যাসহ এক একটি শহরের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী দুইটি অতি সুন্দর, সকল যন্ত্রপাতি সমন্বিত হাসপাতাল ; পঞ্চাশ মাইল সিমেণ্টে বাঁধানো সড়ক ; ৫ লক্ষ বুশেল গম ; ৮০০০ লোক বসবাস করিতে পারে এমন সংখ্যক বাড়ি।"

উপরের তালিকা আমাদের মত দেশের পক্ষে লোভনীয় তো বটেই, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বুভুক্ষু জনসাধারণের নিকট নিছক স্বপ্ন। কিন্তু ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া মার্কিন সরকার এই সকল উৎপাদন করিতে পারেন না। পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিয়া মুনাফা করা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্র, সেখানে হস্তক্ষেপ করা মার্কিন সরকারের কোন সাধ্য নাই। অস্ত্রসজ্জার বিপুল ব্যয়ের কারণই হইল এই অস্ত্রশস্ত্র বাজারে আসে না, লোকের কাছে বিক্রয় হয় না, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয় না, অথচ লোকের হাতে পয়সা আসে, পণ্য বেচিয়া সেই পয়সা ব্যক্তিগত মূলধনের মালিকেরা নিজেদের হাতে তুলিয়া লইবার সুযোগ পান। শুধু মার্কিন কেন, পৃথিবীর সকল ধনতান্ত্রিক দেশেই এই অবস্থা, এমন কি ভারতের মিশ্র-অর্থনীতিতেও এইরূপেই রাষ্ট্রশক্তি ব্যক্তিগত শিল্পপতিও ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা ও প্রসারের ব্যবস্থা করিতেছে। ধনতন্ত্রে মুনাফাই উৎপাদনের একমাত্র প্রেরণা, এই মুনাফা রক্ষার জন্যই অপচয়ের অঙ্গীকরণ। "রুচি, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আধুনিকতা"র দোহাই দিয়া কতটা সার্থকতার সহিত এই অপচয়ের স্বাভাবিকীকরণ ঘটে তাহারই উপর ধনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিহিত।

বাঙালীর সামাজিক জীবনযাত্রায় অর্থ নৈতিক প্রভাব

বাংলা দেশে ক্রমশঃ ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে সামাজিক জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার সমাজ-জীবনের সঙ্গে এখনকার সমাজ-জীবনের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। কেহ যদি প্রবাসে চল্লিশ বৎসর কাটাইয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া আসে তবে তাহার অবস্থা অনেকটা রিপ ভ্যান উইংকিলের মত হইবে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমেই চোখে পড়িবে, ভাঙন ধরিয়া আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের অবস্থা এখন নাভিশ্বাসের মত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই উহার বিলোপ ঘটিয়াছে;—পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, গৃহের বাহিরে বিদেশে উপার্জন করিতে গিয়াছে। যেখানে একান্নবর্তী পরিবারের বিলোপ ঘটে নাই সেখানে অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে: হয় পার্টিশানের ব্যবস্থা, না হয়, ভাইয়ে ভাইয়ে কথা বন্ধ। একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা বা কর্ত্রীর অবস্থা আরও খাবাপ—'ভাগের মা গঙ্গা পায় না'র মতো।

শুধু যে একান্নবর্তী পরিবার ভাঙিয়াছে বা জাতিভেদপ্রথা শিথিল হইয়া গিয়াছে তাহা নয়, সমাজের চেহারাও নানা দিক দিয়া পাল্টাইয়া গিয়াছে। ফিউড্যাল বা সামন্ততন্ত্রী জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জমির উপস্বত্ব ভোগ করিত, অথবা কেহ কেহ ব্যবসা বা চাকরি করিয়া পারিবারিক জীবন সম্পদে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত। পরিশ্রমের চেয়ে অবকাশ ছিল তাহাদের অনেক বেশী। জমিদারের কথা বাদই দিলাম। তাহাদের বিলাস ও ভোগের আয়োজন কম ছিল না। কৃষক ও ভূমি-শ্রমিকদের অবস্থা উচ্চ-শ্রেণীর তুলনায় ছিল নিকৃষ্ট—পরনে কাপড় ও দুবেলা পেট পুরিয়া ভাত-খাওয়া ভগবানের আশীর্বাদ বলিয়া তাহারা মনে করিত। কিন্তু তাহা হইলেও, সকলের ভাগ্য ছিল একই কেন্দ্রের সহিত যুক্ত। গোটা সমাজকে কৃষি-নির্ভর সমাজ বলিয়া অভিহিত করা যাইত। জমিদার ও মধ্যবিত্ত সমাজে দোল-দুর্গোৎসবের আয়োজনের অন্ত ছিল না—সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকেরাই তাহাতে যোগদান করিত। বিপুল ও বিরাট উৎসবে সমগ্র গ্রামের হৃৎস্পন্দন অনুভব করা যাইত। শহরেও ধনী ও মধ্যবিত্তদের মধ্যেও নানা উৎসব দেখা যাইত—কখনো কখনো উৎসবের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে যেসব ঘটা হইত তাহা আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মনে হয়, মানুষের খরচ করিবার যেন অন্ত উপায় ছিল না। তাই এক একটি উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা বিপুল

আয়োজন করিত। পরবর্তী কালে তাহাদের এই কীর্তি (!) প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে।

একথা সত্য যে, সে-যুগে অর্থ যত ছিল ভোগের আয়োজন ও উপকরণ তত ছিল না। তাই তাহাদের জীবন উৎসবের আনন্দ, তীর্থভ্রমণ, পরিপাটি ভোজন ও বিলাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য একথা বলা যায় যে, যাত্রা, পাঁচালী-গান প্রভৃতি অবসর-বিনোদনেরও উপায় ছিল। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই উহাতে আনন্দ লাভ করিত। তাহার উপর ছিল সান্ধ্য বৈঠকে মজলিশ—গান-বাজনা এবং আড্ডা। সর্বশ্রেণীর সঙ্গে মেলামেশা ও আন্তরিকতার সুযোগ ছিল অনেক বেশী। রাস্তাঘাটের তেমন উন্নতি হয় নাই; তাই ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা তাহাদের সমাজ-জীবনকে অতিশয় নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিল। কেন্দ্র ছিল কৃষি, আর পরিধি ছিল ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা—তাই প্রতি স্তরের বাইরের প্রভেদটা চোখে পড়িলেও সমাজগত মিলন ও ঐক্যের দিকটা অত্যন্ত গভীর ছিল।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এই প্যাটার্ন বা ছক পরিবর্তিত হইয়া গেল। যদিও উহার সবটা বদলাইয়া যায় নাই, কিছু কিছু পুরাতন আদর্শ ও মূল্যবোধ এখনও জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিলেও, সমাজ-জীবন দ্রুতবেগে নূতন পথে আগাইয়া চলিয়াছে। আয় ও ভোগ দুই-ই সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনার রূপায়ণ সমাজ-জীবনে নূতন গতিবেগ সৃষ্টি করিয়াছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে পণ্য-উৎপাদনকারীরাই পণ্য-ভোগী;—তাই উৎপাদন-বৃদ্ধি ও উৎপাদন-বৈচিত্র্য উৎপাদনকারীদের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করিতেছে। এখানেও দেখা যায়, আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিযোগিতার বিশৃঙ্খলা বহুদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। আমরা রবীন্দ্রনাথের বলাকা-কাব্যের ভাষায় বলিতে চাই, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।'

গত ৪০ বৎসরের মধ্যে, বিশেষ করিয়া গত দুই দশকে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, দেশখণ্ডন ও স্বাধীনতা লাভ, উদ্বাস্তুদের আগমন, দুইটি পাঁচসালা পরিকল্পনা, জমিদারী প্রথা বিলোপ প্রভৃতি ঘটনার প্রভাব বাঙালীর জীবনযাত্রাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়:—প্রথমতঃ, হুগলী নদী এবং ইস্টার্ন রেলওয়ে বরাবর শিল্পশহরের ব্যাপ্তি; দ্বিতীয়তঃ, সর্বঋতুর উপযোগী সড়ক ও সেতু নির্মাণের ফলে গ্রাম ও শহরের ক্রমশঃ ব্যবধান লোপ; তৃতীয়তঃ, খাদ্যশস্য ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধি; চতুর্থতঃ, জমির উপর অত্যধিক চাপবৃদ্ধির দরুন চাকরি ও শিল্পে

আত্মনিয়োগের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি ; পঞ্চমতঃ, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অবাঙালীদের আধিপত্য অবাঙালীর প্রতি অবিচার এবং বাংলার বাহিরে লভ্যাংশ প্রেরণ ; ষষ্ঠতঃ, সরকারী সংস্থায় বাঙালীর কর্মনিয়োগেও ত্রুটি ; সপ্তমতঃ, বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি ; অষ্টমতঃ, কলা-শিক্ষা অপেক্ষা বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপ্রসার ঘটিলেও তাহা গ্রাম ও কৃষির গুরুত্ব ছাড়াইয়া উঠীতে পারে নাই। কয়েকটি নূতন নূতন শহর ছাড়া অধিকাংশ শহরকে ঠিক শিল্প-কেন্দ্রিক বলা যায় না। সেইজন্য সেইসব শহরের জীবনযাত্রার একটি কেন্দ্র বিন্দু নাই ; ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র বিন্দু অবলম্বন করিয়া ছোট বড় কয়েকটি বৃত্ত গড়িয়া উঠিয়াছে।

পণ্যভোগ-স্পৃহা এবং উহার জন্য আয়-বৃদ্ধির প্রসার আমাদের জীবনকে একদিক দিয়া যেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক করিয়া তুলিয়াছে, অপর দিকে জীবনকে গতিদান করিয়াছে—আমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাই না, উপার্জন-প্রচেষ্টার মধ্যে অবসর যাপনের চিন্তাটুকুও বিলীন হইয়া যাইতেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই আধুনিক বাংলার কর্মব্যস্ত জীবনের রূপটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আমরা আগেকার মত এখন এককভাবে কোনো উৎসব করিতে চাই না—লোকাভাব ও অর্থাভাবের প্রশ্ন উঠিয়া থাকে। তাই প্রাচীন একক উৎসব-কলার পরিবর্তে দেখা দিয়াছে সার্বজনীন উৎসব। চাঁদার পীড়নের কথা বাদ দিয়াও বলা যাইতে পারে প্রত্যেক ব্যক্তি চাঁদা দিয়াই খালাস। উৎসব-সংগঠন কর্তারাও যে খুব বেশী পরিশ্রম করেন তাহাও নয়। কারণ ডেকরেটার প্রভৃতিকে বায়না দিয়া তাঁহারা কাজ সারেন। অর্থাৎ সব ব্যাপারটি যন্ত্রের মত সমাধা হইয়া যায়। এই অর্থকেন্দ্রিক সমাজে টাকাই আলাদিনের মায়ার প্রদীপ—অসাধ্য সাধনে তৎপর। কিন্তু যাঁহারা উদ্যোগ-কর্তা আর যাঁহারা চাঁদাদাতা তাঁহাদের মধ্যে কোনো আন্তরিক যোগ নাই। শুধু পূজা ছাড়াও সার্বজনীন উৎসবে জলসা, প্রদর্শনী, অভিনয় প্রভৃতি হইয়া থাকে। আয়োজন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু ঐক্যের একান্ত অভাব। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে উৎসবের চরিত্র এইরূপই হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?

পারিবারিক উৎসবের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধ আর তেমন ঘটা করিয়া হয় না। বিবাহের আড়ম্বর আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও ক্ষয় ধরিয়াছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে উহা এখন বিভীষিকার মত। বিবাহে স্বল্প-আয়োজন যেমন দেখা দিয়াছে, তেমনি অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত হওয়ায় আড়ম্বরের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। শিক্ষা-বিস্তার, চাকুরি ও শিল্প ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যায় নারীর প্রবেশ, সংবিধানে নরনারীর সমানাধিকারের স্বীকৃতি, নারী-পুরুষের ভেদ-বিলোপের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে।

অবকাশ-যাপনের পথ এখন প্রায় রুদ্ধ। কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পূর্বেও দেখা যাইত বৈঠকখানায় গাল-গল্প, তাস-পাশা আড্ডা অথবা নানা চর্চা। এখন ডাক্তারদের ডিস্‌পেন্সারী আর উকিলদের পরামর্শ-কক্ষ ছাড়া অন্যান্য বৃত্তির লোকদের বৈঠকখানা বিরল। গৃহসমস্যা ও অন্যান্য কারণে বৈঠকখানা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিতর বাড়িতে পরিণত হইয়াছে, রাস্তার ধারে বাড়ী হইলে তাহা দোকানঘর হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে বৈঠকখানা এখন অর্থাগমের উপায়। কিন্তু মানুষ সামাজিক জীব—সে রবীনশন ক্রুশোর মত একা থাকিতে পারে না, তাহাকে অপরের সহিত মিশিতে হইবে, দু'একটা কথা বলিতে হইবে। আমাদের এখানে পাশ্চাত্য ধরনের 'ক্লাব' গড়িয়া উঠে নাই। তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে চায়ের দোকান আর কলিকাতার মত শহরে 'কফি হাউস'। অবকাশ অল্প—এক কাপ চায়ের চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে গল্পও শেষ হইয়া যায়। এই কারণেই আমাদের অবকাশের স্বরূপও পালটাইয়া গিয়াছে। এখন অমরা অনেকটা এককভাবেই অবকাশ যাপন করিতে ভালবাসি, কখনো কখনো বন্ধুবান্ধব কিংবা সহধর্মিণী বা পুত্র-কন্যারা সঙ্গী হয়। সিনেমা, রাস্তায় বা পার্কে ভ্রমণ, রেডিওর গান শোনা, নিদেনপক্ষে লাইব্রেরী হইতে আনা রোমাঞ্চকর উপন্যাসে মনোনিবেশ। মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায় বলা যায়, আমাদের জীবনটা অনেকটা passive হইয়া পড়িয়াছে—আমরা নিজেরা কিছু করি না; হয় আমরা দর্শক, না হয় শ্রোতা।

আমাদের ঘরের চেহারাও বদলাইয়াছে। আগে অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘরে থাকিত দেবদেবীর খানকয়েক ছবি, ট্রাঙ্ক (কদাচিৎ সুটকেস), কাপড় ও জামা রাখার আলনা, সেল্‌ফে প্রয়োজনীয় জিনিস। বাস্, ইহাই তাহাদের উপকরণ ছিল। এখন সেখানে আধুনিক রুচি ও উপকরণ দেখা দিয়াছে। নিদেনপক্ষে একটা ছোট রেডিও, কাঁচের আলমারীতে কিছু পুতুল ও কাপ ডিশ; মাসিক পত্রিকা ও বইয়ের র‍্যাক, বাধাই ফটো (দেবদেবীর মূর্তি থাকিলে তাহা গৃহের কোণে 'ঠাকুরঘর'-এ স্থানান্তরিত), দেওয়াল আলমারী অথবা র‍্যাকে স্নো পাউডার ও অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য, আলনাটিও আধুনিক রুচির, ট্রাঙ্কের চেয়ে সুটকেসের দিকেই ঝোঁক বেশী। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ভার পূর্বের তুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

পোশাক-আশাকেও আমাদের পরিবর্তন কম হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বাঙালী পুরুষেরা ধুতি চাদরেই রপ্ত ছিল—ছোট প্যাণ্টলুন ছিল কাহারো কাহারো (বিশেষ করিয়া সরকারী কর্মচারীদের) বাহিরের পোশাক। মেয়েরা সাদা সাড়িই পরিতেন—কদাচিৎ রঙীন (রঙীন সাড়ির দাম ছিল তুলনায় বেশী এবং উৎপাদন কম)। মোটা কাপড় পরিতে কেহ সঙ্কোচ করিত না। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কবি

দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই।" সেদিন কবির কথা দেশবাসী শিরোধার্য করিয়াছিল, আজও তাহারা তাহাই করিবে, অর্থাৎ মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লইবে. কিন্তু পরিবে না। মানুষের হাতে যেমন টাকা আসিয়াছে, তেমনি তাহার রুচিও বদলাইয়াছে। এখন মিহি কাপড় ও রঙীন সাড়ির চাহিদা বেশী। কিন্তু যুদ্ধের সময় বস্ত্রাভাব বাঙালী পুরুষের পোশাক অনেকটা বদলাইয়া দিয়াছে। বুশসার্ট ও প্যান্টলুনে এখন তাহারা রপ্ত। কাজের দিক হইতে ইহার যেমন উপযোগিতা আছে, তেমনি অর্থেরও সাশ্রয় হয়। বিলাসিতার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। মেস ও গৃহে অবকাশ-সময়ে লুঙ্গির ব্যবহারও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে—ঘরে-বাহিরে ব্যবহারোপযোগী পাৎলুন ক্রমশঃ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। পোশাক-পরিচ্ছদে এই ফিট্‌ফাট্, ছিমছাম, চট্‌পটে ভাব আধুনিক যুগের স্বরূপই প্রকাশ করিতেছে।

বাঙালীর মানসিক জীবনের পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য। ঐহিক জীবনস্পৃহার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বাস্তববাদী হইয়া উঠিতেছি। কারণে-অকারণে আমরা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতাম; আবেগ-প্রবণতা আমাদের চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। কিন্তু এখন এই আবেগ-প্রবণতা হ্রাস পাইয়াছে; বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সবকিছু বিচারের ও মূল্য-নির্ধারণের চেষ্টা চলিতেছে। বিগত যুগের উপন্যাসের সহিত আধুনিক যুগের উপন্যাসের তুলনা করিলে এই পার্থক্য সহজেই চোখে পড়িবে। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা শুধু কাঁদে নাই, নায়কেরা উচ্ছ্বসিত হইয়া জামার হাতায় বার বার চোখের জল মুছিয়াছে। কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের নায়কেরা চোখের জল ফেলে না, সঙ্কটতম অবস্থায় ঘন ঘন সিগারেট টানে। এই বাস্তবতার জন্য পুরাতন নীতিবোধও শিথিল হইয়া পড়িতেছে, ইহা ভাল কি মন্দ তাহা পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া দেখিবেন। কিন্তু তথ্য হিসাবে ইহা বাস্তব সত্য। আজকাল আমরা কুৎসা শুনিতে ভালবাসিলেও তাহা লইয়া মাতামাতি করি না, ঘোঁট পাকাই না। খবরের কাগজে যেমন সংবাদ পড়ি, ইহাও অনেকটা তাই। এই মানসিকতা দেখিয়া জনৈক ফরাসী অর্থনীতিবিদের কথা মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন আধুনিক শহরে বাস করিতে হইলে কিছুটা অন্ধ কিছুটা কালা হওয়া প্রয়োজন। তিনি যাহা 'প্রয়োজন' বলিয়াছিলেন আমরা বাস্তবে তাহা দেখিতে পাইতেছি।

বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে গুরুতর সঙ্কট সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে টেকনোলজী। ধনতান্ত্রিক বিকাশ যন্ত্রবাদের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অপর দিকে কলা ও সাহিত্য যথেষ্ট অনুশীলনের অভাবে কিংবা বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ক্ষীণ হইতে থাকে, অথবা অপরের মনোরঞ্জন করিতে গিয়া দুর্দশায় পতিত হয়। আজ পাঠক-সমাজেরও

পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যন্ত্রপাতির কাজকর্মে যাহারা নিযুক্ত অর্থের দিক দিয়া তাহারা বেশী লাভবান। অথচ এইসব ব্যক্তিদের একটা বিরাট অংশ সামান্য শিক্ষিত। তাই রুচি-বিকার সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অপর দিকে বেকারী ও অর্ধবেকারি হতাশার সৃষ্টি করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতা আনিতেছে। সাহিত্যিক, শিল্পী ও দেশনেতারা এই বিষয়ে অবহিত না হইলে সমাজদেহে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হইয়া বিনাশের পথ প্রশস্ত হইয়া যাইবে।

৫১
দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা

দেশবিভাগের পর ভারত উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ে। পঞ্জাবে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হইতে বিলম্ব হয় নাই। কারণ পশ্চিম পঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা একযোগে চিরকালের মত ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। তারপর উত্তর পঞ্জাবের যাতায়াত নানা বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। পশ্চিম পঞ্জাব হইতে আসিয়াছে হিন্দুরা আর পূর্ব পঞ্জাব হইতে চলিয়া গিয়াছে মুসলমান-সম্প্রদায়। ইহাকে লোক-বিনিময় আখ্যা দিলে ভুল হয় না। এই উদ্বাস্তুদের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় ও তাহারা পশ্চিম ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ায় এই অঞ্চলের উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান অনেক পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অধিষ্ঠানভূমি দিল্লীর কাছে বলিয়া পঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের সমস্যা সরকারের চোখে বেশি করিয়াই পড়িয়াছিল। তাই নানা শহর (Township) গঠন করিয়া পঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু বাংলার উদ্বাস্তুদের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিলেও পঞ্জাবের মত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে নাই। তাই উদ্বাস্তুদের আগমন নিঃশেষে ঘটে নাই। পশ্চিমবঙ্গ হইতে মুসলমান কম গিয়াছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমন ঘটিতেছে অত্যধিক সংখ্যায়। অনেক হিন্দু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া ভিটা ছাড়িতে পারে নাই—তাহারা পরিবারের কয়েকজনকে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। আবার অবস্থার উন্নতি হইলে উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়াছে। পাসপোর্ট-ভিসার কড়াকড়ি, রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর মাঝে মাঝে জুলুম, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের বর্জন প্রভৃতি ব্যাপারের দরুণ পূর্ববঙ্গ হইতে হিন্দু উদ্বাস্তুদের আগমন লাগিয়াই থাকিয়াছে। উহাদের উভয় পথ খোলা থাকায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনেকটা ঔদাসীন্যের দরুণ উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয় নাই। বাংলাদেশের সন্নিহিত

রাজ্যসমূহে যেমন আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশ পুনর্বাসনের যে-ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাও নানা কারণে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। সরকারের অর্থব্যয় ও উদ্বাস্তুদের হয়রানি ছাড়া আর কিছুই ফল হয় নাই। রাজনৈতিক, দলীয় স্বার্থও অনেকখানি কাজ করিয়াছে। সুতরাং এইসব কারণে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে শিবিরে ও অন্যত্রে কাল কাটাইতে বাধ্য হয়।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে চাষীর সংখ্যাই সর্বাধিক। কলকারখানার পরিকল্পনা করিয়া চাষীকে শ্রমিকে পরিণত করিতে গেলে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা বানচাল হইতে বাধ্য। কৃষি-সংক্রান্ত পরিকল্পনাই সেক্ষেত্রে সুবিধাজনক। অথচ শিবিরবাসী পঁয়ত্রিশ হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের কৃষি-ভূমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন। পশ্চিমবঙ্গে পতিত ও অনাবাদী জমির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; তাহাতে, বেশী করিয়া ধরিলেও, উক্ত সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের পুনর্বাসন সম্ভব। বাকী দুই-তৃতীয়াংশের অবস্থা অনিশ্চিত থাকিয়া যাইবে। এই কারণেই সামগ্রিক পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের ঐতিহ্য-প্রীতি প্রবল। 'দণ্ডকারণ্য' নামটি রামায়ণ মহাকাব্য স্মরণ করাইয়া দেয়। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও মুনিঋষিদের পাদস্পর্শপূত অঞ্চলটি নবযুগেরও আদর্শ হইয়া উঠুক, ইহাই সরকারের কামনা। বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও অন্ধ্ররাজ্যের অংশবিশেষ লইয়া ৮০ হাজার বর্গমাইল পরিমিত স্থান জুড়িয়া দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা অঞ্চল গঠিত। এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আয়তন প্রায় ৩৫ হাজার বর্গমাইল। এই দিক দিয়া দণ্ডকারণ্য অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী; কিন্তু লোকসংখ্যার দিক দিয়া উহা অত্যন্ত কম। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি, সেক্ষেত্রে দণ্ডকারণ্যের লোকসংখ্যা মাত্র ৩০ লক্ষ। সুতরাং এখানে অধিকসংখ্যায় পুনর্বাসনের সম্ভাবনা অনেক বেশী।

দণ্ডকারণ্যে আদিবাসী ছাড়া অন্যান্য অধিবাসী তেমন নাই। যে-সব আদিবাসী বাস করে তাহারা নিরীহ ও শান্ত। তাই এখানে বাঙালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বিঘ্ন ঘটিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া দণ্ডকারণ্য অঞ্চল বন ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। শাল, সেগুন, বাঁশ, খয়ের, মহুয়া বেত প্রভৃতি প্রচুর জন্মিয়া থাকে। লোহা, আকরিক বক্সাইট, চুনাপাথর, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অরণ্য অঞ্চল বলিয়া জায়গাটি অস্বাস্থ্যকর নয়। আধুনিক প্রতিষেধক ঔষধ, বীজাণুনাশক ভেষজ ও চিকিৎসার ফলে এই অঞ্চলে নানাপ্রকার ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করা হইয়াছে। সকল ঋতুর উপযোগী রাস্তা নির্মাণ করিয়া দণ্ডকারণ্যের সংযোগ ও পরিবহন-অবস্থারও

উন্নতি হইতেছে। এইভাবে অঞ্চলটি সুসংস্কৃত হইয়া মানব উপনিবেশের উপযুক্ত স্থান হইয়া উঠিয়াছে।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনাটি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পুনর্বাসন কমিটির অনুমোদন লাভ করে। উহার লক্ষ্য প্রধানতঃ দণ্ডকারণ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অধিবাসীদের উন্নয়ন; স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ; যোগাযোগ ব্যবস্থা, চাষবাস ও সেচের ব্যবস্থা; মৎস্য চাষ; শিল্প প্রতিষ্ঠা, সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা এক কথায় একটি সর্বাঙ্গীন আদর্শ উপনিবেশ পত্তনই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। জমিটি উর্বর ও নানা খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ বলিয়া পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রাদেশিক স্বার্থ জাগিয়া উঠে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধ বাধিয়া যায়। পরে ১৯৬০ সালে নেহেরু-রায় বৈঠকে এই বিরোধের অবসান ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের বহু দাবী মানিয়া লন। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থাটি (Dandakaranya Developmant Authority) পুনর্গঠিত করা হয়। সর্ব সময়ের জন্য চেয়ারম্যান, অধিক পরিমাণে স্বায়ত্তাধিকার এবং নিজস্ব পরিকল্পনা রচনা ও বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা এই সংস্থার উপর অর্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দণ্ডকারণ্যে প্রেরিত পরিবারবর্গ পুনর্বাসন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয় ও কাজ পাইবে। নেহেরু-রায় বৈঠকে স্থির হয়, ১২ হইতে ১৫ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর তুলিয়া দিয়া পুনর্বাসনের অবশিষ্ট কাজের ভার অন্যান্য কেন্দ্রীয় দপ্তর বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে দেওয়া হইবে। ১৯৬২ সালে নবগঠিত কেন্দ্রীয় সরকারে পুনর্বাসন দপ্তর স্থান পায় নাই।

পুনর্বাসনের ব্যাপারে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহিত আলোচনা, পরামর্শ ও সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন কমিটির সকল বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সর্ব সময়ের জন্য একজন চেয়ারম্যান ছাড়াও দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন সংস্থায় আছেন—মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চীফ সেক্রেটারীগণ, চীফ অ্যাডমিনিসট্রেটর, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (আদিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য) এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের একজন প্রতিনিধি।

দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার রূপায়ণের কাজ সম্পূর্ণ হইতে বহু বৎসর সময় লাগিবে। সেইজন্য প্রথমেই মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন। শিবিরবাসী উদ্বাস্তুদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিছুদিন হইল শিবিরবহির্ভূত উদ্বাস্তুদেরও দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের রাজসাহী হইতে উৎখ্যাত এক হাজার সাঁওতালকে এখানে পুনর্বাসনের সুযোগদানের কথা প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন।

দণ্ডকারণ্যে পরিকল্পনার প্রাথমিক কার্য অত্যন্ত দুরূহ ছিল। উদ্বাস্তুদের স্বমতে আনিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করা কি যে গুরু দায়িত্ব তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কারণ উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছিল তীব্র নৈরাশ্য, দলীয় রাজনীতির প্রভাব, নানা স্থান হইতে পুনর্বাসিত হইয়া প্রত্যাগমনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা, দীর্ঘদিন বেকার অবস্থায় থাকিয়া কর্মবিমুখতা। তাহাদের মনে নবজীবনের আশা ও আশ্বাস জাগাইয়া তোলা সত্যিই কঠিন। প্রধান সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিনি রাজনৈতিক দল, সরকার প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়া কঠিন কাজকে সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। দণ্ডকারণ্যে এখন নবজীবন যাত্রার আয়োজন দেখা দিয়াছে। নব অধিবাসীদের বিশ্বাস ও আত্মনিভরতা নবযুগের সূচনা করিবে।

পূর্ববঙ্গে সাম্প্রতিক হাঙ্গামার ফলে প্রচুর সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো আবার ভারসাম্যবিহীন হইয়া উঠিয়াছে। দণ্ডকারণ্য এবারও বহু উদ্বাস্তু গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এখন দণ্ডকারণ্যেও আর স্থান সংকুলান হইতেছে না।

বন কাটিয়া বসত আজ নূতন নয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা দেখি, কালকেতু বন কাটিয়া গুজরাট নগরের পত্তন করিয়াছিল। আধুনিক যুগে কালিফোর্নিয়ার বন কাটিয়া বসত নির্মিত হইয়াছে। সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনা ও উদ্বাস্তুদের সহযোগিতার উপর দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করিতেছে।

৫২

বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ

একদিন মানুষ অসহায় হইয়া বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইত। অন্যান্য পরাক্রান্ত প্রাণীর ভয়ে তাহাকে তটস্থ থাকিতে হইত। প্রকৃতির কৃপণ মুষ্টি হইতে যাহা ঝরিয়া পড়িত তাহাই ছিল তাহার প্রাণধারণের সম্বল। কিন্তু সে-অবস্থা বেশীদিন রহিল না। যে-মানুষ সকলের করুণা ভিক্ষা করিয়া যত্র তত্র মাথা কুটিয়া মরিত সেই মানুষ বহুদিনের সাধনায় বিশ্বজগৎকে তাহার করায়ত্ত করিয়া ফেলিল। তাহার বিচার ও বিশ্লেষণী বুদ্ধির নিকট কোন রহস্যই আর রহস্য থাকিল না। তাহার জ্ঞানবলে 'পঞ্চভূত বশীভূত' এবং প্রকৃতি উন্নীত হইল। তাপ ও তেজ, শব্দ ও গতিকে সে বাঁধিয়া ফেলিল। এইভাবে সে জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে বিস্তৃত করিল তাহার আধিপত্য। তাহার চলার পথে বিজ্ঞান তাহাকে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির অধিকারী করিল। নূতন নূতন আবিষ্কার ও প্রয়োগ-বিদ্যা তাহাকে দিল দেবদুর্লভ শক্তির অধিকার। সামান্ত [illegible]

খণ্ড ঘষিয়া, কাজ চালাইবার উপযোগী করিয়া সে যাহার সূত্রপাত করিয়াছিল, আজ পারমাণবিক শক্তি আয়ত্ত করিয়াও তাহার শেষ হয় নাই।

বলা বাহুল্য সেই আদিকাল হইতেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ ছিল দুই মুখী। দক্ষিণ মুখে যাহার বরাভয়ের হাসি ফুটিত, বাম মুখে তাহার রুদ্র-রোষ মৃত্যু বর্ষণ করিত। বিজ্ঞানের সাহায্যেই সে চাষ করিয়াছে, ঘর বানাইয়াছে এবং চরকা প্রস্তুত করিয়া চালাইয়াছে। আবার উহারই সাহায্যে সে শত্রুকে দমন করিয়াছে, আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং আত্মবিস্তারও করিয়াছে। সামান্য প্রস্তর খণ্ড ছুঁড়িয়া সে শিকার করিয়াছে আর হিংস্র জন্তু কিংবা অনধিকারী বহিঃশত্রুকেও তাড়াইয়াছে। অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে উন্নততর চিকিৎসাবিধি এবং যানবাহনের প্রবর্তন করিয়াছে। তাহার কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বাস্তুবিদ্যাও অভাবনীয় রূপ লইয়াছে। নূতন নূতন শক্তির প্রয়োগে যন্ত্রবিদ্যার বিস্ময়কর বিকাশ ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মারণাস্ত্রও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। এককালে দ্বৈরথ সমরে একজনের পক্ষে একজনের প্রাণ লওয়া সম্ভব হইত। মেঘের আড়াল হইতে মেঘনাদ যে শরবর্ষণ করিত তাহারও ধ্বংস-শক্তি ছিল সীমিত। এমনকি মুহূর্তে যে পাশুপাত অস্ত্র প্রলয় ঘটাইতে পারিত তাহাও কবি-কল্পনার প্রশ্রয় পাইয়াই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল। কার্যক্ষেত্রে যে বিশেষ কিছু হইত না তাহা অব্যবহিত পরবর্তী কালের অক্ষুণ্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেই পরিস্ফুট হইত। একদিক দিয়া সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয় দিকেই সেইসব দিন ছিল বামনদের যুগ। আধুনিক যে-কোন সামান্য যন্ত্রবিদ্ সেকালের বিশ্বকর্মা বা ময়দানবকে হেলায় ম্লান করিতে পারে। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারই হন কিংবা বিশ্বত্রাস চেঙ্গিস খাই হন, আজিকার যে-কোন পশ্চাদ্বর্তী দেশের সামান্য সৈনিকের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। বিজ্ঞান মনুষ্যকে উত্তরোত্তর মহাশক্তির অধিকারী করিতেছে। আগেকার রাজচক্রবর্তী সম্রাটরা বহুধনসম্পদের অধিকারী হইয়া যে স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী ছিলেন আজিকার সামান্য শ্রমিকও তদপেক্ষা বহুগুণ আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারে। জীবন রক্ষায় এবং জীবননাশে উভয় দিকেই মানুষ আজ অতুলনীয় শক্তির অধিকারী হইয়াছে। আজ তাহার নিকট দূর বলিয়া কিছু নাই, দুরধিগম্য বলিয়া কিছু নাই, অনায়ত্ত বলিয়াও কিছু নাই।

বিজ্ঞান ও প্রয়োগ-বিদ্যার এইরূপ অভাবনীয় প্রসারে অনেকে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন, পারমাণবিক শক্তির ধ্বংস-ক্ষমতা তাঁহাদিগকে হতচকিত করিয়াছে। গ্রীক পুরাণে আছে, ফীটন একবার সূর্যের রথ চালনা করিয়াছিলেন। তিনি রথের অশ্বদিগের গতির উদ্দামতা তিনি সামলাইতে পারেন নাই, ফলে, সারা পৃথিবীর গায়ে আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। এই পৃথিবীতে আবার আগুন ধরিতে পারে, আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছেন। এই আগুন পারমাণবিক রোষের

আগুন। আধুনিক ফীটন অর্থাৎ যন্ত্রবিদ্‌দের মূঢ়তায় যে-কোন মুহূর্তে প্রলয় ঘটিতে পারে। তাহারা বিজ্ঞানের রথ ছুটাইবার ভার লইয়াছে, কিন্তু রথ চালনার নিয়ম জানে না। সর্বনাশের সম্ভাবনায় অনেক বিজ্ঞানীও নিজেদের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছেন। আইনস্টাইনেরও জীবনে এই আক্ষেপ ছিল, তিনিই একদিন পারমাণবিক বোমা নির্মাণের 'মানহাট্টা' পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিয়াছিলেন। রাডারের আবিষ্কারক স্যর্ রবার্ট ওয়াট্‌সন ওয়াট বলিয়াছিলেন—এমন কী পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেখানে বৈজ্ঞানিক নবদূতেরা আস্তে পা বাড়াইয়া হাঁটিতে ভয় পান, সেখানে টেকনোলজির মূঢ়দিগের পক্ষে হন্তদন্ত হইয়া আগাইয়া যাওয়া খুবই অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার। কিছুদিন আগে অধ্যাপক ওপেনহাইমার তাহার এক প্রবন্ধে জ্ঞানের বিপদ সম্বন্ধে বেশ নূতন কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানের ভার বিপজ্জনক ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। কারণ, এত জ্ঞানের ভার বহন করিবার মত চারিত্রিক যোগ্যতা সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহা আধুনিক মানুষের অদৃষ্টের সবচেয়ে বড় সঙ্কট। তাই পারমাণবিক বোমার আবিষ্কার অধ্যাপক আজ অনুতপ্ত চিত্তে তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়া প্রাক্তন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।

একথা ঠিক, আজ যদি পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তবে পৃথিবীর বুক হইতে মানুষের নাম মুছিয়া যাইবে। তখন আরশুলা, জীবাণু এবং পোকামাকড় ছাড়া জীববংশে বাতি দিবার মত কেহ বাঁচিয়া থাকিবে না। কিন্তু এই ভয়াবহতার জন্য বিজ্ঞান বা টেকনোলজি কি দায়ী? একটু চিন্তা করিলে প্রকৃত সত্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। শিশু যখন পড়িয়া গিয়া ব্যথা পাইয়া কাঁদে তখন তাহাকে প্রবোধ দিবার জন্য মা মেদিনীর বুকে পদাঘাত করে। সেই তো শিশুকে ব্যথা দিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে তাহা নহে ইহা জানার জন্য কাহাকেও বিজ্ঞানী বা চিন্তাশীল হইতে হয় না। বিজ্ঞান বা টেকনোলজি বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন প্রাণী নহে। তাহাকে যে-ভাবে কাজে লাগানো যাইবে সে সেইভাবেই কাজ করিবে। যে-আগুন ঘরের কোণে মঙ্গলদীপ হইয়া অন্ধকার দূর করে সেই আগুনই ঘর পুড়াইয়া মুহূর্তে লঙ্কা-কাণ্ড ঘটাইতে পারে। পৃথিবীর সকল কিছুরই ধ্বংস ও সৃষ্টি দুই বিপরীত ক্ষমতা আছে।

আসলে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার মারাত্মক সম্ভাবনার আশঙ্কায় যে-আর্তনাদ উঠিয়াছে তাহার মূল আরও গভীরে নিহিত। ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায় যে, কোন সমাজ ব্যবস্থাই শাশ্বত নহে। অতীতের দাস যুগ এবং সামন্ত যুগ ইতিহাসের অমোঘ বিধানে কবে বিদায় নিয়াছে। আজ সেখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জাঁকাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও ঘুণ ধরিয়াছে। ইহার মধ্যে যে শ্রমিকশক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আতঙ্কে কায়েমী স্বার্থের বুকে কাঁপন ধরিয়াছে। আত্মরক্ষার

তাগিদে সে এই প্রগতিশীল শক্তিকে দমন করিতে চায়। নিজের অস্তিত্ব নির্বিঘ্ন করিবার জন্য সে ত্রাস ও শঙ্কার আবহাওয়া বজায় রাখিতে চায়। সমাজতন্ত্রের যে-শত্রু গোকুলে বাড়িতেছে তাহাকে ছলে, বলে কিংবা কৌশলে বিনষ্ট করিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টার বিরাম নাই। এইজন্য পৃথিবী আজ দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিযোগিতায় জয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়া সমাজতন্ত্রী শিবির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রস্তাব ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ধনতন্ত্রের স্বস্তি নাই। তাই তাহার সমর-সজ্জারও বিরাম নাই। পরমাণুকে তাই সৃষ্টির কাজে না লাগাইয়া তাহাকে সংহারের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে চাহিতেছে। বিজ্ঞানের যে অভাবনীয় উন্নতি হইতেছে মুনাফার তাড়নায় তাহার প্রসাদ হইতে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে বঞ্চিত করা হইতেছে। শোষণ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়া যে-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে আজ তাহার ভিত্তিতে ফাটল ধরিয়াছে। আভ্যন্তরিক সঙ্কট এড়াইবার কোন উপায় না দেখিয়া সে ঘৃণার বিষাবাষ্প ছড়াইতেছে।

আসল বিপদও সেইখানে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা আজ অশুভশক্তির কবলে পড়িয়াছে! দুষ্ট যাদুকর যেমন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়া যত্রতত্র বিপদ ঘটাইত, লোভ ও হিংসা গগনচুম্বী হইয়া আজ তেমনই বিপদের সৃষ্টি করিতেছে। ইহার জন্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার উপর দোষারোপ করিলে প্রকৃত সত্য আড়ালেই থাকিয়া যাইবে। মানুষ তিল তিল করিয়া যে-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে মানুষের মূঢ়তাই তাহাকে বিনষ্ট করিতে পারে। আজ মানুষ আকাশের যবনিকা উন্মোচন করিতেছে, মহাসমুদ্রের স্বপ্ন চূর্ণ করিতেছে, মরু ও মেরুদেশের নিঃসীম নিঃসঙ্গতাকে দূর করিতেছে। মানুষের প্রতিভার অবাধ স্ফুরণের জন্য নিত্য নূতন উদ্ভাবন ঘটিতেছে। আর ইহার সবই সম্ভব হইতেছে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার সার্থক প্রয়োগে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহারা আজ দুষ্ট যাদুকরের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছে। তাই ইহাদের ধ্বংসশক্তিও সীমাহীন হইয়া উঠিয়াছে। আজ একথা বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে যাদুকরের কবল হইতে বিজ্ঞান ও টেকনোলজির উদ্ধারের উপর। মানব-কল্যাণে তাহাদের কাজ এখনও ফুরাইয়া যায় নাই।

৫৩

ভারতের বৈদেশিক নীতি

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজকাল পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে এত সন্নিকটবর্তী করিয়াছে যে, কাহারও পক্ষে আর স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা সম্ভব নয়। বৈষয়িক ক্ষেত্রেই হউক, রাজনীতি বা অর্থনীতির ক্ষেত্রেই হউক, কোন রাষ্ট্র যাহাই করুক না কেন তাহাকে

অপরের সংস্পর্শে আসিতেই হইবে। ভারতবর্ষ বহুকাল পরশাসনে নিগৃহীত ছিল তথাপি পরাধীনতার আমলেও সে বিশ্বব্যাপারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, যাহার জন্য বিশ্বসভায় তাহার ডাক পড়িত। জাতিসংঘ গঠনকল্পে সানফ্রান্সিস্কোতে যে সম্মেলন বসে উহাতেও পরাধীন ভারতের নির্বাধ কণ্ঠস্বর শোনা গিয়াছিল। তারপর ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। তাহার স্বাধীনতা সংগ্রাম এশিয়া ও আফ্রিকার পদানত দেশগুলির সামনে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। ফলে সকলের দৃষ্টিই স্বাধীন ভারতের উপর পড়ে। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহও তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। বিরাট ভৌগোলিক আয়তন, অমেয় জনবল, এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতকে এক বিশিষ্টতার অধিকার দিয়াছে। আবার অপূর্ণোন্নতির অভিশাপ খণ্ডন করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের প্রয়াসও সকলের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছে। তাহার শান্তি-নীতি সমাজতান্ত্রিক শিবিরেও সম্বর্ধিত হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিক যোজনা-সমূহের রূপায়ণের মধ্য দিয়া ভারত ক্রমোন্নতির পথে যে দৃঢ় পদক্ষেপ করিয়াছে তাহার গতিবেগ অব্যাহত রাখিবার জন্য তাহাকে যথানুরূপ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

কোন দেশের বৈদেশিক নীতি নির্ভর করে উক্ত দেশের বাস্তব প্রয়োজনের উপর। কূটনীতির কৌশল অবলম্বন করিয়া ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ করা আবশ্যক। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের স্বার্থ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে নিহিত আছে :

(ক) আফগানিস্তান, ইরাক, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, পারস্য, পাকিস্তান, নেপাল, ব্রহ্ম, সিংহল, মালয়, থাইল্যাণ্ড এবং চীনের অখণ্ডতা, নিরপেক্ষতা এবং সম্ভব হইলে উহাদের মিত্রতা। কেননা এই সকল সীমান্তবর্তী দেশ হইতেই ভারত আক্রান্ত হওয়া সম্ভব।

(খ) মধ্যপ্রাচ্য এবং ব্রহ্মের পেট্রল পাইবার সুবিধা।

(গ) এই সমস্ত সীমান্ত দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের কল্যাণ। ঐ দেশগুলির সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার।

(ঘ) ভারত মহাসমুদ্রের উপর জল এবং আকাশ-পথের নিরাপত্তা।

(ঙ) বহির্বিশ্বে আপনার যথাযোগ্য স্থান পাইবার আকাঙ্ক্ষা।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতি যেমন উপরে বর্ণিত অবস্থার উপর নির্ভরশীল তেমনই আবার উহাকে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর নানাবিধ চাপের সম্মুখীন হইতে হয়। একদিকে হিমালয় আর দুর্লঙ্ঘ্য নহে অপরদিকে পাকিস্তানের রাজনীতিও তাহার প্রতি কখনও প্রসন্ন নহে। সাম্প্রতিক কালে চীনের ভূমিকাও ভারতের প্রতিকূল

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমতাবস্থায় অন্যান্য সীমান্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক

ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতির আবর্ত হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। কোন শক্তি-জোটের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া সে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। অবশ্য নিরপেক্ষতার অর্থ ইহা নহে যে ভারত বিশ্বব্যাপারে নির্লিপ্ত দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বারবার তাহার কণ্ঠ অন্যায়ের প্রতিবাদে সরব হইয়াছে। "বাঁচ এবং বাঁচিতে দাও"—ইহাই তাহার নীতি। পৃথিবীতে শান্তি অব্যাহত থাকুক ইহাই আন্তরিক কামনা। উপনিবেশবাদ চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হউক এই সদিচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া অনেক সময়েই তাহাকে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পতিত হইতে হইয়াছে। গোয়া এবং কাশ্মীরের ব্যাপারে এইজন্যই স্ব স্ব ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতেও সে বারবার ইতস্তত করে। জাতিসংঘে যে-কোন সমস্যারই উদ্ভব হউক, তাহা কঙ্গো লইয়াই হউক আর ভিয়েৎনামকে লইয়াই হউক, ভারত সর্বদাই ন্যায় ও সত্যের পথ অবলম্বন করে। তাহার সমর্থন সকল সময়ই সমস্যার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাহার নিরপেক্ষতা তাহাকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। সকলকে জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহই তাহার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে। আর্ত ও উৎপীড়িত জাতির পার্শ্বে তাই তাহাকে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের নিরপেক্ষ নীতির চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন আমাদের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিপন্ন হইলে কিংবা পররাজ্য গ্রাসের কোন প্রচেষ্টা হইলে ভারতবর্ষ কোন অবস্থাতেই নিরপেক্ষ থাকে না। ভারতের নিরপেক্ষতা স্থাণু নহে, উহা সর্বদাই সক্রিয় এবং সঞ্চরমান।

১৯৫৪ সালের ২৯শে এপ্রিল চীনের সঙ্গে তিব্বত সম্পর্কে যে-চুক্তি সম্পাদিত হয় উহাতেই ভারতের বৈদেশিক নীতি সূত্রাকারে বিবৃত হইয়াছে। এই চুক্তি যে-পাঁচটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত উহাই সাম্প্রতিক কালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আচরণের প্রথম পাঠ। দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ বিশ্বের সম্মুখে নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে এই পঞ্চশীল নীতি। শক্তির আস্ফালন নয়, সাম-দান-ভেদের কূটনীতি নয়, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে যে-সম্পর্ক অনুরূপ ব্যক্তির থাকে সেই সম্পর্ক ও আচরণবিধিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে। অতীতে যে ভারতবর্ষ বহির্বিশ্বে "ধর্মবিজয়"-এর অভিনব বাণী প্রচার করিয়াছিল সেই ভারতবর্ষের হৃদয় এই পঞ্চশীলের সহিত স্পন্দিত হইতেছে। এই পঞ্চশীল বা নীতি হইল :

(ক) পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা

(খ) অনাক্রমণ।

(গ) পরস্পরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে নিরপেক্ষতা।

(ঘ) সাম্যের ভিত্তিতে পরস্পরের কল্যাণ সাধন।

(ঙ) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

এইগুলির লক্ষ্য স্পষ্ট। ইহাদের বক্তব্য প্রাঞ্জল। সকলেই আপন আপন বিশ্বাস ও সামর্থ্য অনুযায়ী স্বীয় লক্ষ্যসাধনে তৎপর হউক। দাঁতে দাঁতে ঘষিয়া অস্ত্র ঝনৎকারের মধ্যে নয়, বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করিয়া সৌভাগ্যমূলক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া সকলে বিবাদের কারণ দূর করুক—ইহাই ভারতের আন্তরিক ইচ্ছা। সৌভাগ্যক্রমে কোন কোন রাষ্ট্র এই ইচ্ছার মর্যাদা দিতেছে।

কিন্তু ভারতের বৈদেশিক নীতির অগ্নিপরীক্ষা পাকিস্তানের সঙ্গে তাহার সম্পর্কের ভিতর। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কখনও মধুর হয় নাই। বরং কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া উহা তিক্তই রহিয়াছে। বহু মূল্য দিয়া খালের জলের সমস্যার সমাধান ভারত করিয়াছে। কিন্তু কাশ্মীরকে লইয়া গোল রহিয়াই গিয়াছে। ভারতের জোট-নিরপেক্ষতায় বিরক্ত হইয়া কোন কোন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী রাষ্ট্রের উস্কানিতে কাশ্মীর-ক্ষত ভারতকে আজ পর্যন্ত বিব্রত করিতেছে। এই ব্যাপারে ভারত বিচারপ্রার্থী এবং পাকিস্তান পররাজ্যগ্রাসকারী এই সহজ সত্যটিই কথার মারপ্যাঁচে অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতের প্রগতিশীল ভূমিকাকে বিপথগামী করিবার জন্য পাকিস্তান জোটবিশেষের আনুকূল্য লাভ করিয়া তাহার শান্তিনীতির উপর মসীলেপন করিতে চাহে রাশিয়ার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব যদি সক্রিয় না হইয়া উঠিত তবে ইহার পরিণতি কোথায় দাঁড়াইত তাহা ভাবিলেও বুক কাঁপিয়া উঠে। উভয় রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের জটিলতা বৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র।

সাম্প্রতিক কালে ভারত আর একটি অভাবিত দিক হইতে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। ১৯৫৪ সালে যে-চীনের সঙ্গে চুক্তি করিতে যাইয়া পঞ্চশীল নীতির উদ্ভব হইয়াছিল সেই চীন আজ ভারতের ভূমি গ্রাস করিতে উৎসুক। উভয় রাষ্ট্রের সীমারেখার অস্পষ্টতা হয়তো আছে। কিন্তু সেই অজুহাতে চীন যেভাবে ১৯৫৯ সালের ২৭শে আগস্ট ভারতীয় রক্ষীবাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ করিয়াছে তাহার নিন্দা করিবার মত ভাষা পাওয়া যায় না। কোন জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র সম্প্রসারণশীল হইতে পারে। কিন্তু কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি সম্প্রসারণশীল হয় তবে মানবজাতির আশা কোথায়? ভারতবর্ষ আজ পর্যন্ত যেভাবে এই বিরোধকে আলোচনার স্তর হইতে যুদ্ধের পর্যায়ে না নামাইতে সক্ষম হইয়াছে উহার মর্যাদা রক্ষা করা চীনের কর্তব্য। এই দুইটি রাষ্ট্রের সৌহার্দ্যের উপর বিশ্বব্যবস্থার ভারসাম্য অনেকখানি নির্ভরশীল—একথা ভুলিলে চলিবে না।

নবজাগ্রত আফ্রিকা এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুবই মধুর। গোয়ার ব্যাপারে পাশ্চাত্য শক্তিজোট ন্যায়নীতির সমস্ত দাবী পদদলিত করিয়া ভারতের মুখে কালিমা লেপন করিতে চাহিয়াছিল। উহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে ভারতের বৈদেশিক নীতির সাফল্য সূচিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সে প্রভূত মর্যাদার অধিকারী হইয়াছে। অস্ত্রবলে গরীয়ান না হইলেও ভারতের আসন বিশ্বসভায় আজ খুবই উচ্চে। কোন শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাহাকে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়—একথা সত্য। ইহাও সত্য, এইজন্য তাহার ক্রমোন্নতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবার জন্য আর্থিক সাহায্য বন্ধ হইবার শাসানিও তাহাকে হজম করতে হয়। তাহার শান্তির নীতি চীন ও পাকিস্তান সম্পর্কে ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইয়াছে একথাও অস্বীকার করা যায় না। তথাপি আজ ভারতবর্ষ যে আফ্রিকা ও এশিয়ার নবজাগ্রত শক্তিসমূহের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, সে যে আজ তাহাদের প্রেরণাস্থল হইয়া উঠিয়াছে, মহাসোভিয়েটের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব অর্জন করিতে পারিয়াছে ইহা তাহার ন্যায় অপূর্ণোন্নত দেশের সামান্য কীর্তি নহে। ভারত যে এখনও জাতিসংঘে চীনকে স্থান দিবার জন্য বারংবার আবেদন জানাইতেছে ইহাতেই তাহার বৈদেশিক নীতির সততার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের মধ্য দিয়া শ্মশানের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ভারত তাহা চাহে না। সে চায় সম্প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের শান্তি সর্বত্র বিরাজ করুক। জগৎ সকলের আনন্দকলরবে মুখরিত হইয়া উঠুক।

৫৪
নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা

ঘৃণার বিষবাষ্প আজ যে-মারণাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছে তাহা যে-কোন মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীকে ধূলায় পরিণত করিতে পারে। পৃথিবী পরস্পর-প্রতিযোগী দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়াছে। উহাদের মাঝখানে যে নিরপেক্ষ বলয় বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার নৈতিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, কার্যকরী শক্তি অত্যন্ত নগণ্য। তাই নিত্য নূতন মারণাস্ত্রের নির্মাণে উভয়েই তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। আত্মরক্ষার তাগিদই যে এই প্রতিযোগিতার ঘূর্ণী সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু যে-কারণেই হউক অবস্থা আজ এমন দাঁড়াইয়াছে যে, সমস্ত পৃথিবী যেন আগ্নেয়গিরির মুখে বসিয়া আছে। যে-কোন পক্ষই ধৈর্যচ্যুত হইলে নিমিষে প্রলয় ঘটিতে পারে। তবু সর্পের দৃষ্টিতে সম্মোহিত শশকের ন্যায় আমরা বিপর্যয়ের দিকে তাকাইয়াই আছি। ইহাকে রোধ করিবার

কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। সামগ্রিক বিনাশের ভয়াল সম্ভাবনা এখনও বিশ্ববাসীকে তাহার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিতে পারে নাই। 'শান্তির ললিত বাণী' যেখানে ব্যর্থ পরিহাসের মত শুনাইতেছে সেখানে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলেই আসন্ন সর্বনাশের গতিরোধ করা যাইবে না। নগর পুড়িলে দেবালয়ও অব্যাহতি পাইবে না। এইজন্য সারা বিশ্বের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর যে-দায়িত্ব বর্তাইয়াছে তাহার গুরুত্ব অপরিসীম।

এই দায়িত্ব পালন করিবার জন্য সারা বিশ্বের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ইউ. এন্. ও ১৯৪৬ সাল হইতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া ৭০৪টি সম্মেলনে ১৪০০ ঘণ্টা ধরিয়া ১ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ শব্দ খরচ করিয়া যে-বহ্বারম্ভের আড়ম্বর চলিয়াছে তাহা লঘু ক্রিয়াতেই পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের চুক্তি সম্পন্ন না হইলে যে পারমাণবিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিতেছে তাহাতে যে-পক্ষেরই জয় হউক না কেন সর্বনাশের মাত্রা তিল মাত্র কমিবে না। নিরাপত্তার জন্যই অস্ত্রের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সকলেই প্রতিপক্ষের অস্ত্রশক্তি সীমাবদ্ধ করিতে চাহিবে। এইজন্যই ইউ. এন্. ও.-এর মধ্যস্থতায়ও আসল কাজ বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উহার কার্যবিধির সূত্রাবলীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া পারমাণবিক আক্রমণের মুখে ঐ বিধি-নিষেধের কার্যকারিতাও নাই বলিলেই চলে। তাই ১৯৪৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ পারমাণবিক শক্তি কমিশন বসাইতে স্থির করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতেও পারমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। বার্নার্ড বারুচ উহার নির্মাতা। ইহারও উদ্দেশ্য উক্ত শক্তির নিয়ন্ত্রণকল্পে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা। উহার কাজ হইবে সকল প্রকার পারমাণবিক কাজকর্মের তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করা। ঐ বৎসরই সোভিয়েট রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার বিনষ্ট করিয়া উহার উৎপাদন এবং প্রয়োগ নিষিদ্ধ করিবার জন্য যথাযোগ্য সম্মেলন আহ্বান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করে। এই ভাবে পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা হইতে যে কথাবার্তার সূত্রপাত হয় উহাই সামগ্রিক নিরস্ত্রীকরণের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সম্মেলন প্রস্তাব এবং পাল্টা প্রস্তাবের স্তর অতিক্রম করিয়া আসল সমস্যার কোনপ্রকার সমাধান আজও করিতে পারে নাই। পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও পরীক্ষাও বন্ধ হয় নাই।

১৯৪৯ সাল পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য। কিন্তু ঐ বৎসর ২৩শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েট ইউনিয়নও এই শক্তির অধিকারী হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রবাহের প্রতিকূলতায় নিরস্ত্রীকরণের দিকে কোন অগ্রগতি

হয় না। শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৫১ সালের ১৪ই মার্চ বোঝাপড়ার মধ্য দিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি ঘোষণা করে। নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে একীসন কতকগুলি পন্থার নির্দেশ করেন। (ক) জাতিসংঘ পারমাণবিক অস্ত্র সমেত সকল-প্রকার অস্ত্রের তালিকা প্রণয়ন করিবে। (খ) জাতীয় সমরোপকরণাদির তদারকিও তাহারা করিতে পারিবে। (গ) সামরিক বাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্রাদির সামঞ্জস্যপূর্ণ হ্রাস সাধন করিতে হইবে এবং (ঘ) পরিকল্পনামাফিক কাজ হইতেছে কিনা ইহা দেখিবার ক্ষমতা জাতিসংঘের থাকিবে। এই পন্থাগুলি সোভিয়েট রাশিয়ার মনঃপুত হয় না। ফলে রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই সমরসজ্জাকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে।

১৯৫২-৫৩ সালে আমেরিকা ও রাশিয়া হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করে। ইহার ধ্বংসশক্তি অসীম। এইজন্য আইসেনহাওয়ার শান্তির জন্য পরমাণু নিয়োগের পরিকল্পনা উপস্থিত করিলেন। কিন্তু ইহাতে পারমাণবিক বোমার নিষিদ্ধকরণ হয় নাই। এইজন্য সোভিয়েট রাশিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু এত চেষ্টা শেষ পর্যন্ত একেবারে বিফল হইল না। ১৯৫৪ সালে সোভিয়েট রাশিয়া আন্তর্জাতিক তদারকির প্রস্তাব মানিয়া লওয়াতে অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে অনুকূল হয়। ১৯৫৫ সালের ১০ই মে তাহারা নিরস্ত্রীকরণের একটি কার্যসূচী উত্থাপিত করে। ইহাতে জার্মানী হইতে সৈন্যাপসারণ এবং আমেরিকা, সোভিয়েট, চীন ব্রিটিশ এবং ফরাসী সৈন্য হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু কোন প্রস্তাবই ফলপ্রসূ হয় না। ১৯৫৬ সালে নিরস্ত্রীকরণ কমিশন তিনটি স্তরের মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ সমাধাকল্পে ইংরেজ ও ফরাসীদের নিকট হইতে একটি সংশোধিত প্রস্তাব পায়। নিরস্ত্রীকরণ শুরু হওয়ার পূর্বে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠনের প্রস্তাব সোভিয়েট মানিয়া লয়। কিন্তু ঐ ধরনের সংস্থা কিরূপ ক্ষমতার অধিকারী হইবে ইহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৫৭ সালের ১৪ই জুন পারমাণবিক পরীক্ষা দুই তিন বৎসরের জন্য বন্ধ রাখিবার একটি প্রস্তাব পেশ করে। এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও তাহারা মানিয়া লয়। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ বাঁকিয়া বসায় আবার অচল অবস্থা দেখা দিল। অচির কালের মধ্যেই (১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ) সোভিয়েট রাশিয়া একতরফা ভাবে পারমাণবিক এবং হাইড্রোজেন-ঘটিত পরীক্ষা হইতে বিরত হইতে চায়। কিন্তু তাহার এই সাধুসঙ্কল্পও অপর শিবিরের সন্দেহ উদ্রেক করে। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের পটভূমিকায় সোভিয়েট ইউনিয়ন পুনরায় পারমাণবিক পরীক্ষা শুরু করে।

১৯৫৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স

নিরস্ত্রীকরণকল্পে দশ-শক্তি কমিটি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে একটি প্রস্তাব ঘোষণা করে। পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করিতে যাহাতে ব্রিটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়া সচেষ্ট থাকে সেইজন্য সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি উহাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করে। ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী আমেরিকা অস্থায়িভাবে স্বেচ্ছায় পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করিতে চাহে। ক্রুশ্চেভও এই ব্যাপারে পিছাইয়া রহিলেন না। বহুবৎসরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নিরস্ত্রীকরণের পথে এইটুকুই উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই ব্যাপারে বিশ্বজনমত যতখানি উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে তদনুরূপ সাড়া আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও পাওয়া যাইতেছে না।

ইতিমধ্যে আমেরিকা গুপ্তচরবৃত্তির উদ্দেশ্যে সোভিয়েটের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করে। ইহার ফলে রুশ-মার্কিন সম্পর্ক আবার তিক্ত হইয়া পড়ে। উভয়ের মধ্যে কোনরূপ আপোষ মীমাংসা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। পশ্চিম জার্মানীর ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় এবং ফ্রান্স কর্তক পারমাণবিক পরীক্ষা আন্তর্জাতিক অবস্থাকে আরো ঘোরালো করিয়া তোলে। নানাবিধ আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে আবহাওয়া সর্বদাই এইরূপ উত্তপ্ত থাকে যে স্থায়ী নিরস্ত্রীকরণের কোন পন্থা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অথচ অস্ত্রসজ্জার জন্য যে বিপুল পরিমাণ শ্রম ও সম্পদের অপচয় ঘটিতেছে তাহাতে মানুষের প্রতিভার বহুমুখী স্ফুরণও ব্যাহত হইতেছে। এইজন্য সারা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বার্ধক্যের ভারে নুইয়া পড়িলেও আন্দোলনের পথে পা বাড়াইয়াছেন। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের সাধনা যে-সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাকে মুহূর্তের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বিনষ্ট হইতে দেওয়া যায় না। সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র— এই দুই বিসদৃশ শক্তি যদি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি মানিয়া না লয় তবে সারা পৃথিবী শ্মশানে পরিণত হইবে। আর অস্ত্রসম্ভার কখনই শান্তিকে অব্যাহত রাখিবার মত আনুকূল্য করে না। এইজন্য নিত্য নূতন মারণাস্ত্র আবিষ্কার হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না। যে-অস্ত্র এখনও মানুষের স্নেহপ্রীতিপূর্ণ বক্ষের প্রতি উদ্যত হইয়া আছে তাহাকে সংযত এমন কি বিনষ্ট করাও দরকার। আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় আমাদের সরকার এই ব্যাপারে মানবকল্যাণকামী জনগণের সঙ্গে একমত। যুদ্ধের মধ্য দিয়া নহে, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। তাহাদের এই দৃষ্টান্ত সর্বত্র অনুসৃত হইলে নিরস্ত্রীকরণের পথ সহজ হইবে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৫৫

ভারতে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

দীর্ঘকাল পরশাসনে নিষ্পেষিত হইয়া ভারত আজ স্বাধীন। তাহার সুদীর্ঘ স্বাধীনতা আন্দোলন আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই বৈশিষ্ট্য শুধু তাহার অহিংসার নীতির মধ্যেই নিহিত নহে। বহুবিধ উত্তেজনা সত্ত্বেও আন্দোলনকে জনগঠনের মর্মমূলে পৌঁছাইয়া দেওয়াতেই উহার কৃতিত্ব। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হিংসার চণ্ডনীতি যে এই দেশের কোথাও কোনদিনও আত্মপ্রকাশ করে নাই—তাহা নহে। কিন্তু সকল সময়ই চেষ্টা হইয়াছে যাহাতে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা বিশেষ গোষ্ঠী কিংবা গুপ্ত চক্রকে অতিক্রম করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এইজন্যই সকল শ্রেণীর লোকই এই আন্দোলনে সামিল হইয়াছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারত তাহার এই গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয় নাই। একদিকে ব্রিটিশ ধরনের গণতন্ত্রের মহিমা ছটা, অপরদিকে এমনকি পরাধীন দেশের রাজনীতিতেও শাসক কর্তৃক নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোর আমদানী আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের বৃহদংশকেই আকৃষ্ট করিয়াছে। তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইতে আমাদের সম্বল ছিল তাহাদেরই কাছে শেখা গণতন্ত্রের বুলি। আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন ও ফরাসী বিপ্লবের সাম্য স্বাধীনতা ও সৌভাগ্যের মর্মবাণী আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বহুকাল হইতেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। তাই জনগণের জন্যে জনগণের শাসন তাহাদের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা। এইজন্যই দেশ বিভাগের অভিশাপের অগ্নিজ্বালা সহ্য করিয়াও ভারতের সংবিধানসভার কাজ ছিল যত শীঘ্র সম্ভব দেশের জন্য আদর্শ সংবিধান তৈয়ার করা। তাই, নানাবিধ সমস্যার চাপে পিষ্ট হইলেও ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের জন্ম হয়। শুধু তাহাই নহে অচিরকালের মধ্যেই সারা দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বিশ্বের এই বৃহৎ নির্বাচন পর্ব যেরূপ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিরপেক্ষতার সহিত পরিচালিত হয় তাহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। নানা ভাষা, সম্প্রদায় স্বার্থ ধর্ম এবং অনগ্রসরতার টানা-পোড়েনের কথা স্মরণ করিলে ভারতীয় গণতান্ত্রিক পরীক্ষার তাৎপর্য অসাধারণ।

গণতন্ত্র বলিলে কেবলমাত্র বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থার কথাই বোঝায় না। উহার তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। মানুষের সঙ্গে মানুষের, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের কিংবা জাতির সহিত জাতির সর্ববিধ সম্পর্কের মধ্যে মানবিক সম্পর্কের প্রতিষ্ঠাই উহার কাম্য।' যুক্তি এবং ন্যায়ই উহার ভিত্তি। সাম্য এবং স্বাধীনতাই উহার বাণী।

ব্যক্তি কিংবা সমষ্টির চরম বিকাশই উহার লক্ষ্য। এইজন্য মানুষের নৈতিক মূল্যের উপর ইহা আস্থা পোষণ করে। তাহার ব্যক্তিত্বকে ইহা শ্রদ্ধা করে। নিজের বিচার-বুদ্ধি মত যাহাতে সে চলিতে পারে এইজন্য তাহার কতকগুলি স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। এই স্বাধীনতা নাগরিকও বটে আবার রাজনৈতিকও বটে। জাতি-ধর্ম, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এই স্বাধীনতার অধিকারী। ইহারই ফলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা যায় না। স্বাধীনতার পাশাপাশি থাকে নাগরিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য। সমাজে কোন সুবিধাভোগী-শ্রেণীর অস্তিত্ব, আর্থিক নিরাপত্তার অভাব এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদ-দৃষ্টি গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এইসকল কথা স্মরণ করিয়া ভারতীয় গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং উহার গতি ও প্রকৃতির বিচার করিতে হইবে।

সচরাচর গণতন্ত্র যে-অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহাতে রাজনৈতিক সাম্যের উপরই জোর দেওয়া হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বিদ্যমান থাকিলে রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন হইয়া পড়ে। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে ধনবৈষম্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে—একথা আজকাল সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ফলে সামাজিক, নাগরিক এমন কি রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাও বিত্তবান্‌দেরই করতলগত হইয়া পড়ে। শাসন-ক্ষমতাও খুব স্বাভাবিক কারণে জনগণের কল্যাণে জনগণের হাতে না আসিয়া মুষ্টিমেয় সুবিধা-ভোগী শ্রেণীর কল্যাণে তাহাদেরই হাতে আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে শাঁসবর্জিত গণতন্ত্রের আঁঠিই সাধারণের ভাগ্যে বর্তাইবে। ভারতের সামাজিক বিন্যাস লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে। ভারতবর্ষে একদিকে কিছু পুঁজিপতি ও শিল্পপতি, দেশীয় রাজা-মহারাজা এবং জমিদার মহাজন। অন্যদিকে, বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এখানে একদিকে যেমন সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও পদ্ধতি বিদ্যমান আর একদিকে তেমনই নবাগত ধনতন্ত্রের রজতচ্ছটা সকলের চোখে ধাঁধাঁইতেছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা ভাষা ও ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। তাহার রাজনৈতিক চেতনা সমান নহে। অশিক্ষা ও যুগজীর্ণ সংস্কার তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ ও অনুদার করিয়া তুলিয়াছে। নানারকম ভেদ-নিষেধের গণ্ডী তাহাদের গতিপথকে পদে পদে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ইহার উপর, দারিদ্র্যের উষ্ণশ্বাসে তাহার জীবনকে মরুময় করিয়া রাখিয়াছে। এমতাবস্থায়, এই দেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কোথায়—এই প্রশ্ন সহজেই মনে উঠিতে পারে।

আবার, দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রসমূহের অবস্থাও গণতন্ত্রের পোষক নহে। পাকিস্তানের উদ্ভব হইয়াছে সাম্প্রদায়িকতা ও কূটনীতির অভিশপ্ত মিলনের ফলে। ভারত-বিদ্বেষকে মূলধন করিয়া, কাশ্মীর এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উপলক্ষ্য

করিয়া সে সর্বদাই আবহাওয়া উত্তপ্ত রাখিতে চাহে। জঙ্গীজোটের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া তাহার আস্ফালন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। সর্বোপরি দেশের বুকের উপর সামরিক স্বৈরতন্ত্র চাপিয়া বসিয়াছে। সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনকে দমন করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে জীয়াইয়া রাখিয়া সে ভারতের উপর যে-চাপ সৃষ্টি করিয়াছে, উহা ভারতের গণতান্ত্রিক পরীক্ষার উপর বারবার কঠিন আঘাত হানিতেছে। ভারতের আর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল। স্বল্পকালের জন্য সেখানে গণতান্ত্রিক রাজনীতি জাঁকাইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে শুরুতেই উহার শেষ হইল। এইরূপ ব্রহ্ম এবং ইরাকেও সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। পারস্য এবং আফগানিস্তানে সামন্ততন্ত্র এখনও বহাল তবিয়তে বিরাজমান। এশিয়া এবং আফ্রিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলিতেও স্বৈরাচার কায়েম হইয়াছে। ভারতের অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীনে যখন সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় তখন ভারতের জনমানসে আনন্দের জোয়ার বহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চীনও ভারতের দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যে-চীনের সঙ্গে তিব্বত সম্পর্কে চুক্তি-সম্পাদন কালে পঞ্চশীল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করে সেই চীনই ভারতের ভূমি গ্রাস করিয়া ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর তীব্র আঘাত হানিয়াছে। ফলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষীর দল ভারতের শান্তিপূর্ণ নিরপেক্ষ নীতির পরিবর্তনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। জঙ্গীজোটের সহিত গাঁটছড়া বাঁধিয়া ভারত যাহাতে গণতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ করে এমনকি যাহাতে আয়ুবশাহীর পথও অবলম্বন করে সেই উদ্দেশ্যে হাঁকডাকেরও বিরাম নাই। আবার বিশ্বের সর্বত্র গণতন্ত্রের অধিকার রক্ষাকল্পে ভারত যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে বৃহৎ শক্তিপর্যায়ের কোন কোন রাষ্ট্র তাহা সুনজরে দেখে না। ভারতের জোট-নিরপেক্ষতাও তাহার উষ্মার কারণ হইয়াছে। সেইজন্য দেশে ও বিদেশে তাহারা ভারতের উপর নানাবিধ চাপ সৃষ্টি করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। এইরূপ ঘটনাপ্রবাহ ভারতের গণতন্ত্রকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে সে-সম্পর্কে অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে।

কিন্তু পরস্পর-বিরোধী নানা স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের আভ্যন্তরিক রাজনীতিও কুটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের অনন্যসাধারণ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর পর ভারতের আভ্যন্তরীণ ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল হইল কংগ্রেস। গণতন্ত্র সম্পর্কে ইহার বৃহদংশের মনোভাবই অনুকূল নহে। সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনগ্রসরতার দুর্গ ইহাদের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র সম্পর্কে ইহাদের আগ্রহও অকৃত্রিম নহে। সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতার কলুষ ইহাদের চিত্তকে আচ্ছাদিত

করিয়াছে। জঙ্গীজোটের প্রতি ইহাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকায় শাসকদের কার্যসূচীও পদে পদে বিঘ্নিত হইতেছে। প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং কার্যকলাপও স্বচ্ছ নহে। জনসঙ্ঘ, মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা এবং আকালী দল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকিতে চাহে। জনকল্যাণ সাধনের জন্য ইহাদের কোন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই। বর্তমানে এই সকল দক্ষিণপন্থীদের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে স্বতন্ত্র দল। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্ব ইহাদের উপরই বর্তাইবে। ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে চালাইয়া ইহারা দেশের উন্নতি বিধান করিতে চায়। ভারতের জঙ্গীজোট বহির্ভূত নিরপেক্ষ নীতির প্রতিও ইহারা প্রসন্ন নহে। সামন্ততন্ত্র এবং নিরঙ্কুশ ধনতন্ত্রের মধ্যে গাটছড়া বাঁধিয়া ইহারা দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মুখে এক স্পর্ধিত প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গণতন্ত্রের ধারক হইলেও ভারতের কমিউনিস্টপার্টির নীতি এবং কার্যসূচী অনেক সময়ই দ্বিধাগ্রস্থ হইয়া পড়ে।

এবম্বিধ পরিবেশের মধ্যে গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করিতে হইলে ধন-বৈষম্যের অবসান সম্ভব যদি নাও হয় তবে উহার আতিশয্য দূর করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে ভারত যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী কার্যকলাপ সম্প্রসারিত হইতেছে, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়ের মধ্য দিয়া সুদূর গ্রামাঞ্চলেও যাহাতে আর্থিক সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনার অভ্যুদয় ঘটে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। সম্পত্তি, দান এবং মৃত্যুকর বসাইয়া অনুপার্জিত ধনভোগের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করা হইতেছে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নতিসাধন হইতেছে। সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য আইন-কানুনও প্রস্তুত হইতেছে। সকলের নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত করার আয়োজনও সামান্য নহে; যুক্তি এবং ন্যায়ের পথ অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার সমস্যার মানবিক সমাধানের চেষ্টাও চলিতেছে।

এই চেষ্টাকে সফল করিতে হইলে ভারতকে দৃঢ় পদে অগ্রসর হইতে হইবে। রাজনৈতিক চেতনার স্তর যাহাতে উন্নীত হয় সেইজন্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির সহযোগিতা দরকার। আবার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সফল করিতে গেলেও কেবল মাত্র সরকারী যন্ত্রের সাহায্য লইলেই চলিবে না। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করিয়া দেশের লোককে গণতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সীমাবদ্ধতায় গণতন্ত্র প্রহসনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার উপর ভারতের ঘরে ও বাহিরে রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ যে-খাতে চলিতেছে

উহাতে যে-কোন মুহূর্তে গণতন্ত্রের সলিল-সমাধি ঘটিতে পারে। এইজন্য দেশের কল্যাণকামী প্রতিটির প্রগতিশীল ব্যক্তি ও দলের অবহিত থাকা একান্ত দরকার।

৫৬

সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়া যে-শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয় মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া হুলুধ্বনি দিয়া কেহই তাহাকে প্রসন্নচিত্তে বরণ করিয়া লয় নাই। তাহাকে আতুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য চারিদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়াছিল। যাহারা তাহার মঙ্গল কামনা করিত, অমিতশক্তির অধিকারী হইলেও তাহারা ছিল আত্মবিস্মৃত। আর, সাক্ষাৎভাবে যাহারা ইহারা লালন-পালনের দায় গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সঙ্কল্প ছিল কিন্তু সম্বল ছিল না, স্বপ্ন ছিল কিন্তু কোন সহায় ছিল না, আবেগ ছিল কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল না। তবুও জন্মমুহূর্তেই এই শিশুটি যে-চাঞ্চল্য আনিয়াছিল আজও তাহার স্পন্দন থামিয়া যায় নাই। মানুষের নিকট সে কী বার্তা লইয়া আসিয়াছে, অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য সে কোন আয়ুধে সজ্জিত হইয়াছে, রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কার বন্দী মানব-আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাহার দৌত্য সে লইয়া অসিয়াছে ইহা জানিবার ও বুঝিবার জন্য বঞ্চিতের মন আকুল হইয়া উঠিল। অন্য দিকে, দিন ফুরাইয়া আসিতেছে—আশঙ্কা করিয়া অত্যাচারী, ধৃতস্বার্থ কংসের দলও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ইহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য সকলপ্রকার অস্ত্রে শান দেওয়া হইল। হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ইহাকে মসীবর্ণে চিত্রিত করা হইল।

আর সে চিত্র কত ভয়াবহ, তাহার ধারণা পাওয়া যাইবে জর্জ অরওয়েলের '১৯৮৮' নামক বইটিতে। কাঁটাতারের বেষ্টনীর মধ্যে প্রমোদমত্ত নরনারী। পশ্চাতে সামরিক পুলিশের উদ্যত বেয়নেট। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর অর্ধস্ফুট গুঞ্জনও যন্ত্রজালে ধরা পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে উহার রেকর্ড হইতেছে। যে-পুরুষটির প্রণয় নিবেদনে সাম্যবাদের সূত্র ছিন্ন হইতেছে প্রণয়িনীর অভিযোগে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্যটিকে বন্দী করা হইতেছে। যে-রমণীর সন্তান এখনও সমগ্র সমাজকে মাতা বলিয়া ভাবিতে শিখে নাই পুলিসের হাতে সেই রমণীটিও রেহাই পাইতেছে না। সন্তানকে সে ঠিকমত শিক্ষা দেয় নাই —এ কী সামান্য অপরাধ! দূর হইতে গান ভাসিয়া আসিতেছে—পুঁজিপতিদের নিপাত কর, পরিকল্পনা সফল কর, মনের কথা সামরিক পুলিসের নিকট খুলিয়া বল, পুরানো শিক্ষা ভুলিয়া যাও, নূতন শিক্ষা গ্রহণ কর। সাম্যবাদের জিন্দাবাদ দাও। শুধু কি তাই, যে বিরাট পুরুষ, পুরুষবেশিণী রমণীকে সঙ্গে লইয়া সামরিক-সজ্জায়

সজ্জিত সভাসদমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া সুউচ্চ বেদীর উপর দাঁড়াইয়া সমাজের সকল কিছুই নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন সেই মহান পিতা কমরেড-বরের জয়ধ্বনিতে ধরাতল মুখরিত। তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া পরিকল্পনা—এমন কি তিন মাসে এক লক্ষ পাঁচশত তেইশটি বিবাহ সম্পন্ন করার পরিকল্পনাও সফল করিতে হইবে! সাম্যবাদের এইরূপ চিত্রই এতকাল আমাদের সামনে তুলিয়া ধরা হইয়াছিল।

আজ আর এই চিত্রকে প্রচার ও প্রহসন ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এমন এক সময় ছিল যখন সমাজতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কে কোন সংবাদ পাইবার একমাত্র পথ ছিল ধনতান্ত্রিক দেশের সংবাদপত্রসমূহ। নিজস্ব দর্শন ও দৃষ্টিকোণ হইতে সাম্যবাদের কুৎসা প্রচার করাই ছিল তাহাদের একমাত্র কাজ। কিন্তু বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি, সেখানকার মানুষ মানুষই। মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-সংরাগ, স্বপ্ন-কামনা তাহাদের চিত্তকে দোলায়িত করে। সাম্যবাদের পথে পা দিয়াছে বলিয়াই তাহারা পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে নাই। বরং তাহাদের গার্হস্থ্য জীবন সুস্থ ও স্বাভাবিক। শিশুদের তাহারা ভার বলিয়া মনে করে না, দেশের সম্পদ বলিয়া মনে করে। শিশুরাই তাহাদের দেশে সর্বাপেক্ষা সুবিধাভোগী শ্রেণী। তাহাদের শিশুপ্রেম শিশুদিবসের জন্য জীয়াইয়া রাখা হয় না। ভাবীকালের নাগরিকের জন্য' সুস্থ ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনের জন্য তাহাদের বিরাম নাই। তাহাদের দেশে মানুষ আপনার মর্যাদা ফিরিয়া পাইতেছে। দু'মুঠো অন্নের জন্য মানুষ সেখানে পশু বনিয়া যায় নাই। উদ্যত বেয়নেটের সামনে যন্ত্রের মত তাহারা কাজ করে না। তাহাদের সজীব প্রাণের উচ্ছলতা বিচিত্র কর্মধারায় উপচাইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের পরিশ্রমের সময় কমিয়াছে। নৃত্যগীত, কাব্য-শিল্প এবং কলা-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব প্রসার হইয়াছে ঐসব দেশে। অর্থলিপ্সা, পরস্বাপহরণ এবং ধন-সম্পদের আভিজাত্য চিরতরে লোপ পাইয়াছে। অশিক্ষা দূর হইয়াছে। অভাব অনটনের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া মানুষ তাহার সুপ্তপ্রায় প্রতিভার উদ্বোধন করিয়াছে। জ্ঞান ও কর্মের অসংখ্য পথে যাহাতে উহার স্ফুরণ হয় সেইজন্য যথাযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারই ফলে রাজনৈতিক কাঠামোতে দ্রুত ও প্রগতিশীল পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে।

সাম্যবাদ সামগ্রিকভাবে সমস্ত জীবনকে বিচার করে বলিয়াই এইরূপ হইতেছে। বস্তু ও বিশ্বজগৎকে যথাযথভাবে দেখিতে হইবে। বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তিতে ইহার তত্ত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব ও মানবসমাজের গতি-প্রকৃতিকে এই দৃষ্টিকোণ দিয়াই বিচার করা হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে সকল সিদ্ধান্ত ও আবিষ্কারের

যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা হয়। এই মূল্যায়নের সময় বিশ্ব-সমাজের অন্যান্য বিশেষত্বের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। এক কথায় এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলা হয়। ইহা অবাঙ মনসগোচর কোন দুরূহ তত্ত্ব নয়। ইহা প্রত্যেকের বোধগম্য সাধারণ বিষয় মাত্র। ইহাতে বিশ্বজগতের কোনকিছুকেই স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করা হয় না। প্রত্যেক বস্তুই অন্যান্য নানা জিনিসের উপর নির্ভরশীল। শুধু তাহাই নহে। বিশ্বের কোন কিছুই অচল অনড় নয়। প্রত্যেকেই গতিশীল ও পরিবর্তমান। হয় তাহারা অগ্রসর হইতেছে, উপরে উঠিতেছে, নহিলে তাহারা ধ্বংসের দিকে, পতনের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। আর এই গতি সমতালে চলে না, একটি নির্দিষ্ট রেখা ধরিয়া ইহার গতি নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিশেষ বিশেষ বিন্দুতে দ্রুত পরিবর্তন দেখা যায়। আর এই পরিবর্তনের ধারা এমন এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়ায় যেখানে বস্তুর গুণগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন, উত্তাপের সংস্পর্শে আসিয়া জল বাষ্প কিংবা বরফে পরিণত হয়। এই পরিবর্তনের ধারা বহিয়াই মানবসমাজ চলিয়াছে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভাঙ্গিয়া দাসযুগের উদ্ভব ঘটিয়াছে। তাহারই মধ্য হইতে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। সামন্ততন্ত্র ভাঙ্গিয়া ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাও শাশ্বত নয়। ইহা হইতে সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হইবে। সমাজতন্ত্র সাম্যবাদের মধ্যে বিলীন হইবে। এইরূপ পরিবর্তন-পরম্পরার কারণও অনুসন্ধান করিয়াছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। প্রত্যেক জিনিসেরই দুইটি দিক আছে, একটি ধনাত্মক যাহা বিকাশমান এবং অপরটি ঋণাত্মক যাহা ক্ষয়িষ্ণু। একটি দিক বাড়িয়া চলিয়াছে, অপরটি তাহার বাড়তির পায়ে বাধা জন্মাইতেছে। এই দ্বন্দ্বের ফলেই শেষ পর্যন্ত বস্তুর আমূল রূপান্তর ঘটে। ইহাই ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটাইয়া সর্বহারার দল রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করিবে। তাহাদের নেতৃত্বে ক্রমে ক্রমে সমাজ হইতে শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত হইবে। সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বার্থ সমসূত্রে গ্রথিত হইবে। তখন আর শাসনের যন্ত্র রাষ্ট্রের আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আঞ্চলিক ও বৃত্তিগত গণসমিতিগুলি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে নূতন ধরনের সামাজিক কাঠামো গড়িয়া তুলিবে। প্রত্যেকে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন-কার্যে অংশগ্রহণ করিবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী পাইবে।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে সাম্যবাদেরও বিচার হইতেছে। নূতন নূতন ঘটনাপ্রবাহ উহার পরিবর্তন ঘটাইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাম্যবাদ কোন স্থির শাশ্বত বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইহার ভিত্তিমূলে যে-জীবনদর্শন সক্রিয় রহিয়াছে উহা সর্বদাই বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে সকল কিছুকেই বিচার করিতে বলে। সমাজতন্ত্র আজ আর শুধু রাশিয়ায় আবদ্ধ নয়। চীন, পূর্ব ইউরোপ এবং এশিয়ার

কোন কোন অঞ্চলে ইহা এখন সম্প্রসারিত হইয়াছে। সকলেই যে সোভিয়েট রাশিয়ার পথ অনুসরণ করিয়াছে তাহাও নহে। তাহাদের নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী তাহারা নূতন নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। সর্বত্রই যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ করিয়া নূতন সমাজের পত্তন হইতেছে তাহাও নহে। কোথাও আধা সামন্ত-তান্ত্রিক কোথাও বা অপূর্ণোন্নত ধনতন্ত্রের সমাজ জঠর হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে। আবার কোথাও কোথাও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর সহিত সমঝোতাও করা হইতেছে। এমতাবস্থায় তত্ত্ব হিসাবে সাম্যবাদেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। অনেকে তাই মনে করেন সারা বিশ্বে যখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইবে তখনও রাষ্ট্রযন্ত্রের অবসান ঘটিবে না। বহুকাল ধরিয়া জাতীয়তার যে-বীজ দেশে দেশে অঙ্কুরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, উহার মূলোচ্ছেদ করা হইবে না। উহার ছায়া অপরের বিনাশের কারণ হইবে না। সূর্যের আলো ও মাটির রস সকলের জন্য অফুরন্ত পরিমাণে পাওয়া যাইবে। তাই জাতীয়তা মারমুখী না হইয়া নানা ফুলের গাঁথা একটি মালা প্রস্তুত করিয়া সমগ্র মানব-সমাজের শোভা বর্ধন করিবে।

এমতাবস্থায় সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের অবসান ঘটাইয়া ইহা মানুষকে স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। তাই ইহার আবেদন পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষের কাছে। কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারীরা ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও রণোন্মাদনার মধ্য দিয় তাহারা মানুষকে বিভ্রান্ত করিতে চায়, তাহাদের মরণদশাকে বিলম্বিত করিতে চায়। কিন্তু সম্মার্জনী সহযোগে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গকে প্রতিরোধ করা যায় না। সাম্যবাদের গতিও এইসব অপচেষ্টাতে রুদ্ধ হইবে না। নিজের কাজ সারিয়া সে আবার কোন নূতনের অভ্যাগম ঘটাইয়া বিদায় লইবে তাহা আজ কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে আমরা সেই দুর্দম, নিশ্চিত প্রবলের আগমনের সম্ভাবনায় কাল গুণিতেছি।

৫৭

ভারতে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম

উচ্চশিক্ষায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষার ভাষা-মাধ্যমের প্রশ্ন আজ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে প্রশ্নটি যে-আকারে ছিল, এখন আর সে আকারে নাই—পরিবর্তিত অবস্থায় উহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে বিরোধ ছিল ইংরেজী ও প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে; বর্তমানে হিন্দী এই রণাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া বিষয়টিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হিন্দী প্রবল পক্ষ হইয়া

একদিকে ইংরেজীর প্রাধান্য লঘু করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হইয়াছে, অপরদিকে আঞ্চলিক ভাষাকে উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণ হইতে বিতাড়ন করিয়া শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিতেছে। কিন্তু হিন্দী অপরিণত ভাষা বলিয়াই, হিন্দী-সমর্থকদের উদগ্র বাসনা ও আন্দোলন সত্ত্বেও, কার্যক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। অন্য দিকে কয়েকটি উন্নত আঞ্চলিক ভাষার দাবীও এই পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে।

বর্তমান অবস্থায় আমরা ভারতবাসীদের, ভাষার ব্যাপারে অদ্ভুত মানসিকতার পরিচয় পাইতেছি। স্বাধীনতার পূর্বে যাঁহারা মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আজ ইংরেজী ভাষার জন্য আন্দোলন করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই আন্দোলন মূলতঃ অহিন্দী-ভাষীদের। অপরদিকে যেসব নেতা মুখে হিন্দী ও বুনিয়াদী শিক্ষার গুণকীর্তন করিতেছেন তাঁহারা কিন্তু নিজের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন ইংরেজী স্কুলে ও বিদেশে। আচার্য কৃপালিনী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Latest Fad"-এ এই মানসিকতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। এই উভয় মানসিকতা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবতা বিরোধী। অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, প্রথমটিতে আছে হিন্দী-ভীতি, দ্বিতীয়টিতে শাসক-গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ।

সমস্যাটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া তবেই উহার সমাধানের পথ নির্ধারণ করা উচিত। পূর্বেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব পর্যন্ত স্তরে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করা প্রয়োজন, এ-বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের (স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও গবেষণা ক্ষেত্রে) শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে, ইহা লইয়াই প্রশ্নটি গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী সম্বন্ধেও আমাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে—উহাকে আর বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক বলিয়া মনে করি না, উন্নত বিদেশী ভাষা বলিয়াই মর্যাদা দিতে শুরু করিয়াছি। ইংরেজী যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্বে সর্বজনীন ভাষার মত একটা স্থান লাভ করিয়াছে, বিশ্বের সমুদয় জ্ঞানের ভাণ্ডার তাহারই প্রসাদে উন্মুক্ত—এ-ধারণা আজ শিক্ষিত মহলে দৃঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। তৃতীয়তঃ, হিন্দী বহিঃরাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করিলেও ভাষা হিসাবে আজও অপরিণত।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উচ্চশিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নটি এবার বিচার করিব। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ বহুভাষী দেশ। সংবিধানে ১৪টি আঞ্চলিক ভাষা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সবগুলিই সমান উন্নত নয়। তবুও ইংরেজ আমল হইতে এইসকল ভাষা নানাভাবে আন্দোলন চালাইয়া পরিপুষ্টির পথে অনেকদূর অগ্রসর

হইয়াছে। সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রকাশে, কার্যে ও বৃত্তিতে, এইসকল ভাষার গুরুত্ব অনেকখানি কমিয়া যাইবে। গৌণভাষারূপে থাকিয়া পরিশেষে উহারা বিলুপ্ত হইয়াও যাইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা অনেকেই করিতেছেন। ইংরেজ আমলে আঞ্চলিক ভাষার দুর্গতির কথা সকলেই জানেন; স্বাধীন রাষ্ট্রেও তাহাই যদি অনুসৃত হইতে থাকে তবে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব হ্রাসের অর্থ হইবে দেশব্যাপী সংস্কৃতি-সঙ্কট। তৃতীয়তঃ শিক্ষার মাধ্যমের সহিত চিন্তা ও চিন্তাশক্তির যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটা কথা বলিলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আমরা এতাবৎ ইংরেজীতেই শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছি। তাই ইউরোপ-আমেরিকার খবর আমরা যত জানি, দেশের খবর তত জানি না। শুধু তাই নয়, দেশের প্রতি আমাদের আগ্রহেরও অভাব। রবীন্দ্রনাথ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' এই বিষয়টির উল্লেখ করিয়াছেন। আবার উন্নত ভাষাও আমাদের চিন্তাশক্তিকে বাড়াইয়া তোলে। তাই মাতৃভাষা যতই উন্নত হইবে, ততই, আমাদের দেশ-দেখা চোখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিবে এবং চিন্তা-শক্তিও বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু আরও কয়েকটি দিক এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় ঐক্য—সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা যদি শিক্ষার সর্বস্তরকে অধিকার করিয়া রাখে, তবে রাজ্যগুলির যোগসূত্র রক্ষার উপায় কি হইবে? দ্বিতীয়তঃ সর্বভারতীয় চাকরির ক্ষেত্রে প্রতি-যোগিতাই বা কি মাধ্যমে হইবে? তৃতীয়তঃ বহিঃরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোন ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া হইবে? এই প্রশ্নগুলি আমাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু এইগুলি বাদ দিয়া শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্ন কিছুতেই আলোচনা করা যাইতে পারে না।

ভাষা-সমস্যা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, ১৯৬৫ সালের পরও ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা রূপে ব্যবহৃত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, এঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণ উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে আপাততঃ ইংরেজী ভাষা রাখার পক্ষেই মত দিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ২৬শে জুন (১৯৬২) ঘোষণা করিয়াছেন, তৃতীয় যোজনাকালের মধ্যে অধিকাংশ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাক্‌স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনে সমর্থ হইবে। ১৯৫০ সালে রাধাকৃষ্ণণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন যে সুপারিশ করিয়া-ছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, এই ব্যবস্থা ঢিমে-তেতালায় চলিতে দেওয়া যাইতে পারে না। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের এবং কমিশনের পরস্পরবিরোধী উক্তি বর্তমানে সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, সরকারী

মহল হিন্দী সম্বন্ধে বর্তমানে দ্বিধাগ্রস্ত হইলেও পরিশেষে উহাকে রাষ্ট্রভাষা তথা উচ্চ-শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। সেইজন্য জোড়াতালির উপায় হিসাবে ইংরেজীকে রাখার ব্যবস্থা। কিন্তু অহিন্দী ভাষীরা উহাকেই স্থায়ী মর্যাদাদানের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন।

যাঁহারা ইংরেজীকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রাখিতে চান তাঁহাদের যুক্তিগুলি প্রধানতঃ এই: প্রথমতঃ ইংরেজী ভাষা বিশ্বের ভাষা বলিয়া বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত মানসিক সংযোগ রক্ষা সম্ভবপর; দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র দেশ ভারতের পক্ষে হিন্দীতে বা আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি বিষয়ে হাজার হাজার বইয়ের অনুবাদ করা অসম্ভব। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সমানভাবে তাল রাখিয়া চলিতে গেলে এইরূপ বিপুল ব্যয়সাধ্য অসাধারণ অনুবাদ কার্যে আত্মনিয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন; তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষেও বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত সংযোগ-রক্ষা, ভাব ও জ্ঞান বিনিময় আঞ্চলিক ভাষার দ্বারা সম্ভব নয়, ইংরেজী ভাষার দ্বারাই সম্ভব। এক কথায়, দেশ-বিদেশের জ্ঞানী, গুণী ও গবেষকদের সহিত সংযোগ রক্ষার সরলতম পথ ইংরেজী ভাষা। ইহাদের যুক্তিগুলি সুদৃঢ়, সন্দেহ নাই; কিন্তু উহার ভিত্তি যে অত্যন্ত দুর্বল তাহা আবিষ্কার করিতে বিশেষ বিচক্ষণতার প্রয়োজন হয় না। ইংরেজীকে উচ্চশিক্ষার বাহন করিয়া চিরদিন মাতৃভাষাকে কি আমরা দুগ্ধপোষ্য শিশু করিয়া রাখিব? মাতৃভাষার মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাকে বর্জন করিবার হেতু কি? শিক্ষার বাহন উচ্চপর্যায়ে ইংরেজী ও নিম্ন পর্যায়ে মাতৃভাষা থাকিলে দেশের মধ্যে নব জাতি ভেদ কি সৃষ্টি হইবে না? আসল কথা, হিন্দী ভীতিই ঐ সব যুক্তির জন্ম দিয়াছে। ইঁহারা যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইংরেজীর সীমাবদ্ধতা স্বীকার করিয়া মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা বলিতেন তবুও তাঁহাদের যুক্তি অনুধাবন করা যাইত।

বাস্তবতার প্রশ্নে ফিরিয়া আসিয়া আমরা বলিতে পারি, আমাদের এই ভাষাগত বিরোধ আসলে ইংরেজীর সহিত নয়, হিন্দীর সহিত। আজই হক, কালই হক, অথবা দুদিন পরেই হক, হিন্দী ইংরেজী ভাষাকে উচ্ছেদ করিয়া একচ্ছত্র হইয়া উঠিবে। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতার অভাব নাই। রাষ্ট্রীয় মর্যাদার খাতিরে উহা ইতিমধ্যেই বহিঃরাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রপুঞ্জেও হিন্দীর আধিপত্য একক। সুতরাং ভবিষ্যতে হিন্দী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও সেই স্থান গ্রহণের জন্য অধিকতর সচেষ্ট হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দী বহিঃরাষ্ট্রে মূল বিস্তার করিয়াছে, আভ্যন্তরিক জীবনে মুকুল ধরাইতে বাকী। এইখানেই সমস্যাটির সমাধান প্রয়োজন।

আমরা মাতৃভাষাকে যদি সংস্কৃতি, বৃত্তি প্রভৃতির বাহন বলিয়া মনে করি, সেখানে উহাকে নিশ্চয়ই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্থান দিতেই হইবে। আঞ্চলিক ভাষা এই ভূমিকা

গ্রহণ করিলে বল্কান উপদ্বীপের মত আমাদের দুর্দশা হইবে, এই মন্তব্য যাহারা করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। একথা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ভাষাই রাষ্ট্রের একমাত্র উপাদান নয় ;—আধুনিক রাষ্ট্রে বহু উপাদানের সমবায় স্বাতন্ত্র্যের পথ প্রস্তুত করিয়া থাকে। সুতরাং ভাষার ব্যাপারে রক্ষণশীল মনোভাব অবলম্বন না করাই শ্রেয়ঃ। অন্যান্য সমস্যার সমাধানের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, হিন্দীকে কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ-কর্মের স্তরে (কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে হিন্দী, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা) নিবদ্ধ রাখা উচিত। কেন্দ্রীয় আইন সভায় রাষ্ট্রপুঞ্জের মত ব্যবস্থা করিলে কিছুটা অর্থব্যয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সকলের পক্ষে মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় বর্তমানের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, সদস্যদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজী ভাষায় মনের ভাব-প্রকাশ করিতে হয় অক্ষম, না হয় আড়ষ্ট। হিন্দীতেও তাই। দ্বিতীয়তঃ বিদেশীভাষা হিসাবে ইংরেজী থাকিবেই, তবে তাহা গৌণভাবে। উচ্চশিক্ষার পারদর্শিতার জন্য এই ভাষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য ; কিন্তু তাই বলিয়া মাধ্যম হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। যে-সব ছাত্র উচ্চ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে, তাহারা জার্মান ভাষা শিখিয়া থাকে, ইহাও অনেকটা সেই রকম। তবে জার্মান ভাষা যেমন নিজে নিজে শিখিতে হয়, ইহা তেমন হইবে না। বিদ্যালয়ে গৌণবিষয়রূপে থাকিবে। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে মাতৃভাষা ইংরেজী-হিন্দীর আওতা হইতে মুক্ত হইয়া বনস্পতির মত আপনার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া লৌকিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সহজেই মহত্তম আশ্রয় দান করিতে পারিবে এবং সেই সঙ্গে গণতন্ত্রের পরীক্ষা সফল ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সার্থক হইয়া উঠিবে।

৫৮
আবশ্যিক সঞ্চয় ব্যবস্থা

১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ভারতের অর্থমন্ত্রী অর্থসংগ্রহের এমন এক নূতন ব্যবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন যাহার নজীর সারা পৃথিবীতে কখনও এবং কোথায়ও দেখা যায় নাই। অভূতপূর্ব এই পদ্ধতির নাম আবশ্যিক সঞ্চয় ব্যবস্থা। অর্থউপার্জনকারী ভারতের নাগরিকেরা তাহাদের আয় হইতে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে কিছু অংশ সরকারের নিকট গচ্ছিত রাখিবেন, পাঁচ বৎসর পরে ভারত সরকার সুদ সহ এই অর্থ তাঁহাদের প্রত্যেককে ফিরাইয়া দিবেন। এই ব্যবস্থার নূতনত্ব ইহাকে বিতর্কমূলক করিয়া তুলিয়াছে, ভারতের অর্থনীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানাবিধ

যুক্তির অবতারণা করিতেছেন। রাজনৈতিক দলগুলিও পিছাইয়া নাই, কেহ ইহার বিপুল প্রশাসনিক অসুবিধাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন; কেহ-বা ইহার সাংবিধানগত অসঙ্গতির কথা তুলিয়া ইহাকে অবৈধ ঘোষণা করিতে চাহিতেছেন। আমরা ইহার অর্থনৈতিক দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চাই।

সঞ্চয় বলিলে বোঝা যায় আয়ের যে অংশ ভোগ-কার্যে ব্যয়িত হইল না, সেই অংশ। কোন একটি ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ হইতে তাকাইলে উহাই সঞ্চয়। কিন্তু যদি সঞ্চিত অংশ আলমারিতে বা গুপ্তস্থানে রক্ষিত থাকে, তবে সেই মজুত অর্থ ব্যক্তির চোখে সঞ্চয় বলিয়া গণ্য হইলেও সমাজের চক্ষে মৃত, এবং সঞ্চয় বলিয়া গণ্য নয়। সমগ্র সমাজের দৃষ্টিতে সঞ্চয় বলিলেও যে-পরিমাণ প্রকৃত উপকরণ, ইঁট, কাঠ, চুণ, সুরকী, লোহা, কয়লা ও ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতি উপাদান ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে ব্যয়িত না হইয়া মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োজিত হইল, তাহাকে বোঝায়। নূতন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনের নাম বিনিয়োগ, সমাজের দৃষ্টিকোণে এই বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ ইহাই ভবিষ্যৎ সম্পদ উৎপাদনের মূল উৎস। এই বিনিয়োগই সমাজের সঞ্চয় সামাজিক মূলধন-গঠনের এই উপায়কেই আমরা সঞ্চয় বলিতে পারি।

ধনী দেশে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি, কারণ তাহাদের আয় বেশি; ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশে জাতীয় আয়ের অধিক অংশ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগে নিয়োজিত অংশ খুবই কম। ব্রিটেন ও আমেরিকার ন্যায় ধনশালী দেশে প্রতিটি ব্যক্তির সঞ্চয় বেশি এবং দেশে সামগ্রিক মূলধন-গঠনের হারও উচ্চ। সরকারী কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা ছাড়াই এই সকল দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বেশি থাকে। ভারতের ন্যায় দেশে শিল্পপ্রসার শুরু করিতে হইলে স্বাধীন ও অনিয়ন্ত্রিত শক্তির উপর সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা ছাড়িয়া দেওয়া চলে না, তাই পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারী প্রচেষ্টায় উপকরণগুলিকে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হইতে অপসারণ করিয়া মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে নিয়োগ করিতে হয়।

পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সরকারকেও টাকার হিসাবে দাম দিয়া উপকরণগুলিকে উহাদের বাজার হইতে কিনিয়া লইতে হয়। তাই সরকার দেশের লোকের হাত হইতে যে-টাকা তুলিয়া লইয়া বিনিয়োগ করেন, তাহা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সঞ্চয়। এই সঞ্চয় সংগ্রহ করার তিনটি প্রধান পদ্ধতি আছে: (ক) কর আদায়, (খ) মুদ্রাস্ফীতি, ও (গ) ঋণ গ্রহণ। কর আদায়ের পরিমাণ বেশি করিলে নাগরিকদের কর্মোদ্যম ও উৎসাহ হ্রাস পাইবে, তাই কর আদায়ের সীমা আছে। দ্বিতীয়ত, নোট ছাপাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইলে দ্রব্য-সামগ্রীর দাম বাড়ে, বেশি দামে সরকার উহাদের কিনিয়া লইয়া বিনিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু এই পদ্ধতির

মাধ্যমে মূলধন-গঠন একান্তভাবে নিষ্ঠুর পদ্ধতি, বেশির ভাগ জনসাধারণের অসহনীয় কষ্ট ও দুর্দশা হয় এবং সর্বোপরি সমাজে অর্থসম্পদের কেন্দ্রীভবন হইল এই পদ্ধতির ফল। তাই তৃতীয় পদ্ধতি, অর্থাৎ ঋণগ্রহণ অনেক সময় সরকারী অর্থসংগ্রহের অন্যতম প্রধান পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়। এই ঋণগ্রহণ যদি স্বেচ্ছামূলক হয় তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ না-হইবারই সম্ভাবনা। ভারত সরকার তাই বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ করার এই নূতন উপায় ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের বর্তমান আর্থনীতিক অবস্থায় বাধ্যতামূলক পদ্ধতির একটি প্রধান গুরুত্ব হইল, বর্তমানে যে-মুদ্রাস্ফীতি ঘটিতেছে তাহার প্রকোপ কমানো। লোকের হাত হইতে টাকার পরিমাণ কিছুটা অন্তত অপসারণ করিতে পারিলে সেই টাকা আর ভোগ্যদ্রব্যের বাজারে প্রবেশ করিয়া ভোগ্যদ্রব্যের দামের উপর চাপ দিতে পারিবে না। শুধু তাহাই নহে। লোকে যদি কম জুতা কেনে, তবে জুতা কোম্পানীর যন্ত্রের জন্য চাহিদা কমিবে, ঐ লৌহ, ইস্পাত অন্যান্য উপকরণ সরকারী ব্যবহারে চলিয়া আসিতে পারিবে। সর্বোপরি দেশের আপামর জনসাধারণের নিকট হইতে সঞ্চয় গৃহীত হওয়ায় সকলের মনে দেশরক্ষার কাজে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হইবে।

এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে তত্ত্বগত আপত্তিও বিশেষ গ্রহণযোগ্য নয়। অনেকে বলিতেছেন যে, আবশ্যিক সঞ্চয়ের অর্থ হইল ভোগব্যয় হ্রাস পাওয়া; ভোগব্যয় হ্রাস পাইলে উৎপাদন কম হইবে, উৎপাদন কম হইলে কর্মসংস্থান ও আয়সৃষ্টি হ্রাস পাইবে। কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নয়। যে-টাকা ব্যক্তির হাত হইতে সংগৃহীত হইয়া রাষ্ট্রের হাতে আসিল, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আলমারীতে মজুত থাকিলেই তবেই একমাত্র কুফল দেখা দিতে পারে। সংগৃহীত এই টাকা রাষ্ট্র ব্যয় করিবেন নূতন মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে। ব্যক্তির ব্যয় হ্রাস করিয়া ইহা বেসরকারী ক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন কমাইবে বটে, কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রে মূলধনী দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়িবে, তাই দেশের সামগ্রিক কর্ম-সংস্থান ও আয় হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা ইহাতে নাই। শুধু তাহাই নহে। ব্যক্তিরা ব্যয় করিলে উৎপাদন হইত ভোগ্যদ্রব্য, কিন্তু রাষ্ট্র মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করায় দেশে ভবিষ্যতে আরও যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করার ক্ষমতা সৃষ্টি হইবে। ইহাতে ভবিষ্যতে জাতীয় আয় দ্রুততর হারে বাড়িবে, বর্ধিত সেই আয় হইতে এই বাধ্যতামূলক ঋণ সুদে-আসলে ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হইবে।

আবশ্যিক সঞ্চয় ব্যবস্থার পক্ষে মূল যুক্তি তাই সরকারী ব্যয়-কাঠামোর মধ্যে নিহিত। যদি এমন অনুৎপাদক কাজে ইহা ব্যয়িত হয় যে ইহা হইতে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা দেশে সৃষ্টি হইতে পারিল না, তবে বর্ধিত করের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সুদসহ এই

ঋণ আমাদের বা আমাদের বংশধরদের ফেরৎ দিতে হইবে। অস্ত্রোৎপাদন এই প্রকার একধরনের অনুৎপাদক ব্যয়, কারণ সেই গোলাগুলি ও বন্দুক দিয়া পরবর্তী স্তরে কোন যন্ত্র বা ভোগ্যদ্রব্য তৈয়ার করা যায় না। আবশ্যিক সঞ্চয় পদ্ধতিতে সংগৃহীত টাকা রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করিতে পারিল কি না, তাহারই উপর নির্ভর করে ইহা সমর্থনযোগ্য কি না। সুষ্ঠুরূপে ব্যয় করার অর্থ হইল এমনভাবে সুচিন্তিতরূপে ইহাকে বিনিয়োগ করা, অর্থাৎ অগ্রাধিকার নীতি ও উৎপাদন-কৌশল নির্দিষ্ট করা, যাহাতে দীর্ঘকাল ধরিয়া দ্রুততম উন্নয়নের হার পাওয়া যায়।

৫৯
চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হইবার বহু পূর্ব হইতেই চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া কিরূপে রচিত হইবে তাহা লইয়া পরিকল্পনা কমিশন জল্পনা কল্পনা শুরু করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রয়োজন আছে। আজ আমরা যে-কাজ সফল করার চেষ্টা করি, তাহার পিছনে থাকে সেই কাজের পূর্ণ ফল কি দাঁড়াইবে সেই বিষয়ের চিত্ররূপ। চিত্রকর বা ভাস্কর কল্পনার চোখে সমস্ত চিত্র বা মূর্তিটি চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া উহাকে খণ্ড খণ্ড অংশে রূপদান করিতে থাকেন। ক্রমশ সেই চিত্র বা মূর্তিটির রূপ পূর্ণতর হইতে থাকে। ভারতের অর্থনীতিক উন্নয়নের যাত্রাপথে তৃতীয় পরিকল্পনা এইরূপ একটি স্তর মাত্র। এই স্তরের শেষে যে-অবস্থা দাঁড়াইবে তাহার ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনার রচিত হইবে ঠিকই, কিন্তু এখন হইতে উহার খসড়া রচনা না-করিলে বর্তমান কার্যসূচীকে পরবর্তী পরিকল্পনার কার্যসূচীর সহিত সংযুক্ত করার অসুবিধা দেখা দিবে।

পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, প্রথমে চতুর্থ পরিকল্পনার একটি কাঠামো তৈয়ারী করিয়া লইয়া, অর্থাৎ জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য কি হইবে ধরিয়া লইয়া তাহার পরে এক একটি ক্ষেত্রে পৃথকভাবে প্রতিটি কর্মসূচীকে বিশেষভাবে আলোচনা করা ভাল। কমিশনের মতে এইরূপ সামগ্রিক কোন একটি কাঠামো চক্ষের সম্মুখে না রাখিলে পৃথকভাবে প্রতিটি কর্মসূচী নির্ধারণ করা যায় না, বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মসূচী মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না, তাহাদের পরস্পর-নির্ভরশীলতার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, এবং সর্বোপরি, পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে নানারূপ প্রতিবন্ধক দেখা দেয়।

কমিশন অনেকবার বলিয়াছেন যে, সুউচ্চ হারে দীর্ঘকাল ধরিয়া উন্নয়ন হইলে

তবেই দারিদ্র্য হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। প্রথম দুইটি পরিকল্পনায় উন্নয়নের হার ধরা হইয়াছে বার্ষিক শতকরা গড়ে ৩'৫ হারে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ছিল ৫%। কমিশন মনে করেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় অন্তত বার্ষিক শতকরা ৭% হারে বৃদ্ধি পাওয়া দরকার। এই ভিত্তিতে হিসাব করিয়া বলা হইয়াছে যে, পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় দাঁড়াইবে বৎসরে ৩৩,০০০ কোটি টাকা (১৯৬০-৬১ সালের দাম স্তর অনুসারে) এবং মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হইবে ৫২০ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সালের দ্বিগুণ।

চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হইয়াছে যে, বিনিয়োগের পরিমাণ এমন বাড়াইতে হইবে যাহাতে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বিনিয়োগের হার দাঁড়ায় জাতীয় আয়ের ২০% এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণ হয় ২৬০০০ কোটি। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে বিনিয়োগের হার দাঁড়াইবে জাতীয় আয়ের ১৪%। কমিশন মনে করেন যে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা আর উচিত নয়। কমিশনের মতে জাতীয় আয়ের ১০% হইতে ১২% বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে বর্তমানে যে-পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য গৃহীত হইতেছে তাহা খুবই আপত্তিজনক। ভবিষ্যতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ক্রমশ কমাইয়া বর্তমানের তুলনায় অর্ধেক করিয়া ফেলিতে হইবে। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষ হইতে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাইবে এবং ভারত নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিবে। বর্তমানে মোট বিনিয়োগের এক-পঞ্চমাংশই বৈদেশিক সাহায্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য আভ্যন্তরিক সঞ্চয়ের হার এতটা বাড়াইতে হইবে যেন চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হয় প্রায় ২২০০০ কোটি টাকা। রপ্তানি বাড়াইয়া বিদেশ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করার ক্ষমতা আমাদের সীমাবদ্ধ, তাই আমাদের উৎপাদন ও বিনিয়োগ এমন বিভিন্নমুখী করিতে হইবে যে, দেশের মধ্য হইতেই যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালগুলি পাওয়া সম্ভব হয়।

আভ্যন্তরিক উৎপাদন বাড়াইবার জন্য কেবল সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়াইলেই চলিবে না, দেশের ভোগস্তর, বিশেষ করিয়া দরিদ্র শ্রেণীর ভোগস্তর এমনভাবে বাড়াইতে হইবে যাহাতে দেশের মধ্যে এই বর্ধিত উৎপাদন বিক্রয় হইয়া যায়। কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনে সরকার বদ্ধপরিকর, তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য সামাজিক সেবামূলক কাজকর্মের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। হিসাব করা হইয়াছে যে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে মোট ভোগের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৯৬০-৬১ সালের দামস্তরে ২৪,১০০ কোটি টাকা। রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজকর্ম বা সামাজিক ভোগের পরিমাণ হইবে ১১৭০ কোটি টাকা হইতে ২৮০০ কোটি টাকা। ১৯৭০-৭১ সালে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ হইবে ৩৮০ টাকা।

মোট ভোগ, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও আমদানি ভিত্তিতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষির উৎপাদন ২৭% বাড়ানো দরকার। সংগঠিত খনি ও যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ৬৬% বাড়ানো দরকার, ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে ৪৫% এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৪০%। ২০০০০ কোটি টাকা নীট বিনিয়োগের মধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনায় শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রশিল্প উৎপাদন, পরিবহণ ও সংযোজন প্রভৃতিতে বিনিয়োগ হইবে মোট ১৩০০০ কোটি টাকা, অর্থাৎ নীট বিনিয়োগের ৬৫%।

খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে হইবে ১০০ মিলিয়ন টন, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ইহাকে ১২০ মিলিয়ন টন করিতে হইবে। তুলার পরিমাণ ৭ মিলিয়ন বেল হইতে ৯ মিলিয়ন বেল করিতে হইবে। কয়লার উৎপাদন দ্বিগুণ করিতে হইবে, অর্থাৎ ৮৭ মিলিয়ন হইতে ১৮০ মিলিয়ন টন করিতে হইবে, লৌহ মাক্ষিকের পরিমাণ ৩০ মিলিয়ন টন হইতে ৬০ মিলিয়ন টন করিতে হইবে। অপরিশোধিত তৈল উৎপাদনের পরিমাণ ৬ মিলিয়ন টন হইতে ১৪ মিলিয়ন টন হইবে, আর তৈল-শোধনাগারগুলি উৎপাদন ১৬ মিলিয়ন টন হইতে ২৭ মিলিয়ন টনে পরিণত করিতে হইবে। সারের ক্ষেত্রে সরকার দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যের (নাইট্রোজেনের হিসাবে ১ মিলিয়ন টন) অর্ধেক পর্যন্ত পূরণ হইতে পারে তবে চতুর্থ পরিকল্পনায় ইহার লক্ষ্য রাখা হইয়াছে ১·৬ মিলিয়ন টন। ইস্পাতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে ১৮ মিলিয়ন টন ইন্‌গট্‌, ইহা হইতে ১২ মিলিয়ন টন ইস্পাত এবং ৩ মিলিয়ন টন কাঁচা লোহা বিক্রয়ের জন্য পাওয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত আরও অর্ধ মিলিয়ন বিশেষ ধরনের এবং মিশ্রিত ইস্পাত উৎপন্ন হইবে আশা করা যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণও ১৯৬৫ সালের ১৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট হইতে ২৫ মিলিয়ন কিলোওয়াটে উন্নীত হইবে। অ্যালুমিনিয়াম, সীসা, দস্তা এবং তামার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। চতুর্থ পরিকল্পনার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যন্ত্রপাতির উৎপাদন। এই পরিকল্পনাকালে কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি পাইবে আড়াই গুণ। ইহাদের তুলনায় বস্ত্রের উৎপাদন খুবই নিম্নাকাঙ্ক্ষী বলিতে হইবে। ইহার লক্ষ্য হইল তৃতীয় পরিকল্পনার শেষকালীন ৫৩০০ মিলিয়ন মিটার হইতে ৬৪০০ মিলিয়ন মিটারে পৌঁছানো। মোটর গাড়ি ও জীপের উৎপাদন হইবে দ্বিগুণ, আর ট্রাক্‌, বাস, মোটর সাইকেল ও স্কুটারের উৎপাদন হইবে আড়াই গুণ বেশি। কমিশন মনে করেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ১৯৭১ সালে ভারতের সাইকেল শীর্ষস্তরে উন্নীত হইবে, ইহার উৎপাদন ১৯৬৫ সালের ২ মিলিয়ন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া পাঁচ বৎসর পরে দাঁড়াইবে ৩·৩ মিলিয়ন টনে।

এই সকল লক্ষ্য কার্যকরী করার জন্য দেশের সম্পদের আভ্যন্তরিক সম্পদের পূর্ণ

ব্যবহার করিতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ যদি কমাইতে হয়, তবে আমাদের প্রত্যেককে যে বিপুল আর্থিক ভার বহন করিতে হইবে তাহা চলতি বৎসরের ভারের তুলনায় অনেক বেশি। মূল প্রশ্ন হইল, যে-শ্রেণী পরিকল্পনা হইতে লাভবান হইতেছেন সেই ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর নিকট হইতেই অধিকতর অর্থ সংগৃহীত হউক, ইহাই সকলের কাম্য।

মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট সরকারীভাবে প্রকাশিত না হইলেও এই কমিটির প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়াছে যে, গত দশ বৎসরে পরিকল্পনায় ভারতের নিম্নতম আয়ের লোকেদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। সাম্প্রতিককালে জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস পাওয়ার বদলে তাহা আরও তীব্রতর হইয়াছে। বর্তমানের বাজেট এবং সরকারের আর্থনীতিক নীতির কোনরূপ পরিবর্তন না হইলে ভবিষ্যতে এই আর্থিক বৈষম্য আরও তীব্র আকার ধারণ করিবে। শুধু তাহাই নহে। বিগত ১২ বৎসরের পরিকল্পনার পরেও আমাদের দেশে জীবিকা-কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে নাই। এখনও জনসংখ্যার ৭০ ভাগের উপর কৃষিজীবী এবং তাহারা কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল। ভূমিস্বত্ব আইনগুলি কার্যকরী হয় নাই। জমির মালিকানায় কেন্দ্রিকতার ঝোঁক বাড়িয়া চলিয়াছে। ভূমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা দূর হয় নাই। কৃষিতে ধনতন্ত্রের প্রবেশ ঘটিতেছে কিন্তু যন্ত্রীকরণের দ্বারা ইহার উৎপাদন-ক্ষমতা এখনও সুউচ্চ হারে বাড়ে নাই। বৃহৎ চাষীরা এখনও 'সমবায় চাষ সমিতি' গঠন করিয়া ভূমিহীন মজুরদের খাটাইয়া কৃষিকে শিল্পের স্তরে উত্তোলন করে নাই। কৃষিকে এইরূপ অনগ্রসর স্তরে ফেলিয়া রাখিয়া শিল্পক্ষেত্রকে আর আগাইয়া লওয়া সম্ভব নয় বলিয়া মনে হইতেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার সহজ সাফল্যের ইহাই প্রধান বাধা।

৬০

প্রতিরক্ষা ও উন্নয়ন

অথবা

প্রতিরক্ষার ব্যয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ভারত আর্থনীতিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তাহার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান এশিয়ার অনেক দেশ অপেক্ষাও নীচুতে, গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থাকিয়া আর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্যে উৎপাদন-শক্তি ক্রমাগত বাড়াইয়া চলাই তাহার উন্নয়নের মূল কথা।

চীনা আক্রমণের সম্মুখেও ভারতের নেতারা এই লক্ষ্য পরিত্যাগ করেন নাই, বরঞ্চ এই পরীক্ষায় আরও গভীরভাবে আত্মনিয়োগের শপথ তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে-যুদ্ধজনিত ব্যয়ের চাপে পরিকল্পনার বহু কর্মসূচী বাতিল করিতে হইবে। ব্যক্তি-ক্ষেত্রের সমর্থক প্রচারকগণ সমগ্র পরিকল্পনা বাতিলের দাবীও উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে নতিস্বীকার করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নাই, একটি চলিতে থাকিলে অপরটি চলিতে পারে না,—ইহাদের সম্পর্ক এরূপ নহে। আজিকার যুদ্ধে লোকসংখ্যা অপেক্ষা সমর সম্ভারের প্রয়োজন অনেক বেশি, আর সেই সমরোপকরণ উৎপাদনের মূল উৎস হইল কলকারখানা। শিল্পের দ্রুত প্রসারই অস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপায়। পরিকল্পনার প্রতিটি কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ তাই দেশের আর্থনীতিক ও সামরিক বনিয়াদ একই সঙ্গে সুদৃঢ় করিয়া তোলে। উন্নয়নই প্রতিরক্ষা।

এই কথা বর্তমানে আরও সত্য, কারণ ভারত বিদেশ হইতে আশানুরূপ সাহায্য পায় নাই। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন উন্নয়নের পরিকল্পনাসূচী বাদ দিয়া সেই অর্থের সাহায্যে বিদেশ হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করা আশু কর্তব্য, তাঁহাদের মোহমুক্তি ঘটিয়াছে। উপযুক্ত দাম দিয়াও অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই, পশ্চিমী দেশগুলি অস্ত্রের বিনিময়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার একাংশ আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই অবস্থায় 'বৈদেশিক সাহায্যে'র উপর নির্ভরশীলতায় আর লাভ নাই' আভ্যন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশের মধ্যেই অস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। প্রতিরক্ষার জন্যই এখন উৎপাদন দরকার। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সেবামূলক কাজকর্মের জন্য ব্যয় বা কৃষির জন্য ব্যয় কমাইয়া দিয়া শিল্পখাতে ব্যয়-বরাদ্দ বাড়াইয়া তোলা প্রয়োজন, তাহাতেই সফল প্রতিরক্ষার দৃঢ় ভিত্তি তৈয়ারী হইতে পারে। পরিকল্পনার অশিল্পগত ব্যয় যথাসম্ভব হ্রাস করিয়া মূল ও ভারী-শিল্পের উপর ব্যয় বাড়ানোই প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে একান্ত কর্তব্য।

কথা হইল একই সঙ্গে পরিকল্পনা ও প্রতিরক্ষার কাজ চালাইতে গেলে ভারতের গণজীবনের উপর যে আর্থনীতিক চাপ আসিবে, যে কৃচ্ছ্রসাধন বরণ করিতে হইবে, তাহা আমাদের পক্ষে সম্ভব কিনা। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগব্যয় বা জীবনযাত্রার মান কিছুটা কমাইয়া দিয়া কয়েক বৎসরের শেষে আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছাইতে পারিব কি না যখন আমাদের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে এবং একই সঙ্গে উন্নয়নের কর্মসূচী সফল হইয়াছে।

প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে আমাদের ব্যক্তিগত ভোগব্যয় সংকুচিত হইবে তিন

উপায়ে : অধিক রপ্তানি করিয়া দেশে ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ কমানো, অধিকতর সঞ্চয় করা এবং অধিক পরিমাণে কর প্রদান করা। অধিক পরিমাণে সঞ্চয় করিলে এবং কর প্রদান করিলে আমরা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিব অনেক কম, সেই দ্রব্যাদি দেশের বাহিরে রপ্তানি করিয়া যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিব, তাহার সাহায্যে প্রতিরক্ষার আশু প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হইবে। কৃচ্ছ্রসাধন, বিদেশে রপ্তানি ও বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ, ইহাই বর্তমান অবস্থায়,—যখন ভারতে প্রতিরক্ষা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—আমাদের প্রতিরক্ষার মূল নীতি।

রপ্তানি বাড়াইয়া বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটাও—এই নীতি যথেষ্ট কার্যকরী হইতেছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। যে-পরিমাণ 'রপ্তানির উদ্বৃত্ত' (export surplus) আমাদের সৃষ্টি করা দরকার, তাহা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অপ্রয়োজনীয় আমদানির পরিমাণ আমাদের খুবই কম, তাই আর আমদানি হ্রাসের প্রশ্ন উঠে না। এদিকে আমাদের রপ্তানি দ্রব্যগুলির চাহিদা বিদেশে আর বেশি বাড়ানো সম্ভব হইতেছে না। বরং পাট ও চা-র ব্যবসাতে পাকিস্তান ও সিংহলের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্রতর হইতেছে, এক্ষণেই রপ্তানির মূল্য বাড়ানো আর বেশি সম্ভব বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। এই সমস্যা মিটাইবার একটি পথ হইল দেশের মধ্যে প্রভূত পরিমাণ লুকানো স্বর্ণ সরকারের হাতে তুলিয়া নেওয়া। সরকার যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্ণ পান, তবে রপ্তানির আধিক্য সৃষ্টি না করিয়াও এবং দেশে ভোগের স্তর না কমাইয়াও, আমরা বিদেশ হইতে অস্ত্রসম্ভার ক্রয় করিতে পারি, উন্নয়নের কর্মসূচী বজায় রাখিয়াও আমরা প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মিটাইতে পারি। কিন্তু, যতদূর দেখা যাইতেছে সাম্প্রতিক স্বর্ণনীতি সফল হয় নাই এবং ভারত সরকারের হাতে মজুত-করা বা লুকানো সোনা পৌঁছায় নাই।

ভোগের স্তর না কমাইয়া প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের প্রয়োজন একই সঙ্গে মিটানো সম্ভব যদি আমাদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সকল দিকের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানো যায়। দেশের জমি, খনি, মৎস্যচারণ ক্ষেত্র, কয়লা, লোহা ও কলকারখানার যন্ত্রপাতি—সারা দেশের মাটি ও মানুষের কোন অংশ যেন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া না থাকে, প্রতিটি উপকরণের উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণতম ব্যবহার যেন সম্ভবপর হয়। অব্যবহৃত বা স্বল্পব্যবহৃত উপকরণের দরুন উৎপাদন কম হইলে, এই অবস্থায় প্রবল মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। নূতন সৈন্যসামন্ত, পথঘাট নির্মাণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য দেশে প্রতিরক্ষামূলক ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে। এই অবস্থায় উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত না বাড়িলে মুদ্রাস্ফীতি ঠেকাইবার কোন পথ থাকে না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় হইল, রপ্তানি-বৃদ্ধির কোন চিহ্ন তো নাই-ই, দেশের শিল্প ও কৃষি-

কাঠামোরও অনড় অচল অবস্থায় রহিতেছে, তাহাদের মধ্যেও উৎপাদন বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতির আবহাওয়া ইতিমধ্যেই দেখা দিয়াছে। এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেশের মধ্যে একপ্রকার কৃত্রিম স্বাচ্ছন্দ্যের ভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যেমন খাদ্যশস্যের মণ প্রতি দাম বাড়িয়াছে, বিশ মণ ধান বেচিয়া যে-চাষী ৩৫০ টাকা পাইত, আজ সে ৪০০ টাকা পাইতেছে। টাকা বেশি পাওয়ায় তাহার মনে এই মোহ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক যে ইহা সুস্থতার লক্ষণ। কিন্তু একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে নাই। দেশের আর্থনীতিক দেহে নকল কাঁচের ঝলমলানি চক্ষু ধাঁধাইতেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সকল পুষ্টি স্বাভাবিক সৌন্দর্যের রূপে প্রতিভাত হইতেছে না।

টাকার হিসাবে প্রতিরক্ষার ব্যয় ভবিষ্যতে কত হইবে তাহা আন্দাজ করা অসুবিধা। তবে ইহা ঠিকই আমাদের স্থূল জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ প্রতিরক্ষায় ব্যয়িত হইবে। ইহা কম নয়। উন্নয়নের প্রয়োজন ও নির্ধারিত লক্ষ্য ছাপাইয়া ঊর্ধ্বতর কোন এক বিন্দুতে পরিকল্পনা সকল দিকের কর্মসূচী হিসাব করা দরকার। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন এইখানেই। যদি আমরা দেশরক্ষা ও আর্থনীতিক অগ্রগতি উভয় লক্ষ্য সফল করিতে ইচ্ছা করি, তবে দেশব্যাপী উৎপাদন বৃদ্ধির যজ্ঞ শুরু করাই একমাত্র পথ। বর্তমানে জাতীয় আয় বাড়ে শতকরা ৩ হারে, ইহা শতকরা ৫ হারে উঠানো যাইবে কি, ইহাই মৌলিক প্রশ্ন।

৬১

খাদ্যশস্যের সরকারী বাণিজ্য

খাদ্যদ্রব্যের বাজার এখন সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া মূলধনের গ্রাসে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া কালোবাজারীরাই এখন প্রকাশ্যে দরদস্তুর ও সরবরাহ স্থির করিতেছে। চাল, সরিষার তৈল ও চিনি—একটির পর একটি পণ্য এক এক সময় বাজার হইতে উধাও হইয়া যায়—সরকার তখন বাধ্য হইয়া নাকে খত দিয়া সর্বোচ্চ মূল্য চড়াইয়া দেন। দরের উপরে বর্তমানে চলিতেছে ভেজাল। সভ্য জগতের নৈতিক বিধির সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া তেলকলের মালিকেরা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, দাম না-বাড়াইলে ভেজাল তো হইবেই। এতদিন কালো-বাজারীরা মূল্যবৃদ্ধির অধিকার লইয়া লড়াই করিতেছিলেন, এখন তাঁহারা ভেজালের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া মূল্যবৃদ্ধির নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। মুনাফা-খোরদের মুনাফার মহোৎসব জমিয়া উঠিয়াছে।

মূল কথা : সরকারী সরবরাহের ব্যবস্থা না-থাকিলে মূল্য নিয়ন্ত্রণ যে একেবারেই অকেজো সেই অভিজ্ঞতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় হইতেই আমরা পাইয়াছি। ১৯৪৪ সালে রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের পরই অবস্থা আয়ত্তাধীনে আসিল, ইহা আমরা সকলেই জানি। কলিকাতার বাজারে রেশনিং তুলিয়া দিবার পর হইতেই অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটিয়া বর্তমানে এই অবস্থায় ঠেকিয়াছে। ১৯৩৯ সালের মহাযুদ্ধের সময় হইতেই আমরা দেখিতেছি—একচেটিয়া পাইকারেরা ফসল ও অন্যান্য দ্রব্য করায়ত্ত করিয়া দর বাড়াইতে থাকে, সরকার দর বাঁধিয়া দিলেই তাহারা ঘোষণা করে দ্রব্যের যোগান কম। বাজারের উপর তাহাদের একচেটিয়া দখল আজ এত নিশ্ছিদ্র যে মুহূর্তের মধ্যেই তাহারা মজুত পণ্য গোপনে অপসারণ করিতে পারে। তাই নির্দিষ্ট দর বজায় রাখিতে হইলে সরকারকেই সেই দরে সরবরাহের দায়িত্ব লইতে হইবে।

এতদিন সরকারী কর্তারা ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন যে তাঁহারা কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য সর্বদা মজুত করিয়া রাখিবেন অসময়ের জন্য, কারবারীরা দর বাড়াইলেই ঐ মজুত তাঁহারা বাজারে ছাড়িবেন, তাহা হইলেই কারবারীরা বাজার হাতছাড়া হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বাঁধা দরে পণ্য বিক্রয় সুরু করিবে। কিন্তু কালোবাজারীদের কাছে ইহা এখন স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে সরকারী রিজার্ভ কখনই এত বেশি হইতে পারে না যে বাজারের সকল চাহিদা সরকার মিটাইতে পারিবে। সুতরাং তাহারা এখন আতঙ্কিত না-হইয়া অপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে। এই অপেক্ষাকালের মধ্যে সরকারী মজুত নিঃশেষ হইবে, এই কথা তাহারা জানে। তাহাদের এই অপেক্ষা করার নীতি, কার্যত দুইটি কারণে সফল হইতেছে : প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে সরকারী ও বেসরকারী গুদাম ও হিমঘর নির্মাণ, এবং দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক ঋণের সাহায্যে মজুত ধরিয়া রাখার ক্ষমতা বৃদ্ধি।

মোট কথা বাজারের ফসল যাহাতে পাইকারের হাতে না-পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকারকেই খাদ্যশস্যের পাইকারী ক্রয়বিক্রয়ের সংযোগসূত্রগুলি নিজ হাতে তুলিয়া লইতে হইবে। খুচরা ব্যবসায় সরকারের হাতে তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। পাইকারী বাজার সরকারের হাতে থাকিলে খুচরা কারবারীরা সরকারের নিকট হইতে বাঁধা দরে সরবরাহ পাইবে। ফলে তাহারা বাঁধা দরে ক্রেতা সাধারণকে সরবরাহ করিতে পারিবে। পাইকারেরা যেভাবে ব্যাঙ্কের সাহায্য পায় খুচরা বিক্রেতারা তাহা পায় না, ফলে তাহাদের ধরিয়া রাখার ক্ষমতা কম। উপরন্তু, পাশাপাশি সরকার কর্তৃক ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং আংশিক রেশন ব্যবস্থা চালু রাখিলে খুচরা ব্যবসায়ীদের মুনাফাখোরী দমন করা একেবারে অসম্ভব হইবে না।

সরকারী পাইকারী ব্যবসায় সফল হইতে পারে কি অবস্থায়? যে ফসল বাজারে

ওঠে তাহার বেশির ভাগ যদি সরকার না-কেনেন তাহা হইলে পাইকারের ক্ষমতা অব্যাহত থাকিয়া যাইতে পারে। কিছু কিনিব, কিছু বেচিব ও কিছু জমাইব—এই ধরনের সংকল্প লইয়া যদি সরকার সীমাবদ্ধ পরিমাণ ক্রয় করার চেষ্টা করেন তাহা হইলে খাদ্যশস্যের সরকারী ব্যবসায় বিফল হইবে। তখন পাইকারী ব্যবসায়ীদের তত্ত্ববিদেরা ঘোষণা করিবেন—এই দেখ সরকারী বাণিজ্য খাদ্যসংকট সমাধানে অক্ষম। পশ্চিমবঙ্গে যত চাল উৎপন্ন হয় মোটামুটি উহার এক-তৃতীয়াংশ বাজারে আসে, সুতরাং বাজারে সচরাচর ১৫ লক্ষ টন আসে। আমরা এই হিসাব মানিলে অন্তত ১২ লক্ষ টন চাল সরকারকে কিনিতেই হইবে। সরকারের হাতে যদি ১২ লক্ষ টন চাল মজুত থাকে তাহা হইলে খুচরা ব্যবসায়ীদের আর পাইকারদের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। অর্থনীতিবিদ্‌গণের মতে সারা ভারতে সরকারী ব্যবসায়ের জন্য ৪০০ কোটি টাকা মূলধন দরকার। পশ্চিমবঙ্গে তাহা হইলে ৩০ হইতে ৪০ কোটি হইলেই চলিবে। এই মূলধন সংগ্রহের জন্যই ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

সরকার কখন কিনিবেন এবং কিভাবে কিনিবেন? বৎসরের প্রথমে অল্পবিত্ত কৃষকেরা বাজারে ধান বিক্রয় করে। এই সময়ে খুচরা বিক্রেতাদের নিকট হইতেই সরকারকে কিনিতে হইবে। ইহাদের নিকট হইতে সরকার যাহা পাইবেন, উহাই নিশ্চিত, কারণ বৃহৎ পরিমাণ জমির মালিকেরা বহুক্ষেত্রে নিজেরাই পাইকার। তাহা ছাড়া পাইকারদের নিকটও তাহারা বিক্রয় করিবে। আইন করিয়া ইহা ঠেকানো শক্ত—গোপন কারবার চলিবেই। আর, পাইকারেরা সারা বছর ধান চাল ধরিয়া রাখিতে পারে।

দীর্ঘকাল ধান চাল ধরিয়া রাখিতে পারে এইরূপ জোতদারের সংখ্যা সমগ্র কৃষি-পরিবারের সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ। ইহাদের হাতে মোট চাষের জমির শতকরা ৫৮ ভাগ। শুধু তাহাই নহে নিজের জমির ছাড়াও অপরের জমির উদ্বৃত্ত ফসল তাহারা কেনে। তাই ইহারাই কৃষিজাত ফসলের একচেটিয়া মালিক এবং পাইকারী কারবারের সঙ্গে গাটছড়াবদ্ধ। এই মনোপলি যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ বাজারে পাইকারদের দাপটও থাকিবে। তাই জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ এবং উহার যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া খাদ্যশস্যের বাজারে সরকারী বাণিজ্য বেশিদূর সাফল্যলাভ করিতে পারে না। ঠিক এই সূত্রে প্রকৃত ভূমি সংস্কার ও খাদ্যশস্যের সরকারী ব্যবসায় ওতঃপ্রোতোভাবে জড়িত।

সুতরাং বেশির ভাগ ফসল কয়েকটি বড় জোতদারের হাতে কেন্দ্রীভূত, তাহারা দীর্ঘকাল ধান ধরিয়া রাখে বলিয়াই খাদ্য সংকটের তীব্রতা এত বেশি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ কৃষকেরা তিন মাসের মধ্যে তাহাদের বিক্রয়যোগ্য ফসল বাজারে আনে

বহু গরীব চাষী নিজের ঘরে সারা বৎসরের খাদ্য না-রাখিয়াই টাকার তাগিদে ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। তাই এই তিন মাসের জন্য পাইকারদের ক্রয় একেবারে নিষিদ্ধ করিতে হইবে, সরকারকে ক্রয়কেন্দ্র খুলিতে হইবে গ্রামের বাজারে বাজারে। চাষীদের জন্য ন্যায্যদর স্থির করিতে হইবে এবং নগদ টাকায় কিনিতে হইবে।

কিন্তু গরীব চাষীদের অনেকেই মহাজনদের নিকট হইতে দাদন লইয়া তাহাদের সঙ্গে পূর্ব হইতেই ফসল বিক্রয়ের চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাদের ফসল বাজারে আসিবে না। সুতরাং, এখনই চাষের সময়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা সরকারকেই করিতে হইবে, যাহাতে চাষীরা মহাজনদের দ্বারস্থ হইতে বাধ্য না হয়। সরকারী বাণিজ্যের মূলধন হইতেই এই টাকা দেওয়া চলে, কারণ ইহা আসলে অগ্রিম ক্রয়। এই ঋণদানের সময় এখনই। ফসল ওঠার সময় বাজারে নামার জন্য অপেক্ষা না করিয়া সরকারকে এখনই চাষীদের দাদন দিতে হইবে ফসল ক্রয়ের চুক্তিতে।

সুতরাং খাদ্যশস্যের বাজারে সরকারী ব্যবসায় ব্যবস্থা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি ব্যবস্থা দরকার। একটি ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ, মূলধন পাইবার জন্য; অপরটি পর্যাপ্ত কৃষি ঋণ, ফসল পাইবার জন্য।

৬২

ভারতের ইউনিট ট্রাস্ট

ভারতে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া তাহাদের দীর্ঘকালীন মূলধন সংগ্রহ করেন। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ নানা কারণে এখন পর্যন্ত নূতন কোম্পানীগুলির শেয়ার কিনিতে সাহস পান না। একমাত্র সুবিখ্যাত কোন ব্যবসায়ীর নাম পরিচালকমণ্ডলীর সহিত যুক্ত থাকিলে তবে সেই কোম্পানীর শেয়ার অনেকে ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন। তাহা ছাড়া, শেয়ার বাজারে অনেক দুর্নীতির কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত থাকায় তাঁহারা শেয়ার কিনিতে ভয় পান। উপরন্তু, কোনো ফার্মের ভবিষ্যতে কিরূপ মুনাফা পাইবার সম্ভাবনা আছে তাহা বিচার করিতে হইলে যে খুঁটিনাটি বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তাহা এইরূপ সম্ভাব্য সাধারণ শেয়ারক্রেতাদের মধ্যে না থাকারই সম্ভাবনা। নূতন ফার্মগুলি যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন পাইতে পারে এবং কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে শেয়ার কুক্ষিগত না হইতে পারে, যাহাতে অধিকসংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে শেয়ারগুলির মালিকানা বণ্টিত হইতে পারে, সেই

উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালে ভারত সরকার 'ইউনিট ট্রাষ্ট' নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়াছেন, ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে এই সংস্থা কাজ শুরু করিয়াছেন।

ভারতের ইউনিট ট্রাষ্টের প্রারম্ভিক মূলধন ৫ কোটি টাকা নিম্নলিখিতভাবে সংগৃহীত হইয়াছে: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া ২'৫ কোটি, ভারতের জীবনবীমা করপোরেশন ৭৫ লক্ষ টাকা; ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও উহার সহযোগী ব্যাঙ্কসমূহ ৭৫ লক্ষ টাকা এবং তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ১ কোটি টাকা। এই প্রারম্ভিক তহবিল লইয়া ট্রাষ্ট ভাল ভাল সিকিউরিটির একটি সুষম বিভাগ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার ভিত্তিতে ইউনিট তৈয়ারী করিয়া লগ্নীকারী জনসাধারণের নিকট উহা বিক্রয় করা হইতেছে। এই ইউনিটসমূহ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা ট্রাষ্টের মূলধন গড়িয়া তুলিবে। প্রতি ইউনিটের মূল্য বর্তমানে ধার্য হইয়াছে ১০ টাকা, এইগুলি একসঙ্গে দশটি বা দশের গুণিতকে ক্রয় করা যায়। কোন ব্যক্তি কত পরিমাণ ইউনিট ক্রয় করিতে পারিবেন তাহার কোন উচ্চতম সীমা নির্দেশ করা হয় নাই।

একটি ট্রাষ্টিবোর্ডের হাতে এই ট্রাষ্টের ব্যবসায়, কাজকর্ম ও সাধারণ পরিচালনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ করে। ব্যবসায়, শিল্প, ব্যাঙ্কিং, আর্থিক বিষয় বা লগ্নী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক আরও চারজন ট্রাষ্টি মনোনীত করেন। জীবনবীমা করপোরেশন একজন এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক একজন ট্রাষ্টি নিয়োগ করেন। যে-সব প্রতিষ্ঠান প্রারম্ভিক মূলধন যোগাইবে তাহারাও দুইজন ট্রাষ্টি নির্বাচিত করিবে, তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথমে দুইজন ট্রাষ্টি মনোনীত করিয়াছে। ইহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রশাসনিক ট্রাষ্টি নিয়োগ করে।

যাঁহারা ইউনিট ক্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের স্বার্থের দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য রাখিয়া বোর্ড ব্যবসায়িক নীতিতে তাঁহাদের কাজকর্ম পরিচালনা করিবেন। তাহা ছাড়া, এই আইন অনুযায়ী তাঁহাদের দায়িত্ব পালনের সময়, জনস্বার্থ সংক্রান্ত কোন নীতি স্থির করার সময় ট্রাষ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিবে।

ইউনিট ট্রাষ্টের কাজ হইল মধ্যে মধ্যে এইরূপ শেয়ার বিক্রয় করিয়া সেই টাকা দিয়া শিল্পের শেয়ার ক্রয় করা। প্রতি আর্থিক বৎসরের শেষে (৩০শে জুন) নিজের খরচ-খরচা কাটিয়া রাখিয়া এই ইউনিট-ট্রাষ্ট শিল্পের শেয়ারগুলি হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ এই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় টিঁকিবার জন্য সরকার ইউনিট ট্রাষ্ট হইতে প্রাপ্ত ১০০০ টাকা পর্যন্ত লভ্যাংশ করমুক্ত করিয়াছেন।

এই ইউনিট-ট্রাষ্টের উপযোগিতা বা গুরুত্ব কম নয়। ভারতের ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীরা এতদিন শিল্পের শেয়ারে অর্থে-বিনিয়োগের উপযুক্ত পদ্ধতি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। ইউনিট-ট্রাষ্ট গঠনে তাহারা নিরাপত্তার সহিত টাকা খাটাইতে পারিবে। এতদিন স্বর্ণ বা জমি ক্রয়ে লোকের সঞ্চয় আবদ্ধ থাকিত। দেশের সেই স্বল্পসঞ্চয়গুলি এখন শিল্পপ্রসারে সাহায্য করিবে। এই সকল স্বর্ণ বা জমির তুলনায় ইহাদের শেয়ারগুলি অনেক বেশি লিকুইড্। শেয়ার-ক্রেতা প্রয়োজন মনে করিলে এই শেয়ারগুলিকে বিক্রয় করিয়া নগদ টাকায় পরিণত করিতে পারিবেন।

এই ইউনিট-ট্রাষ্ট গঠন করা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণ একমত হইতেছেন না, ইহার বিরূপ সমালোচনাও শোনা যাইতেছে। ভারতের কলকারখানাগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতেই নূতন যন্ত্রপাতি আনিতে পারে নাই, পরবর্তীকালে ইহারা লোভের বশবর্তী হইয়া মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণের ভাণ্ডার পূরণ করেন নাই। কৃত্রিম পদ্ধতিতে লভ্যাংশের হার বাড়াইয়া রাখিয়া শেয়ার লইয়া ফাটকাবাজিতে সাহায্য করিয়াছে। আজ ইউনিট ট্রাষ্ট এই সকল সন্দেহজনক কোম্পানীর শেয়ার কিনিয়া প্রভূত ঝুঁকি বহন করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'পত্র রচনা'

বৈষয়িক বাংলা

বৈষয়িক পত্ররচনা সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

[হাতে-কলমে বৈষয়িক পত্ররচনা অভ্যাস করিবার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের এই অংশটি অবশ্যই পড়িয়া লইতে হইবে। কারণ, **বৈষয়িক পত্ররচনা এমন একটি বিষয় যাহার প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষায় উত্তরদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।** ইহার পরিধি বাস্তব-জীবনের সুবৃহৎ কর্মক্ষেত্রের সমস্ত দিকে প্রসারিত। এইজন্য পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তরদানের প্রস্তুতি হিসাবেই শুধু নয়—বাস্তবজীবনে কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জনের দিক হইতেও বিষয়টিকে গ্রহণ করিতে হইবে।]

বৈষয়িক পত্র ও পত্র সাহিত্য :

জীবনে আমাদের প্রত্যেককে প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে বহু রকমের চিঠিপত্র লিখিতে হয়। যে-সমস্ত চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু হইতেছে প্রয়োজনভিত্তিক, সেইগুলি বৈষয়িক পত্রের পর্যায়ভুক্ত। আর যে-সমস্ত চিঠিপত্রের মধ্যে পত্রলেখক তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রাপকের কাছে তুলিয়া ধরিতে সচেষ্ট থাকেন সেইগুলিকে পত্র-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। কেউ কেউ মনে করেন যে, বৈষয়িক পত্র কখনও ব্যক্তিগত হইতে পারে না। কিন্তু, এইরূপ ধারণাকে পুরাপুরিভাবে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কারণ, বৈষয়িক পত্র ও পত্র-সাহিত্যের পার্থক্যটিকে নৈর্ব্যক্তিকতা ও ব্যক্তিনিষ্ঠতার দ্বারা চিহ্নিত করা অযৌক্তিক। বৈষয়িক পত্রও ব্যক্তিগত হইতে পারে। পারিবারিক জীবনে জননী যখন প্রবাসী সন্তানের ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার কুশল কামনা করিয়া পত্র লেখেন, তখন তাঁহার সেই পত্ররচনার পিছনে সন্তানের কুশল-কামনা-জনিত প্রয়োজন-বোধটাই প্রাধান্য পায় বলিয়া উহা ব্যক্তিগত হইলেও বৈষয়িক পত্রের পর্যায়ভুক্ত। তবে কখনও কখনও রচনার গুণে এইরূপ চিঠিপত্রও সাহিত্য-গুণান্বিত হইতে পারে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের কোন কোন চিঠি।

সাধারণত বৈষয়িক পত্র মাত্রেই বিষয়বস্তুর প্রাধান্য থাকে বলিয়া এখানে পত্র-লেখকের পক্ষে ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশের ও সেই অনুভূতির সহিত তাল রাখিয়া ভাষাগত ঐশ্বর্য-বৈচিত্র্য প্রদর্শনের সুযোগ থাকে না বলিলেই চলে। বরং, বৈষয়িক পত্ররচনার সময় ব্যক্তিগত আবেগানুভূতি যতদূর সম্ভব বর্জন করিয়া চলাই শ্রেয়। তাহা

না হইলে অনুভূতির অমূর্ততা (abstraction) ভাষার মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়া এই ধরনের পত্রের প্রধান ধর্ম, বক্তব্য বিষয়টিকেও অস্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারে—যাহা এই ধরনের পত্ররচনার প্রধানতম ত্রুটি।

সেইজন্য, বৈষয়িক পত্র রচনাকালে বিষয়বস্তু যাহাতে কোনক্রমে অস্পষ্ট হইয়া না যায়, সেই ব্যাপারে প্রত্যেকের দৃষ্টি থাকা দরকার। বক্তব্য বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরাই হইতেছে বৈষয়িক পত্রলেখকের প্রাথমিক ও প্রধান কৃতিত্ব। আর, সেই কারণে অসংখ্য লোকের বহুল ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমানকালে বৈষয়িক পত্র রচনার ব্যাপারে একটা মোটামুটি নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ওই নিয়মগুলিই বৈষয়িক পত্র রচনার কাঠামোটিকে গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু পত্রসাহিত্য রচনার ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাইবে যে, যেহেতু ওই ধরনের চিঠিপত্রে বক্তব্যটিকে মুখ্য ও স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরাই পত্রলেখকের উদ্দেশ্য নয়, সেইজন্য ওই শ্রেণীর পত্র-রচনার ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা নিয়মের উদ্ভব হয় নাই।

বৈষয়িক পত্র-রচনার কাঠামো :

সাধারণত বৈষয়িক পত্র রচনাকালে যে কাঠামোটি অনুসৃত হইয়া থাকে তাহা হইতেছে মোটামুটি এইরূপ :

(১) শিরোনামা।

(২) অন্তর্বর্তী ঠিকানা।

(৩) পূর্বসূত্র অথবা / এবং সূচক সংখ্যা।

(৪) শিষ্টাচারসম্মত সম্বোধন।

(৫) বিষয়বস্তু।

(৬) অন্ত্য-সৌজন্য।

(৭) স্বাক্ষর।

(৮) ক্রোড়পত্র।

(৯) পুনশ্চ।

(১০) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্রের নকল প্রেরণ।

অবশ্য, এই স্তরগুলির প্রত্যেকটিই যে প্রতিটি বৈষয়িক পত্র রচনাকালে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহাদের এক বা একাধিক অংশ প্রয়োগ করিবার কোনও প্রয়োজনই হয় না।

(১) **শিরোনামা**—পত্রের শীর্ষদেশে এই অংশটির স্থান। এখানে থাকে পত্রপ্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্বরূপ, সাধারণ ঠিকানা ও টেলিগ্রাফ-ঠিকানা, টেলিফোন-নম্বর, তারিখ ইত্যাদি।

শিরোনামার এই সমস্ত অংশগুলি বিন্যাসেরও একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে এবং পত্র রচনাকালে এই পদ্ধতিটি স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্বরূপ পত্রের শীর্ষদেশে ঠিক মধ্যস্থলে উল্লিখিত থাকিবে। ইহার পর কিছুটা নিচে ডানদিকে থাকিবে সাধারণ ঠিকানা ও তারিখ এবং বামদিকে থাকিবে টেলিগ্রাফ-ঠিকানা ও টেলিফোন-নম্বর। যেমন,—

চ্যাটার্জি এণ্ড কোং

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

গ্রাম : চ্যাটকো, ১০/১, কলেজ স্কোয়ার,
ফোন : ২৪-৩৩৪৮ কলিকাতা—১২

তাং, ২৩ শে মে, ১৯৬২

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্বত্রই শিরোনামা ব্যবহার করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু **চাকুরীর জন্য আবেদনপত্রে শিরোনামা দেওয়া রীতিসম্মত নয়।**

যে সমস্ত ক্ষেত্রে চিঠি লেখার জন্য ছাপানো কাগজপত্র ব্যবহার করা হয়, সেখানে 'শিরোনামা' অংশটি ছাপা থাকে। তবে, তারিখ দেওয়ার জায়গাটি এইভাবে ফাঁকা থাকে—তাং............১৯৬........।

(২) **অন্তর্বর্তী ঠিকানা**—বৈষয়িক পত্রে শিরোনামার নিচেই বামদিকে ঠিকানাসহ প্রাপকের নাম লেখা উচিত। বৈষয়িক পত্ররচনার ব্যাপারে এই নিয়মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত যেখানে কোন প্রতিষ্ঠানকে দৈনিক শত শত পত্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট পাঠাইতে হয়, সেখানে যাহাতে একজনের পত্র অন্যের নাম-লেখা খামের মধ্যে চলিয়া না যায়, তাহার জন্যই এই নিয়ম। দ্বিতীয়ত শ্রম-সংক্ষেপের দিক হইতেও এই নিয়মটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রেরিতব্য অজস্র পত্রের জন্য ততগুলি খামের উপর যদি পৃথক্ পৃথকভাবে ঠিকানা লিখিতে হয় তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করিতে হয়। কিন্তু মাঝখান-কাটা কাচ-স্বচ্ছ কাগজে আটকানো খামের মধ্যে চিঠি ভরিবার সময় অন্তর্বর্তী ঠিকানাটি উপযুক্তভাবে ভাঁজ করিয়া যদি ওই কাচ-স্বচ্ছ কাগজের মুখে রাখা যায়, তাহা হইলে, খামের উপর আলাদাভাবে ঠিকানা লিখিবার জন্য আর অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের প্রয়োজন হয় না। ভারতীয়-জীবনবীমা সংস্থা পত্র-প্রেরণ কালে সাধারণত এই রীতিই অনুসরণ করিয়া থাকে। 'অন্তর্বর্তী ঠিকানা' লেখার নিয়মটি **সর্বপ্রকার বৈষয়িক পত্ররচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।**

কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট পত্র লিখিতে হইলে তাঁহার নামের পূর্বে 'শ্রী' বা 'শ্রীমতী' ব্যবহার করা শিষ্টাচারসম্মত। আর কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখিতে

হইলে অন্তর্বর্তী ঠিকানাটি অবস্থানুযায়ী দুইভাবে লেখা বিধেয়। যেমন, সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের নিকট লিখিতে হইলে উহার নামোল্লেখ করিলেই চলিবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগীয় কর্মকর্তা বা পদাধিকারী ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিতে হইলে প্রতিষ্ঠানের নামের উপরে সেই পদের উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন—

(ক) ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে—শ্রীঅনাদিপ্রসাদ আইচ, এম. এ., বি. এল.
উকিল, জজকোর্ট,
হাওড়া।

(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে— ব্যানার্জি ব্রাদার্স,
মনোহারী দ্রব্য বিক্রেতা ও সরবরাহকারী,
১০৩, গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোড্
আসানসোল,
জিলা—বর্ধমান।

(গ) প্রতিষ্ঠানের পদাধিকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে— গণসংযোগ কর্মকর্তা,
পূর্ব রেলপথ : শিয়ালদহ বিভাগ
১, ফেয়ারলি প্লেস,
কলিকাতা—১

কর্মখালির ক্ষেত্রে কখনও কখনও বক্স নম্বরের মাধ্যমে আবেদন-পত্র আহ্বান করা হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনে যেটুকু তথ্য সরবরাহ করা হয় তাহাই উল্লেখ করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিজ্ঞাপনে দুই রকমের বক্স নম্বরের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। একধরনের বক্স নম্বর থাকে পত্রিকার নামে এবং অন্য ধরনের বক্স নম্বর থাকে ডাকঘরের নামে। নমুনা হিসাবে উভয় ক্ষেত্রেই আবেদন করার রীতিটি দেখাইয়া দেওয়া হইল—

(ক) বিজ্ঞাপনদাতা,
বক্স নম্বর—২৩৪,
হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা,
৬, সুতার্কিন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১

(খ) বিজ্ঞাপনদাতা,
পোষ্ট বক্স নম্বর—৪৫৩২
জি. পি. ও
কলিকাতা—১

(৩) **পূর্বসূত্র অথবা / এবং সূচক-সংখ্যা**—বৈষয়িক পত্র রচনাকালে এই অংশটিরও উল্লেখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বিভাগ লইয়া গঠিত কোন বিরাট প্রতিষ্ঠান যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট চিঠিপত্র লিখিয়া থাকে, তখন যে বিভাগ হইতে পত্র পাঠানো হয় সেই বিভাগের সূচক-সংখ্যার উল্লেখ পত্রের মধ্যে থাকে। ওই পত্রের উত্তর দিবার সময় প্রাপকের কর্তব্য হইতেছে সেই সূচক-সংখ্যার উল্লেখ করা। প্রাপক যদি তাঁহার উত্তরে এই সূচক-সংখ্যার উল্লেখ না করেন, তাহা হইলে, ওই বৃহৎ প্রেরক-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খুঁজিয়া বাহির করা মুস্কিল হইবে যে, কোন্ বিভাগ হইতে কোন্ সময়ে মূল পত্রটি লেখা হইয়াছিল। ইহার ফলে, উভয় পক্ষ হইতেই কার্যটি বিলম্বিত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে—যাহা ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রেরকের তরফ হইতে চিঠিতে যখন ওই স্মারক সংখ্যার উল্লেখ করা হয়, তখন তাহাকে **সূচক সংখ্যা** বলা হইবে এবং প্রাপকের তরফ হইতে যখন পত্রে ওই সূচক সংখ্যার উল্লেখ করা হয় তখন তাহাকে **পূর্বসূত্র** বলা হইবে।

যেমন, ধরা যাক্ ভারতীয় জীবন-বীমা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে একজন দালালের নিকট দালালী সম্পর্কে চিঠি লেখা হইল নিম্নোক্ত সূচক সংখ্যার উল্লেখ করিয়া—

সূচক সংখ্যা :—এজেন্সী/৪৫০৩/৬২।

উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে যাহাতে চিঠিতে কোন্ বিভাগ হইতে কোন্ সময় লেখা হইয়াছে তাহা সহজেই বাহির করা যায়।

আবার, প্রাপক যখন চিঠির উত্তর দিবেন তখন তাঁহাকে লিখিতে হইবে—

পূর্বসূত্র :—এজেন্সী/৪৫০৩/৬২।

(৪) **শিষ্টাচার-সম্মত সম্বোধন**—অন্তর্বর্তী ঠিকানার নিচেই এই অংশের স্থান। কেউ কেউ মনে করেন যে, গুরুগম্ভীর শব্দ প্রয়োগ করিয়া এই অংশ লিখিত হইলেই বোধ করি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তাই তাঁহারা উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তির নিকট পত্রাদি রচনাকালে 'মহামহিম মান্যবর............শ্রদ্ধাস্পদেষু' ইত্যাদি ধরনের সম্বোধন করার পক্ষপাতী। কিন্তু, এইরূপ ধারণা পোষণ করার পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। কেননা, পত্রলেখকের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি নির্ভর করে তাঁহার যোগ্যতা ও বিষয়বস্তু উত্থাপন-রীতির উপর, সম্বোধন-বৈশিষ্ট্যের উপর নয়। কিন্তু, তবুও বৈষয়িক পত্ররচনার ক্ষেত্রে যে শিষ্টাচার-সম্মত সম্বোধনের বিশেষ একটি মূল্য আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না, এবং সে মূল্য শিষ্টাচার বহির্ভূত কোন কাজ করিয়া উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ব্যক্তিবিশেষের নিকট পত্র লিখিবার সময় 'মহাশয়' এবং সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠানের

ক্ষেত্রে 'সবিনয় নিবেদন' প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। তবে, বর্তমানে আমাদের বিশেষ ধরনের সামাজিক কাঠামোটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বলা চলে যে, নিয়োগকারীর নিকট পত্রাদি লিখিবার সময় 'মাননীয় মহাশয়' লেখাই বোধ হয় শ্রেয়।

(৫) **বিষয়বস্তু**—বৈষয়িক পত্রের এই অংশই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পত্র-লেখকের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা-রীতির উপর। অন্য যাহা কিছু তাহা আনুষঙ্গিক মাত্র। সুতরাং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা-রীতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত রীতিগুলি অনুসরণ করিলে ভাল হয়:

(ক) যদিও বাংলা ভাষায় লিখিত ভাষা হিসাবে সাধু ও চলিত উভয়েরই স্থান আছে, তবুও বৈষয়িক পত্ররচনার ব্যাপারে সাধু ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। কারণ, ভাষার উপর অসামান্য দখল না থাকিলে, চলতি ভাষায় পত্র লিখিতে গেলে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বহুলাংশে লঘু হইয়া যাইতে পারে—যাহা প্রেরকমাত্রেরই নিকট অবাঞ্ছনীয়।

(খ) বক্তব্যকে সুন্দর করিয়া তুলিবার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষাবশত দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করা কোনো মতে উচিত নয়। ইহাতে বক্তব্যের সৌন্দর্য তো বাড়েই না, উপরন্তু ভাষাগত কৃত্রিমতার জন্য উপস্থাপনা রীতিটি আড়ষ্ট হইয়া পড়ে ও বিষয়বস্তুটিকে অস্পষ্ট করিয়া তোলে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বৈষয়িক পত্রের ভাষাগত সৌন্দর্য নির্ভর করে বক্তব্য বিষয়টিকে সরাসরি ও অনায়াসে প্রকাশ করার উপর। আর তাহা নির্ভর করে সুবোধ্য ও সুপ্রচলিত অথচ মার্জিত শব্দ প্রয়োগের উপর।

(গ) একটি পত্রের বিষয়বস্তু একটিই হওয়া উচিত। কারণ, তাহা না হইলে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার উদ্ভব হইতে পারে—যাহার ফলে পত্রলেখকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। বিশেষ করিয়া বিভিন্ন বিভাগ-সমন্বিত প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্রাদি লিখিবার ব্যাপারে এই নিয়মটি অনুসরণ করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি উদাহরণ গ্রহণ করা যাক্।

কোন একজন ব্যক্তি জীবন-বীমা কর্পোরেশনের নিকট একই চিঠিতে যদি এই অনুরোধ করেন যে, তাঁহার পুরাতন এজেন্সীটি পুনরায় নূতন করিয়া লওয়া হোক এবং তাঁহার পূর্বপ্রদত্ত একটি প্রিমিয়াম সম্পর্কে যে জটিলতার উদ্ভব হইয়াছে তাহার নিরসন করা হোক, তাহা হইলে, প্রাপক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রথমেই যে সমস্যা দেখা দিবে তাহা হইতেছে এই যে, চিঠিটি প্রথমে কোন বিভাগে যাইবে? 'প্রিমিয়াম' বিভাগে, না, 'এজেন্সী' বিভাগে? চিঠিটি প্রথমে যদি এজেন্সী বিভাগেই যায়, তাহা হইলে, যতদিন না ওই ব্যাপারটি সম্পর্কে

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, ততদিন চিঠিটি 'এজেন্সী' বিভাগেই থাকিবে। ফলে, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার প্রিমিয়াম সংক্রান্ত ব্যাপারের কোন নিরসনই হইবে না। সুতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে পত্রলেখকেয কর্তব্য হইতেছে 'এজেন্সী ও প্রিমিয়াম' এই দুইটি পৃথক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করিয়া দুইটি স্বতন্ত্র চিঠি লেখা।

(ঘ) যেখানে একটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে একাধিক জ্ঞাতব্য তথ্য থাকে, সেখানে তথ্য-সংখ্যা অনুযায়ী সমগ্র বিষয়বস্তুটিকে একাধিক অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। কোন কোন ক্ষেত্রে চাকুরী-বাকুরীর ব্যাপারে এইরূপ স্থলে নির্দিষ্ট একটি ছকের অনুবর্তন করা হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গুরুত্ব অনুযায়ী তথ্যগুলিকে ক্রমবিন্যস্ত করা উচিত। যে তথ্যটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা সর্বাগ্রে থাকিবে।

(ঙ) বিষয়বস্তু যেখানে শেষ হইবে ঠিক সেইখানেই সমাপ্তিসূচক 'ইতি' বা 'ধন্যবাদান্তে—' লেখা বিধেয়। ইহা একদিকে যেমন রীতি-প্রসিদ্ধ, তেমনই অন্যদিকে সতর্কতামূলক পদ্ধতিও বটে। কারণ, এই অংশটি না থাকিলে সংশ্লিষ্ট কেউ কেউ দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া পত্রলেখকের স্বার্থবিরোধী কোন কিছু বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে পারেন। সুতরাং বৈষয়িক পত্রে ইহার যে একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না।

(৬) **অন্ত্য-সৌজন্য**—মৌখিক আলাপ-আলাচনার শেষে পরস্পর বিদায়সম্ভাষণ জানানো যেমন একটি শিষ্টাচার-সম্মত প্রথা, তেমনি পত্র-রচনাকালেও ওইরূপ শিষ্টাচার-সম্মত প্রথাকে 'অন্ত্য-সৌজন্য' বলে। এইরূপ স্থলে সাধারণত এইগুলির যে কোন একটি লেখা হইয়া থাকে—'বিনীত', 'নিবেদক', 'বিনীত নিবেদক', 'ভবদীয়', 'বিশ্বস্ত', 'একান্তভাবে বিশ্বস্ত' ইত্যাদি।

(৭) **স্বাক্ষর**—ইহার স্থান অন্ত্য-সৌজন্যের ঠিক নিচেই। এই স্থানে প্রেরক তাঁহার নাম স্বহস্তে লিখিয়া থাকেন। প্রেরক যদি কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তিবিশেষ হন, তাহা হইলে তাঁহার নামের নীচে সেই প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সম্পর্ক-বৈশিষ্ট্য ও প্রতিষ্ঠানের শীলমোহর-যুক্ত নামোল্লেখ থাকা প্রয়োজন। কয়েকটি নমুনা, যেমন—

(ক) একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে— শ্রীকমলকুমার কর্মকার

(খ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

(৴০) শ্রীমণিরাম বেরা
ম্যানেজার, সী-ভিউ হোটেল,
দীঘা

(৶০) সেন এণ্ড দাস কোং—পক্ষে,
শ্রীঅমূল্যচরণ দাস

(৷৴০) সেন এণ্ড দাস কোং—পক্ষে,
আমমোক্তার-নামা-প্রাপ্ত
প্রতিনিধি
শ্রীকৃষ্ণকমল পুরকায়স্থ।

(৮) **ক্রোড়পত্র**—বৈষয়িক পত্রাদি রচনা ব্যাপারে অনেক সময়ে পত্রলেখককে বিষয়বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রাপকের নিকট দাখিল করিতে হয়। মূল পত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ওই সমস্ত কাগজপত্র পাঠানো হয় বলিয়া উহাদের 'ক্রোড়পত্র' বলা হয়। স্বাক্ষরের নিচে পত্রের বাম দিকে ক্রোড়পত্রের উল্লেখ করিতে হয়। মূলপত্রে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের উল্লেখ না থাকিলে ভ্রমক্রমে ওইগুলি সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে এবং তাহাতে পত্রলেখকের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা থাকে। ক্রোড়পত্র বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে। যেমন, চাকুরীর ক্ষেত্রে,—ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার অভিজ্ঞান-পত্র, প্রশংসাপত্র অথবা উহাদের প্রত্যয়িত অনুলিপি। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে,—যেমন, মূল্যজিজ্ঞাসার স্থলে মূল্যতালিকা, চুক্তি স্মরণ করাইয়া দেওয়ার স্থলে চুক্তির অনুলিপি, আইন সম্পর্কিত জটিলতার ব্যাপারে আইনের ধারাবিশেষের উদ্ধৃতি ইত্যাদি। চাকুরীর ক্ষেত্রে নমুনাস্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

ক্রোড়পত্র :—

১। স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার অভিজ্ঞান-পত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি।

২। প্রশংসাপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি দুইখানি।

(৯) **পুনশ্চ**—পত্র রচনা শেষ করিবার পর যদি নূতন কিছু লিখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, উহা পত্রের শেষে বাম দিকে 'পুনশ্চ' লিখিয়া সংযোজন করিতে হয়। এই অংশের শেষেও পত্রলেখকের পুনঃস্বাক্ষর থাকা উচিত। নচেৎ, ব্যবসায়-বানিজ্যের ক্ষেত্রে মতবিরোধিতার স্থলে 'পুনশ্চ' অংশের বক্তব্য সম্পর্কে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

কিন্তু, সাধারণভাবে বৈষয়িক পত্র রচনার ক্ষেত্রে এই অংশ সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। কারণ, 'পুনশ্চ' অংশের বক্তব্য সাধারণত তখনই সংযোজিত হয় যখন মূল বক্তব্য হইতে তাহা ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়া যায়। আর, এই ধরনের ভ্রান্তির অর্থই হইতেছে, হয় পত্রলেখকের শৈথিল্য, নয় তাঁহার অযোগ্যতা।

তবে একথা অবশ্য অস্বীকার করা চলে না যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই

অংশের অন্তর্ভুক্তি অনিবার্য হইয়া উঠে। ইহা সকলেই জানেন যে, ব্যবসায়-বানিজ্যের ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যাপারে বাজার দর ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠা-নামা করে। এইরূপ ক্ষেত্রে চিঠি ডাকে ফেলিবার পূর্বমুহূর্তে যদি পত্রে পন্নিবেশিত তথ্য অপেক্ষা নূতন কোন তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে, সমগ্র চিঠি বাতিল করিয়া নূতন করিয়া লিখিতে গেলে হয়তো সেদিনের ডাকে আর পত্র যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাই, প্রেরক প্রতিষ্ঠানকে অনিবার্যভাবেই পুনশ্চ অংশ যোজনা করিয়া নূতন তথ্য সরবরাহ করিতে হয়।

(১০) **সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্রের নকল প্রেরণ**—অনেক সময় নিজের বক্তব্যকে জোরালো করিয়া তুলিবার জন্য পত্র-লেখক তাঁহার মূল পত্রের অনুলিপি এক বা একাধিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। যেমন, ধরা যাক্, কোন একজন প্রাথমিক শিক্ষক তাঁহার মাহিনা সম্পর্কে একটি গোলযোগ মিটাইবার জন্য পূর্বে বার বার জেলা স্কুল-বোর্ডের নিকট চিঠি লিখিয়াও কোন উত্তর পান নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে, তিনি শেষ পর্যন্ত স্কুল-বোর্ডের নিকট মূল চিঠি লিখিয়া তাহার অনুলিপি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট এইভাবে পাঠাইতে পারেন—

অনুলিপি প্রেরিত হইল :—

(ক) প্রধান পরিদর্শক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহ,
রাইটার্স্ বিল্ডিংস্, কলিকাতা।

(খ) শিক্ষা-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ,
রাইটার্স্ বিল্ডিংস্, কলিকাতা, ইত্যাদি।

যেক্ষেত্রে একাধিক স্থানে অনুলিপি প্রেরণ করিতে হয়, সেক্ষেত্রে যে অনুলিপিটি যাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইতেছে তাঁহার নামের পাশে একটি দাগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইহা ভিন্ন, 'অনুলিপি প্রেরিত হইল' ইত্যাদির শেষে পত্র প্রেরণকারীকে নিজ হস্তে স্বাক্ষর করিতে হয় এবং সেক্ষেত্রে মূল পত্রে স্বাক্ষর না করিয়া 'স্বাক্ষরিত' বলিয়া নাম থাকিলেই চলিবে।

বাংলায় বৈষয়িক পত্র রচনার প্রয়োজন :

যদিও এখনও পর্যন্ত বড় বড় প্রতিষ্ঠানের নিকট চিঠিপত্র লিখিবার সময় আমরা ইংরাজি ভাষারই সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকি, তবুও বাংলা ভাষায় বৈষয়িক পত্র রচনার প্রয়োজনকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। এমন অনেক ছোট-খাট ব্যবসাদার আছেন যাঁহারা ইংরাজী জানেন না। তাঁহাদের সহিত কাজকর্ম করিতে হইলে তাঁহাদের কাছে বোধগম্য মাতৃভাষা বাংলারই সাহায্য লওয়া উচিত। ইহা ভিন্ন, পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকার করিয়া লইলেও উহাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির গণ্ডী

হইতে মুক্ত করিয়া ব্যবহারিক জীবনে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইলে বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে বৈষয়িক পত্র-রচনার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা অসম্ভব।

তবে, এই প্রসঙ্গে একটি বাস্তব সমস্যার কথা সব সময়েই মনে রাখা উচিত। এই সমস্যাটি হইতেছে পরিভাষা লইয়া। যেখানে ব্যবহারিক জীবনে কিছু কিছু বিদেশী শব্দ ওতপ্রোতভাবে ভাষার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, সেক্ষেত্রে সেই সমস্ত শব্দগুলিকে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট উদ্ভট পরিভাষার সাহায্যে হটাইয়া দিবার চেষ্টা করা কোনমতেই উচিত নয়। সাধারণভাবে যখন বাংলা-শব্দভাণ্ডারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বহু ইংরাজি, আরবী, ফারসী ইত্যাদি শব্দকে আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ওইরূপ বহু-জন-স্বীকৃত ও সুপ্রচলিত বিদেশী শব্দগুলিকে মানিয়া লওয়া উচিত। ইহাতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষা শক্তিশালীই হইয়া উঠিবে।

(১)

চাকুরীর জন্য আবেদনপত্র

['Application for a situation]

নমুনা : ১। ইং ২৫।৩।৬২ তারিখের 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন :—

কোন একটি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যৌথ কোম্পানীর জন্য একজন মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষক আবশ্যক। গণনা ও হিসাব-রক্ষার ব্যাপারে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ন্যূনপক্ষে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স, ন্যূনতম বেতন ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া ২।৪।৬২ তারিখের মধ্যে আবেদন করুন।— পোষ্ট বক্স নম্বর—৫১৩২, জি. পি. ও., কলিঃ-১।

আবেদনপত্র :— ২৭বি, শ্রীমন্ত দে লেন, কলিকাতা-১২

২৫।৩।৬২

পূর্বসূত্র : ২৫।৩।৬২ তারিখের 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপনদাতা,

পোষ্টবক্স নম্বর—৫১৩২,

জি. পি. ও. কলিকাতা-১

মাননীয় মহাশয়,

উল্লিখিত সূত্র হইতে জানিতে পারিলাম যে, আপনাদের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যৌথ প্রতিষ্ঠানটির জন্য একজন মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত পদটির জন্য একজন প্রার্থী হিসাবে আমি এই আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেছি।

গত ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আমি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৫৪ সালে আই. এ. (বাণিজ্য) পরীক্ষার প্রথম বিভাগে ও ১৯৫৬ সালে বি. কম্. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বি. কম্. পরীক্ষায় আমার ঐচ্ছিক বিষয় ছিল উচ্চতর হিসাবশাস্ত্র এবং হিসাব-

১৯৫৬ সালেই আমি ৩৮২, নেতাজী সুভাষ রোডস্থ 'নাগ এণ্ড নাগ কোম্পানী'তে সহকারী গাণনিক হিসাবে কাজ করিতে সুরু করি এবং এতাবৎকাল ওই একই কোম্পানীতে নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছি। কর্মনিষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতায় আমি আমার বর্তমান মালিকপক্ষকে প্রকৃতই সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বিশ্বাস। সম্ভবত সেই কারণেই ১৯৬১ সাল হইতে প্রায়ই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য গাণনিক ও হিসাব রক্ষকের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আমাকেই স্থানাপন্ন মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষক হিসাবে কাজ করিতে হইত। আমার উক্তির সমর্থনে অন্যান্য অভিজ্ঞান-পত্রাদির অনুলিপির সহিত বর্তমান মালিক-পক্ষের প্রশংসাপত্রের একটি অনুলিপি পাঠাইলাম।

এই প্রতিষ্ঠানে অদূর ভবিষ্যতে মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষক হিসাবে স্থায়ীভাবে কাজ করিবার সুযোগ আমার নাই বলিয়াই আমাকে অন্যত্র চাকুরীর অনুসন্ধান করিতে হইতেছে।

বর্তমানে আমার বয়স হইতেছে ২৭ বৎসর ৮ মাস। দেহে ও মনে আমি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, কাজকর্মের ব্যাপারে চটপটে অথচ নির্ভুল এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ও অপরাঙ্মুখ।

এই প্রতিষ্ঠান হইতে আমি বর্তমানে মহার্ঘ ভাতাদিসহ মাসিক দুই শত পঞ্চাশ টাকা (২৫০৲) বেতন পাইয়া থাকি। সম্প্রতি মাসিক বেতন হিসাবে আমাকে সাড়ে তিন শত টাকা করিয়া দেওয়া হইলে আমার কর্মনিষ্ঠতা, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতাজনিত যোগ্যতা দিয়া আপনাদের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতির কাজে সানন্দে আত্মনিয়োগ করিতে পারি।

আশা করি, আপনাদের সাক্ষাৎকারের অনুমতি-লাভে বঞ্চিত হইব না।

ধন্যবাদান্তে—

বিনীত

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

ক্রোড়পত্র :

১। স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি

২। আই. এ. (বাণিজ্য) পরীক্ষার...., " "

৩। বি. কম্. পরীক্ষার.... " "

৪। প্রশংসাপত্র—১টি

নমুনা : ২। উপরের আবেদনপত্রটি একটি ছকে ফেলিয়াও লেখা যাইতে পারে। যেমন—

বিজ্ঞাপনদাতা,

পোষ্টবক্স নম্বর—৫১৩২

জি. পি. ও.,

কলিকাতা—১

পূর্বসূত্র :—২৫।৩।৬২ তারিখের 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিক
প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

মাননীয় মহাশয়,

উল্লিখিত সূত্র হইতে জানিতে পারিলাম যে, আপনাদের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ যৌথ প্রতিষ্ঠানটির জন্য একজন মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষকের প্রয়োজন। উক্ত পদটির জন্য একজন প্রার্থী হিসাবে আমি এই আবেদন পত্র প্রেরণ করিতেছি।

আমার যোগ্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহ নিম্নে ছকের আকারে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দেহে ও মনে আমি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, কাজকর্মের ব্যাপারে চটপটে অথচ নির্ভুল এবং কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্ত ও অপরাঙ্মুখ।

আশা করি, আপনাদের সাক্ষাৎকারের অনুমতি-লাভে বঞ্চিত হইব না। ধন্যবাদান্তে—

২৭ বি, শ্রীমন্ত দে লেন,
কলি : ১২
২৫।৩।৬২

বিনীত
শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহের বিবরণ

১। আবেদনকারীর পূর্ণ নাম :—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়।

২। " পিতার নাম :—৺রমণীরঞ্জন রায়।

৩। ঠিকানা :—

(ক) স্থায়ী—২৭ বি, শ্রীমন্ত দে লেন, কলিঃ—১২

(খ) বর্তমান— ঐ

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতা :—

পরীক্ষার বিবরণ	বৎসর	বিভাগ/শ্রেণী	মন্তব্য
(ক) স্কুলফাইনাল	১৯৫২	প্রথম	
(খ) আই. এ. (বাণিজ্য) [ক. বি.]	১৯৫৪	প্রথম	
(গ) বি. কম্. [ক. বি.]	১৯৫৬	দ্বিতীয়	ঐচ্ছিক বিষয় উচ্চতর হিসাবশাস্ত্র ও হিসাব-পরীক্ষা

প্রতিষ্ঠান	পদের বিবরণ	কখন হইতে	কখন পর্যন্ত
নাগ এণ্ড নাগ কোং, ৩৮২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিঃ ১২	(ক) সহকারী গাণনিক	১৯৫৬	১৯৬২
	(খ) স্থানাপন্ন মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষক	৫।৩।৬১ ২৮।৬।৬১ ২০।১২।৬১	৪।৬।৬১ ২৫।৭।৬১ ২৫।১।৬২

৬। বর্তমান বয়স :—২৭ বৎসর ৮ মাস।

৭। অন্যত্র কর্মানুসন্ধানের কারণ :—অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী-ভাবে মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষকের পদে উন্নীত হইবার অনিশ্চয়তা।

বর্তমান বেতন :—মহার্ঘ ভাতাদিসহ সাকুল্যে ২৫০৲ আড়াই শত টাকা।

৯। প্রত্যাশিত বেতন : ৩৫০৲ সাড়ে তিন শত টাকা।

১০। তথ্য-প্রমেয় ক্রোড়পত্র :—

(ক) স্কুলফাইনাল পরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি

(খ) আই. এ. (বাণিজ্য)" " " "

(গ) বি. কম্. " " " "

(ঘ) বর্তমান কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রশংসা পত্রের "

১১। স্বাক্ষর :—

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

২৫।৩।৬২

নমুনা : ৩। ইং ২।৭।৬২ তারিখের 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন :—

আমাদের কারখানায় প্রস্তুত ঔষধ-পত্রাদির ব্যাপক প্রচারের জন্য একজন উপার্থক (Canvasser) আবশ্যক। উপার্থন-কার্যে পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। নির্বাচিত প্রার্থীকে ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। রাহা-খরচ, কমিশন ইত্যাদি ভিন্ন মহার্ঘ ভাতাসহ প্রারম্ভিক বেতনের পরিমাণ ৩০০৲ তিন শত টাকা। যোগ্যতা ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট সত্বর আবেদন করুন—

ডাঃ অনুপম দাস

স্বত্বাধিকারী

হেমনলিনী ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্

৭৫।৪বি, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

আবেদনপত্র :—

১৪৪।৪, বেলেঘাটা মেন রোড্ কলিকাতা—১০

৩।৪।৬২

পূর্বসূত্র :—২।৪।৬২ তারিখের 'বিশ্ববন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

ডাঃ অনুপম দাস,

স্বত্বাধিকারী, হেমনলিনী ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্,

৭৫।৪বি, সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিঃ—৯

মাননীয় মহাশয়,

উপরস্থ সূত্র হইতে জানিতে পারিলাম যে, আপনাদের কারখানায় প্রস্তুত ঔষধ-পত্রাদির ব্যাপক প্রচারের জন্য একজন উপার্থক আবশ্যক। উক্ত পদটির জন্য একজন প্রার্থী হিসাবে আমি এই আবেদনপত্র প্রেরণ করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমি ১৯৫০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ১৯৫২ সালে আই. এস-সি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে এবং ১৯৫৪ সালে রসায়ন শাস্ত্রে সসম্মানে বি. এস-সি. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। ইহার পর আর্থিক ও অন্যান্য নানাবিধ দুর্যোগবশত আমার পক্ষে আর লেখাপড়া চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হয় নাই। ১৯৫৪ সালেই আমি বেঙ্গল কেমিক্যালে রাসায়নিক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করি এবং এতাবৎকাল এইখানেই কাজ করিয়া আসিতেছি।

যদিও ঔষধপত্রের প্রচার ব্যাপারে উপার্থক হিসাবে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা নাই, তবুও দীর্ঘ আট বৎসর যাবৎ বেঙ্গল কেমিক্যালের মত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের রাসায়নিক বিভাগের সহিত যুক্ত থাকার ফলে বিভিন্ন ধরনের ঔষধপত্রের প্রস্তুতপ্রণালী ও উপকারিতা সম্পর্কে আমি অনেকখানি জ্ঞান অর্জন করিয়াছি।

ইহা ভিন্ন, ঔষধপত্রের ব্যাপারে সর্বভারতীয় উপার্থক হইবার অন্য যোগ্যতাও আমার আছে বলিয়া মনে করি। আমি বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় লিখিতে ও ভালভাবে কথাবার্তা বলিতে সক্ষম। উর্দুতে লিখিতে না পারিলেও কথাবার্তা চালাইয়া যাইতে পারি। তদুপরি, ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানে যাইতে আমি অনিচ্ছুকও নহি।

আমার বর্তমান বয়স ৩০ বৎসর।

বর্তমান কর্ম-ক্ষেত্রে আমার অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা নাই বলিয়াই আমাকে অন্যত্র কর্মানুসন্ধান করিতে হইতেছে।

সাক্ষাৎকারের অনুমতি লাভ করিলে আশা করি, আমি আমার যোগ্যতা সম্পর্কে আপনাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সক্ষম হইব। ধন্যবাদান্তে—

বিনীত,

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিম্নলিখিত প্রত্যেকটি পদের জন্য আবেদন পত্র রচনা করুন :—

১। একজন সহকারী প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন। যোগ্যতা—ইংরাজিতে এম. এ. অথবা অনার্স ও বি. টি.। বেতন—বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন—সম্পাদক, ঘূর্ণি উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া। [১৪।৫।৬২ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।]

২। কলিকাতার নিকটবর্তী সহরতলীস্থ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন স্টোর একাউন্টান্টের প্রয়োজন। বেতন ক্রম :—১২৫৲—৩৲—১৪০৲—৪৲—

২০০৲। যোগ্যতাবলী :—(ক) **অত্যাবশ্যক**—(১) প্রবেশিকা বা উহার সমতুল, (২) স্টোর একাউন্টস্ রক্ষণাবেক্ষণে তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা, (৩) স্টোর সামগ্রীর জ্ঞান ও (৪) স্টোর রেকর্ড্স্ রক্ষণাবেক্ষণে অভিজ্ঞতা। (খ) **বাঞ্ছনীয়**—দ্রব্য সামগ্রীর বিবরণ প্রস্তুত করিতে ও স্টক কম্পাইলেশন ইত্যাদিতে অভিজ্ঞতা। সত্বর আবেদন করুন—বক্স নম্বর : ৮৩২৪, আনন্দবাজার পত্রিকা (২৫।৪।৬২)।

৩। লব্ধপ্রতিষ্ঠ একটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন টাইপ জানা ও সঙ্কেত-লিখনে অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। প্রার্থীর পক্ষে অতি অবশ্যই প্রবেশিকা বা তৎসমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া চাই। যোগ্যতা ও ন্যূনতম বেতন ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া সত্বর আবেদন করুন—পোষ্টবক্স নম্বর : ৫১৪৪, জি. পি. ও., কলিকাতা—১ [স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা : ৫।৬।৬২]

৪। কোনও ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ শাখার ম্যানেজার পদের জন্য দরখাস্ত কর।

[বর্ধ: বিশ্বঃ (মডিফায়েড)-১৯৬৪]

[বিঃ দ্রঃ—এই পদটির জন্য কোন যোগ্যতার উল্লেখ করা হয় নাই। পত্রলেখককে নিজেই যোগ্যতার পরিচয় দিতে হইবে। যোগ্যতাবলীর মধ্যে এইগুলি থাকা বাঞ্ছনীয় :

(১) শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়গুলির মধ্যে ব্যাঙ্কিং ছিল কিনা, এবং

(২) ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা।]

সুপারিশপত্র

[Letter of Recommendation]

কোন কর্মপ্রার্থীকে চাকুরী পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করিতে অথবা কোন ব্যবসায়ী বন্ধুকে নূতন ব্যবসায়িক সম্বন্ধ স্থাপনে সাহায্য করিবার জন্যই সাধারণত সুপারিশপত্র লিখিত হইয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণীর সুপারিশ পত্রগুলি বহুলাংশে প্রশংসা-পত্রেরই পর্যায়ভুক্ত। এইগুলি নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। চাকুরী পাইবার জন্য স্কুল-কলেজের পাঠশেষে ছাত্রগণ প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের নিকট হইতে সুপারিশপত্র সংগ্রহ করিয়া থাকেন। আবার, কর্মকালীন অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতি লাভের জন্য অনেকে নিয়োগকর্তার নিকট হইতেও সুপারিশপত্র সংগ্রহ করেন। এই ধরনের সুপারিশ পত্রগুলিতে সাধারণত শিক্ষা, পরিচিতি, যোগ্যতা, নৈতিক চরিত্রের প্রশংসা, শুভেচ্ছা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর সুপারিশ পত্রগুলিরই গুরুত্ব সমধিক। ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যখন এই শ্রেণীর পত্র লিখিত হয়, তখন উহাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন—

(ক) যাহার জন্য সুপারিশ করা হইতেছে তাহার পূর্ণ পরিচয়।

(খ) সুপারিশের উদ্দেশ্য।

(গ) যাহার জন্য সুপারিশ করা হইতেছে তাহাকে পরামর্শ দান বা অন্যপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য সুপারিশকারীর অনুরোধ।

(ঘ) প্রয়োজন হইলে, যাহার জন্য সুপারিশ করা হইতেছে তাহার আর্থিক সঙ্গতি, ব্যবসায়িক সুনাম ইত্যাদির বিবরণ, এবং

(ঙ) সাহায্য দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

এই শ্রেণীর সুপারিশ পত্র রচনার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, ইহা পূর্বোক্ত শ্রেণীর মত মামুলী ধরনের নয়। এখানে পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে ভাসা-ভাসা মন্তব্য করিলে চলে না বলিয়া সুপারিশকামী ব্যক্তি সম্পর্কে সুপারিশকারীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

নমুনা ঃ ১। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান-ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ পত্র ঃ—

ইচ্ছাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়
স্বর্ণটিকুরী, হুগলী।

২।৮।৬১

হুগলী জেলার স্বর্ণটিকুরী ডাকঘরের অন্তর্ভুক্ত মণিরামপুরের একজন বিশিষ্ট অধিবাসী শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান হরিবিলাস মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। শ্রীমানের বিদ্যালয় জীবনের প্রারম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত এই বিদ্যায়তনের সহিত জড়িত বলিয়া তাহাকে আমার বিশেষভাবে জানিবার সুযোগ হইয়াছে। লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ, শিক্ষকদের প্রতি সম্মান, সহপাঠীদের প্রতি সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বিভিন্ন দিক হইতে শ্রীমান হরিবিলাস এই বিদ্যায়তনে তাহার ছাত্রজীবনের সুরু হইতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার সম্পর্কে আমার যে উচ্চ ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা সে বর্তমান বৎসরের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সুপ্রমাণিত করিয়াছে। শ্রীমান স্বাস্থ্যবান, উৎসাহী, অমায়িক ও একনিষ্ঠ কর্মী। তাহার উত্তর জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি আমার একান্তভাবে কাম্য। ইতি—

শ্রীঅরুণকান্তি সমাদ্দার
প্রধান শিক্ষক, ইচ্ছাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়।

নমুনা : ২। নিয়োগকর্তা প্রদত্ত সুপারিশপত্র :—

৩৮২, নেতাজী সুভাষ রোড্
কলিকাতা—১
৪।৫।৬২

শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় গত ছয় বৎসর যাবৎ আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতার সহিত সহকারী গাণনিক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। কাজকর্মের ব্যাপারে শ্রীরায় অত্যন্ত চটপটে, নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার ধারণা জন্মাইয়াছে। মাঝে মাঝে মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষকের অবর্তমানে তিনি স্থানাপন্ন মুখ্য গাণনিক ও হিসাব-রক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়া আমার অধিকতর আস্থা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ আরও বিস্তৃত হোক, ইহাই আমার কামনা। ইতি—

শ্রীননীগোপাল নাগ,
অংশীদার,
নাগ এণ্ড নাগ কোং।

নমুনা : ৩। ব্যবসায় সম্বন্ধে সাহায্য দানের জন্য সুপারিশপত্র :—

গুপ্ত পাবলিশার্স

পুস্তক বিক্রেতা ও পুস্তক প্রকাশক

টেলিগ্রাম : গুপ্তালী, ৪০২।১, মহাত্মা গান্ধী রোড
টেলিফোন : ২২-৩৪৪৪ কলিকাতা—৭
১১।১২।৬১

বর্ধমান পুস্তকালয়,
৩৫, জি. টি. রোড্, বর্ধমান।

সবিনয় নিবেদন,

পত্রবাহক শ্রীনবীনকৃষ্ণ পাল প্রসিদ্ধ কাগজ বিক্রেতা 'পাল এণ্ড সন্স কোম্পানী'র স্বত্বাধিকারী। ব্যবসায়-সূত্রে তাঁহার সহিত আমাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দীর্ঘকালের। পাল মহাশয় বর্ধমানে তাঁহার প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা-কার্যালয় খুলিতে মনস্থ করিয়াছেন। অথচ বর্ধমানে ওই জাতীয় ব্যবসায় সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। বর্ধমানে কাগজ ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার জন্য তাই তাঁহাকে বর্ধমান যাইতে হইতেছে। আপনারা বর্ধমানের স্থায়ী অধিবাসী বলিয়া স্থানীয় বাজার সম্বন্ধে আপনাদের যেরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, সেইরূপ অভিজ্ঞতা বাহির হইতে স্বল্পক্ষণের জন্য গিয়া কাহারও পক্ষে অর্জন করা

সম্ভবপর নয়। সুতরাং, এই ব্যাপারে আপনাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আপনারা যদি পাল মহাশয়কে সাহায্য করেন, তাহা হইলে, বাধিত থাকিব। আপনাদের সক্রিয় সাহায্য পাইলে, আশা করি, পাল মহাশয়ের উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত হইবে।

বস্তুত, জানিবেন যে, পাল মহাশয়কে সাহায্য করিলে উহা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে সাহায্য করারই নামান্তর হইবে এবং আমিও আপনাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত
স্বত্বাধিকারী,
গুপ্ত পাবলিশার্স।

অনুশীলনী

১। আপনি বি.-কম্. পরীক্ষায় পাস করিবার পর চাকুরীর প্রয়োজনে আপনার কলেজের অধ্যক্ষের নিকট সুপারিশ পত্র আনিতে গেলে তিনি যেভাবে উহা লিখিয়া দিবেন তাহা কল্পনা করিয়া একটি পত্র রচনা করুন।

২। আপনি নিজেকে একটি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে মনে করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠানের একজন সুযোগ্য কর্মচারীর ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করিয়া একটি সুপারিশপত্র লিখিয়া দিন।

৩। আপনার সহিত দীর্ঘকাল ব্যবসায়-সূত্রে পরিচিত এক তাঁত-বস্ত্র বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠানের অংশীদার-বন্ধু পাটনাতে একটি শাখা-বিক্রয়কেন্দ্র খুলিতে চান। তাঁহার জন্য আপনার মিল-বস্ত্র বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আপনার পরিচিত পাটনার একটি বস্ত্র-বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের নিকট সুপারিশপত্র দিন।

প্রত্যয়-পত্র

[Letter of Credit]

প্রত্যয়-পত্র বহুলাংশে সুপারিশ পত্রেরই মত। পার্থক্য শুধু এইখানে যে, প্রত্যয়-পত্রে প্রাপক প্রত্যয়-যোগ্য ব্যক্তি বা পত্রগ্রাহককে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপারে নির্দিষ্ট পরিমাণ **অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার জন্য** অনুরুদ্ধ হইয়া থাকেন।

আকাঙ্ক্ষিত **সাহায্যের প্রকৃতি** অনুসারে প্রত্যয়-পত্র **লেখক-স্বার্থে** অথবা **বাহক-স্বার্থে** লিখিত হইতে পারে। **লেখক-স্বার্থে লিখিত প্রত্যয়-**

পত্র তাহাকেই বলা হইবে যেখানে পত্রবাহকের সাহায্য প্রাপ্তির ফলে পত্রলেখক স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইয়া থাকেন। আর যখন এইরূপ পত্র মুখ্যত পত্রবাহকেরই স্বার্থে লিখিত হইয়া থাকে তখন তাহাকে **বাহক-স্বার্থে লিখিত প্রত্যয়-পত্র** বলা চলে।

আবার, **প্রাপক-সংখ্যার দিক হইতে** বিচার করিলে প্রত্যয়-পত্রকে দুইটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা চলে—**সরল প্রত্যয় পত্র** (Simple Letter of Credit) এবং **সামুহিক প্রত্যয় পত্র** (Circular Letter of Credit)। এইরূপ পত্র যখন **একটি মাত্র** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে লিখিত হয় তখন তাহাকে **সরল প্রত্যয়-পত্র** বলা হয় এবং যখন **একাধিক** ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে লিখিত হয় তখন তাহাকে **সামুহিক প্রত্যয়-পত্র** বলা হইয়া থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাপককে পূর্বে সংবাদ দেওয়া উচিত যাহাতে পত্র-প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যাহত না হয়।

প্রত্যয়-পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা অবশ্যই প্রয়োজন—

(ক) অর্থের পরিমাণ,

(খ) পরিশোধের উপায়,

(গ) পত্রের মেয়াদ,

এবং (ঘ) প্রত্যয়-যোগ্য ব্যক্তির স্বাক্ষরের নমুনা (Specimen Signature)।

প্রত্যয়-পত্রের লেখক পত্রবাহকের অর্থ সাহায্য প্রাপ্তির জন্য নিজেই দায়ী থাকেন বলিয়া এই জাতীয় পত্রে অর্থের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে, পত্রবাহক যে পরিমাণ অর্থই ধার করুক না কেন উহা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আসিয়া পড়িবে পত্রলেখকের উপর। দ্বিতীয়টির যদি উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে সাহায্য করার ব্যাপারে প্রাপক কিছুটা ইতস্তত বোধ করিলেও করিতে পারেন—পত্রলেখকের পক্ষে যাহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। তৃতীয়টির উল্লেখ না থাকিলে, পত্রবাহক যতদিন পর্যন্ত ধার করিয়া চলিবেন ততদিন পর্যন্ত গৃহীত অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন পত্রলেখক —যাহা হয়তো পত্রলেখকের ব্যবসায়িক স্বার্থের পক্ষে অনভিপ্রেত ও অপ্রয়োজনীয়। চতুর্থটির নিদর্শন না থাকিলে, যদি ওই চিঠিটি কোনক্রমে প্রকৃত পত্রবাহকের নিকট হইতে খোয়া যায়, তাহা হইলে, উহা যাহার নিকটে থাকিবে সে ইচ্ছা করিলে প্রাপককে ঠকাইয়া পত্রে উল্লিখিত অর্থ নিজে সংগ্রহ করিয়া লইবে। এইরূপ ভাবে ঠকিবার সম্ভাবনা থাকায় পত্রবাহকের নমুনা-বিহীন প্রত্যয়-পত্রের উপর

নির্ভর করিয়া প্রাপক সাহায্যদান হইতে বিরত থাকিতে পারেন—যাহা এইরূপ পত্রের স্বার্থ-বিরোধী ব্যাপার।

প্রত্যয়-পত্রের প্রাপক পত্রবাহককে টাকা দিবার সময় তাঁহার নিকট হইতে দুইখানি রসিদ লিখাইয়া লন এই মর্মে যে, পত্রবাহক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নগদ বুঝিয়া পাইয়াছেন। পত্রবাহকের স্বাক্ষর-যুক্ত হইয়া একটি রসিদ থাকে পত্রের পিছনে এবং অন্যটি থাকে পৃথক্ একটি কাগজে। পৃথক্ কাগজে লিখিত রসিদটি প্রাপক পরে পত্রলেখকের নিকট দাখিল করিয়া প্রদত্ত অর্থের দাবী জানান এবং পত্রটি নিজের দফ্তরে রাখিয়া দেন।

পূর্বে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় পত্রের অত্যধিক গুরুত্ব ও প্রচলন থাকিলেও বর্তমানে Travellers Cheque, Telegraphic Money Orders ইত্যাদির প্রচলন হওয়ায় প্রত্যয়-পত্র লিখিবার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে।

এই জাতীয় পত্রের কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হইল।

নমুনা : ১। লেখক-স্বার্থে লিখিত সরল প্রত্যয়-পত্র :—

সিঙ্কো

প্রসিদ্ধ রেশন বস্ত্র ব্যবসায়ী

গ্রাম : সিঙ্কো ৭০।২, রাজাকাট্‌রা, বড়বাজার

ফোন : ২৪-৪৪৮৮ কলিকাতা—৭

পূর্বসূত্র :—আমাদের ২৬।৫।৬২ তারিখে লিখিত পত্র—

শ্রীভবতারণ দাস,
স্বত্বাধিকারী,
দাস এণ্ড কোং
বারাণসী।

মহাশয়,

পত্রবাহক শ্রীঅম্বুজাক্ষ পাল আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন দীর্ঘকালের বিশ্বস্ত গস্তিদার (Purchasing Agent)। আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য রেশমজাত বস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইনি বারাণসী গমন করিতেছেন। আমাদের ব্যবসায়গত স্বার্থে ইঁহাকে সাহায্য করিলে বাধিত থাকিব।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, মোটামুটিভাবে কিছু মাল সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা শ্রীপালের সহিত কিছু অর্থ পাঠাইয়াছি। কিন্তু, তাহা সত্ত্বেও, যদি

প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, অনুগ্রহপূর্বক শ্রীপালকে অনধিক ১০০০ এক হাজার টাকা পর্যন্ত দিয়া সাহায্য করিবেন।

আনুষঙ্গিক খরচ-খরচা সমেত প্রদত্ত টাকার জন্য আমাদের নামে দর্শনী হুণ্ডি কাটিয়া অথবা আমাদের হিসাবে ওই টাকা খরচ দেখাইয়া আপনাদের আদায় দেখাইতে পারেন।

এই পত্রের মেয়াদ অদ্য হইতে চারি সপ্তাহকাল পর্যন্ত কার্যকরী থাকিবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর প্রদত্ত অর্থ সম্পর্কে যে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীপালের স্বাক্ষরের নমুনা এই পত্রের নিচে প্রদত্ত হইল। টাকা দিবার সময় অনুগ্রহপূর্বক এই নমুনার সহিত মিলাইয়া লইবেন।

আপনাদের এই সাহায্যের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান সর্বতোভাবে কৃতজ্ঞ রহিল। ভবিষ্যতে অনুরূপ সাহায্য করিবার সুযোগ দান করিয়া, আশা করি, আমাদের ওই কৃতজ্ঞতার পরিমাণ অধিকতর বৃদ্ধি করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

বিনীত,
পরেশচন্দ্র মান্না
স্বত্বাধিকারী,
সিস্কো

শ্রীঅম্বুজাক্ষ পালের নমুনা-স্বাক্ষর :—

শ্রীঅম্বুজাক্ষ পাল

নমুনা : ২। বাহক-স্বার্থে লিখিত সরল প্রত্যয়-পত্র :—

দি আসাম ভ্যালী টী কোং

প্রসিদ্ধ চা-পাতা রপ্তানিকারক

গ্রাম : অ্যাভ্‌কো
ফোন : ৩৪-৩৩৩৩

১২২, স্ট্র্যাণ্ড্ রোড,
কলিকাতা—১

শ্রীকানাইলাল দেশমুখ,
ম্যানেজার,
গিলাপুকুরী টী এস্টেট্, আসাম।

পূর্বসূত্র :—আমাদের ৬৷৫৷৬২ তারিখে লিখিত পত্র।

মহাশয়,

পত্রবাহক শ্রীগণপতি হাজরা আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ পরিচিত। শ্রীহাজরা দীর্ঘকাল যাবৎ জীবন-বীমা কোম্পানির অধিকর্তার কার্য করিয়া আসিতেছেন।

সম্প্রতি তিনি আসামের চা-বাগান এলাকায় তাঁহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ওই দিকে যাইতেছেন। ওখানে গিয়া তিনি প্রথমেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। চা-বাগান এলাকা সম্পর্কে তাঁহার কোন্ প্রকার পূর্ব-অভিজ্ঞতা না থাকায় আপনাদের উপদেশকেই মূলধন করিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই, আপনাদের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, তাঁহাকে সময়োচিত ও যথোচিত উপদেশ দিয়া বাধিত করিবেন।

কর্ম-ব্যপদেশে শ্রীহাজরাকে হয়তো সমগ্র আসামই পরিভ্রমণ করিতে হইবে। পরিকল্পনানুযায়ী ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়াই তিনি এখান হইতে গমন করিতেছেন। কিন্তু পথে নানাপ্রকার বিপদ-আপদ ঘটিবার সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে এবং তাহার ফলে তিনি যদি আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে অনধিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দিয়া সাহায্য করিলে বাধিত হইব।

প্রদত্ত টাকার জন্য আমাদের নামে দর্শনী হুণ্ডি কাটিয়া অথবা আমাদের হিসাবে ওই টাকা খরচ দেখাইয়া আপনাদের আদায় দেখাইতে পারেন।

এই পত্রের মেয়াদ অদ্য হইতে তিনমাস কাল যাবৎ কার্যকরী থাকিবে। এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পর প্রদত্ত অর্থ সম্পর্কে যে আমাদের কোনপ্রকার দায়িত্ব থাকিবে না তাহাও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীহাজরার স্বাক্ষরের নমুনা এই পত্রের নিচে প্রদত্ত হইল।

শ্রীহাজরাকে সাহায্য করিলে আমাদেরই সাহায্য করা হইবে বলিয়া ধরিয়া লইবেন এবং আমরাও অনুরূপভাবে আপনাদের সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীঅনিমেষ বেরা
স্বত্বাধিকারী,
দি আসাম-ভ্যালী টী কোং

শ্রীগণপতি হাজরার নমুনা-স্বাক্ষর :

শ্রীগণপতি হাজরা

লেখক-স্বার্থে অথবা বাহক-স্বার্থে লিখিত সামূহিক প্রত্যয়-পত্র রচনার পদ্ধতি সরল প্রত্যয়-পত্র রচনারই অনুরূপ। পার্থক্য শুধু অন্তর্বর্তী ঠিকানার ক্ষেত্রে। উপরের নমুনা দুইটি সামূহিক প্রত্যয়-পত্রের রূপ লাভ করিবে যদি উহাদের অন্তর্বর্তী ঠিকানায় একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম থাকে। তবে যে পত্রটি যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের

নিকট প্রেরিত হইবে তাহার নামের নিচে বা পার্শ্বে দাগ দিয়া চিহ্নিত করিয়া দেওয়া উচিত। এইরূপ পত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই লিখিতে হয় যে সমস্ত ক্ষেত্রে পত্রবাহককে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে একাধিক স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

অনুশীলনী

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ সালে পাটনা হইতে 'দি রিলায়েবল্ কেমিস্ট্স্ এণ্ড ড্রাগিস্ট্স্' কলিকাতার 'দাস মেডিক্যাল ষ্টোরস্'-কে লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীঅমূল্য চরণ মাহাতোর অনুকূলে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত ঋণ দিবার জন্য একখানি প্রত্যয়-পত্র প্রদান করিয়াছেন এবং অনুরোধ জানাইয়াছেন যে ওই পত্রটি উপস্থাপিত হইলে যেন উহা অনাদৃত না হয়। পত্রখানি লেখক-স্বার্থে এবং বাহক-স্বার্থে এই দুইভাবে রচনা করুন।

যোগ্যতানুসন্ধান-পত্র

[Status Enquiry Letter]

চাকুরীর ক্ষেত্রে কখনও কখনও দেখা যায় যে, নিয়োগকারী আবেদনকারীকে আবেদনপত্রে পরিচয়-সূত্র হিসাবে এক বা দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করিতে বলিতেছেন। নিয়োগকারীর দিক হইতে এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, তিনি বিশ্বাস করিয়া যাঁহার উপর দায়িত্ব অর্পণ করিতে যাইতেছেন তিনি বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি কিনা তাহা পদাধিকারবলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসযোগ্য অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া লওয়া। এইরূপ ক্ষেত্রে নিয়োগকারী যখন পরিচয়-সূত্রে উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হইতে আবেদনকারী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন, তখন যে পত্রের সাহায্যে ওইরূপ অনুসন্ধান কার্য সমাহিত হয় তাহাকে **যোগ্যতানুসন্ধান-পত্র** বলা হইয়া থাকে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনুসন্ধানের পর প্রয়োজন হয় বলিয়া এই সমস্ত ক্ষেত্রেও যোগ্যতানুসন্ধান-পত্র লিখিত হইয়া থাকে। কারণ, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধারে মাল সরবরাহ না করিলে অনেক সময় কাজকর্ম অচল হইয়া পড়ে। অথচ কোন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানই অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ধারে মাল সরবরাহ করিবার পূর্বে সরবরাহকারী মাত্রই ক্রেতার অর্থসঙ্গতি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পর্কে অন্যের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ অনুসন্ধান কার্য, সাধারণত অন্য পরিচিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্কের নিকটেই করা হইয়া থাকে।

এই জাতীয় পত্র লিখিবার সময় পত্রলেখকের মনে রাখা প্রয়োজন যে, তিনি যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া চিঠি লিখিতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে একটি উপকার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব, আর্থিক দিক হইতে তথ্য সরবরাহকারী যাহাতে অহেতুক ভারগ্রস্ত বলিয়া নিজেকে না মনে করেন, সেইজন্য পত্রের সহিত পত্রলেখকের নিজের নাম-ঠিকানা সম্বলিত টিকিট লাগানো একখানি খাম দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। তবে, অন্যের নিকট এই জাতীয় পত্র লেখার ব্যাপারে পত্রলেখকের দিক হইতে কুণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ, পারস্পরিক সহযোগিতাই ব্যবসায়-বাণিজ্য-জগতের মূল ভিত্তি বলিয়া তথ্য-সরবরাহকারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে পত্রলেখকের আরও একটি কথা স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয়। যোগ্যতানুসন্ধান-পত্রে জ্ঞাতব্য বিষয়টি সব সময়েই স্পষ্ট হওয়া উচিত। না হইলে, যে-উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া তিনি ঐরূপ পত্র লিখিতেছেন তাহা সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, কোন একজন নিয়োগকর্তা যদি তাঁহার নিকট চাকুরী-প্রার্থী জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁহার পূর্বতন নিয়োগকর্তার নিকট লেখেন যে, 'শ্রী........এর সম্পর্কে আপনাদের যে ধারণা তাহা আমাদের জানাইলে বাধিত হইব', তাহা হইলে, তথ্য-সরবরাহকারী ব্যক্তি অনুসন্ধেয় ব্যক্তি সম্পর্কে ঠিক কি কি জানাইবেন তাহা তাঁহার কাছে স্পষ্ট না থাকায়, তিনি এমন সমস্ত তথ্য সরবরাহ করিতে পারেন যাহা পত্রলেখকের কোন কাজে না-ও আসিতে পারে। সেইজন্য এই জাতীয় পত্রে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সব সময়েই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

যোগ্যতানুসন্ধান-পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা আবশ্যক—

(ক) পত্র লিখিবার কারণ,

(খ) জ্ঞাতব্য তথ্য,

(গ) তথ্য-গুপ্তির প্রতিশ্রুতি

এবং (ঘ) অনুরূপ সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি।

এই জাতীয় পত্রের উত্তর দেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। উত্তরগুলি যাহাতে স্পষ্ট ও জ্ঞানবুদ্ধি মতে সত্য হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ভাল বা খারাপ কোন দিক হইতেই অতিরঞ্জন করা বিধেয় নয়। যোগ্যতানুসন্ধান পত্রের উত্তর তিন রকমের হইয়া থাকে—(ক) অনুকূল, (খ) প্রতিকূল ও (গ) নেতিবাচক। যাঁহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছে তাঁহার পক্ষে অথবা বিপক্ষে কিছু বলিবার যদি না থাকে, তাহা হইলে, সেক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তথ্য সরবরাহ না করিয়া পত্রলেখককে উত্তরদাতার জানাইয়া দেওয়া উচিত যে, তিনি এ সম্পর্কে অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে পারেন।

পত্রলেখক অথবা উত্তরদাতা উভয়েরই তরফ হইতে গোপনীয়তা রক্ষা করা এই জাতীয় পত্রের প্রধানতম অঙ্গ। সেইজন্য, যে-ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়, অনেক ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম মূল চিঠির মধ্যে উল্লিখিত থাকে না—একটি স্বতন্ত্র কাগজে তাহা লিখিয়া ক্রোড়পত্রাকারে মূল চিঠির সহিত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। গোপনীয়তা রক্ষা করিবার জন্য প্রাপক নাম-সম্বলিত ক্রোড়-পত্রটি প্রয়োজনান্তে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারেন। ইহাতে, মূল চিঠিটি দৈবক্রমে অন্যের হাতে পড়িলেও তাঁহার পক্ষে কিছুই জানিবার উপায় থাকিবে না।

বিভিন্ন স্তর অনুসারে নিম্নে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল।

নমুনা : ১। কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতানুসন্ধান-পত্র :—

বর্ধমান দুগ্ধ সমবায়-কেন্দ্র

রাণীগঞ্জ বাজার,

পোঃ ও জেলা—বর্ধমান

ফোন : বার-৫০১ তাং....২৯।৫।৬২

গ্রাম : বারমিলকো

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়,

খড়ুয়াবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী শ্রীফণীভূষণ সামন্ত আমাদের প্রতিষ্ঠানে হিসাব-লেখকের পদের জন্য আবেদন করিয়াছেন। শ্রীসামন্ত তাঁহার আবেদনপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বর্তমানে তিনি আপনাদের প্রতিষ্ঠানে অনুরূপ পদে কার্য করিতেছেনএবং তাঁহার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য আপনাদের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

এইজন্য শ্রীসামন্ত সম্পর্কে কয়েকটি সংবাদ প্রদানের জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাইতেছি। প্রথমত, শ্রীসামন্ত কতদিন যাবৎ আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কার্যরত রহিয়াছেন; দ্বিতীয়ত, কি কারণে তিনি আপনাদের প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক এবং তৃতীয়ত, বর্তমান নিয়োগকর্তা হিসাবে তাঁহার কার্যদক্ষতা, সততা ও আনুগত্য সম্পর্কে আপনাদের কি অভিমত,—এই সংবাদগুলি অনুগ্রহপূর্বক জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

এই প্রসঙ্গে আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আপনাদের প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হইবে এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান ভিন্ন অন্য কাহারও উহা কোনরূপে

জানিবার সম্ভাবনা নাই। এই সূত্রে আরও জানাইতেছি যে, আপনাদিগকে অনুরূপ সাহায্য করিতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকিব।

ধন্যবাদান্তে—
বিনীত,
শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সাধু,
ম্যানেজার,
বর্ধমান দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্র।

নমুনাঃ ২। অনুকূল উত্তর ঃ—

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

খড়ুয়াবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী।

গোপনীয়

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সাধু, তাং····২।৬।৬২
ম্যানেজার,
বর্ধমান দুগ্ধ সমবায়-কেন্দ্র,
রাণীগঞ্জ বাজার,
পোঃ ও জেলা—বর্ধমান।

পূর্বসূত্র ঃ—আপনাদের ২৯।৫।৬২ তারিখে লিখিত পত্র।

মহাশয়,

উল্লিখিত সূত্র অনুযায়ী আপনাদের জানাইতেছি যে, শ্রীফণীভূষণ সামন্ত গত ১।৪।৬১ হইতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সততা ও আনুগত্যের সহিত হিসাব-লেখকের কার্য করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার কার্যদক্ষতা সংশয়াতীতভাবে প্রশংসনীয়। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে মনে হয় যে, অমাদের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে তাঁহার মত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা খুব কম বলিয়াই তিনি অন্যত্র চাকুরীর সন্ধান করিতেছেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী
স্বত্বাধিকারী,
শিবদুর্গা বস্ত্রালয়।

নমুনা ঃ ৩। নেতিজ্ঞাপক উত্তর ঃ—

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

খড়ুয়াঁবাজার, চুঁচুড়া,

হুগলী।

গোপনীয়

শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সাধু, তাং····২।৬।৬২

ম্যানেজার

বর্ধমান········ইত্যাদি।

পুর্বসূত্র ঃ—(নমুনা ২-এর অনুরূপ)

মহাশয়,

উল্লিখিত সূত্র অনুযায়ী অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাদের জানাইতেছি যে, আপনারা যে সংবাদ আমাদের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন সে-সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই জানাইতে সক্ষম নই। কারণ, শ্রীসামন্ত মাত্র গত ১১।৫।৬২ তারিখ হইতে আমাদের স্থায়ী হিসাব-লেখকের মাসেককাল বাবৎ অবকাশ-গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহার বদলী হিসাবে অস্থায়ীভাবে কর্মে যোগদান করিয়াছেন এবং আমাদের স্থায়ী কর্মচারী ১১।৬।৬২ তারিখে তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীসামন্ত অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোন কর্মচারীর কার্যদক্ষতা, সততা ও আনুগত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়িয়া ওঠা সম্ভবপর নয় বলিয়া শ্রীসামন্ত সম্পর্কে বিশেষ কিছুই তথ্য সরবরাহ করিতে সক্ষম হইতেছি না। তবে, যে কয়দিন তিনি এখানে কাজ করিতেছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই পর্যন্ত জানাইতে পারি যে, তাঁহার বিরুদ্ধে বলিবার মত আমরা কিছু খুঁজিয়া পাই নাই।

শ্রীসামন্তের অন্যত্র কর্মানুসন্ধান সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানে তাঁহার চাকুরীর অস্থায়ীত্বই হয়তো তাঁহাকে অন্যত্র কর্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিতেছে।

আপনাদের অনুসন্ধান ব্যাপারে আমরা বিশেষ কাজে লাগিতে পারিলাম না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীবিপিন বিহারী নন্দী, ইত্যাদি।

নমুনা ঃ ৩ (ক)। অনুসন্ধেয় ব্যক্তির পূর্বতন নিয়োগকর্তা সম্পর্কে যদি পত্র-প্রাপকের জানা থাকে, তাহা হইলে, এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি পত্রলেখককে তাঁহাদের

নিকট অনুসন্ধান করিতে বলিতে পারেন। তাহা হইলে, 'শিবদুর্গা বস্ত্রালয়' উপরের চিঠির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পরে অতিরিক্ত একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করিয়া এইভাবে লিখিতে পারেন :—

এই প্রসঙ্গে আরও একটি সংবাদ এই যে, শ্রীসামন্ত সম্পর্কে আমাদের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পূর্বে তিনি চন্দননগর স্টেশন রোডের 'ভ্যারাইটি এম্পোরিয়াম' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ছয় মাস কাল যাবৎ বিক্রেতা হিসাবে কার্য করিয়াছেন। সুতরাং ইচ্ছা করিলে আপনারা 'ভ্যারাইটি এম্পোরিয়ামে'র নিকট হইতে শ্রীসামন্ত সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইতে পারেন।

নমুনা : ৪। প্রতিকূল উত্তর :

প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, অন্তবর্তী ঠিকানা, পূর্বসূত্র, সম্বোধন ইত্যাদি যথাপূর্ব। এক্ষেত্রে পত্রের বিষয়বস্তুটি হইবে নিম্নরূপ—

উল্লিখিত পত্রে আপনারা যে ব্যক্তির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহার সম্বন্ধে কোন সুসংবাদ দিতে পারিতেছি না। উক্ত ভদ্রলোক মাত্র তিনমাস কাল যাবৎ আমাদের প্রতিষ্ঠানে হিসাব-লেখকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, তিনি নিয়মিতভাবে কাজে উপস্থিত হন না এবং তাঁহার কাজেও প্রায়ই অসংখ্য ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যায়। তাঁহার কাজের এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁহাকে ইতিপূর্বে দুইবার সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও যখন আমরা দেখিলাম যে, তিনি সংশোধনের অতীত, তখন বাধ্য হইয়া আমরা তাঁহাকে কর্মচ্যুতির বিজ্ঞপ্তি দিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আরও জানাইয়া রাখি যে, আমাদের এই বক্তব্য বিশেষভাবে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যত্র তিনি হয়তো ভালভাবে কাজ করিলেও করিতে পারেন। সুতরাং এই পত্রের মর্মার্থ এইভাবে গ্রহণ করিবেন না যে, উক্ত ভদ্রলোককে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী না দেওয়াই আমাদের অভিমত।

আশা করি, এই পত্রখানি বিশেষভাবে গোপন রাখিয়া আমাদের বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

ইত্যাদি।

[**বি. দ্র. :**—যোগ্যতানুসন্ধান-পত্রের উত্তরটি যখন প্রতিকূলাত্মক হয়, তখন পত্রে অনুসন্ধেয় ব্যক্তির নামোল্লেখ না থাকাই বাঞ্ছনীয়।]

নমুনা : ৫। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান :—

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়রণ ফ্যাক্টরি

লিলুয়া, হাওড়া।

গ্রাম : লৌহালয় তাং……৩০।৫।৬২

ফোন : হাউ-৪৫১

চ্যাটার্জি এণ্ড কোং

গোরাবাজার, মালদহ,

পঃ বঙ্গ।

সবিনয় নিবেদন,

মালদহ গোরাবাজারের একটি প্রতিষ্ঠান 'লৌহবিপণি' আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত কারবার করিতে ইচ্ছুক। পূর্বে তাঁহাদের সহিত আমাদের প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ ব্যবসায়গত সম্পর্ক ছিল না বলিয়া তাঁহারা পরিচয়-সূত্র হিসাবে আপনাদের নাম জানাইয়াছেন।

সেই অনুসারে আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা কিরূপ এবং মালদহের বাজারে উহাদের সুনাম ও ব্যবসায়িক সততাই বা কেমন তাহা জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। এই প্রসঙ্গে আরও অনুরোধ এই যে, আমরা উহাদের নিকট বিশ্বাসের উপর অথবা দীর্ঘ-মেয়াদী হুণ্ডিতে এককালীন চার-পাঁচ হাজার টাকার মত মাল নিরাপদে পাঠাইতে পারি কি না, সে সম্পর্কে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাইয়া বাধিত করিবেন।

এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানিতে না পারা পর্যন্ত আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়া আপনাদের উত্তরের আশায় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলাম। বলা বাহুল্য যে, আপনাদের প্রদত্ত সংবাদ সর্বতোভাবে গোপন রাখা হইবে। ধন্যবাদান্তে—

বিনীত,

শ্রীঅমূল্য চরণ গাঙ্গুলী,

ম্যানেজার,

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়রণ ফ্যাক্টরি।

নমুনা : ৬। অনুকূল উত্তর :—

চ্যাটার্জি এণ্ড কোং
গোরাবাজার, মালদহ
পঃ বঙ্গ।

শ্রীঅমূল্য চরণ গাঙ্গুলী, তাং····৭।৬।৬২
ম্যানেজার,
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়রণ ফ্যাক্টরি,
লিলুয়া, হাওড়া।

পূর্বসূত্র :—আপনাদের ৩০।৫।৬২ তারিখের পত্র।

মহাশয়,

উল্লিখিত সূত্র অনুযায়ী আপনাদের সানন্দে জানাইতেছি যে, এখানের গোরাবাজারস্থ 'লৌহবিপণি' নামক প্রতিষ্ঠানটি গত দীর্ঘ পনেরো বৎসর যাবৎ স্থানীয় বাজারে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাজ করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে ইঁহাদের কর্মপরিধি প্রায় সমগ্র মালদহ জেলাতেই বিস্তৃত বলিলে চলে এবং সেই দিক হইতে লৌহ-দ্রব্য বিক্রেতা হিসাবে সমগ্র মালদহ জেলায় এই প্রতিষ্ঠানটিকে শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এযাবৎ কাল আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির নিকট যে ব্যবহার পাইয়া আসিতেছি তাহা নিঃসন্দেহে সন্তোষজনক ও বিশ্বাস-ব্যঞ্জক। ইহা ভিন্ন, আমাদের ক্রেতৃমহল হইতে বিভিন্ন সূত্রে যে সংবাদ পাইয়াছি তাহাও আমাদের ধারণাকে অযথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করে না।

আমাদের জ্ঞানগোচর মতে ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল বলিয়াই মনে হয়। আর, অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে স্থানীয় বাজারে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাহাদের যথেষ্ট সুনাম আছে বলিয়া জানি।

এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপন করিলে আপনাদের প্রতিষ্ঠান উপকৃত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা। ধন্যবাদান্তে—

বিনীত,
শ্রীবিবেকানন্দ চ্যাটার্জি,
স্বত্বাধিকারী,
চ্যাটার্জি এণ্ড কোং।

নমুনা : ৭। নেতিজ্ঞাপক উত্তর :—

নাম, ঠিকানা, তারিখ, অন্তর্বর্তী ঠিকানা, পূর্বসূত্র, সম্বোধন ইত্যাদি যথাপূর্ব। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুটি হইবে নিম্নরূপ :—

উল্লিখিত সূত্র অনুযায়ী আপনাদের জানাইতেছি যে, এখানের গোরাবাজারস্থ 'লৌহবিপণি' নামক প্রতিষ্ঠানটি মাত্র ছয়মাস কাল যাবৎ স্থাপিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাজারে সুনাম অর্জন করা যে কতখানি কঠিন তাহা, আশা করি, আপনারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে এ-সম্পর্কে মন্তব্য করাও যে কতখানি দুরূহ তাহাও আশা করি, আপনাদের অজানা নয়। স্থানীয় ব্যবসায়ী বলিয়া মাঝে মাঝে এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত আলাপের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে বটে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁহাদের সহিত আমাদের এমন কোন অর্থ-সংক্রান্ত লেনদেন হয় নাই, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, তাঁহাদের নিকট বিশ্বাসের উপর অথবা দীর্ঘমেয়াদী হুণ্ডিতে একমালীন চার-পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের মাল পাঠানো নিরাপদজনক।

ইহা ভিন্ন, উক্ত প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধেও আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। অতএব আপনারা যাহা অনুসন্ধান করিতেছেন সে-সম্পর্কে আপনাদের যথাযথ সাহায্য করিতে পারিলাম না বলিয়া আন্তরিক দুঃখিত।

আমাদের প্রদত্ত এই সংবাদ গোপন রাখিয়া, আশা করি, আমাদের বাধিত করিবেন।

ইতি····।

নমুনা : ৮। প্রতিকূল উত্তর :—

নাম, ঠিকানা····ইত্যাদি যথাপূর্ব। বিষয়বস্তু—

উক্ত পত্রে যে-প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আপনারা অনুসন্ধান করিতেছেন সে সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, কয়েক বৎসর পূর্বেও স্থানীয় বাজারে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু প্রায় আড়াই বৎসর হইল উহার মালিকানা হস্তান্তরিত হইয়ছে। এই ঘটনার পর হইতে উহাদের লেনদেন সন্তোষজনকভাবে চলিতেছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না এবং উহাদের বর্তমান আর্থিক অবস্থাও বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া মনে করি না। এই অবস্থায় এককালীন চার-পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের মাল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া অথবা দীর্ঘমেয়াদী হুণ্ডিতে পাঠানো নিরাপদজনক নয় বলিয়া আমাদের ধারণা।

পত্রের মর্মার্থ সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিয়া আমাদের বাধিত করিবেন এবং তৎসহ ইহাও জানিবেন যে, প্রদত্ত সংবাদ সম্পর্কে কোন প্রকার দায়িত্বও আমাদের নাই। ধন্যবাদান্তে—

ইত্যাদি····।

নমুনা : ৯। পরিচয়-সূত্র জ্ঞাপনের অনুরোধ-পত্র :—

[কখনও কখনও কোন অপরিচিত প্রতিষ্ঠান পরিচয়-সূত্রের উল্লেখ না করিয়াই ধারে মাল পাঠাইতে অনুরোধ করিলে সরবরাহকারী-প্রতিষ্ঠান নিজের নিরাপত্তার জন্য পত্রলেখককে পরিচয়-সূত্র জ্ঞাপনের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়রণ ফ্যাক্টরি, কর্তৃক লৌহবিপণি'কে লিখিত পত্রখানি হইবে নিম্নরূপ :—]

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়রণ ফ্যাক্টরি

লিলুয়া, হাওড়া।

গ্রাম: লৌহালয়। তাং·······৩০।৫।৬১

ফোন : হাউ—৪৫১।

শ্রীঅনিমেষ পাল,
স্বত্বাধিকারী,
লৌহবিপণি,
গোরাবাজার, মালদহ,
পঃ বঙ্গ।

পূর্বসূত্র :—আপনার ১০।৫।৬২ তারিখযুক্ত অর্ডার নম্বর, ৪৫৩২।

মহাশয়,

উক্ত সূত্র হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যবসায়-গত সম্পর্ক স্থাপন করিতে ইচ্ছুক। আপনার এই অভিপ্রায় আমাদের যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং ইহার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রসঙ্গত, আপনার অবগতির জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের একটি স্থায়ী নিয়ম সম্পর্কে জানাইতেছি। নূতন কোন ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপনকালে আমাদের প্রতিষ্ঠান সমস্ত ক্ষেত্রেই পরিচয়-সূত্র গ্রহণ করিয়া থাকে। যেহেতু, ইতিপূর্বে আপনার প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই, সেইহেতু, আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, আপনি অনুগ্রহপূর্বক পরিচয়-সূত্র হিসাবে দুইটি প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা জানাইয়া বাধিত করিবেন। আশা করি, এই পত্রটিকে অসৌজন্যমূলক মনে করিয়া আমাদের লজ্জা দিবেন না।

আপনার উক্ত নির্দেশপত্র অনুযায়ী কার্য করিবার জন্য যত্ন লওয়া যাইতেছে এবং যথাশীঘ্র মাল প্রেরণ করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ধন্যবাদান্তে—

বিনীত,
শ্রীঅমূল্য চরণ গাঙ্গুলী
ম্যানেজার,
দি ওয়েস্ট বেঙ্গল আয়রণ ফ্যাক্টরি।

নমুনা : ১০। ব্যাঙ্কের তরফ হইতে লিখিত যোগ্যতানুসন্ধান পত্রের উত্তর।

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে ধার চাহিয়াছেন ও তাহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় জানিবার জন্য তোমার নাম করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক এবিষয়ে তোমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। তুমি এই বিষয়ে যথোপযুক্ত উত্তর লিখ। [বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয় : ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রি পরীক্ষা : ১৯৬২]

উত্তর : **হিন্দ কমার্শিয়াল কন্‌সার্ণ**

৪০০।১, ওয়েলিংটন স্কোয়ার
কলিঃ ১২

ফোন : ৪৪-৩৩১১ তাং·······৭।৮।৬২

গ্রাম : হিন্দ্‌ কন্‌সার্ণ

কর্মাধ্যক্ষ
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
প্রধান কার্যালয়

পূর্বসূত্র : আপনাদের পত্র সংখ্যা : ইউ. বি. আই. (সি) অনুসন্ধান।১০৩১ তাং ৩০।৭।৬২

সূচক সংখ্যা : হিন্দ্‌।যো-উ।৪৫১।৬২

মহাশয়,

উল্লিখিত পূর্বসূত্র অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, আবেদনকারী শ্রীআশুতোষ গড়াই আমাদের প্রতিবেশী প্রতিষ্ঠান 'হিন্দ্‌ জলপান'-এর একমাত্র স্বত্বাধিকারী। সম্ভবত, শ্রীগড়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্যই আপনাদের ব্যাঙ্ক হইতে ধার চাহিয়াছেন এবং সেই আবেদনের যৌক্তিকতা হিসাবে আপনাদের নিকট তাঁহার সম্পত্তির মোট মূল্যও দাখিল করিয়াছেন। খুঁটিনাটি তথ্য বাদ দিয়া এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, ব্যক্তিগতভাবে শ্রীগড়াই এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠান হিন্দ্‌ জলপান'-এর বাজারে বেশ সুনাম আছে বলিয়াই জানি এবং দীর্ঘকালের প্রতিবেশী

প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের এমন কোন অভিজ্ঞতা হয় নাই, যাহাতে বলিতে পারি যে, টাকাকড়ির ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সহিত জড়িত হইতে হইয়াছে। সুতরাং আপনাদের ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহার ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা আছে বলিয়াই মনে করি।

পরিশেষে, বক্তব্য এই যে, শ্রীগড়াই ও তাঁহার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই উভয়ের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণের নামান্তর নয়। ধন্যবাদান্তে—

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ
হিন্দ্ কমার্শিয়াল কন্‌সার্ণ।

অনুশীলনী

১। আপনার প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর জন্য আবেদনকারী জনৈক ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার পূর্বতন নিয়োগকর্তার নিকট একখানি পত্র লিখুন।

২। আপনার প্রতিষ্ঠানের জনৈক পূর্বতন কর্মচারীর যোগ্যতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া অন্য একটি প্রতিষ্ঠান হইতে আপনার নিকট একখানি পত্র আসিয়াছে। অনুকূল, প্রতিকূল এবং নেতিজ্ঞাপক এই তিনভাবে উত্তর দিয়া যথাক্রমে তিনখানি পত্র রচনা করুন।

৩। আপনার প্রতিষ্ঠানের সহিত অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি সম্পাদনে ইচ্ছুক অন্য একটি প্রতিষ্ঠান সেই ব্যাঙ্কেরই সহিত লেনদেন করিয়া থাকেন, যে ব্যাঙ্কের সহিত আপনার প্রতিষ্ঠানও যুক্ত। উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া আপনার ব্যাঙ্কের নিকট একখানি পত্র লিখুন।

৪। কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান (যাহার সহিত আপনার পূর্বের কোন ব্যবসায়গত সম্পর্ক নাই) আপনার প্রতিষ্ঠানের নিকট ধারে দেড় হাজার টাকা মূল্যের মাল চাহিয়াছেন। পত্রলেখক কর্তৃক পরিচয়-সূত্রে প্রদত্ত অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট নূতন ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক উক্ত প্রতিষ্ঠানটির যোগ্যতানুসন্ধান করিয়া একখানি পত্র রচনা করুন।

৫। আপনার প্রতিষ্ঠানের সহিত নূতন ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপনে ইচ্ছুক অন্য একটি প্রতিষ্ঠান ধারে মাল পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু পত্রে কোন পরিচয় সূত্রের উল্লেখ নাই। অতঃপর আপনার কর্তব্য স্থির করিয়া একখানি পত্র রচনা করুন।

৬। আপনার অঞ্চলের এক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের মাল শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ধারে সরবরাহ করা উচিত কিনা সে-সম্পর্কে আপনার মতামত প্রার্থনা করিয়া আপনার প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র আসিয়াছে। অনুকূল, প্রতিকূল এবং নেতিজ্ঞাপক এই তিনভাবে উত্তর দিয়া যথাক্রমে তিনখানি পত্র রচনা করুন।

৭। কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে ধার চাহিয়াছেন ও তাঁহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় জানিবার জন্য আপনার নাম উল্লেখ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে আপনার নিকট জানিতে চাহিয়াছে। আপনি এ বিষয়ে যথোপযুক্ত উত্তর লিখুন।

(বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২)

প্রচার-পত্র

(Circular Letter)

বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া থাকা সমস্ত ক্রেতৃবৃন্দের অবগতির জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যে পত্রের মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচার করা হইয়া থাকে তাহাকেই সাধারণতঃ **প্রচারপত্র** বলা হইয়া থাকে। ইহা ছাপানো অথবা সাইক্লোস্টাইল করা পত্রাকারে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট পাঠানো হইয়া থাকে। কিংবা হ্যাণ্ডবিল আকারে ছাপাইয়াও বিতরণ করা হয়। আবার কখনও কখনও সংবাদ পত্রের মাধ্যমেও উহা প্রচার করা হইয়া থাকে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনে জাতীয় পত্রের ব্যাপক প্রচলন ঘটিতেছে। ওই জাতীয় বিভিন্ন প্রয়োজনের কয়েকটিকে গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ প্রচারপত্রের নমুনা দেওয়া হইল।

(ক) নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা

নমুনা : ১। হ্যাণ্ডবিল আকারে প্রচার পত্রের নমুনা—

জগজ্জননী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

নিবারণ চন্দ্র কোলে, ৭১২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
স্বত্বাধিকারী। কলিকাতা।

১লা বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

সবিনয় নিবেদন,

আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত আপনাদের জানাইতেছি যে, আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতাকেই একমাত্র মূলধন হিসাবে

করিয়া লইয়া অদ্য শুভ নববর্ষের দিন হইতে একটি মিষ্টান্ন তৈয়ারী ও বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান আমার পরিচালনাধীনে উপরোক্ত ঠিকানায় স্থাপিত হইল। এই প্রতিষ্ঠানটির নাম হইতেছে,

জগজ্জননী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

প্রসঙ্গত, আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, মিষ্টান্ন তৈয়ারী করা আমাদের একমাত্র পারিবারিক ব্যবসায় এবং আমাদের পরিবার পুরুষানুক্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই ব্যবসায়ে লিপ্ত। পারিবারিক উত্তরাধিকারী হিসাবে আমি বাল্যকাল হইতেই এই বৃত্তিতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছি এবং আমার এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে উক্ত নব-প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে আপনাদের ও দেশের সেবায় লাগাইব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। আশা করি, আপনাদের নিরন্তর উৎসাহের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমার এই প্রতিষ্ঠানটি দেশ-সেবার মহৎ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইবে না।

উল্লেখযোগ্য এই যে, আজকালকার এই ভেজাল-প্রাচুর্যের দিনে আমার প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি যাহাতে সর্বপ্রকারে ভেজাল-মুক্ত থাকে তাহার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হইবে। এতদ্‌ভিন্ন, আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানাইতেছি যে, আমার প্রতিষ্ঠান হইতে শুধু স্থানীয়ভাবেই যে মিষ্টান্নাদি বিক্রয় করা হইবে তাহা নয়; বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষেও মালপত্র বিশেষ যত্নসহকারে সরবরাহ করার জন্য আমার প্রতিষ্ঠান সব সময়েই প্রস্তুত থাকিবে।

আপনাদের সহযোগিতা ও পরীক্ষার সুযোগ লাভ করিলে নিজেকে ধন্য মনে করিব। ইতি—

নিবেদক,
ভবদীয় সেবক
শ্রীনিবারণ চন্দ্র কোলে।

[**বি. দ্র.** :—হ্যাণ্ডবিল-আকারে অথবা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনাকারে প্রচারিত প্রচার-পত্র সম্পর্কে জনসাধারণ খুব বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন না বলিয়া ব্যবসায়-জগতে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম সংগ্রহ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পত্রাকারে উহা প্রেরণ করিয়া থাকেন। উপরের নমুনাটিকেই পত্রাকারে ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে, সেক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী ঠিকানা হিসাবে প্রাপক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামটি লিখিয়া দিতে হয়।]

নমুনা : ২। (খ) শাখা প্রতিষ্ঠা

শান্তি পুস্তকালয়

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

শাখা কার্যালয় :
৬০১, বি. সি. রোড্
বর্ধমান

প্রধান কার্যালয় :
১/১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা।

সবিনয় নিবেদন,

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় বর্ধমান শহরে নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া উক্ত অঞ্চলে যেরূপ ব্যাপকভাবে আমাদের ব্যবসায়ের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে তাহার জন্য আমরা আমাদের সমর্থক ও ক্রেতৃবৃন্দকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। এই প্রসঙ্গে, ইহাও আপনাদের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি যে, আমাদের ব্যবসায়ের এইরূপ অভাবিতপূর্ব দ্রুত প্রসারের জন্য এবং উক্ত অঞ্চলে আমাদের স্বীকৃতি-প্রাপ্ত কোন এজেন্সী না থাকার জন্য কলিকাতা হইতে উক্ত অঞ্চলে আমাদের ব্যবসায়-সংক্রান্ত কার্য-নির্বাহ করা প্রায় দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি, ইহাও বিভিন্ন সূত্র হইতে অবগত হইলাম যে, এই কারণে উক্ত অঞ্চলে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাদি ক্রয় করার ব্যাপারে ক্রেতৃবৃন্দকে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তাই, আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি দূর করার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের সমর্থক ও ক্রেতৃবৃন্দের সুবিধার জন্য আমরা উপরোক্ত ঠিকানায় বর্ধমান শহরে আমাদের একটি শাখা-কার্যালয় স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি।

প্রস্তাবিত এই শাখাটির কার্য আরম্ভ হইবে **আগামী ১লা জুলাই** হইতে। আমাদের মূল-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার শ্রীকরুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত শাখা-কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং, উক্ত অঞ্চলের সমর্থক ও ক্রেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, উক্ত অঞ্চলে প্রসারিত আমাদের ব্যবসায়-সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্মের ব্যাপারে তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া উক্ত শাখা কার্যালয়ের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলেন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনাদের সেবাকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া পুরস্কার স্বরূপ আপনাদের নিকট হইতে যে অপরিমেয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছি তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ এবং আমাদের মূল প্রতিষ্ঠানটি যেরূপ আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বঞ্চিত হয় নাই, আশা করি, আমাদের শাখা-কার্যালয়টির ক্ষেত্রেও সেইরূপই ঘটিবে। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শান্তি পুস্তকালয়।

নমুনা : ৩। (গ) নবীকৃত মজুত মাল সম্পর্কে নিয়মিত ক্রেতৃবৃন্দকে অবহিত-করণ

[ব্যবসায়-জগতে কোন কোন সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের কার্যালয়ে তাঁহাদের বিশিষ্ট ক্রেতৃবৃন্দের একটি তালিকা রাখিয়া থাকেন। নূতন ও উল্লেখযোগ্য কোন মালপত্র আসিলে তাঁহারা নিয়মিতভাবে ওই তালিকাভুক্ত ক্রেতাদের প্রত্যেকের নিকট তাঁহাদের অবগতির জন্য ক্রমিক পত্র (Follow up Letters) প্রেরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ একটি পত্রের নমুনা নিচে দেওয়া হইল)]।

ফরেন্ পাবলিকেশন্‌স্

বিদেশী পুস্তকের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী।

গ্রাম : ফরেন — ৪৫/৪, কলেজ স্ট্রীট,

ফোন : ৩৩-৪৫১২ — কলিকাতা।

অধ্যাপক ডঃ প্রণবেশ রায়চৌধুরী.

কাশিয়াং

পশ্চিমবঙ্গ।*

মহাশয়,

অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, মাত্র এক সপ্তাহ হইল আমরা বিদেশ হইতে সদ্য-প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের পুস্তক আমদানী করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, সাম্প্রতিক বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত বিভিন্ন কারণে, আমদানীকৃত এই পুস্তকগুলির সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু, আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত ক্রেতা বলিয়া মাল নিঃশেষিত হইবার পূর্বেই আপনাকে অবহিত করা আমাদের দায়িত্ব বলিয়া মনে করিতেছি। এই পত্রের সহিত বিদেশ হইতে সদ্য-প্রকাশিত পুস্তকাবলীর একটি তালিকা সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল। মাল নিঃশেষিত হইবার পূর্বেই আপনার প্রয়োজন অনুসারে সরবরাহ করিবার সত্বর আদেশ দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

ক্রোড়পত্র : ১টি — শ্রীঅনিলেন্দু ভৌমিক,

ম্যানেজার,

ফরেন পাব্‌লিকেশন্‌স্

* ছাপানো ক্রমিক পত্রে এই স্থানটি ফাঁকা থাকে। কর্মক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এইখানে হাতে লিখিয়া বা টাইপ করিয়া দিতে হয়।

নমুনা : ৪। নূতন অংশীদার গ্রহণ

চ্যাটার্জি এণ্ড কোং

প্রসিদ্ধ লৌহ-ব্যবসায়ী

গ্রাম : চ্যাট্‌কো
ফোন : ৪৪-৪৪৪৪

৪৪৮, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১৩৬৯

সবিনয় নিবেদন,

এই পত্র মারফৎ আপনাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আপনাদের সকলের মিলিত সহানুধ্যায়িতা, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছায় আমার ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হওয়ায় ও কর্ম-পরিধি ক্রম-প্রসারিত হইতে থাকায় অদ্য শুভ নববর্ষ দিবস হইতে আমি শ্রীকাঙ্গাল চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে এই প্রতিষ্ঠানের নূতন নাম হইল—

চ্যাটার্জি এণ্ড ব্যানার্জি কোং

প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য এই যে, এই নূতন ব্যবস্থার ফলে পূর্ববর্তী কারবারের প্রকৃতি, নীতি, ঠিকানা ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হইবে না।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন-ভাবে যুক্ত থাকিয়া এই জাতীয় ব্যবসায়-সম্পর্কে প্রশংসনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে যে, তাঁহার মূল্যবান অভিজ্ঞতার সংস্পর্শে আসিয়া এই কারবার উত্তরোত্তর অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

পরিশেষে, আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি যেন পূর্বের মতই আপনাদের সহানুধ্যায়িতা, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভ করিয়া ধন্য হয়।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষরের নমুনা নিচে দেওয়া হইল। ধন্যবাদান্তে—

শ্রীকাঙ্গালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্বাক্ষরের নমুনা :—

শ্রীকাঙ্গালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদক,
শ্রীঅনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়
অংশীদার,
(বর্তমান) চ্যাটার্জি এণ্ড ব্যানার্জি কোং

নমুনা : ৫। অংশীদারের অবসর গ্রহণ

চ্যাটার্জি এণ্ড ব্যানার্জি কোং

প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী।

গ্রাম : চ্যাট্‌কো — ৪৪৮, নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট,

ফোন : ৪৪-৪৪৪৪ — কলিকাতা।

১লা বৈশাখ, ১৩৬৯

সবিনয় নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের অন্যতম সুযোগ্য অংশীদার কাঙ্গালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ফলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এই ব্যবসায়ের সহিত ভবিষ্যতে লিপ্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হওয়ার জন্য, অদ্য নববর্ষ-দিবস হইতে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারীই এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হিসাবে পরিগণিত হইলাম এবং ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়িত্ব আমার উপরেই বর্তাইল।

এই নূতন ব্যবস্থার ফলে পূর্বতন কারবারের প্রকৃতি, নীতি ঠিকানা ইত্যাদির কোন পরিবর্তন হইল না বটে, কিন্তু নাম পরিবর্তন করিয়া নিম্নরূপ রাখা হইল—

চ্যাটার্জি এণ্ড কোং।

এ যাবৎ কাল পূর্বতন প্রতিষ্ঠানটি যেরূপ বিশ্বাসের সহিত আপনাদের সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, আশা করি, বর্তমান প্রতিষ্ঠানটিও তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। ইতি—

নিবেদক,
শ্রীঅনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়
স্বত্বাধিকারী,
(বর্তমান) চ্যাটার্জি এণ্ড কোং।

নমুনা : ৬। প্রতিষ্ঠানের প্রভাবশালী ব্যক্তির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ

শান্তি পুস্তকালয়

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।

শাখা কার্যালয় :— — প্রধান কার্যালয় :—

৬০১, বি. সি. রোড, — ১/১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট,

বর্ধমান। — কলিকাতা। ১৫।৬।৬২

সবিনয় নিবেদন,

এতদ্বারা আমাদের প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, ক্রেতৃবর্গ ও জনসাধারণকে অবহিত

করা যাইতেছে যে, অদ্য ১৫ই জুন তারিখ হইতে আমাদের বর্তমান শাখা কার্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্রীকরুণাময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা হইল এবং সেই অনুযায়ী আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সর্বপ্রকার সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন হইল। সুতরাং অদ্য হইতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইয়া কোনপ্রকার কার্য পরিচালনা করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাঁহার রহিল না।

অতঃপর উক্ত তারিখ বা তাহার পর হইতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কেহ কাজ-কারবার করিলে তাহা সম্পূর্ণভাবে নিজ দায়িত্বেই করিবেন এবং উহার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠান কোনক্রমেই দায়ী থাকিবে না। ইতি—

নিবেদক,
শান্তি পুস্তকালয়।

নমুনাঃ ৭। ব্যবসায় ক্রয়

শ্রীঅমিয় কুমার বসু, এম. এ., এল. এল্ বি.,
এ্যাডভোকেট, আলিপুর কোর্ট।

৪, এস্প্ল্যানেড ইস্ট,
কলিকাতা।
১।১।৬২

সবিনয় নিবেদন,

এতদ্দ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে, ১০নং এস্প্ল্যানেড ইস্টে অবস্থিত 'সিটি ড্রাগ্ স্টোরস্' নামে সুপরিচিত ঔষধের প্রতিষ্ঠানটি আমার মক্কেল শ্রীঅনুপম হাজরা উহার সমস্ত দেনা-পাওনা সমেত ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আমার মক্কেলের ঐকান্তিক উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিই যেন কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না হন। এই কারণে আপনাদের জানাইতেছি যে, উক্ত কোম্পানীর সহিত আপনাদের কোন চল্তি হিসাব থাকিলে তাহা ৩১।১।৬২ তারিখের মধ্যে আমার নিকট অবশ্য দাখিল করিবেন এবং সে-সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ করিয়া একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য যে, উক্ত তারিখের মধ্যে আপনাদের চল্তি হিসাবের হিসাব-নিকাশ করিয়া না লইলে আমার মক্কেল উহার জন্য দায়ী থাকিবেন না। আশা করি, এ বিষয়ে আমার মক্কেল আপনাদের পরিপূর্ণ ও আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিতে বঞ্চিত হইবেন না

ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীঅনুপম হাজরার পক্ষে

নমুনা ঃ ৮। ব্যবসায় বিক্রয়

১০, এসপ্ল্যানেড ইস্ট,
কলিকাতা।
১।২।৬২

সবিনয় নিবেদন,

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ঠিকানায় অবস্থিত 'সিটি ড্রাগ্ স্টোর্স্' নামক আমাদের ঔষধের প্রতিষ্ঠানটি ১৫নং চৌরঙ্গী প্লেসের শ্রীঅনুপম হাজরার নিকট বিক্রয় করা হইল। এই হস্তান্তরীকরণ অদ্য হইতে কার্যকর হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও জানানো যাইতেছে যে শ্রীহাজরা পুরাতন প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃতি, নাম, ঠিকানা ইত্যাদি অপরিবর্তিত রাখিয়াই উহা পরিচালনা করিবেন।

শ্রীহাজরা এই ব্যবসায়ে সুপরিচিত ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনাধীনে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি যে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই লাভ করিবে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

প্রসঙ্গত, ইহাও আপনাদের নিকট অনুরোধ যে, আমাদের পরিচালনাধীনে থাকাকালীন উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আপনারা যে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিয়াছেন বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহা অনুগ্রহ করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীগণপতি মালিক,
পূর্বতন স্বত্বাধিকারী,
সিটি ড্রাগ্ স্টোর্স্।

নমুনা ঃ ৯। একাধিক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি-করণ।

৪০১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা।
১লা বৈশাখ, ১৩৬৮

সবিনয় নিবেদন,

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য ইহা ঘোষণা করিতে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, ৪০১নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ 'দি সিটি রিলায়েবল্ ফার্ণিচার্স' এবং ৪০০নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ 'দি সিটি ফার্ণিচার্স' নামক প্রতিষ্ঠান দুইটি সমবেতভাবে আপনাদের সেবা করিবার উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া, সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে, অদ্য শুভ নববর্ষ-দিবস হইতে উভয় প্রতিষ্ঠানের সমস্ত

শক্তি ও সম্পদ একত্র করিয়া উপরোক্ত ঠিকানায় নিম্নলিখিত নামে নূতন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল—

দি রিলায়েব্‌ল্‌ সিটি ফার্ণিচার্স।

উক্ত নব-গঠিত প্রতিষ্ঠানে আমরা উভয়েই আমাদের সমগ্র শক্তি ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করিয়া আপনাদের নির্দেশ পালনের জন্য সর্বতোভাবে প্রস্তুত আছি। এই সংযুক্তি-করণের ফলে আমাদের কারবারের উপরাঙ্গিক ব্যয় (Overhead cost) শতকরা প্রায় ৩০ ত্রিশ ভাগ হ্রাস পাইবে। সেই কারণে, আশা করি, বর্তমান প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক বাজারে আমরা পূর্বের তুলনায় অধিকতর সুলভে এবং অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত আপনাদের সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম হইব।

আশা করি, এই নব-গঠিত প্রতিষ্ঠানটি পূর্বের মতই আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করিয়া ধন্য হইবে। ইতি—

নিবেদক,

দি রিলায়েব্‌ল্‌ সিটি ফার্ণিচার্স।
দি রিলায়েব্‌ল্‌ ফার্ণিচার্স

পূর্বতন,

দি সিটি ফার্ণিচার্স

নমুনা: ১০। প্রতিষ্ঠানের স্থানান্তরীকরণ

৪১০, বহুবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৮।৫।৬২

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের মিলিত শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ফলে আমাদের প্রতিষ্ঠান যেভাবে দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাতে উপরোক্ত ঠিকানায় সুষ্ঠুভাবে কাজকর্ম নির্বাহ করা প্রায় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য, আগামী **১লা জুন, ১৯৬২ সাল** হইতে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে **৪১২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ** ভবনে স্থানান্তরিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। অতঃপর আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম এই নূতন ঠিকানা হইতে সম্পাদিত হইবে এবং অনুগ্রহ করিয়া আপনারা ১লা জুন হইতে উক্ত পরিবর্তিত ঠিকানাতেই আমাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবেন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

প্রসঙ্গত, ইহাও জানানো হইতেছে যে, এই স্থানান্তরীকরণ উপলক্ষে আমাদের প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজকর্ম আগামী ১৯শে মে হইতে ৩১শে মে পর্যন্ত সাময়িক-ভাবে বন্ধ থাকিবে। ইহার ফলে, আপনাদের যে সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে তাহার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ইতি—

নিবেদক,
নাগ এণ্ড নাগ কোং।

নমুনা: ১১। চাহিদা বৃদ্ধি ও সৃষ্টি

[ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রচারপত্রের প্রচলনই সর্বাধিক। বলা বাহুল্য যে প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক বাজারে ইহা অনিবার্য পরিণতি। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক বলিয়াই এই জাতীয়-পত্র রচনায় একটি বিষয়ে প্রত্যেকেরই সবিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এই জাতীয় পত্রের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে অন্যকে কিছু ব্যয় করিতে অনুরোধ করা—যদিও তাহার ভিত্তিতে আছে কোন কিছুর বিনিময়। কিন্তু ব্যবহার জগতে প্রায়ই দেখা যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার শ্রমলব্ধ অর্থ ব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ। জনসাধারণের এইরূপ মনোভাবকে দূর করিয়া স্বীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি ও সৃষ্টি করা খুবই যে কঠিন ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই জাতীয় অবস্থা অতিক্রম করিতে সাহায্য করে যে-জাতীয় প্রচারপত্র তাহা রচনা করিতে হইলে শিল্পগত (Artistic) প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হইবে।]

'হিন্দুস্থান বিল্ডিংস'
········চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউ
কলিকাতা।
১।১।৬২

মহাশয়,

আপনি কি জানেন যে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন বিষয়ে আপনার বহু কষ্টে অর্জিত সঞ্চয় হইতে যে অর্থ আপনি ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা কি প্রতিটি ক্ষেত্রেই একান্তভাবে অনিবার্য? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে, এই মুহূর্ত হইতেই চিন্তা করুন, কোন ব্যয়টি আপনার অনিবার্য এবং কোনটি তাহা নয়।

যে ব্যয় অনিবার্য নয়, নিঃসন্দেহে তাহা অপব্যয় এবং সেই অপব্যয়ের পরিমাণ আপাতদৃষ্টিতে যত স্বল্প বলিয়াই মনে হউক না কেন কোনক্রমেই তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। বিন্দু বিন্দু বারিকণা লইয়াই গড়িয়া উঠে মহাসমুদ্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণা লইয়াই গড়িয়া উঠে দেশ-মহাদেশ। যুগ যুগ ধরিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তির

বাস্তব জীবনবোধের ভিত্তি গড়িয়া উঠে। আমাদের প্রবাদেও তাই বলে, 'রাই কুড়িয়ে বেল'। সুতরাং দৈনন্দিন যে অপব্যয়কে আপনি এই মুহূর্তে নগণ্য বলিয়া মনে করিতেছেন, আপনার সমগ্র জীবনের পরিধির দিক হইতে বিচার করিলে তাহাকে নগণ্য তো বলা চলিবেই না উপরন্তু সেই অঙ্কের পরিমাণ আপনাকেই স্তম্ভিত করিয়া দিবে।

শুধু তাহা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আপনি যে অপব্যয় করিতেছেন তাহার পরিণতি কেবলমাত্র আপনারই ব্যক্তিগত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতেছে না। ব্যক্তিগত অপব্যয়ের চরম পরিণতি জাতীয় অপব্যয়। আর, দীর্ঘকাল শোষণে জর্জরিত জাতিকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে জাতীয় অপব্যয়ের সর্বপ্রকার পথ যে বন্ধ করিতে হইবে তাহা আপনার কাছে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

অতএব, এই মুহূর্ত হইতে আপনার ব্যক্তিগত অপব্যয়ের সমস্ত পথগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া আনুন এবং এইভাবে সঞ্চিত অর্থ, যত সামান্যই হউক না কেন, আপনার স্বার্থে, আপনার পারিবারিক স্বার্থে, আপনার জাতীর স্বার্থে, জাতীয় পরিকল্পনাগুলিকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য **জীবন-বীমায় বিনিয়োগ** করুন। ইতি—

নিবেদক,

ভারতীয় জীবন-বীমা কর্পোরেশন।

অনুশীলনী

নমুনায় উদ্ধৃত বিষয়গুলির **প্রত্যেকটিকে** অবলম্বন করিয়া নিজে ইচ্ছামত কয়েকটি পত্র রচনা করুন।

॥ বিক্রয়-প্রস্তাব এবং মূল্য-জিজ্ঞাসা ও মূল্য-জ্ঞাপন ॥
(Offers and Quotations)

কোন বিক্রেতা স্বীয় স্বার্থে ক্রেতার নিকট নিজের পণ্য বিক্রয়ের জন্য চেষ্টা করেন, অর্থাৎ **বিক্রয় প্রস্তাব** (Offer) করিয়া থাকেন। তেজী বাজারে এজন্য বিক্রেতাকে বিশেষ মাথা ঘামাইতে হয় না। সংবাদ পত্রে একটি বিজ্ঞাপন দিলেই তাঁহার কাজ চলিয়া যায়। কারণ, বাজারে টান থাকার ফলে ক্রেতা নিজেই আগ্রহ করিয়া বিক্রেতার নিকট মূল্য-জিজ্ঞাসার পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু, বাজারের অবস্থা যদি মন্দা থাকে, তাহা হইলে, বিক্রেতাই সম্ভাব্য ক্রেতাবৃন্দের

নিকট পণ্য বিক্রয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই ধরনের প্রস্তাবপত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকে।

(ক) বিক্রেয় পণ্যের বিবরণ,
(খ) উহার বিশেষ উপযোগিতা,
(গ) উহার মূল্য,
(ঘ) বাক্সবন্দী করার খরচ ও মাশুল,
(ঙ) অন্য কোন সর্তাদি থাকিলে তাহার উল্লেখ,
এবং (চ) বিক্রয় পণ্যের প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও মেরামতের সন্ধান প্রভৃতি।

নমুনা : ১।

প্রশ্ন : কোনও প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে বড় একটি লাইব্রেরীতে সুবিধাজনক সর্তে ভালো ভালো বই জোগান দিবার প্রস্তাব করিয়া একখানি পত্র লিখ।

[বর্ধমান বিশ্বঃ (মডিফায়েড) ১৯৬৩]

উত্তর—

চ্যাটার্জি পাবলিশার্স

প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট

গ্রাম : 'মৌলিক' কলি-১২।

ফোন : ২৪-২৪২৪ তাং—১৫।১।৬৪

গ্রন্থাগারিক,
নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

মহাশয়,

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিলাম যে, আপনারা আপনাদের গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যেই কিছু বর্ধিত করিতে চান। আপনাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুস্তক সরবরাহ করিবার আশাতেই এই পত্র প্রেরণ করিতেছি।

আমাদের প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ যোগ্যতা ও দায়িত্বের সহিত পুস্তক সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, আমরা স্বপ্রকাশিত পুস্তক ভিন্নও অন্যের প্রকাশিত পুস্তকও

সরবরাহ করিয়া থাকি। দেশী পুস্তক ভিন্ন বিদেশী পুস্তক সরবরাহ করার ব্যাপারেও আমাদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘকালের।

আপনাদের অবগতির জন্য ইহাও জানাইতেছি যে, গ্রন্থাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ যে-হারে কমিশন দিয়া থাকি তাহা দেশী পুস্তকের ক্ষেত্রে ১৫% শতকরা পনেরো ভাগ এবং বিদেশী পুস্তকের ক্ষেত্রে ১২½% শতকরা সাড়ে বারো ভাগ। এই ব্যাপারে বাজারে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, আমাদের প্রদত্ত কমিশনের হারই বাজারে সর্বোচ্চ। ইহা ব্যতীত ক্রেতার নিকট মাল পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্বও আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি।

এ সম্পর্কে আপনাদের আর কোন কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের পুস্তক-নির্বাচনের সুবিচারের জন্য আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের একটি তালিকা এই পত্রের সহিত পাঠানো হইল।

আশা করি, আমাদের এই প্রস্তাব, আপনারা সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আপনাদের উত্তরের আশায় অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীঅমলপ্রসাদ গুঁই

কর্মাধ্যক্ষ,

চ্যাটার্জি পাব্লিশার্স।

ক্রোড়পত্র

একটি প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা।

বর্তমান যুগের বাজার সুতীব্র প্রতিযোগিতার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং ক্রেতা মাত্রের পক্ষেই সেই প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। কোন একজন ক্রেতা যখন অন্যের পরিশ্রম বা পণ্য ক্রয় করিতে চান তখন তিনি উক্ত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহাদের পরিশ্রম বা পণ্যের **মূল্য জিজ্ঞাসা** করিয়া থাকেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তিনি সর্বনিম্ন দর পাইবেন সেই প্রতিষ্ঠানের সহিতই তিনি কাজ-কারবার করিবেন।

মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন—

(ক) যে জাতীয় শ্রম বা দ্রব্যের মূল্য জিজ্ঞাসা করা হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ;

(খ) মূল্য অনুকূল বিবেচিত হইলে কি পরিমাণ শ্রম বা দ্রব্য ক্রয় করা হইবে তাহার আভাস-দান; (কারণ, পরিমাণ অধিক হইলে বিক্রেতার তরফ হইতে সুলভ মূল্য প্রস্তাবের সম্ভাবনা থাকে);

(গ) সরবরাহকালে কোন বিশেষ ধরনের বাক্সবন্দী করার প্রয়োজন আছে কি না ;

(ঘ) পূর্বে কারবার করা হয় নাই এমন প্রতিষ্ঠানের নিকট মূল্য-জিজ্ঞাসাকালে পত্রলেখক নগদ মূল্যে কি ধারে মাল পাইতে ইচ্ছা করেন তাহার উল্লেখ ;

এবং (ঙ) সর্বনিম্ন মূল্য-জ্ঞাপনের অনুরোধ।

নমুনা ঃ ২।

দি করুণাময়ী স্টোর্স

প্রসিদ্ধ চীনামাটি ও কাচ-দ্রব্য বিক্রেতা এবং সরবরাহকারী

৫৪০, বি. সি. রোড

বড়বাজার, বর্ধমান।

১।৬।৬২

দি ইস্টার্ণ পটারীজ লিঃ,
৫০, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা।

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের ব্যবসায়-সম্পর্কিত প্রয়োজনে অবিলম্বে পাঁচশতটি প্রমাণ সাইজের কাচের টী-সেটের প্রয়োজন। উক্ত পরিমাণ মাল আপনারা সর্বনিম্ন কি মূল্যে সরবরাহ করিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া যথাশীঘ্র জানাইলে বাধিত হইব। প্রসঙ্গত, ইহাও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, আপনাদের প্রদত্ত সর্বনিম্ন মূল্য আমাদের নিকট অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইলে আমরা আরও অধিকসংখ্যক মাল ক্রয় করিতে পারি। সেই সঙ্গে, আপনাদের অবগতির জন্য ইহাও জানানো হইতেছে যে, লেন-দেন করার ব্যাপারে আমরা সব সময়েই নগদ মূল্যে কারবার করার পক্ষপাতী।

যদি আপনাদের প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতেই মাল ক্রয় করা স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে, উহার সরবরাহ সম্পর্কে আপনাদের নিকট আমাদের এই কয়টি অনুরোধ রহিল—

(ক) মাল বাক্সবন্দী করিবার সময় প্রতিটি টী-সেট কাগজের টুকরায় জড়াইয়া অনুগ্রহপূর্বক স্বতন্ত্র এক একটি কার্ডবোর্ডের প্যাকেটে রাখিবেন এবং এইরূপ দশটি প্যাকেট এক একটি কাঠের বাক্সের তলায় কাঠের গুঁড়া দিয়া বাক্সবন্দী করিবেন ; এবং

(খ) কলিকাতা হইতে বর্ধমানের দূরত্ব যেহেতু খুব বেশি নয়, সেইহেতু রেলে মাল না পাঠাইয়া ভ্যান অথবা লরীতে করিয়া পাঠাইবেন। কারণ, রেলে

পাঠাইলে একদিন যেমন বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা আছে, তেমনই অন্য দিকে মালের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনাও সমধিক—যাহা আপনাদের এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই অনভিপ্রেত।

সত্বর পত্রের উত্তর দান করিয়া, আশা করি, আমাদের বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মালিক,
স্বত্বাধিকারী,
দি করুণাময়ী স্টোর্স।

কোন ব্যবসায়ী ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র-প্রাপ্তির উত্তরে শ্রম বা পণ্যের মূল্য জানাইয়া যে পত্র লিখিয়া থাকেন তাহাকেই **মূল্য-জ্ঞাপন** পত্র বলা হয়। এই জাতীয় পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন—

(ক) যে জাতীয় শ্রম বা দ্রব্যের মূল্য জ্ঞাপন করা হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ;

(খ) ক্রেতার অনুরোধ অনুযায়ী বাক্সবন্দী করিতে হইলে স্বতন্ত্র ব্যয় আবশ্যক কি না;

(গ) ক্রেতার অনুরোধ অনুযায়ী সরবরাহ করিতে হইলে ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব কাহার, তাহার উল্লেখ;

এবং (ঘ) ক্রেতা ধারে মাল গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে মূল্য পরিশোধের সর্ত।

এই শ্রেণীর পত্র কখনও কখনও 'পুনশ্চ' দিয়া শেষ করিবার প্রয়োজন অনিবার্য হইয়া পড়ে। এ সম্পর্কে 'বৈষয়িক পত্র রচনা সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়'—এ 'পুনশ্চ' পর্যায়ে যে-আলোচনা করা হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য।

নমুনা: ৩।

দি ইস্টার্ণ পটারীজ লিঃ

গ্রাম: ইপ্‌টা।
ফোন: ৩৪-৩৩৪৪

৫০, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড্,
কলিকাতা।

৭।৬।৬২

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মালিক,
স্বত্বাধিকারী,
দি করুণাময়ী স্টোর্স,
৫৪০, বি. সি. রোড,
বড়বাজার, বর্ধমান।

পূর্বসূত্র ঃ আপনার ১।৬।৬২ তারিখে লিখিত মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র।

মহাশয়,

অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমরা আপনার উল্লিখিত পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া জানাইতেছি যে, উক্ত পরিমাণ মাল সম্পর্কে আপনার নির্দেশনামা প্রাপ্তি মাত্রই আমরা অবিলম্বে উহা পাঠাইতে সক্ষম হইব।

এই প্রসঙ্গে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে জানানো যাইতেছে যে, আমাদের নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র হইতে মাল গ্রহণ করিলে সর্বনিম্ন দর হইবে নিম্নস্বরূপ :—

খুচরা প্রতিটি টী-সেটের মূল্য···· ···· ···· ···· ১২৲
পাইকারী প্রতি ১০০টি ,, ,, টা. ১১৲ হিঃ ···· মোট ···· ১১০০৲
,, ,, ৫০০টি ,, ,, টা. ১০·৫০ প. হিঃ ,, ···· ৫২৫০৲
,, ,, ১০০০টি ,, ,, টা. ১০·২৫ প. হিঃ ,, ···· ১০২৫০৲

উপরন্তু ইহাও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, নগদ মূল্যে পাইকারী হিসাবে মাল ক্রয় করা হইলে আমাদের প্রতিষ্ঠান হইতে শতকরা দশ টাকা কমে উহা বিক্রয় করা হয়।

প্রসঙ্গত, আপনাকে জানাইতেছি যে, খুচরা মাল বিক্রয়কালে আমরা নিজেরাই প্রতিটি সেটের জন্য প্যাকেট-খরচা বহন করি এবং পাইকারীভাবে মাল সরবরাহ-কালে শুধুমাত্র কাঠের বাক্সে বাক্সবন্দী করার খরচটুকুই আমাদের। কিন্তু, উক্ত পত্রে আপনি যে-ভাবে আমাদের মাল সরবরাহ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাহাতে প্রতিটি টী-সেট বাক্সবন্দী করার যে খরচ তাহা আপনাকেই বহন করিতে হইবে এবং এজন্য প্রতি টী-সেট পিছু তালিকাতিরিক্ত ২৫ পয়সা করিয়া মূল্য পড়িবে।

উক্ত পত্রানুযায়ী ইহাও আপনাকে জানানো হইতেছে যে, আমাদের বিক্রয়কেন্দ্র হইতে মাল গ্রহণ না করিলে পরিবহন-খরচ সম্পূর্ণভাবে ক্রেতৃপক্ষেরই।

আমাদের এই মূল্য-জ্ঞাপন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া সত্বর নির্দেশনামা পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদন,
শ্রীপ্রিয়নাথ সেন,
ম্যানেজার
দি ইস্টার্ণ পটারীজ্ লিঃ।

অনুশীলনী

১। আপনাদের পুরাতন ক্রেতা দীর্ঘকাল আপনাদের সহিত কাজ-কারবার করিবার পর হঠাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিজন্য তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য এবং পুনরায় তাঁহাদের নির্দেশপত্র লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রস্তাব প্রদান করিয়া পত্র রচনা করুন।

২। আপনাদের কলেজের ম্যাগাজিন ছাপিবার জন্য ছাপাখানার নিকট মূল্য জিজ্ঞাসা করিয়া একটি পত্র রচনা করুন।

৩। হাওড়া রোটারী ক্লাবের বার্ষিক ভোজে সদস্য ও অতিথি মিলিয়া প্রায় তিনশত জন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবেন। এই উপলক্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে পরিবেশনীয় বিভিন্ন দফা খাদ্যের উল্লেখ করিয়া গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের নিকট একটি মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র প্রেরণ করুন।

৪। আপনার কারখানা হইতে এমন একটি পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয় যাহার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপর সরকারী কর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার ফলে আপনার উৎপাদিত পণ্য দ্রব্যের উৎকর্ষ যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপনি উহার মূল্য বৃদ্ধি করাই স্থির করিয়াছেন। অতঃপর এই সংবাদ জানাইয়া আপনি আপনার ক্রেতৃবৃন্দের নিকট পত্র প্রেরণ করুন।

৫। আপনার কারখানার জন্য বিদেশ হইতে আপনি এমন একটি যন্ত্রের আমদানি করিয়াছেন যাহার ফলে আপনি ব্যয় সঙ্কোচ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে আপনার উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও আপনার পক্ষে উহার মূল্য হ্রাস করা সম্ভবপর হইয়াছে। অতঃপর আপনার ক্রেতৃবৃন্দকে এই সংবাদ জানাইয়া পত্র রচনা করুন।

৬। উপরের ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তরে দুইখানি স্বতন্ত্র মূল্য-জ্ঞাপন পত্র রচনা করুন।

॥ নির্দেশ প্রেরণ, গ্রহণ, পালন, প্রত্যাখ্যান ও বাতিল ॥

(Orders and Confirmation, Execution, Refusal and Cancellation of Orders)

বিক্রেতার নিকট হইতে মূল্য-জ্ঞাপন পত্র পাইবার পর ক্রেতা যখন পণ্য প্রেরণ করিবার নির্দেশ দিয়া বিক্রেতাকে পত্র দিয়া থাকেন তখন তাহাকে **নির্দেশ-পত্র** বা **নির্দেশনামা** (Orders) বলে। এইরূপ পত্র সাধারণত তিন

দফা করা হয়; মূল পত্রখানি বিক্রেতার নিকট প্রেরণ করা হয়, একখানি প্রতিষ্ঠানের নথিভুক্ত থাকে এবং অন্যটি মাল বুঝিয়া লইবার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে যায়।

নির্দেশ-পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন—

(ক) যে পণ্য সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রেরণ করা হইতেছে তাহার বিশদ বিবরণ। মূল্য-জিজ্ঞাসা বা মূল্য-জ্ঞাপন পত্রে ইহার উল্লেখ থাকিলেও সুষ্ঠুভাবে কার্যনির্বাহ করার জন্য নির্দেশ-পত্রে ইহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন আছে।

(খ) পণ্যের মূল্য।

(গ) পূর্ব হইতে কোন বন্দোবস্ত না থাকিলে মূল্য প্রদানের উপায়।

(ঘ) সরবরাহ করিবার সময়।

(ঙ) পূর্ব হইতে কোন বন্দোবস্ত না থাকিলে পণ্য-সরবরাহের উপায়।

(চ) পূর্ব হইতে কোন বন্দোবস্ত না থাকিলে মাল বাক্সবন্দী করা, বীমা করা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ।

নমুনা : ১।

দি করুণাময়ী স্টোর্স

প্রসিদ্ধ চীনামাটি ও কাঁচ-দ্রব্য বিক্রেতা ও সরবরাহকারী

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, ৫৪০, বি. সি. রোড,
ম্যানেজার, বড়বাজার, বর্ধমান।
দি ইস্টার্ণ পটারীজ লিঃ ১৫।৬।৬২
৫০, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা।

পূর্বসূত্র : আপনাদের ৭।৬।৬২ তারিখে লিখিত মূল্য-জ্ঞাপন পত্র।

আমাদের সূচক সংখ্যা : নির্দেশ/ক-টী/৭১২।৬২

মহাশয়,

আপনাদের উল্লিখিত পত্রের জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন এবং পাঁচশতটি প্রমাণ সাইজের কাচ-নির্মিত টী-সেট লরীযোগে আমাদের উপরোক্ত ঠিকানায় আগামী ২৫।৬।৬২ তারিখের মধ্যে অনুগ্রহপূর্বক পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন।

উক্ত পরিমাণ মালের জন্য মোট মূল্য টা. ৫২৫০৲ পাঁচ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা হইতে আপনাদের শতকরা দশ টাকা হিসাবে প্রদত্ত কমিশন বাবদ টা. ৫২৫৲ পাঁচশ পঁচিশ টাকা বাদ দিয়া নগদ টা. ৪৭২৫৲ চার হাজার সাত শত পঁচিশ টাকা মাল

সরবরাহকালে অকুস্থলে আপনাদের প্রতিনিধির হস্তে দেওয়া হইবে। উক্ত পরিমাণ টাকা আপনারা যদি স্টেট-ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার উপর প্রদত্ত চেক্ মারফৎ গ্রহণ করিতে চান, তাহা হইলে তাহাও আমাদের অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়া দিবেন।

ইহা ভিন্ন, আমাদের ১।৬।৬২ তারিখে আপনাদের নিকট লিখিত মূল্য-জিজ্ঞাসা পত্র অনুযায়ী আপনারা আপনাদের উপরোক্ত পত্রে মাল বাক্সবন্দী ও সরবরাহ করা সম্পর্কে যে সর্তাদি আরোপ করিয়াছেন তাহাও আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু প্রসঙ্গত, ইহাও জানাইয়া রাখিতেছি যে, আপনাদের প্রেরিত মালের মধ্যে যদি কিছু দাগী অথবা ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে, উহার পরিবর্তে অক্ষত মাল প্রেরণ করিবার দায়িত্ব ও ব্যয়ভার সম্পূর্ণভাবে আপনাদেরই উপর বর্তাইবে। এতদ্‌ব্যতীত, আমাদের নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মাল যদি না পৌঁছায়, তাহা হইলে, আপনারা প্রতিদিন বিলম্বের জন্য টা. ২৫৲ পঁচিশ টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

অনুগ্রহপূর্বক, উপরোক্ত সর্তে নির্দেশগ্রহণ স্বীকার করিয়া সত্বর পত্রদানে বাধিত করিবেন। উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মালিক,
স্বত্বাধিকারী,
দি করুণাময়ী স্টোর্স

ক্রেতার নিকট হইতে নির্দেশপত্র পাঠাইবার পর বিক্রেতা যদি উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী মাল পাঠাইতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে নির্দেশ গ্রহণ পূর্বক ক্রেতার নিকট যে-পত্র প্রেরণ করেন তাহাকেই **নির্দেশ-গ্রহণ** (Confirmation of Orders) পত্র বলা হইয়া থাকে। ক্রেতার নিকট হইতে নির্দেশ-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ পত্র পাঠাইতে হয়। ইহার প্রয়োজন শুধুমাত্র শিষ্টাচার-প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও ইহার গুরুত্ব সমধিক। এইরূপ পত্র বিলম্ব করিয়া পাঠাইলে, প্রথমত, বিক্রেতা-প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং ইহার ফলে, ব্যবসায় ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির সম্ভাবনা বহুলাংশে ব্যাহত হইয়া যায়। দ্বিতীয়ত, এই জাতীয় বিলম্বের ফলে ক্রেতাকে অহেতুক উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হয়। কারণ, ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হইতে যতক্ষণ না এই জাতীয় পত্র পাইতেছেন, ততক্ষণ তিনি বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী মাল সরবরাহ করা হইবে কি না। এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় ক্রেতার পক্ষে তাঁহার পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ক্রেতা তখন

নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অন্যত্র মাল পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারেন।

তবে, যে-সমস্ত ক্ষেত্রে নির্দেশপত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিক্রেতা মাল পাঠাইয়া দেন, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ-গ্রহণ-স্বীকৃতিমূলক পত্র না পাঠাইলেও চলে। এইরূপ ক্ষেত্রে নির্দেশ-পালন পত্রই নির্দেশ-গ্রহণ-স্বীকৃতির কাজ করিয়া থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, যেহেতু নির্দেশ-পত্রের উত্তরে এই শ্রেণীর পত্র লিখিত হয়, সেইজন্য, ইহারা অন্য নিরপেক্ষভাবে লিখিত হইতে পারে না। আর, সেই কারণেই, নির্দেশ-পত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী ইহাদের প্রকৃতিটি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। উপরের নির্দেশ-পত্রটির উপর ভিত্তি করিয়া নির্দেশ-গ্রহণের সম্ভাব্য কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হইল।

নমুনা ঃ ২ক।

সাধারণ নির্দেশ-গ্রহণ পত্র

[বিক্রেতা যদি ক্রেতার নির্দেশটি যথাযথভাবে পালন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন, তাহা হইলে, সেই শ্রেণীর পত্রকে এই পর্যায়ভুক্ত করা চলে।]

দি ইস্টার্ণ পটারীজ্ লিঃ

গ্রাম ঃ ইপ্টা।
ফোন ঃ ৩৪-৩৩৪৪

৫০, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড
কলিকাতা।
১৮।৬।৬২

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মালিক,
স্বত্বাধিকারী,
দি করুণাময়ী স্টোর্স
৫৪, বি. সি. রোড্
বড়বাজার, বর্ধমান।

পূর্বসূত্র ঃ আপনাদের ১৫।৬।৬২ তারিখে লিখিত
নির্দেশ-পত্র সংখ্যা ঃ নির্দেশ/ক-টী/৭১২।৬২
সূচক সংখ্যা ঃ নি-গ্র/৩০৪৫/ডী

মহাশয়,

আপনাদের ১৫।৬।৬২ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশের জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিবার সর্বপ্রকার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিলাম এবং ২৫।৬।৬২ তারিখে

সরবরাহ করার ব্যাপারে যাহাতে কোনপ্রকার ত্রুটি না হয় সেদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রহিল।

আপনাদের নির্দেশ-পত্রে উল্লিখিত সর্তসমূহ আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত। তবে, প্রসঙ্গত, ইহাও উল্লেখ করা যাইতেছে যে, আমাদের প্রেরিত মালের মধ্য হইতে যদি কিছু দাগী বা ভাঙ্গা বাহির হয়, তাহা হইলে, উহা সরবরাহকাল হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে না পৌছাইলে এ সম্পর্কে আমাদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না।

লেনদেনের ব্যাপারটি চেক মারফৎ হওয়াই নিরাপদজনক। সুতরাং মাল সরবরাহ করিবার জন্য আমাদের যে প্রতিনিধিকে প্রেরণ করা হইবে তাঁহার নিকট আমাদের নামে স্টেট ব্যাঙ্কের উপর রেখাঙ্কিত চেক কাটিয়া দিলে বাধিত হইব।

আপনাদের এই নির্দেশের জন্য পুনরায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং আশা করিতেছি যে, ভবিষ্যতেও অনুরূপ নির্দেশ দান করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করিবেন। আপনাদের ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীপ্রিয়নাথ সেন,
দি ইস্টার্ণ পটারীজ্ লিঃ।

নমুনা ২খ। পূর্ণ বিবরণ জিজ্ঞাসাভিত্তিক নির্দেশ গ্রহণ পত্র

['সাধারণ নির্দেশ-গ্রহণ পত্র' তখনই লেখা হইয়া থাকে যখন নির্দেশ-পত্র অনুযায়ী মাল পাঠাইতে বিক্রেতার কোন দিক হইতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু নির্দেশ-পত্র ত্রুটিপূর্ণ হইলে মাল সরবরাহকালে বিক্রেতাকে যখন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, তখন তিনি ক্রেতার নিকট এই শ্রেণীর পত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন। যেমন,—]

(শিরোনামা ইত্যাদি পূর্ববৎ)

আপনাদের উক্ত নির্দেশ-পত্রটি পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং এজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনাদের উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী পাঠাইবার মত মাল আমাদের মজুত আছে এবং উহা আমরা ২৫।৬।৬২ তারিখের মধ্যে সরবরাহ করিতেও সক্ষম। কিন্তু ওই পাঁচ শতটি টী-সেটের মধ্যে কতগুলি কোন্ রঙের হইবে, অথবা, যদি সবগুলিই এক রঙের হয়, তাহা হইলেই বা রঙটি কিরূপ হইবে, তাহার উল্লেখ উক্ত নির্দেশ পত্রে না থাকায়

আমরা এই মুহূর্তেই মাল পাঠাইতে পারিতেছি না। অবশ্য, আমরা নিজেরাই রঙ পছন্দ করিয়া মাল পাঠাইতে পারিতাম; তাহাতে আপনাদের অসুবিধা হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া আমরা সেই পথ গ্রহণ করিলাম না। প্রসঙ্গত, উল্লেখযোগ্য এই যে, আপনাদের নির্দেশ অনুসারে মাল সরবরাহ করিবার মত সব রঙের টী-সেট আমাদের মজুত আছে এবং রঙের পার্থক্য মূল্যের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করিবে না। এখন এ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত জানিতে পারিলেই আমরা মাল পাঠাইয়া দিব।

(চিঠির বাকি অংশ 'নমুনা : ২ক'-এর মত)

নমুনা : ২গ। অতিরিক্ত সময় প্রার্থনা করিয়া নির্দেশ-গ্রহণ পত্র

[নির্দেশ-পত্রে যদি ক্রেতা মালের পূর্ণ বিবরণ দিয়া থাকেন এবং সেই অনুযায়ী মাল যদি বিক্রেতার নিকট ঠিক সেই মুহূর্তে মজুত না থাকে, তাহা হইলে, নির্দেশ অনুযায়ী মাল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে অতিরিক্ত সময় প্রার্থনা করিয়া নির্দেশ-গ্রহণ পত্র লিখিতে পারেন। যেমন, ধরা যাক, 'নমুনা : ১'-এর ক্ষেত্রে 'করুণাময়ী স্টোর্স্' 'ইস্টার্ণ পটারীজ্'-কে জানাইতেছেন যে, তাঁহাদের নিম্নলিখিতভাবে মাল সরবরাহ করা হোক—

১। হালকা সবুজ রঙের টী-সেট—২০০
২। " নীল " " —২০০
৩। সাদা " " —১০০

মোট টী-সেট—৫০০

এক্ষেত্রে, 'ইস্টার্ণ্ পটারীজ্'-এর নিকট ক্রেতার নির্দেশ অনুযায়ী মাল যদি মজুত না থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাদের নির্দেশ গ্রহণ-পত্রটি হইবে এইরূপ—]

(শিরোনামা ইত্যাদি পূর্ববৎ)

আপনাদের উক্ত নির্দেশ পত্রটি পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং এজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

উক্ত নির্দেশ-পত্র অনুসারে আপনাদের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি যে, আপনারা যে-রঙের যতগুলির জন্য নির্দেশ দিয়াছেন ঠিক সেই অনুযায়ী মাল আমাদের বর্তমানে মজুত নাই। প্রথম ও তৃতীয় দফার ক্ষেত্রে আপনাদের নির্দেশ অনুযায়ী মাল সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া উহা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব না বলিয়াই আশঙ্কা করি। আপনাদের নির্দেশ-পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই

যদিও আমরা মাল প্রস্তুত করিতে সুরু করিয়াছি, তবুও উহা ২৫।৬।৬২ তারিখের মধ্যে তৈয়ারী হইবে বলিয়া আশা হয় না। এমতাবস্থায় সরবরাহকাল আরও এক সপ্তাহ বাড়াইয়া দিবার জন্য আপনাদের অনুরোধ জানাইতেছি।

সুতরাং, অনুগ্রহপূর্বক ২।৭।৬২ তারিখ পর্যন্ত যদি আপনারা সরবরাহ লইতে স্বীকৃত থাকেন তাহা হইলে সত্বর পত্রের উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। নিশ্চিত জানিবেন যে, উক্ত তারিখের মধ্যে আমরা মাল অবশ্যই সরবরাহ করিতে সক্ষম হইব। ধন্যবাদান্তে—ইত্যাদি।

ক্রেতার নির্দেশ অনুযায়ী মাল পাঠাইবার সময় যে পত্র বিক্রেতার তরফ হইতে লিখিত হয় তাহাকে **নির্দেশ-পালন** (Execution of Order) পত্র বলা হয়। এই শ্রেণীর পত্রে, সাধারণত, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকে—

(ক) পণ্যের বিবরণ,
(খ) সরবরাহের তারিখ ও পরিবহণ-ব্যবস্থা,
(গ) মূল্য-প্রদানের প্রণালী, এবং
(ঘ) নির্দেশের জন্য ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও পুনরায় নির্দেশ প্রদান করিতে অনুরোধ।

যদি কখনও কোন নির্দেশ আংশিকভাবে পালন করা হয়, তাহা হইলে, নির্দেশ-পালন পত্রে উহার উল্লেখ করিয়া বাকি অংশ কবে পালিত হইবে তাহা বিনীতভাবে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

'করুণাময়ী স্টোর্স'-র নির্দেশ-পত্রটি উপরোক্ত '২গ'-এর [ ] চিহ্নিত অংশের অনুরূপভাবে লিখিত হইলে, উহার সম্ভাব্য নির্দেশ-পালন পত্র এইরূপ হইতে পারে—

নমুনা ৩ক। সম্পূর্ণভাবে নির্দেশ পালন পত্র

দি ইস্টার্ণ পটারীজ্, লিঃ

গ্রাম : ইপ্‌টা
ফোন : ৩৪-৩৩৪৪

৫০, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড্,
কলিকাতা।
২৫।৬।৬২

দি করুণাময়ী স্টোর্স্,
৫৪০, বি. সি. রোড্,
বড়বাজার, বর্ধমান।

পূর্বসূত্র : আপনাদের ১৫।৬।৬২ তারিখে লিখিত নির্দেশ-পত্র সংখ্যা :

নির্দেশ/ক—টী/৭১২/৬২

সূচক সংখ্যা : নি—পা/২০৪৮/৬২

সবিনয় নিবেদন,

আপনার উপরোক্ত নির্দেশ-পত্র অনুযায়ী নিম্নোক্ত মালগুলি অগ্ন প্রেরিত হইল-

দফা	মালের বিবরণ	সংখ্যা	মূল্য
১।	হালকা সবুজ রঙের টী-সেট	২০০	টা. ২১০০৲
২।	,, নীল ,, ,,	২০০	টা. ২১০০৲
৩।	— সাদা ,, ,,	১০০	টা. ১০৫০৲
		মোট ৫০০	টা. ৫২৫০৲
	১০% শতকরা দশ হিসাবে কমিশন বাদ		—টা. ৫২৫৲
		মোট দেয়	টা. ৪৭২৫৲

মালের মূল্য বাবদ টা. ৪৭২৫৲ আমাদের নামে স্টেট ব্যাঙ্কের উপর রেখাঙ্কিত চেক কাটিয়া আমাদের প্রতিনিধি শ্রীহরিহর সাধুর নিকট অনুগ্রহপূর্বক দিয়া দিবেন। ইহা ভিন্ন, পরিবহণ খরচ বাবদ টা. ২৭৫৲ এবং বাক্সবন্দী খরচ বাবদ টা. ১২৫৲, একুনে টা. ৪০০৲ নগদও শ্রীসাধুর হস্তে দিয়া দিবেন।

আপনাদের এই নির্দেশের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং আশা করিতেছি যে, ভবিষ্যতেও আপনাদের মাল সরবরাহ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে বঞ্চিত হইব না।

ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীপ্রিয়নাথ সেন
ম্যানেজার,
দি ইস্টার্ন পটারীজ্ লিঃ।

নমুনা : ৩খ। আংশিক নির্দেশ-পালন পত্র

(শিরোনামা ইত্যাদি যথাপূর্ব)

আপনাদের উপরোক্ত নির্দেশ-পত্র অনুযায়ী নিম্নোক্ত মালগুলি অদ্য প্রেরিত হইল—

হালকা সবুজ রঙের টী-সেট ২০০টি
— সাদা „ „ ১০০টি
মোট টী-সেট ৩০০টি

অপ্রত্যাশিত চাহিদার জন্য গত সপ্তাহেই হালকা নীল রঙের টী-সেট সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে এবং আমরা ইতিমধ্যেই মাল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু উহা বাজারে বাহির করিতে এখনও এক সপ্তাহ সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য, বিলম্বে আপনাদের ক্ষতি হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া যে-মাল আমাদের মজুত আছে তাহাই পাঠাইলাম। বাকি মাল অবশ্যই এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠাইব এবং কোনক্রমেই তাহার অন্যথা হইবে না।

মূল্য বাবদ টাকা দ্বিতীয় দফায় যখন মাল প্রেরিত হইবে তখন দিলেই চলিবে। বলা বাহুল্য যে, দ্বিতীয় দফায় মাল প্রেরণ করিবার জন্য পরিবহণ বাবদ যে খরচ হইবে তাহা আমরাই বহন করিব।

সম্পূর্ণভাবে মাল সরবরাহ করিতে পারিলাম না বলিয়া আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য, আশা করি, অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

ইত্যাদি।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সময় সময় এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন বাধ্য হইয়া বিক্রেতাকে **নির্দেশ প্রত্যাখ্যান** (Refusal of Orders) করিতে হয়। সাধারণত, আইনঘটিত বাধা, ক্রেতার উপর বিক্রেতার অবিশ্বাস এবং ত্রুটিপূর্ণ নির্দেশের ফলেই এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়।

আইনঘটিত বাধার ক্ষেত্রে বিক্রেতার কর্তব্য হইতেছে, সেই বাধার স্বরূপটি ক্রেতাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া ও তদনুযায়ী কার্য করিতে পরামর্শ দেওয়া। মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে ক্রেতার উপর অবিশ্বাস থাকিলে, বিক্রেতা সরাসরি ভাবে মাল পাঠাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ না করিয়া প্রেরিতব্য মালের জন্য অগ্রিম মূল্য দাবী করিতে পারেন। আর, অনিয়মিত ক্রেতা যদি প্রেরিতব্য মালের জন্য কোনরূপ বায়না না দিয়াই মাল পাঠাইবার জন্য নির্দেশ পাঠান, তাহা হইলে, বিক্রেতা এক্ষেত্রেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করিয়া উহা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিতে পারেন। মোট কথা,

আইনঘটিত বাধা ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রেতাকে কথনই বিক্রেতার সরাসরি প্রত্যাখ্যাত করা উচিত নয়। যেমন, উপরে ১নং নমুনার নির্দেশ অনুযায়ী বিক্রেতা এইভাবে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—

নমুনা : ৪।

(শিরোনামা ইত্যাদি যথাপূর্ব)

আপনার উপরোক্ত নির্দেশ-পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রসঙ্গত, আপনার অবগতির জন্য নিবেদন করা যাইতেছে যে, ব্যবসায়-জগতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আমরাও নির্দেশ-পালনের পূর্বে ১০% শতকরা দশ টাকা হিসাবে মূল্য অগ্রিম লইয়া থাকি। আমাদের প্রেরিত মূল্য-তালিকানুসারে পাঁচশতটি টী-সেটের মোট মূল্য হইতেছে টা. ৫২৫০৲ পাঁচ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা। সুতরাং আপনার নির্দেশ অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিতে হইলে অবিলম্বে টা. ৫২৫৲ পাঁচ শত পঁচিশ টাকা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। উক্ত পরিমাণ টাকা আমাদের নিকট পৌছাইলেই আমরা আপনাদের নির্দেশমত মাল সরবরাহ করিবার জন্য সর্বপ্রকার যত্ন লইব।

বলা বাহুল্য যে, ব্যবসায়-জগতের চিরাচরিত রীতি অনুসারে এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ীই আপনাদের এইরূপ পত্র লিখিতেছি এবং আপনাদের নির্দেশ-পত্র প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই মাল পাঠাইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। ধন্যবাদান্তে—

ইত্যাদি।

ক্রেতা বিক্রেতাকে মাল পাঠাইবার জন্য নির্দেশ দিয়া পরে যখন উহা বাতিল করিয়া পত্র লেখেন, তখন তাহাকে **নির্দেশ-বাতিল** (Cancellation of Orders) পত্র বলা হয়। নির্দিষ্ট মালের বাজার-মূল্য অত্যধিক হ্রাস পাইলে, অথবা ক্রেতা যে গ্রাহক বা গ্রাহক-সম্প্রদায়ের জন্য মাল পাঠাইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি বা তাঁহারা দেউলিয়া হইলে বা নির্দেশ বাতিল করিলে, অথবা ক্রেতা অন্য কোন স্থান হইতে আকস্মিকভাবে অধিকতর সুলভ মূল্যে মাল পাইলে এইরূপ পত্র রচনার প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরবরাহ না করার জন্যও নির্দেশ বাতিল করা হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বাতিল পত্রে বিশেষভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিবে—

(ক) নির্দেশ বাতিল করার কারণ, এবং

(খ) নির্দেশ-বাতিল-জনিত বিক্রেতার সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের আশ্বাসদান।

বলা বাহুল্য এইরূপ পত্র নির্দেশ পালন করিবার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই বিক্রেতার নিকট পৌছানো চাই। নচেৎ ইহার জন্য ক্রেতাকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে, হাতে যদি বিশেষ সময় না থাকে, তাহা হইলে তারযোগে ক্রেতাকে নির্দেশ বাতিল করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ তারের সমর্থন করিয়া পত্রাকারে নির্দেশ বাতিল করা প্রয়োজন। যেমন—

নমুনা : ৫। বিলম্বের জন্য বাতিল

দি করুণাময়ী স্টোর্স্

প্রসিদ্ধ চীনামাটি ও কাঁচ-দ্রব্য বিক্রেতা ও সরবরাহকারী

৫৪০, বি. সি. রোড্

বড়বাজার, বর্ধমান।

ম্যানেজার

দি ইস্টার্ণ পটারীজ্ লিঃ

৫০, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড্,

কলিকাতা।

পূর্বসূত্র : আপনাদের ১৮।৬।৬২ তারিখে লিখিত

পত্রসংখ্যা : নি-গ্র/৩০৪৫/ভুই

মহাশয়,

আমাদের ১৫।৬।৬২ তারিখে লিখিত নির্দেশ-পত্র সংখ্যা : নির্দেশ/ক-টী/ ৭১২।৬২ অনুযায়ী আপনারা উপরোক্ত পত্রে ২৫।৬।৬২ তারিখের মধ্যেই আমাদের পূর্ব নির্দেশমত মাল পাঠাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। অথচ, উক্ত তারিখের মধ্যে মাল এখানে আসিয়া না পৌছানোর ফলে আমাদের গ্রাহকবৃন্দের নিকট কথার খেলাপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ইহাতে আমাদের ব্যবসায়িক সুনামও ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা সমধিক।

অতএব বাধ্য হইয়াই আমরা আমাদের পূর্বের নির্দেশ এই পত্র মারফত বাতিল করিয়া দিতেছি। প্রসঙ্গত, ইহাও জানাইয়া দিতেছি যে, অতঃপর এখানে মাল পৌছিলে তাহা গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য থাকিব না। ইতি—

নিবেদক,

ইত্যাদি।

নমুনা

১। দার্জিলিং হইতে একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী কলিকাতার কোন একটি বস্ত্রোৎপাদন-কারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ১০০০ খানি কাপড় রেলযোগে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। পত্রখানি রচনা করুন।

২। উপরোক্ত নির্দেশ-পত্রটি পাইয়া বিক্রেতা দেখিলেন যে, উহাতে কতগুলি শাড়ি এবং কতগুলি ধুতি বা উহাদের সাইজই বা কিরূপ হইবে তাহার উল্লেখ নাই। অতঃপর বিক্রেতার দিক হইতে একটি নির্দেশগ্রহণ পত্র রচনা করুন।

৩। 'শিবদুর্গা বস্ত্রালয়' বিশেষ এক ধরনের গরম কাপড় পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া 'মোহিনী বস্ত্রালয়'কে একটি পত্র লিখিয়াছেন। মোহিনী বস্ত্রালয়ে ঠিক সেই ধরনের গরম কাপড় না থাকিলেও অন্য ধরনের গরম কাপড় আছে। অতঃপর মোহিনী বস্ত্রালয়ের যাহা করা উচিত তাহা স্থির করিয়া একটি পত্র রচনা করুন।

৪। ১নং প্রশ্নের নির্দেশ-পত্রটির উপর ভিত্তি করিয়া একটি নির্দেশ পালন-পত্র রচনা করুন।

৫। আপনার প্রতিষ্ঠানের নিকট এমন একটি প্রতিষ্ঠান ধারে মাল পাঠাইবার জন্য নির্দেশ-পত্র পাঠাইয়াছেন, যাহার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া আপনি জানিয়াছেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান বিশ্বাসযোগ্য নয়। অতঃপর কিভাবে আপনি পত্র রচনা করিবেন তাহা দেখাইয়া দিন।

৬। আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে আপনার গ্রাহক সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ এক ধরনের মাল উহার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু পরে দেখিলেন যে, আপনার গ্রাহক সম্প্রদায় ঠিক সেই ধরনের মাল লইতে চান না বটে, তবে অন্য ধরনের মাল লইতে চান। অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠানটির নিকট যেভাবে আপনার পত্র পাঠানো উচিত তাহার আদর্শটি দেখাইয়া দিন।

৭। কোন বিদেশী কোম্পানিকে একলক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রশিল্পের জন্য বিদ্যুৎ-চালিত বয়নযন্ত্র সরবরাহের নির্দেশ দিয়া একখানি পত্র লিখুন।

[বর্ধঃ বিশ্বঃ (মডিফায়েড)—১৯৬৪]

প্রতিবাদ, দাবী ও মীমাংসা

[Complaints, Claims and Adjustments]

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভুল-ভ্রান্তি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই ভুল-ভ্রান্তি যদি শুধুমাত্র ব্যবসায়ীর নিজের প্রতিষ্ঠানেরই একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হয়, তাহা হইলে, অন্যের তথা ক্রেতৃবৃন্দের কিছু বলিবার থাকে না। আর, উহার সহিত যদি ক্রেতার স্বার্থহানি ঘটিবার সম্ভাবনা জড়িত থাকে, তাহা হইলে তিনি ওই জাতীয় ভুল-ভ্রান্তিকে নির্বিবাদে মানিয়া লইতে পারেন না। কারণ, আমাদের জীবনের যেদিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন, দেখা যাইবে যে, যেখানে একের ভুলে অন্যের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে কেহই তাহা বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতে পারেন না ; এবং ব্যবসায়-জগৎও যে সামগ্রিক জীবন-যাত্রার ব্যতিক্রম নয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্রেতা যখন বিক্রেতার নিকট তাহার ভুল-ভ্রান্তির প্রতিবাদ জানাইয়া পত্র রচনা করেন তখন উহাকে **প্রতিবাদ-পত্র** (Letter of Complaints) বলা হইয়া থাকে।

কিন্তু শুধুমাত্র প্রতিবাদ জানানোই প্রতিবাদ-পত্রের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ, ক্রেতা যদি তাঁহার প্রতিবাদ-পত্রের মারফত শুধুমাত্র বিক্রেতার ভুল-ভ্রান্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাইয়া তাঁহার দায়িত্ব শেষ করেন, তাহা হইলে, যে ক্ষতির বা উহার সম্ভাবনার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তিনি এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কোন কাজে আসিবে না। এইজন্য, প্রতিবাদ-পত্রের লেখক একদিকে যেমন প্রাপকের ভুল-ভ্রান্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন, তেমনই অন্যদিকে উহা সংশোধন করিবার জন্য পথ-নির্দেশও করিবেন। অর্থাৎ স্বীয় স্বার্থে ক্রেতা যখন প্রতিবাদ-পত্রের মারফত বিক্রেতাকে তাঁহার ভ্রম-সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ জানান, তখন সেই অনুরোধ-জ্ঞাপক পত্রেরই পারিভাষিক নাম হয় **দাবী-পত্র** (Letter of Claims)। মোটকথা সাধারণভাবে, প্রতিবাদ-পত্র ও দাবী-পত্র উভয়েই পরস্পর-নির্ভর।

ক্রেতার নিকট হইতে এই জাতীয় পত্র পাইয়া বিক্রেতা তাঁহার ভ্রম-সংশোধন অথবা ভুল-ভ্রান্তি না থাকিলে সে-সম্পর্কে ক্রেতার ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করিয়া মিটমাট করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে যে পত্র রচনা করেন তাহাকেই

মীমাংসা-পত্র (Letter of adjustments) বলা হয়। এই শ্রেণীর পত্র প্রতিবাদ ও দাবী-পত্র পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই লিখিত হওয়া উচিত।

সাধারণভাবে, প্রতিবাদ ও দাবী-পত্রের লেখক হইতেছেন ক্রেতা এবং উহার উত্তরদাতা বা মীমাংসা-পত্রের লেখক হইতেছেন বিক্রেতা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্রেণীর পত্র রচনাকালে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলা উচিত। নচেৎ পরিণামে এমন একটা তিক্ত সম্পর্কের উদ্ভব হইতে পারে যাহা কোনদিক হইতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি যেমন বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে, তেমনই উহারই উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল প্রতিবাদ ও দাবী-পত্রও বিভিন্ন কারণে লিখিত হইয়া থাকে। নমুনা হিসাবে কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হইল।

নমুনা : ১। সরবরাহে নিয়মিত অনিয়মের জন্য প্রতিবাদ ও দাবী-পত্র।

বঙ্গজননী বস্ত্রালয়

সিউড়ী, বীরভূম।

শ্রীঅনিলবরণ কাঞ্জিলাল
স্বত্বাধিকারী,
মনোমোহিনী হোসিয়ারী,
বেলেঘাটা, কলিকাতা।

তাং ১।৬।৬২

পূর্বসূত্র :

৪।১০।৬১ তারিখে লিখিত আপনাদের নির্দেশপালন-পত্র সংখ্যা : ম-নো /৪৩২/১০/৬১
৮।১২।৬১ „ „ „ „ „ „ : ম-নো /১০০৮/১২/৬১
২৫।৫।৬২ „ „ „ „ „ „ : ম-নো /৩০৫ /৫/৬২

সূচক-সংখ্যা :

১৫।৯।৬১ তারিখে লিখিত আমাদের নির্দেশনামা সংখ্যা : ব-ব/১০২/ ৯/৬১
১৫।১১।৬১ „ „ „ „ „ : ব-ব /২০১/ ১১/৬১
১।৫।৬২ „ „ „ „ „ : ব-ব /৯৫/৫/৬২

মহাশয়,

আপনাদের প্রতিষ্ঠান হইতে আমরা নিয়মিতভাবে মাল ক্রয় করিয়া থাকি। কিন্তু এই লেনদেনের ব্যাপারে এমন একটি অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে যাহা আমাদের স্বার্থবিরোধী এবং সে-সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিতেছি না।

সূচক-সংখ্যায় উল্লিখিত আমাদের নির্দেশনামাগুলির সহিত পূর্বসূত্রে উল্লিখিত আপনাদের নির্দেশপালন পত্রগুলি মিলাইয়া পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আপনারা নির্দেশ পালনের ব্যাপারে চার পাঁচ দিন করিয়া বিলম্ব করিয়াছেন ; অথচ নির্দেশ গ্রহণকালে আপনারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমাদের নির্দিষ্ট তারিখেই আপনারা মাল সরবরাহ করিতে সক্ষম। মাল সরবরাহের ব্যাপারে এইরূপ বিলম্ব হয়তো আপনাদের নিকট উপেক্ষণীয়, কিন্তু আমাদের নিকট সেইরূপ নয়। কারণ, আমাদের ক্রেতৃবৃন্দকে নির্দিষ্ট তারিখে মাল লইতে বলিয়া তাহার পর তাঁহাদের সেই তারিখে ফিরিয়া যাইতে বলা আমাদের স্বার্থবিরোধী ব্যাপারও বটে, আবার আমাদের ব্যবসায়িক সুনামের পক্ষেও ক্ষতিকর বটে।

আশা করি, আমাদের এইরূপ অবস্থাটি আপনারা বিশেষ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং ভবিষ্যতে মাল সরবরাহকালে এইরূপ অনিয়ম যাহাতে পুনরাবৃত্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিবেন। নচেৎ আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সহিত আমাদের প্রতিষ্ঠানের যে ব্যবসায়িক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি—যাহা কোন দিক হইতেই কাম্য নয়।

আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম। ধন্যবাদান্তে— নিবেদক,

শ্রীজন্মেজয় সিংহ
স্বত্বাধিকারী
বঙ্গজননী বস্ত্রালয়

নমুনা ঃ ২। সরবরাহে বিলম্ব-জনিত প্রতিবাদ ও ক্ষতিপূরণ দাবী।

দি গ্লাস এম্পোরিয়াম

কাচ-দ্রব্য বিক্রেতা ও সরবরাহকারী।

৪০১, জি. টি. রোড,
বাগবাজার, চন্দননগর
১।২।৬২

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্লাস ফ্যাক্টরি
৭৯, যশোর রোড,
দমদম।

পূর্বসূত্র ঃ আপনাদের নির্দেশপালন পত্র সংখ্যা $\frac{\text{ডব্লু-বি-জি-এফ}}{\text{নি-পা}}$/৫০০/৬২

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ২৮।১।৬২ তারিখে লিখিত উপরোক্ত পত্রানুসারে জানানো যাইতেছে যে, আমাদের নির্দেশনামা সংখ্যা $\frac{\text{জি-ই}}{\text{নি}}$/৪৮/৬২ তাং ২।১।৬২ অনুযায়ী আপনারা ২৫।১।৬২ তারিখের মধ্যে মাল পাঠাইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ইহার

উত্তরে আপনাদের ১০।১।৬২ তারিখে লিখিত নির্দেশগ্রহণ পত্রে নির্দিষ্ট মাল উক্ত তারিখের মধ্যে পাঠাইবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে আমাদের নির্দেশনামার শর্ত অনুযায়ী আপনারা ইহাও প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মাল সরবরাহ করা না হইলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ১০০৲ একশত টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত।

আপনাদের প্রেরিত মাল এখানে পৌঁছিয়াছে গত ২৮।১।৬২ তারিখে। অর্থাৎ আপনারা মাল সরবরাহ করিতে তিন দিন বিলম্ব করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী দৈনিক একশত টাকা হিসাবে তিনশত টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৫।২।৬২ তারিখের মধ্যে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
দি গ্লাস এম্পোরিয়াম্।

নমুনা ঃ ৩। মাল গ্রহণ করিতে অস্বীকার।

দাস বিল্ডার্স এণ্ড কোং

ঠিকাদার ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

গ্রাম ঃ বিল্ডার্স ১০৪, ক্লাইভ স্ট্রীট্
ফোন ঃ ৩৩-৩৩৩৩ কলিকাতা।
দে স্যাণ্ড্ সাপ্লায়িং এজেন্সী ৫।৫।৬২
মগরা, হুগলী।

পূর্বসূত্র ঃ আপনাদের নির্দেশপালন পত্র এস-এস-এ / নি-পা /৪১২ /৬২ তাং ৩।৫।৬২

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের উপরোক্ত পত্র অনুসারে জানাইতেছি যে, ৩।৫।৬২ তারিখে আপনারা যে বালি আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন ওই ধরনের বালি সরবরাহ করিবার জন্য আমাদের নির্দেশ ছিল না। আপনারা যে নমুনাগুলি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে যেটি নির্বাচন করিয়াছিলাম, প্রেরিত বালির দানাগুলি তাহা অপেক্ষা অনেক মিহি এবং আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে অনুপযোগী।

এমতাবস্থায়, যে মাল আমাদের কোন প্রয়োজনেই আসিবে না তাহা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। বর্তমানে ওই মাল আমাদের গুদমজাত রহিল বটে, কিন্তু স্থানাভাবে বেশীদিন উহা আমাদের গুদামে রাখিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। অতএব উহা ১৫।৫।৬২ তারিখের মধ্যে অনুগ্রহপূর্বক আপনাদেরই খরচে ফেরত লইবার

বন্দোবস্ত করিবেন। নচেৎ উক্ত তারিখের পর ওই মাল আমরা নিলামে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইব।

এ-সম্পর্কে আপনাদের আশু সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রহিলাম। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

দাস বিল্ডার্স এণ্ড কোং।

যে-সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির জন্য প্রতিবাদ ও দাবী-পত্র লিখিত হয়, সেইগুলি একদিকে যেমন বিক্রেতার গাফিলতির জন্য ঘটিয়া থাকে, তেমনি অন্যদিকে ঘটিয়া থাকে ডাকবিভাগ, রেল-কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির জন্য। ক্রেতার নিকট হইতে প্রতিবাদ ও দাবী-পত্র পাইবার পর বিক্রেতার কর্তব্য হইতেছে সেই ভুল-ভ্রান্তির প্রকৃত কারণ বাহির করা এবং সত্বর ক্রেতাকে জানাইয়া দেওয়া। প্রতিবাদ ও দাবী-পত্রের উপরোক্ত নমুনাগুলির ভিত্তিতে কয়েকটি মীমাংসাপত্রের নিদর্শন দেওয়া হইল।

নমুনা ঃ ৪।

মনোমোহিনী হোসিয়ারী

বেলেঘাটা, কলিকাতা।

বঙ্গজননী বস্ত্রালয়, তাং ৪।৬।৬২

সিউড়ী, বীরভূম।

পূর্বসূত্র ঃ ১।৬।৬২ তারিখে লিখিত আপনাদের প্রতিবাদ ও দাবী-পত্র।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের উপরোক্ত পত্র পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। কারণ এই পত্রটি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষার পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর।

উক্ত পত্রটিতে আপনারা যে অভিযোগ দাখিল করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম যে, উহা সর্বতোভাবে সত্য এবং শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া ইহাও জানা গেল যে, সরবরাহ-ব্যবস্থার এইরূপ ত্রুটির মূলে রহিয়াছে আমাদেরই সরবরাহ বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট একজন কর্মচারী। এইরূপ ত্রুটির মূল আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদিও আমরা উক্ত কর্মচারীটিকে বরখাস্ত করিয়াছি, তবুও আমাদের প্রতিষ্ঠানেরই এই ধরনের গাফিলতির জন্য আপনাদের যে অপূরণীয় ক্ষতি ও অসুবিধা সাধিত হইয়াছে তাহার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে লজ্জিত ও দুঃখিত। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহার জন্য আমরা সজাগ দৃষ্টি রাখিব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

মনোমোহিনী হোসিয়ারী।

নমুনা : ৫।

দি ওয়েস্ট্‌ বেঙ্গল গ্লাস ফ্যাক্টরি

গ্রাম : গ্লাস ৭৯, যশোর রোড,

ফোন : ৩৪-৪৩৩৪ দমদম।

দি গ্লাস এম্পোরিয়াম ৪।২।৬২

৪০১, জি. টি. রোড,

বাগবাজার, চন্দননগর।

পূর্বসূত্র : ১।২।৬২ তারিখে লিখিত আপনাদের প্রতিবাদ ও দাবী-পত্র।

সবিনয় নিবেদন,

উপরোক্ত পত্রে বিলম্বে মালপ্রাপ্তির জন্য আপনারা যে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আপনাদের নিশ্চয়ই আছে এবং মাল পাঠাইতে বিলম্ব হইলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য আমরা যে ক্ষতিপূরণ বাবদ দৈনিক একশত টাকা হিসাবে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম তাহাও আমরা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সরবরাহ ব্যাপারে আপনাদের সহিত আমাদের যে-চুক্তি হইয়াছিল তদনুযায়ী আপনারা যাহাতে ২৫।১।৬২ তারিখের মধ্যে মাল পাইতে পারেন সে-বিষয়ে আমাদের দিক হইতে কোন গাফিলতি নাই। আমরা গত ২২।১।৬২ তারিখেই আপনাদের জন্য নির্দিষ্ট মাল রেল-কর্তৃপক্ষের জিম্মায় পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। আমাদের উক্তির সমর্থনে রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত রসিদের একটি নকল এই পত্রের সহিত পাঠাইয়া দিতেছি। ইহা হইতে দেখিতে পাইবেন যে, আপনাদের নিকট মাল সরবরাহ করিবার ব্যাপারে আমাদের তরফ হইতে কোন ত্রুটি নাই। সুতরাং একটু সহানুভূতির সহিত বিচার করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, শর্ত অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ বাবদ যে তিনশত টাকার দাবী আপনারা জানাইয়াছেন তাহা দিতে আমরা ন্যায়ত বাধ্য নই। বিলম্বে মাল প্রাপ্তির জন্য আপনাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণের জন্য, ইচ্ছা করিলে, আপনারা রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাইতে পারেন। যে কোন কারণেই হোক, বিলম্বে মাল প্রাপ্তির জন্য আপনাদের যে-ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

ওয়েস্ট্‌ বেঙ্গল গ্লাস ফ্যাক্টরি

নমুনা : ৬।

দে স্যাণ্ড সাপ্লায়িং এজেন্সী

মগরা, হুগলী।

দাস বিল্ডার্স এণ্ড কোং, তাং ৮।৫।৬২

১০৪, ক্লাইভ স্ট্রীট,

কলিকাতা।

পূর্বসূত্র : ৫।৫।৬২ তারিখে লিখিত আপনাদের প্রতিবাদ পত্র।

সবিনয় নিবেদন,

উপরোক্ত পত্রানুসারে আপনাদের জানাইতেছি যে, ভ্রমক্রমে অন্যের মাল আপনাদের নিকট চলিয়া যাওয়ার জন্য আমরা একান্তভাবে লজ্জিত ও আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাদের এই ভ্রান্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আপনারা যথার্থ বন্ধুর মতই কার্য করিয়াছেন এবং এজন্য আমরা আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

১৫।৫।৬২ তারিখের মধ্যেই আমরা নিজ খরচে ভুল মাল আপনাদের নিকট হইতে লইয়া আসিব এবং নিজ খরচেই নমুনা অনুযায়ী মাল আপনাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। অনুগ্রহপূর্বক আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য মার্জনা করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

দে স্যাণ্ড সাপ্লায়িং এজেন্সী।

॥ অনুশীলনী ॥

১। যে নমুনানুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল প্রেরিত মাল তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া অবিলম্বে এই মাল ফেরত লইয়া উপযুক্ত মাল পাঠানো না হইলে পূর্বচুক্তি বাতিল করা হইবে—এই মর্মে একখানি প্রতিবাদ ও দাবী-পত্র রচনা করুন।

২। বিক্রেতা আপনার নির্দেশ অনুযায়ী মালের একাংশ মাত্র পাঠাইয়াছেন এবং যাহা পাঠাইয়াছেন তাহা বিলম্বে প্রেরিত ও ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ এই মালের জন্য শতকরা পনর টাকা হারে অতিরিক্ত কমিশন দাবী করিয়া ও নির্দেশের বাকি অংশ বাতিল করিয়া একখানি পত্র রচনা করুন।

৩। আপনি বীমা কোম্পানিতে প্রিমিয়ামের জন্য টাকা জমা দিতে গিয়াছিলেন। টাকা গ্রহণ করিবার নির্দিষ্ট সময় শেষ হইবার কয়েক মিনিট পূর্বে যাইলেও খাজাঞ্চি সময় অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া আপনার প্রিমিয়াম লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর, উক্ত কর্মচারীর এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ জানাইয়া বীমা কোম্পানির নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করুন।

৪। উপরোক্ত তিনটি বিষয়বস্তুর প্রত্যেকটিরই উপর ভিত্তি করিয়া একখানি করিয়া মীমাংসা-পত্র রচনা করুন।

৫। আপনি যে মালের অর্ডার দিয়াছিলেন তাহা সরবরাহ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মান ঠিক নাই এবং দরও বাজার অপেক্ষা উচ্চ। আপনি বাজার-দরে যথা মানের মাল ঐ ব্যবসায়ী ফার্মের নিকট হইতেই এই মালের পরিবর্তে লইতে ইচ্ছুক। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ করুন। [ব. বি. (পার্ট ওয়ান) : '৬২]

[মন্তব্য : পত্রটি নমুনা : ৩-এর অনুরূপ হইবে। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাজার-দরের প্রসঙ্গটি অতিরিক্ত। এই অতিরিক্ত প্রসঙ্গটি যুক্ত করিয়া পত্রটি নিজে রচনা করুন।]

৬। আপনার বিদেশীমাল আমদানির ব্যবসায় আছে। কিছু মাল পথে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত খেসারত চাহিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখুন। [ক. বি. (পুরাতন কোর্স) : ৬২]

[মন্তব্য : প্রদত্ত উদাহরণগুলির অভিজ্ঞতায় উত্তরটি নিজে লিখুন।]

তাগিদ-পত্র

(Collection Letters)

বর্তমান ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই ধারে কারবার হইয়া থাকে। বিক্রেতা ক্রেতৃ-প্রতিষ্ঠানের সুনামের উপর আস্থা রাখিয়া ধারে মাল সরবরাহ করেন এবং সরবরাহ-কালে প্রেরিত মালের বিবরণ দিয়া একটি চালান প্রেরণ করেন। ক্রেতা মাল হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই চালান অনুযায়ী দাম চেক, বিনিময়পত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণত মিটাইয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রেতা দেনা মিটাইবার ব্যাপারে অহেতুক বিলম্ব করিয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে বিক্রেতা দাম মিটাইয়া দিবার জন্য তাগিদ দিয়া ক্রেতার নিকট যে-পত্র প্রেরণ করেন তাহাকেই **তাগিদ-পত্র** বলা হয়।

তাগিদ-পত্র যাঁহাদের নিকট প্রেরণ করা হয় তাঁহারা সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—

(ক) পরিশোধের ইচ্ছা এবং সামর্থ্য থাকিলেও যাঁহারা আলস্য অথবা ভ্রান্তিবশত দেনা মিটাইবার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না। এই শ্রেণীর ক্রেতাদের নিকট একখানি বা দুইখানি তাগিদ-পত্র পাঠাইলেই কার্যোদ্ধার হয়।

(খ) যাঁহারা সাময়িক অর্থাভাবে ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। ইঁহাদের নিকট পর পর কয়েকখানি তাগিদ-পত্র পাঠাইলেই ইঁহারা সময় চাহিয়া

উত্তর দেন এবং শেষ পর্যন্ত কিছু কমাইয়া মূল্য গ্রহণ করিবার জন্য পত্র-লেখককে অনুরোধ জানাইয়া থাকেন।

(গ) যাঁহারা সামর্থ্য সত্ত্বেও ইচ্ছাপূর্বক ঋণ পরিশোধ করিতে বিলম্ব করেন ও সম্ভব হইলে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য আদায় করা খুবই কঠিন এবং বহুক্ষেত্রেই অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে অধিক পত্র লিখিয়া কোন লাভ নাই। বরং দুই-একখানি পত্রেই মূল্য আদায়ের জন্য কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে তাহা জানাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মূল্য আদায়ের জন্য যে-সমস্ত ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে পত্র রচনা করিতে হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে তিনটি স্তর অবলম্বিত হইয়া থাকে—

(ক) বিজ্ঞপ্তি—এই স্তরে সাধারণত দুইখানি পত্র প্রেরণ করা হয়।

(খ) অনুরোধ হইতে ক্রমশ ভীতি প্রদর্শন। এই স্তরে অবস্থাভেদে পত্রের সংখ্যা কম বা বেশি হইবে। পাওনা আদায় হইবার সম্ভাবনা থাকিলে পত্রের সংখ্যা হইবে বেশি নচেৎ কম।

(গ) আদায়ের ব্যবস্থা—এই স্তরে মূল্য আদায়ের জন্য যে-ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহা একখানি মাত্র পত্রে লিখিয়া জানাইয়া দেওয়া হয়।

তাগিদ-পত্র রচনাকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা প্রয়োজন—

(ক) ক্রেতা বাকি পাওনা পরিশোধ করিবেন এমন মনোভাব লইয়াই তাগিদ-পত্র রচনা করিতে হইবে। নচেৎ, পত্র পাঠ করিয়া ক্রেতা যদি বুঝিতে পারেন যে, বিক্রেতা পাওনার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলে, উহা পরিশোধ করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ থাকার সম্ভাবনা কম।

(খ) এই শ্রেণীর পত্র হইবে সৌজন্যপূর্ণ। কিন্তু সৌজন্যের নামে কুণ্ঠা প্রকাশ করা উচিত হইবে না। কারণ, কুণ্ঠা প্রকাশে বিক্রেতার যে মানসিক দৌর্বল্য প্রকাশ পাইবে, ক্রেতা তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে অধিকতর বিলম্ব করিতে পারেন।

(গ) ভাষা ও বিষয়বস্তুর দিক হইতে আপত্তিজনক কোন কিছু তাগিদ-পত্রে থাকা অনুচিত। নচেৎ, সেই অজুহাতে ক্রেতা অনির্দিষ্ট কালের জন্য টাকা প্রদান স্থগিত রাখিতে পারেন।

(ঘ) ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে ক্রেতার পক্ষ হইতে সম্মানজনক পথ উন্মুক্ত রাখা উচিত।

(ঙ) কখনও কখনও তাগিদ-পত্রের সহিত বিক্রয়-আকর্ষণ যুক্ত করা যাইতে পারে।

(চ) সম্ভব হইলে তাগিদ-পত্রে ভীতিপ্রদর্শন না করাই বাঞ্ছনীয়। তবে, একবার ভীতি প্রদর্শন করিলে তাহা কার্যে পরিণত করা উচিত।

(ছ) ক্রেতার আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তাঁহাকে সাধ্যমত সুযোগ-সুবিধা দেওয়াও বিক্রেতার কর্তব্য।

নমুনা : ১। **বিক্রয়-আকর্ষণযুক্ত তাগিদ-পত্র।**

শাল-সম্ভার

শ্রীমানী মার্কেট, কলিকাতা।

রাহা এণ্ড সন্স, তাং ১০।১০।৬১

জি. টি. রোড, আসানসোল।

সবিনয় নিবেদন,

আসন্ন শীত উপলক্ষে আমরা কাশ্মীর হইতে কিছুসংখ্যক নূতন শাল আমদানি করিয়াছি। বর্ণে ও শীত নিবারণে এই শালগুলি আপনাদের ক্রেতৃবৃন্দের তৃপ্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। এই পত্রের সহিত উহার একটি তালিকা সংযুক্ত করিয়া দিলাম। আমদানি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বলিয়া সত্বর উহার জন্য নির্দেশ দান করিয়া বাধিত করিবেন।

প্রসঙ্গত, অনুরোধ জানাইতেছি যে, আপনাদের পূর্বের বাকি ৪৫০৲ সাড়ে চারিশত টাকার জন্য একখানি চেক পাঠাইয়া নূতন নির্দেশ চলতি হিসাবে সরবরাহ করিতে সাহায্য করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শাল-সম্ভার।

নমুনা : ২।

ধারাবাহিক তাগিদ পত্র

[প্রথম পর্যায় : প্রথম পত্র]

মনোমোহিনী হোসিয়ারী

বেলেঘাটা, কলিকাতা।

বঙ্গজননী বস্ত্রালয়, তাং ১।২।৬২

সিউড়ী, বীরভূম।

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের নির্দেশমত আমাদের ২০।১।৬২ তারিখের প্রেরিত পার্সেল, আশা করি, যথাসময়ে আপনাদের নিকট নিরাপদে পৌঁছাইয়াছে। অনুগ্রহপূর্বক ঐগুলির প্রাপ্তি সংবাদ জানাইয়া আমাদের উদ্বেগ দূর করিবেন।

আশা করা যাইতেছে যে, এতদিনে আমাদের প্রেরিত চালান ও বিল মিলাইয়া দেখিয়াছেন। আপনাদের সুবিধামত বিলটির ভুক্তান বাবদ মোট ৫২৫৲ পাঁচশত পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
মনোমোহিনী হোসিয়ারী।

নমুনা : ২ (ক)। [প্রথম পর্যায় : দ্বিতীয় পত্র]
(শিরোনামা ইত্যাদি পূর্ববৎ)

তাং ১৫।২।৬২

সবিনয় নিবেদন,

গত ১।২।৬২ তারিখে আপনাদিগকে বাকি হিসাব পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানাইয়া একখানি পত্র দিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি তাহার কোন উত্তর পাই নাই। পত্রখানি আপনাদের বরাবর পৌছিয়াছে কিনা বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় হিসাবসহ এই পত্র পাঠাইতেছি। যাহাতে সত্বর টাকা পাইতে পারি সে বিষয়ে অবহিত হইলে বাধিত হইব।

বর্তমানে আপনাদের হিসাব বাকী আছে মাত্র ৫২৫৲ পাঁচশত পঁচিশ টাকা। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
মনোমোহিনী হোসিয়ারী।

নমুনা : ২ (খ)। [দ্বিতীয় পর্যায় : প্রথম পত্র]
(শিরোনামা ইত্যাদি পূর্ববৎ)

তাং ১।৩।৬২

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের ২০।১।৬২ তারিখের প্রেরিত পার্সেলের সহিত চালান ও বিলখানি প্রায় একমাসের উপর হইল আপনাদের নিকট পাঠানো হইয়াছে। আপনাদের ইহা নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আপনাদের সহিত নূতন ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপনের খাতিরে উক্ত বিলের উপর আমরা ১২½% শতকরা সাড়ে বারো টাকা হিসাবে কমিশন বাদ দিয়াছি। আপনাদের সহিত লেনদেনের পূর্বে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, একমাসের মধ্যে দাম মিটাইয়া দেওয়ার শর্তেই আমাদের প্রতিষ্ঠান হইতে ঐরূপ কমিশন দেওয়া হইয়া থাকে। এখন যদিও, একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, তবুও আপনাদের সহিত নূতন ব্যবসায়িক সম্বন্ধ স্থাপনের খাতিরে আমরা এই কমিশনের সুযোগ গ্রহণের সময় বর্ধিত করিয়া দেড়মাস পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত

আছি। অতএব, দয়া করিয়া যাহাতে আগামী ৭।৩।৬২ তারিখের মধ্যে বকেয়া পাওনা মিটিয়া যায়, সে-বিষয়ে একটু অবহিত হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইবে। ধন্যবাদান্তে।

নিবেদক,
মনোমোহিনী হোসিয়ারী।

নমুনা : ২ (গ)। [দ্বিতীয় পর্যায় : দ্বিতীয় পত্র]

তাং ১৫।৩।৬২

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের ২০।১।৬২ তারিখে প্রেরিত পার্সেলের পর ১।২।৬২, ১৫।২।৬২ এবং ১।৩।৬২ তারিখের লিখিত পত্র তিনখানি, আশা করি, যথাসময়েই আপনাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এতদিনেও আপনাদের নিকট হইতে আমাদের বিলের টাকা বাবদ ৫২৫৲ পাঁচশত পঁচিশ টাকা বুঝিয়া পাইলাম না। আমাদের ১।৩।৬২ তারিখের পত্রে কমিশনের সুযোগ গ্রহণের সময় বর্ধিত করিয়া যে দেড়মাস করা হইয়াছিল, তাহারও মেয়াদ মায় অতিরিক্ত দিবস গত ১৪।৩।৬২ তারিখে শেষ হইয়া গেল। অতএব, আমাদের শেষ অনুরোধ, আপনি আগামী ২২।৩।৬২ তারিখের মধ্যেই আমাদের বিলের সম্পূর্ণ টাকা শোধ করিয়া আমাদের পারস্পরিক প্রীতির সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সাহায্য করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
মনোমোহিনী হোসিয়ারী।

নমুনা : ২ (ঘ)। [তৃতীয় পর্যায় : প্রথম পত্র]

তাং ২৩।৩।৬২

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের ১৫।৩।৬২ তারিখে লিখিত পত্রের পর এবং অতিরিক্ত দিবস সমেত কমিশনের সুযোগ গ্রহণের সব রকমের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার পর, আপনাদের শেষ পর্যন্ত জানাইতে বাধ্য হইতেছি যে, মাত্র ৫২৫৲ পাঁচশত পঁচিশ টাকার জন্য আমাদের পক্ষে অপেক্ষা করা আর সম্ভব হইতেছে না। যেহেতু আপনারাই আমাদের পারস্পরিক প্রীতির সম্বন্ধ স্বেচ্ছায় নষ্ট করিতেছেন, সেইহেতু, বর্তমানে বাধ্য হইয়া বিষয়টি আমরা আমাদের আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতার হাতে তুলিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছি।

অতঃপর, আমাদের বিলে যে কমিশন দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইল এবং আপনারা ৫২৫৲ টাকার পরিবর্তে প্রেরিত মালের পূর্ণ মূল্য বাবদ ৫৯০৲

পাঁচশত নব্বই টাকা দিতে বাধ্য থাকিবেন। উপরন্তু, উক্ত পরিমাণ টাকার জন্য ১২½% শতকরা সাড়ে বারো টাকা হারে সুদ ও আমাদের পাঁচখানি পত্র প্রেরণের ব্যয় বাবদ সমস্ত খরচ বহন করিবার জন্যও বাধ্য থাকিবেন। ইতি—

নিবেদক,

মনোমোহিনী হোসিয়ারী।

॥ অনুশীলনী ॥

১। পর পর কয়েকখানি তাগিদ-পত্র প্রেরণ করিবার পর ক্রেতা সমগ্র পাওনার কিয়দংশ পরিশোধ করিয়া একখানি চেক পাঠাইয়াছেন এবং ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত সময় প্রার্থনা করিয়া ও বাকী পাওনার কিছু অংশ ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বিক্রেতার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন। বিক্রেতার উত্তরের আদর্শটি রচনা করুন।

২। কয়েকখানি তাগিদ-পত্র প্রেরণ করিবার পর ক্রেতা জানাইতেছেন যে, বিক্রেতা কর্তৃক প্রেরিত মাল নিকৃষ্ট ধরনের হওয়ার জন্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিয়াছে এবং সেই কারণেই তাঁহার পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হইতেছে না। অতএব বিক্রেতা যেন তাঁহাকে ছয় মাস পর্যন্ত সময় মঞ্জুর করেন। পত্রখানি রচনা করুন।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তর-পত্রটি রচনা করুন এবং ক্রেতাকে জানাইয়া দিন যে, দীর্ঘ ছয়মাস সময় বর্ধিত করা সম্ভব নয় বলিয়া দেনা পরিশোধের জন্য তিনমাস বাড়াইতে আপনি প্রস্তুত। সেই সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিন যে, মাল সম্পর্কে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইবার পর তাঁহাদের ঐরূপ মন্তব্য এবং মাল অবিক্রীত থাকার সর্বপ্রকার দায়িত্ব আপনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন।

৪। ক্রেতা প্রেরিত মালের সহিত চালান এবং বিল পাইয়াও একমাসের মধ্যে টাকা শোধ করেন নাই। একমাসের মধ্যে টাকা শোধ করিলেই ১২½% কমিশন দিবার ব্যবস্থা আছে, সেকথা স্মরণ করাইয়া আর ১৫ দিন সেই সুযোগের মেয়াদ বর্ধিত করিয়া একখানি তাগিদ-পত্র রচনা কর। [ব. বি. (মডিফায়েড) : '৬৩]

[মন্তব্য : উত্তরটি নমুনা : ২(খ)-এর অনুরূপ।]

এজেন্সী বা কারপরদাজী বা অভিকর্তৃত্ব
(Agency)

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতার সহিত যেমন একদিকে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করিয়া থাকেন, তেমনই অন্যদিকে সেই সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে অন্যেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্য করাকে বলে **কারপরদাজী কারবার বা এজেন্সী** এবং মাধ্যমকে বলে **এজেন্ট বা কারপরদাজ।**

এজেন্ট বা কারপরদাজ সাধারণত তিন শ্রেণীর হইয়া থাকে—

(ক) স্থানীয় এজেন্ট (Local Agent)—ইঁহাদের মারফত যতমাল বিক্রয় করা হয় তাহার উপর শতকরা হারে ইঁহারা একটি দস্তুরি (commission) পাইয়া থাকেন। প্রচার কার্য ইত্যাদির জন্য যে-ব্যয় হয় তাহা বহন করিবার দায়িত্ব মালিকের। কোন কোন সময় বিশেষ অঞ্চলের জন্য শুধুমাত্র একজনকেই এজেন্ট নিযুক্ত করা হয়। ইঁহাদের বলা হয় একক কারপরদাজ (Sole Agent)

(খ) দালাল (Broker)—ইঁহারা মালিকের পক্ষ হইয়া মাল ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং সেইজন্য একটা দালালী (brokerage) পাইয়া থাকেন। এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি কাজকারবার হইয়া থাকে এবং দালাল শুধু উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া দেন।

(গ) ভ্রাম্যমান অভিকর্তা (Travelling Agent)—ইঁহারা মালিকের নিকট হইতে মাসে মাসে বেতন ও বিক্রয়ের উপর শতকরা হিসাবে একটা দস্তুরি পাইয়া থাকেন। মালিকের পক্ষ হইতে ইঁহারা বিভিন্ন স্থানে অর্ডার বা কারবার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহার পর ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি কাজ-কারবার হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ অভিকর্তা মালিকের নিকট হইতে শুধুমাত্র দস্তুরিই পাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর এজেন্ট সাধারণত একই সঙ্গে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকেন।

এজেন্সীর জন্য আবেদন-পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন—

(ক) স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা,

(খ) কারপরদাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা,

(গ) কারপরদাজ যে-সমস্ত বিশেষ সুবিধা দিতে পারিবেন তাহার উল্লেখ,

(ঘ) দস্তরির হার ও অন্যান্য শর্তাবলী,

(ঙ) পরিচয়-সূত্র, এবং

(চ) আশাবাদিতা।

এজেন্সীর প্রস্তাব যদি মালিক-পক্ষ হইতে আসে তাহা হইলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকিবে—

(ক) স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের সম্ভাবনা,

(খ) পণ্যের উপযোগিতা ও উৎকর্ষ,

(গ) কারপরদাজের কার্য ও তাঁহার সম্ভাব্য লাভ,

(ঘ) দস্তরির হার ও অন্যান্য শর্তাবলী, এবং

(ঙ) আশাবাদিতা।

এজেন্টকে ক্রয়-বিক্রয়ের নির্দেশ দিবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নচেৎ, নির্দেশের মধ্যে যদি কোনরূপ অস্পষ্টতা থাকে, তাহা হইলে ব্যবসায়ে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

মাল ক্রয় করিবার নির্দেশ দিবার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়—

(ক) মালের পরিমাণ ও প্রকার,

(খ) সর্বোচ্চ মূল্য,

(গ) মাল পাঠানো ও গুদমজাত করিবার ব্যবস্থা,

(ঘ) বীমার ব্যবস্থা, এবং

(ঙ) মূল্য প্রদানের শর্ত।

মাল বিক্রয় করিবার সময় কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে অবস্থানুসারে যদিও কারপদাজই তাহা স্থির করিয়া থাকেন, তবুও সর্বনিম্ন কি মূল্য হইলে মাল বিক্রয় করা যাইতে পারে তাহা মালিকেরই জানাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ, লাভ বা লোকসান যাহাই হোক না কেন, তাহার সমস্ত দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত মালিকেরই উপর বর্তায়।

কারপরদাজী পত্রে সম্বোধন-রীতির একটি বৈশিষ্ট্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইবার পূর্বে কারপরদাজকে 'মহাশয়' বা 'সবিনয় নিবেদন' বলিয়া সম্বোধন করাই রীতি। কিন্তু, যখনই তিনি প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত হইয়া গেলেন, তখনই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠানের নিজের লোক বলিয়া ধরা হয় এবং এই অবস্থায় তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া অন্তরঙ্গতাব্যঞ্জক 'বাবু' যুক্ত করাই শ্রেয়।

নমুনা ঃ ১। দেশী কোম্পানির নিকট এজেন্সীর আবেদন

দি গ্লাস এম্পোরিয়াম

সিউড়ী, বীরভূম।

দি পাইওনীয়র গ্লাস ফ্যাক্টরি তাং ১।১০।৬১

বি. টি. রোড, বরানগর।

সবিনয় নিবেদন,

বীরভূমে আপনাদের কারখায় প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং আশা করি, তাহা আপনাদের অবিদিত নয়। আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদিগকে এই জেলার একমাত্র স্থানীয় কারপরদাজ হিসাবে নিযুক্ত করিলে আমরা প্রচুর বিক্রয় দেখাইতে পারিব।

শুধু স্থানীয় বাজারেই নয়, সমগ্র জেলাতেই আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ কাচ-নির্মিত দ্রব্যের ব্যবসায় করিয়া আসিতেছি এবং এই এলাকায় ঐ ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। ইহা ভিন্ন, সমগ্র জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত আমরা নিয়মিতভাবে কাজ-কারবার করিয়া থাকি বলিয়া আপনাদের কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র জেলায় প্রচারের জন্য ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, কারপরদাজীর জন্য আমরা ১৫% শতকরা পনর টাকা হারে দস্তরি প্রত্যাশা করি। তবে, আপনাদের মালের প্রচারের জন্য নমুনা ইত্যাদি আনুষঙ্গিক খরচের ভার আপনাদেরই বহন করিতে হইবে।

পরিচয়-সূত্র হিসাবে পত্রের শেষে বীরভূম জেলার দুইটি সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হইল। প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান করিতে পারেন।

আমাদিগকে কারপরদাজীর ভার প্রদান করিয়া, আশা করি, আপনাদের কাচ-নির্মিত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় ও প্রচার করিবার সুযোগদানে বঞ্চিত করিবেন না। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

দি গ্লাস এম্পোরিয়াম্।

পরিচয়সূত্র ঃ—

১। বিবিধ ভাণ্ডার, রামপুরহাট।

২। প্রয়োজনী, বোলপুর।

নমুনা : ১। (ক)। বিদেশী কোম্পানির নিকট এজেন্সীর আবেদন।

ইণ্টারন্যাশন্যাল বুক এম্পোরিয়াম

গ্রাম : ইণ্টারন্যাশন্যাল। ৩, এস্প্ল্যানেড ইস্ট,

ফোন : ২২-৩৩২১ কলিকাতা।

তাং—১।৬।৬৪

মেসার্স্ ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং লিঃ

লণ্ডন।

সূচকসংখ্যা : ই-বি/৩৫২/এজেন্সী/৬৪

সবিনয় নিবেদন,

কলিকাতায় আপনাদের পুস্তকের চাহিদা যথেষ্ট। কিন্তু পূর্বভারতের এই অঞ্চলে আপনাদের কোন এজেন্সী নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের প্রতিষ্ঠান বিদেশী পুস্তক সরবরাহ ব্যাপারের সহিত জড়িত। দীর্ঘকালের এই অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, আপনাদের প্রকাশিত পুস্তক সরবরাহের ব্যাপারে আমাদের যোগাযোগ করিতে হয় আপনাদের বোম্বাই, মাদ্রাজ, অথবা দিল্লীর এজেণ্টের সহিত। এই যোগাযোগের ব্যাপারে একদিকে যেমন সময়ের অপচয় হয়, তেমনি অন্যদিকে বিলম্বে সরবরাহের জন্য ক্রেতারাও অসন্তুষ্ট হন। এমতাবস্থায় আমাদের প্রস্তাব এই যে, পূর্বভারতের এই অঞ্চলে অবিলম্বে আপনাদের একটি এজেন্সী চালু হওয়া উচিত। প্রসঙ্গত জানাইতেছি যে, আমাদিগকে পূর্বভারতের একমাত্র এজেণ্ট হিসাবে নিযুক্ত করিলে আপনাদের প্রতিষ্ঠান উত্তরোত্তর লাভবানই হইবে।

কলিকাতা এবং পূর্বভারতে বিদেশী পুস্তক সরবরাহের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি এবং আমাদের আর্থিক অবস্থাও আপনাদের এজেন্সী পাইবার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। আমাদের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আপনারা ৪ নং চৌরঙ্গি রোডে অবস্থিত লয়েড্স্ ব্যাঙ্কের ভারতীয় শাখার নিকট খোঁজখবর লইতে পারেন।

আমাদের এজেন্সী দেওয়া যদি আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক যথাশীঘ্র আপনাদের এজেন্সী সংক্রান্ত নিয়মাবলী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

অবিনাশ চক্রবর্তী,

জেনারেল ম্যানেজার,

ইণ্টারন্যাশন্যাল বুক এম্পোরিয়াম।

নমুনা ঃ ২। এজেন্সী প্রদানের প্রস্তাব

দি কালীঘাট হোসিয়ারী

লক্ষ্মী কাট্‌রা,
৭৫, কালীঘাট টেম্প্‌ল রোড,
কলিকাতা।
২।৩।৬২

শ্রীঅনুপম সান্যাল,
স্বত্বাধিকারী,
আবরণী,
বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর।

মহাশয়,

বালুরঘাটের 'বেতার প্রতিষ্ঠান'-এর মালিক বন্ধুবর শ্রীজিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর নিকট হইতে আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক সুনাম এবং কর্মদক্ষতার বিষয় অবগত হইয়া প্রকারান্তরে তাঁহারই উপদেশ অনুসারে আপনাকে আমরা আমাদের কারখানায় প্রস্তুত হোসিয়ারী দ্রব্যসামগ্রী ঐ অঞ্চলে বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্সী দিবার বিষয় চিন্তা করিতেছি, এবং সে-বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত অভিমত প্রার্থনা করি।

আমাদের কারখানার নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন এবং এই কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর সহিত সম্ভবত আপনার পরিচয়ও আছে। পশ্চিম দিনাজপুরের বাজারে আমাদের প্রস্তুত মালের বিশেষ ও নিয়মিত চাহিদা আছে। কিন্তু দূরত্বের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ রাখিতে না পারায় ঐ জেলার সর্বত্র বহুল পরিমাণে মাল যোগান দিয়া উঠিতে পারা সম্ভবপর হইতেছে না। সেইজন্য, আপনার নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, যদি আপনি উক্ত অঞ্চলে আমাদের কারখানাজাত হোসিয়ারী দ্রব্যাদির বিক্রয়-কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে, আমাদের উভয়ের পক্ষেই ঐ ব্যবস্থা লাভজনক হইবে বলিয়া আশা করি।

আমাদের পণ্য বাজারে বিশেষ সুপরিচিত বলিয়া ইহা বিক্রয় করিতে আপনাকে বিন্দুমাত্র অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না। উপরন্তু, বিক্রয়ের সুবিধার জন্য আমাদেরই খরচে বিজ্ঞাপনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে। আপনার বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য এ-সম্পর্কে একটি খসড়া পরিকল্পনাও ক্রোড়পত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতেছে যে, আমরা ১৫% শতকরা পণের টাকা হিসাবে দস্তুরি দিয়া থাকি এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ও বহন করি। আশা করি, আমাদের প্রস্তাব

সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আপনার অনুমোদন পাইলেই চুক্তিপত্র পাঠাইয়া দিব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীনির্মলেন্দু ভৌমিক
অংশীদার,
দি কালীঘাট হোসিয়ারী।

নমুনা: ৩। মাল ক্রয় করিবার জন্য এজেন্টকে নির্দেশদান

বেনারসী মিউজিয়াম

গড়িয়াহাট মার্কেট, কলিকাতা।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ত্রিপাঠী, তাং....৫।৩।৬০
স্বত্বাধিকারী,
এন্. সি. ত্রিপাঠী অ্যাণ্ড কোং
টেম্পল্ রোড্, বেনারস।

প্রিয় নারায়ণবাবু,

গতকল্য আপনার ২।৩।৬০ তারিখে লিখিত পত্রখানি পাইয়াছি। উক্ত পত্রে যাহা লিখিয়াছেন সেই অনুযায়ী যদি ৬০৲ ষাট টাকা জোড় হিসাবে ঐ শ্রেণীর বেনারসী শাড়ি সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া অবিলম্বে অন্তত পঞ্চাশ জোড়া শাড়ি সওদা করিয়া ফেলুন। ইহা ভিন্ন, আগামী পূজা মরসুমের জন্য ঐ দরেই আরও একশত জোড়া শাড়ি ছয় মাসের আগাম চুক্তিতে দাদন দিয়া রাখুন।

বর্তমানের সংগৃহীত মাল সীলমোহরসহ বস্তাবন্দী করিয়া বীমাভুক্ত রেল পার্সেলে সত্বর পাঠাইয়া দিবেন। কারণ, বিবাহের বাজারের চাহিদার সহিত তাল রাখিতে গিয়া আমার মজুত মাল প্রায় নিঃশেষ হইতে বসিয়াছে।

এই পত্রের সহিত আপনার মোকামের শ্রীহনুমানপ্রসাদের সাকরাণ-করা ২২৫০৲ দুইহাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকার একখানি মেয়াদী হুণ্ডি এবং ৭৫০৲ সাতশত পঞ্চাশ টাকার একখানি ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট্ পাঠাইলাম। হুণ্ডিখানি হনুমানপ্রসাদের ব্যাঙ্কে বাট্টা

বাদে ভাঙ্গাইয়া লইবেন এবং হুণ্ডি ও ড্রাফ্‌টের টাকায় পঞ্চাশ জোড়া শাড়ি অবিলম্বে সওদা করিয়া ও রেলপথে চালান দিয়া আমাকে রেল-রসিদ্ পাঠাইলেই আমি একশত জোড়া দাদনী শাড়ির জন্য আগাম ২০% শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে টাকা পাঠাইয়া দিব। আপনার রেল-রসিদের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান রহিলাম। ইতি—

ভবদীয়

শ্রীমনোহর দাস বর্মণ।

নমুনা : ৪। মাল বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্টকে নির্দেশ দান

শ্রীকৃষ্ণ সোপ্ ওয়ার্কস্

বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

শ্রীপদ্মলোচন হাজরা, তাং....১।৬।৬২

স্বত্বাধিকারী,

লক্ষ্মীনারায়ণ স্টোর্স,

জি. টি. রোড, আসানসোল।

প্রিয় পদ্মলোচনবাবু,

আপনার মজুত মালের বিবরণী দাখিল করিয়া ২৮।৫।৬২ তারিখে লিখিত যে পত্রখানি আপনি পাঠাইয়াছেন তাহা গতকল্য পাইলাম। বর্তমানে আপনার নিকট অত্যন্ত বেশি পরিমাণে মাল জমিয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে। অত্যধিক পরিমাণে মাল মজুত রাখিলে চাহিদা অনুযায়ী যোগান দেওয়ার ব্যাপারে যে অনেকখানি সাহায্য হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যাপারটি অন্যদিক হইতেও বিচারসাপেক্ষ। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে, একদিকে যেমন মূলধনের কিছুটা অংশ আটক পড়িয়া থাকে, তেমনই অন্যদিকে বীমার জন্য অধিক মাত্রায় প্রিমিয়ামও দিতে হয়। ফলে, ভাবী বিক্রয়ের সম্ভাবনায় অপেক্ষা করিতে গিয়া যে লাভ হয়, তাহার তুলনায় লোকসানের পরিমাণই বেশি হইয়া থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় আপনার মজুত মাল ১২½% শতকরা সাড়ে বারো টাকা হ্রাসমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুন।

এই প্রসঙ্গে আপনাকে ব্যবসায়িক দিক হইতে একটা অনুরোধ জানাইয়া রাখি। আমার দিক হইতে আপনাকে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী মাল সরবরাহ করিতে যখন কোনরূপ বিলম্ব হয় না, তখন, আপনি যদি বাজারের ভবিষ্যৎ রূপের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী মাল মজুত করেন, তাহা হইলে, এই ব্যবস্থা

অবলম্বনের ফলে আপনার এবং আমার উভয়েরই মঙ্গল হইবে। নচেৎ বারংবার হ্রাসমূল্যে বিক্রয় করার ফলে আমাদের উভয়েরই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য স্থানীয়-বাজারের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার দায়িত্ব আপনারই। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত, আমার অনুরোধ এবং আপনার অভিজ্ঞতাকে যাহা করণীয় মনে করেন তাহাই করিবেন। ইতি—

শ্রীকৃষ্ণকান্ত হাটি।

॥ অনুশীলনী ॥

১। বিদেশী কারবারের এজেন্সী লইবার উদ্দেশ্যে সেই কারবারের ,কর্তৃপক্ষকে নিজের ব্যবসায়ের বিবরণ দিয়া পত্র লিখ।

[ক. বি. (পার্ট ওয়ান) : ৬২]

[মন্তব্য : নমুনা : ১(ক)-এর অনুরূপ]

২। আপনার কারখানায় প্রস্তুত প্রসাধন-সামগ্রী বিক্রয় করিবার জন্য এজেন্সী গ্রহণের প্রস্তাব দিয়া 'কোচবিহার ভ্যারাইটি স্টোর্স'-এর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করুন।

৩। কলিকাতার 'হালদার কেমিক্যাল্‌স্‌'-এর নিকট তাঁহাদের তৈয়ারী একটি পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয়ের এজেন্সী প্রার্থনা করিয়া এমন একটি জায়গার ঔষধ-বিক্রেতা পত্র লিখিয়াছেন যেখানে পূর্ব হইতে আপনাদের এজেন্সী দেওয়া আছে। অতঃপর 'হালদার কেমিক্যালস' এর পক্ষ হইতে তাহাদের কর্তব্য স্থির করিয়া পত্রদাতার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করুন।

৪। বিক্রয়ের অবনতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এবং মাসিক বিক্রয়-বিবরণী প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানাইয়া আপনার এজেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখুন।

৫। আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে কাশ্মীরে শাল ক্রয় করিবার জন্য নিযুক্ত একজন এজেণ্ট সংগৃহীত মাল যেক্ষেত্রে রেলপথে পাঠাইলেও চলে সেক্ষেত্রে প্রায়ই আকাশপথে পাঠাইয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে আপনার ব্যবসার যে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা জানাইয়া আপনার এজেণ্টের নিকট একখানি পত্র লিখুন।

৬। কোন ভোগ্যপণ্যের সরবরাহকারকের নিকট উক্ত পণ্যদ্রব্যের এজেন্সী চাহিয়া তোমার নিজ কারবারের বিস্তৃত বিবরণসহ একটি পত্র লিখ।

[ব. বি. (পার্ট ওয়ান) : '৬৩]

[মন্তব্য : উত্তরটি নমুনা : ১-এর অনুরূপ হইবে।

ব্যাঙ্ক ও বীমা-সংক্রান্ত পত্র

(Banking and Insurance Lett---,

যদিও আমানত গ্রহণ ও ঋণ দান করাই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ তবুও বর্তমান-কালে ব্যাঙ্কগুলির কার্যক্ষেত্র আরও প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। আমানতকারীর পক্ষ হইতে তাঁহার নামে অন্য ব্যাঙ্কের চেকে টাকা আদায় করা, তাঁহার হুণ্ডি, ড্রাফট্, বণ্ড্ ইত্যাদি ভাঙ্গাইয়া দেওয়া, তাঁহার পক্ষ হইয়া বীমা কোম্পানি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে টাকা প্রেরণ করা, মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও দলিলপত্র গচ্ছিত রাখা, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা প্রভৃতি বহুবিধ কার্য ব্যাঙ্ক বর্তমানে করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত পত্রাদিও যে বহু ধরনের হইয়া থাকে তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। ঐরূপ বহুবিধ পত্রের কয়েকটি মাত্র নমুনা এখানে দেওয়া হইল।

নমুনা : ১। পাসবই হাল-নাগাদী (up-to-date) করিতে অনুরোধ।

চ্যাটার্জি পাব্লিশার্স
বি. সি. রোড, বর্ধমান।

দি ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ তাং····২০।৩।৬১
বর্ধমান শাখা,
বর্ধমান।

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৩১শে মার্চ আমাদের কারবারের বর্ষশেষ। সুতরাং উক্ত তারিখ পর্যন্ত লেনদেনের হিসাব অন্তর্ভুক্ত করিয়া আমাদের নাম ১০০২নং ও ২০৫০নং চলতি আমানতের পাসবই দু'খানিকে অনুগ্রহপূর্বক হাল-নাগাদী করিয়া ৭।৪।৬১ তারিখের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব।

এতদ্ভিন্ন, হিসাব-নিরীক্ষকের নিকট দাখিল করিবার জন্য উহার সঙ্গে একখানি উদ্বর্তপত্রও পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

অনুপত্রে : শ্রীব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়,
দুইখানি চলতি আমানতের কর্মাধ্যক্ষ,
পাসবই। চ্যাটার্জি পাব্লিশার্স

নমুনা : ২। চেক প্রত্যাখ্যানের কারণ জিজ্ঞাসা

(শিরোনামা ইত্যাদি পূর্ববৎ)

সবিনয় নিবদন,

আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গত ১০।১।৬২ তারিখে 'দামোদর ফার্নিচার্সে'র নামে মাত্র ১৫০৲ দেড় শত টাকার একখানি চেক দেওয়া হইয়াছিল—যাহার নম্বর হইতেছে গ/৩৪৪৫১। কিন্তু উক্ত চেকখানি আপনারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমাদের ধারণামত, জমা টাকার পরিমাণ কিংবা স্বাক্ষর ইত্যাদি কোন কারণেই উহা প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত নয়।

অতএব, এমতাবস্থায় উক্ত চেকখানি কি কারণে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে তাহা সত্বর জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ,
চ্যাটার্জি পাবলিশার্স্।

নমুনা : ২। (ক) ব্যাঙ্ক কর্তৃক চেক প্রত্যাখ্যানের কৈফিয়ৎ

দি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

বর্ধমান শাখা।

গ্রাম : ইউবি। তাং····১৮।১।৬২

ফোন : বার-৪৫

শ্রীব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়
কর্মাধ্যক্ষ,
চ্যাটার্জি পাবলিশার্স্।

মহাশয়,

আপনার ১৫।১।৬২ তারিখে লিখিত পত্রখানি পাইয়া আপনার অভিযোগ সম্পর্কে অবগত হইলাম। আপনি জানেন যে, আপনার নামে আমাদের চলতি আমানতে দুইটি হিসাব আছে। আপনি ভুল করিয়া 'গ' চিহ্নিত আমানতের চেক বহিতে 'ঘ' চিহ্নিত আমানত হইতে টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়াই আমাদের পক্ষে ওই

চেক গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। উহা গ্রহণ করিলে হিসাবের ক্ষেত্রে গরমিল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমরা এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছি।

আশা করি, এমতাবস্থায় আমাদের অক্ষমতার জন্য ক্রটি লইবেন না

ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীহিমেন্দুনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যানেজার,

দি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

বর্ধমান শাখা।

নমুনাঃ ৩। ব্যাঙ্ককে মেয়াদি হুণ্ডি সাকরাণ করিবার জন্য অনুরোধ

(শিরোনামা ইত্যাদি নমুনা—১এর অনুরূপ)

তাং····১।৪।৬২

সবিনয় নিবেদন,

ইংলণ্ড হইতে আমরা আনুমানিক ৩০০ তিনশত পাউণ্ড মূল্যের পুস্তক ছয় মাসের মেয়াদী হুণ্ডিতে আমদানি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি, কিন্তু ইংলণ্ডের রপ্তানিকারকের নিকট আমরা পরিচিত নই বলিয়া তাঁহারা আমাদের নামে হুণ্ডি পাঠাইতে অনিচ্ছুক। এমতাবস্থায় আপনাদের নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে, আপনারা যদি আমাদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের হুণ্ডি সাকরাণ করিয়া জাহাজী রসিদগুলি আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে, বিশেষভাবে উপকৃত হই। ইহাতে আপনাদের কোন ঝুঁকি লইতে হইবে না। কারণ, মালের বাজার-দর হুণ্ডির মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে এবং হুণ্ডির সহিত চালানী রসিদ ও বীমাপত্র থাকিবে। প্রসঙ্গত, প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, ছয় মাসের মধ্যেই আমরা উক্ত হুণ্ডির ভুক্তান দিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ আমাদের চলতি আমানতে জমা দিব।

আপনাদের সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডের রপ্তানিকারককে কোনরূপ নির্দেশ দিতে পারিতেছি না বলিয়া, অনুগ্রহপূর্বক সত্বর পত্রের উত্তর দানে বাধিত করিবেন

ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক, ইত্যাদি।

নমুনা : ৩। (ক) ব্যাঙ্কের অনুকূল উত্তর

(শিরোনামা ইত্যাদি নমুনা—২(ক)-এর অনুরূপ)

তাং····১০।৪।৬২

মহাশয়,

আপনার ১।৪।৬২ তারিখের পত্রের উত্তরে সানন্দে জানাইতেছি যে, আপনাদের পক্ষ হইয়া আমাদের দ্বারা ইংলণ্ডের উক্ত হুণ্ডি সাকরাণ করিবার কোন অসুবিধা হইবে না। তবে, কবে নাগাদ কোন্ রপ্তানিকারকের নিকট হইতে হুণ্ডি আসিতে পারে তাহা বিশদভাবে জানাইয়া দিলে বাধিত হইব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীহিমেন্দুনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যানেজার,

দি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

বর্দ্ধমান শাখা।

নমুনা : ৩। (খ) ব্যাঙ্কের প্রতিকূল উত্তর

(শিরোনামা ইত্যাদি পূর্ববৎ)

তাং····১০।৪।৬২

মহাশয়,

আপনার ১।৪।৬২ তারিখে লিখিত পত্রের উত্তর দিতে গিয়া কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করিতেছি। বর্তমানে বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদানকে কেন্দ্র করিয়া স্টার্লিং বিনিময় এরূপ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, সম্প্রতি আমাদের পক্ষে আপনার নির্দেশ অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করা একান্তই অসুবিধাজনক। নগদ মূল্যে স্টার্লিং বিনিময় নিয়ামকের নিকট হইতে স্টার্লিং সংগ্রহ করিতে না পারিলে এই প্রকার ঝুঁকি লইতে আমাদের ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ স্বীকৃত হন না।

আপনার নির্দেশ অনুযায়ী কার্য করিতে আমাদের অপারগতাজনিত ত্রুটি অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক, ইত্যাদি।

নমুনা : ৪। ব্যাঙ্কের নিকট ড্রাফট্-সংক্রান্ত পত্র

ম্যানেজার, পায়রাখানা গলি, বর্ধমান।
দি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ ১।৪।৫২
বর্ধমান শাখা,
বর্ধমান।

মহাশয়,

অনুগ্রহপূর্বক আমেরিকা-প্রবাসী শ্রীদিলীপরঞ্জন দের নামে 'ওয়ার্ল্ড্ ব্যাঙ্ক'-এর উপর একখানি ৩০০ তিনশত ডলারের ড্রাফট্ লিখিয়া তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন—

Dilip Ranjan De,
11064W, AVE 2,
Lancaster, California.

উক্ত ড্রাফটের বিনিময়-মূল্য আমার ৫০২১ সংখ্যক চল্‌তি আমানতের খাতে খরচ দেখাইয়া উক্ত সংখ্যক আমানতে আমার আর কত জমা রহিল তাহাও জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীপ্রদীপরঞ্জন দে।

নমুনা : ৪। (ক) ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে আমানতকারীর নিকট উত্তর

দি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
বর্ধমান শাখা

শ্রীপ্রদীপরঞ্জন দে, জি. সি. রোড, বর্ধমান
পায়রাখানা গলি, বর্ধমান। ৮।৪।৬২

মহাশয়,

আপনার ১।৪।৬২ তারিখে লিখিত পত্রখানি পাইয়া আমরা ৭।৪।৬২ তারিখে শ্রীদিলীপরঞ্জন দের নামে 'ওয়ার্ল্ড্ ব্যাঙ্ক'-এর উপর একখানি ৩০০ তিনশত ডলারের ড্রাফট্ লিখিয়া উক্ত দিবসেই উহা নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছি—

11064 W, AVE 2,
Lancaster, California.

উক্ত ড্রাফটের জন্য এই তারিখের বিনিময় হার প্রতি ডলার ৫৲ পাঁচ টাকা হিসাবে প্রেরণ ব্যয় ও পারিশ্রমিক (service charge) সমেত আপনার ব্যয় হইয়াছে মোট ১৫২৫·৮০ ন.প. (এক হাজার পাঁচশত পঁচিশ টাকা আশি নয়া পয়সা)।

উক্ত পরিমাণ টাকা খরচ লিখিয়া বর্তমানে আপনার হিসাবে জমা রহিল ৮০৮৫·৭০ ন.প. (আট হাজার পঁচাশি টাকা সত্তর নয়া পয়সা)। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক

শ্রীহিমেন্দুনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যানেজার,

দি ইউনাইটেড্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ,

বর্ধমান শাখা।

নমুনা : ৪। (খ) ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট পত্র

(শিরোনামা ও ঠিকানা পূর্ববৎ)

শ্রীদিলীপরঞ্জন দে,

11064W, AVE 2,

Lancaster, California.

মহাশয়,

বর্ধমানের শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীপ্রদীপরঞ্জন দে মহাশয়ের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা আপনার নিকট এই পত্রের সহিত 'ওয়ার্ল্ড্ ব্যাঙ্ক'-এর উপর আপনার নামে ৩০০ তিনশত ডলারের একখানি ড্রাফ্‌ট্ পাঠাইতেছি।

অনুগ্রহপূর্বক উহার তুই প্রস্থ প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক, ইত্যাদি।

ক্রোড় পত্র :

ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের উপর একখানি

৩০০ তিনশত সংখ্যক ডলারের ড্রাফট্

নমুনা : ৫। শেয়ার ক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্ককে অনুরোধ

(শিরোনামা ইত্যাদি নমুনা ৪-এর অনুরূপ)

তাং...১।৬।৬২

মহাশয়,

অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্য 'বেঙ্গল অয়েল কোং'-এর ৫০ খানি শেয়ার প্রতি শেয়ার অনধিক ১০০৲ একশত টাকা দরে ক্রয় করিয়া ক্রয়মূল্য ও কমিশন আমার ৫০২১ সংখ্যক চলতি আমানতের খাতে খরচ হিসাব লিখিয়া লইবেন এবং ক্রীত শেয়ার-পত্রগুলি আপনাদের জিম্মায় রাখিয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীপ্রদীপরঞ্জন দে।

নমুনা : ৫ (ক)। ব্যাঙ্কের উত্তর

(শিরোনামা ইত্যাদি নমুনা—৪(ক)-এর অনুরূপ)

তাং....৭।৬।৬২

মহাশয়,

আপনার ১।৬।৬২ তারিখে লিখিত পত্র অনুযায়ী আমরা আপনার পক্ষ হইতে ৬।৬।৬২ তারিখে 'বেঙ্গল অয়েল কোং'-এর ৫০ খানি শেয়ার প্রতি শেয়ার ৯৫৲ পাঁচানব্বই টাকা দরে ক্রয় করিয়াছি। এই কার্য বাবদ ব্যয় হইয়াছে নিম্নরূপ—

৯৫৲ দরে ৫০ খানি শেয়ার	.... টা,	৪৭৫০৲
শেয়ার প্রতি ৫০. ন. প. হিঃ দালালী	.... টা.	৪৭·৫০ ন. প.
শতকরা ৫০ ন. প. হিঃ ব্যাঙ্কের কমিশন	.... টা.	২৩·৭৫ ন. প.
মোট	.... টা.	৪৮২১·২৫ ন. প.

উপরোক্ত চার হাজার আটশত একুশ টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা আপনার ৫০২১ সংখ্যক চলতি আমানতের খাতে খরচ হিসাবে লিখিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ক্রীত শেয়ার-পত্রগুলি আপনার গ্রহণের জন্য আমাদের সংরক্ষণ বিভাগে পাঠাইয়া দিয়াছি। ঐগুলি আপনার সুবিধামত পত্র-প্রাপ্তির পনর দিনের

মধ্যে আসিয়া লইয়া যাইবেন। আর উক্ত সময়ের মধ্যে যদি ঐগুলি না লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে, নিরাপদ রক্ষণের জন্য উহাদের শতকরা মূল্যের উপর ৫৫ ন. প. হিসাবে সংরক্ষণ-ব্যয় আপনাকে বহন করিতে হইবে। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক, ইত্যাদি

নমুনা : ৬। ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের জন্য আবেদন

দি গুড্ উইল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

ফোন : আসান-২৯৮ ১, নেতাজী সুভাষ রোড্

গ্রাম : গুড্লি আসানসোল।

এজেণ্ট, তাং… ১।৬।৬৪

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ

(আসানসোল শাখা)

জি. টি. রোড, আসানসোল।

বিষয় : ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ঋণের আবেদন।

হিসাব সংখ্যা : চলতি হিসাব—৫৩৩২

মহাশয়,

আমাদের এই শিল্প-সংস্থাটি জাতীয় শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে সামান্য হইলেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছে দীর্ঘ ২০ বৎসর যাবৎ এবং আপনাদের ব্যাঙ্কের সহিত আমাদের সম্পর্কও তদবধি।

বর্তমান সঙ্কটাবস্থায় আমাদের সরকার নীতি হিসাবে শিল্পপ্রসারের উপর যে-অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, আমরা তাহা সমর্থন করি। সম্প্রতি সরকারের এই মূল্যবান নীতিটিকে কার্যকরী করার ব্যাপারে আমরা উদ্যোগী হইয়াছি এবং আমাদের ব্যবসায়টিকে সম্প্রসারিত করার জন্য চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু, আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতিরেকে আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না।

সেইজন্য, আপনাদের নিকট আমাদের আবেদন এই যে, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে আপনারা ১০,০০০ দশহাজার টাকা ঋণ দিয়া সাহায্য করুন। এই ঋণ আমরা পাঁচ বৎসরের মধ্যে সুদসহ পরিশোধ করিয়া দিব। এইজন্য আমরা

আমাদের শিল্পসংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ আপনাদের নিকট বন্ধক রাখিতে প্রস্তুত আছি।

অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই আবেদন সম্পর্কে আপনাদের মতামত ও অন্যান্য সর্তাবলী সত্বর জানাইয়া বাধিত করুন। ধন্যবাদান্তে—

পি. সি. মিত্র,
জেনারেল ম্যানেজার, দি গুড উইল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ

নমুনা: ৭। **রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পত্রালাপ**

ওরিয়েন্টাল স্টীল কোং লিঃ

বার্ণপুর

ফোন: ১৮২ গ্রাম: ওরিস্

তাং—১৫।৬।৬৪

গভর্ণর,
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
বোম্বাই-১।

বিষয়: বিদেশী মুদ্রার জন্য আবেদন।

সূচক সংখ্যা: ও-বি/২০১/৬৪

মাননীয় মহাশয়,

বিদেশী মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের বর্তমান নীতি সম্পর্কে আমরা অবহিত হইয়াও নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ কারণে আমাদের ২,০০০ দুই হাজার পাউণ্ড মূল্যের বিদেশী মুদ্রা অনুমোদন করিবার জন্য আবেদন জানাইতেছি।

আমাদের কারখানা সম্প্রসারণের জন্য আমরা ইংলণ্ড হইতে একটি যন্ত্র আমদানি করিতে মনস্থ করিয়াছি। এই যন্ত্রটি আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না। অথচ, বিদেশ হইতে এই যন্ত্রটি কিনিয়া আনিয়া আমাদের কারখানায় বসাইতে পারিলে আমাদের কারখানার উৎপাদন ৩০% শতকরা তিরিশ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। আমাদের কারখানাজাত দ্রব্য পূর্ব হইতেই বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়া আসিতেছে। এই যন্ত্রটি বসাইতে পারিলে আমরা আমরা আরও বেশি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করিয়া আরও বেশি করিয়া বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিতে সক্ষম হইব।

আশা করি, বিদেশী মুদ্রার জন্য আমাদের আবেদনের যৌক্তিকতা আপনি উপলব্ধি করিবেন এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

এন. কে. বিশ্বাস
জেনারেল ম্যানেজার,
ওরিয়েণ্টাল স্টীল কোং লিঃ।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধরনের বীমা হইয়া থাকে এবং তদনুযায়ী বীমা-সংক্রান্ত পত্রও হয় বিভিন্ন ধরনের। তবে বহুবিধ বীমার মধ্যে প্রধান হইতেছে, (ক) জীবন-বীমা (Life Insurance), (খ) অগ্নি-বীমা (Fire Insurance) এবং (গ) নৌ-বীমা (Marine Insurance)। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিকে কেন্দ্র করিয়া এত বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয় যে, এতদ্‌সংক্রান্ত পত্রাবলীরও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। এখানে সামান্য কয়েকটির নমুনা দেওয়া হইবে।

জীবন-বীমা—প্রধানত দুই শ্রেণীর হয়—আজীবন-বীমা (Whole life Policy) এবং মেয়াদী-বীমা (Endowment Policy)। উভয় বীমাতেই বীমাকারী তাঁহার দাবীদার (nominee) নির্বাচন করিয়া যাইতে পারেন। মেয়াদী-বীমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হইলে বীমাকারী নিজেই বীমাকৃত অর্থ গ্রহণ করেন, অথবা মেয়াদকালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার দাবীদার বা আইনসম্মত উত্তরাধিকারী ওই অর্থ পান। এইরূপ বীমায় বীমাকারীকে মেয়াদকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিয়া যাইতে হয়। আজীবন-বীমায় বীমাকারীকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত প্রিমিয়াম দিতে হয়, কিন্তু বীমাকৃত অর্থ দেওয়া হয় তাঁহার মৃত্যুর পরে। মেয়াদী এবং আজীবন উভয় বীমাই-লভ্যাংশযুক্ত (with profit) এবং লভ্যাংশ বিহীন (without profit) হইতে পারে। তবে প্রথম ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার বেশি।

১৯৫৬ সালে জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠানগুলি রাষ্ট্রায়ত্তে আসিবার পর হইতে ইহার কার্যকলাপ বহুদিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে যৌথ জীবন-বীমা (joint policy), বহুমুখী (multipurpose), কন্যার বিবাহ (marriage policy), সন্তানদের শিক্ষা (education policy) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর হইয়া থাকে।

সাধারণত, দুই বৎসর প্রিমিয়াম দেওয়ার পর বীমাপত্র বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যর্পণ (surrender) করিলে বীমার মূল্যস্বরূপ কিছু নগদ টাকা পাওয়া যায়। উহাকে প্রত্যর্পণ-মূল্য (surrender value) বলা হয়। প্রয়োজন হইলে, বীমাকারী বীমা-প্রতিষ্ঠানের নিকট বীমাপত্র গচ্ছিত রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে পারেন। বীমা-পত্রে প্রত্যর্পণ-মূল্য জমিবার পর বীমাকারী যদি আর নিয়মিতভাবে প্রিমিয়াম দিতে

সক্ষম না হন, তাহা হইলে, তিনি বীমাটিকে আদায়ীকৃত (paid-up policy) বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ ঘটিলে তাঁহাকে আর প্রিমিয়াম দিতে হয় না এবং উক্ত পরিমাণে টাকা তিনি বীমার মেয়াদ শেষ হইবার পরেই পাইবার অধিকারী।

জীবন-বীমা সংক্রান্ত পত্র

নমুনা : ১। **প্রিমিয়ামের কিস্তির পরিবর্তন**

১/১ রামচাঁদ নন্দী লেন,
কলিকাতা-৬।
২।১।৬০

লাইফ ইনস্যুরেন্স্ কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া,
বিভাগীয় কার্যালয়,
র‍্যালি বিল্ডিং, স্ট্র্যাণ্ড রোড,
কলিকাতা।

বীমাপত্র সংখ্যা : ১০০০৫৩ (নিজ নামে)

সবিনয় নিবেদন,

আমার উপরোক্ত সংখ্যক বীমাপত্রটির জন্য প্রিমিয়ামটি ত্রৈমাসিক পর্যায়ের। সম্প্রতি নানাবিধ কারণে, আমি প্রিমিয়ামের সময়টি বার্ষিক করিয়া লইতে চাহি। উক্ত বীমাপত্রটির জন্য আমি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে গত তিন বৎসর ধরিয়া নিয়মিতভাবে প্রিমিয়াম দিয়া আসিয়াছি। চতুর্থ বৎসরের প্রথম কিস্তির প্রিমিয়াম দিবার তারিখ হইতেছে ১৫।২।৬০। যেহেতু, বর্তমান বৎসর হইতেই আমি আমার বীমাপত্রটিকে বার্ষিক কিস্তিতে দেয় হিসাবে পরিণত করিয়া লইতে চাই, সেই হেতু, এ-সম্পর্কে আমার যাহা করণীয় তাহা সত্বর জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। ইহা ভিন্ন, উক্ত বীমাপত্রটির জন্য বার্ষিক কিস্তিতে প্রিমিয়ামের হারই বা কিরূপ হইবে এবং এইরূপ পরিবর্তনের ফলে কোনপ্রকার ছাড় (rebate) পাওয়া যাইবে কিনা তাহাও জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীঅরবিন্দ ভট্টাচার্য।

নমুনা : ২। **মূল প্রস্তাবের পরিবর্তন**

৫০, আর. এল. মিত্র রোড
বেলেঘাটা, কলিকাতা
১।৪।৬২

(অন্তবর্তী ঠিকানা পূর্ববৎ)

বীমাপত্র সংখ্যা : মেয়াদী বীমা নং ২৩২৩২৩ (নিজ নামে)

সবিনয় নিবেদন,

আমার উপরোক্ত বীমাটি ৩০ ত্রিশ বৎসরের মেয়াদী বীমাপত্র। বর্তমানে উক্ত মেয়াদ কিছু কমাইয়া উহাকে ২০ কুড়ি বৎসরের মেয়াদী বীমাপত্রে পরিণত করিতে

ইচ্ছা করি। এ-সম্পর্কে আমাকে কি কি করিতে হইবে তাহা জানাইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীপার্থপ্রতিম পাল।

নমুনা: ৩। বীমা প্রত্যর্পণের প্রস্তাব

(অন্তর্বর্তী ঠিকানা পূর্ববৎ) ৫৫, কাঁসারীপাড়া রোড,
কলিকাতা-২৫।

বিষয়: আমার বীমাপত্র সংখ্যা—১১২২৩৩।

সবিনয় নিবেদন,

নানাবিধ আর্থিক কারণে সম্প্রতি আমার পক্ষে উপরোক্ত বীমার জন্য নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করা প্রায় সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সম্প্রতি আমার কিছু নগদ টাকারও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে বটে। এই সমস্ত কারণে আমি আমার বীমাটি প্রত্যর্পণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি।

অতএব অনুগ্রহপূর্বক আপনারা যদি আমাকে উক্ত বীমার প্রত্যর্পণ-মূল্য কত হইবে এবং কত দিনের মধ্যে উহা পাওয়া যাইবে তাহা জানাইয়া এ-সম্পর্কে আমার কর্তব্য সম্পর্কে আমাকে নির্দেশ দেন, তাহা হইলে, বিশেষ উপকৃত হইব।

আশা করি, সত্বর উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীপ্রীতিভূষণ মল্লিক

নমুনা: ৩ (ক)। বীমা-প্রতিষ্ঠানের উত্তর

লাইফ ইনস্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

বিভাগীয় কার্যালয়।

ফোন: ৩৪-৪৪৩৩
৩৪-৪৪৩৪

'র‍্যালি বিল্ডিং',
স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

শ্রীপ্রীতিভূষণ মল্লিক,
৫৫, কাঁসারীপাড়া রোড,
কলিকাতা-২৫।

বীমাপত্র সংখ্যা—১১২২৩৩,

মহাশয়,

আপনার ২।৬।৬২ তারিখের পত্র পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। বাস্তব জীবনে প্রত্যেককেই কিছু না কিছু আর্থিক দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া, কোন স্থায়ী পরিকল্পনাকে অসম্পূর্ণ রাখা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়াই আমাদের ধারণা। সেইজন্য, আপনার প্রস্তাব সম্পর্কে আপনাকে পুনর্বার বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

তবে, উক্ত পত্রে আপনি যাহা জানিতে চাহিয়াছেন সে-সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, এ-পর্যন্ত আপনার বীমাপত্রে যে-পরিমাণ টাকা জমা পড়িয়াছে তাহাতে ৯০% শতকরা নব্বই টাকা হারে উহার প্রত্যর্পণ মূল্য দাঁড়ায় ১৩৫০৲ এক হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা। বলা বাহুল্য যে এইরূপ ব্যবস্থার ফলে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্তই হইতে হইবে। কারণ, কিস্তিতে কিস্তিতে যে পরিমাণ টাকা আপনি জমা দিয়াছেন ফিরিয়া পাইতেছেন তাহা অপেক্ষা ১০% শতকরা দশ টাকা কম।

পক্ষান্তরে, আপনি যদি উক্ত বীমাপত্রের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করিতে রাজি থাকেন, তাহা হইলে, আমরা আপনার প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ৮০% শতকরা আশি ভাগ অর্থাৎ ১২০০৲ বারশত টাকা পর্যন্ত ৬% শতকরা ছয় টাকা হার সুদে ঋণ অনুমোদন করিতে পারি। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে, একদিকে যেমন আপনার স্থায়ী পরিকল্পনাটি বিপর্যস্ত হইবে না, তেমনই অন্যদিকে অর্থানুকূল্য ঘটিলেই আপনি আপনার সুবিধামত ঋণ শোধ করিতে সক্ষম হইবেন। অবশ্য একবার প্রত্যর্পণ করিয়া পরে আবার আপনি আপনার সুবিধামত জীবন-বীমা করিতে পারেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে অসুবিধাও আছে অনেক। প্রথমতঃ, আপনার বয়স বাড়িয়া যাওয়ার ফলে প্রিমিয়ামের হার হইবে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি। দ্বিতীয়তঃ, নূতন করিয়া বীমা করাইবার সময় আপনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের চিকিৎসকের অভিমত যদি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে, আপনি জীবন-বীমার সর্বপ্রকার সুযোগ হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং আমাদের অনুরোধ, সমস্ত দিকগুলি ভাবিয়া আপনি আপনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করুন।

আপনার সুচিন্তিত নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীরাখোহরি মিশ্র,
বিভাগীয় কর্মাধ্যক্ষ।

নমুনা : ৪। বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়া ঋণের জন্য আবেদন।

আঞ্চলিক ম্যানেজার,
পূর্বাঞ্চল,
ভারতীয় জীবনবীমা নিগম,
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস,
কলিকাতা।

মহাশয়,

গত পনেরো বৎসর হইল আমি ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের অধীনে কুড়ি বছরের মেয়াদে দশ হাজার টাকার একটি পলিসি খুলিয়াছিলাম এবং এ পর্যন্ত নিয়মিত-ভাবে উহার প্রিমিয়াম দিয়া আসিতেছি। আমার বীমাপত্রের নম্বর হইতেছে ৪৩৮৮৭৬। আমার এই পনেরো বৎসরের মধ্যে আমি জীবনবীমা নিগম হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই। কিন্তু, বর্তমানে আমার পারিবারিক প্রয়োজনে কিছু ঋণ করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

এমতাবস্থায় আপনার কাছে আমার অনুরোধ এই যে, উক্ত বীমাপত্রের উপর সর্বাধিক কত টাকা ঋণ পাইতে পারি এবং উহা কতদিনের মধ্যে কয় কিস্তিতে পরিশোধনীয় তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাইয়া বাধিত করিবেন। উপরন্তু, আপনারা ঋণের উপর শতকরা কত টাকা হারে সুদ লইয়া থাকেন তাহাও জানাইলে বাধিত হইব। এ ব্যাপারে আপনাদের যে সমস্ত সর্ত আছে তাহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত। ধন্যবাদান্তে—

৪।২-বি, হিদারাম ব্যানার্জি লেন,
কলিকাতা-১২
১৫।৬।৬৪

নিবেদক,
অমিয় চক্রবর্তী

(খ) অগ্নি-বীমা সংক্রান্ত পত্র

আকস্মিক ভাবে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় বীমা-প্রতিষ্ঠানের সহিত বীমাকারী যে-চুক্তি করেন তাহাকেই **অগ্নি-বীমা** বলা হয়। অগ্নি-বীমা কেবলমাত্র ক্ষতিপূরণের চুক্তি (Indemnity contract) বলিয়া ক্ষতি না হইলে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন অবান্তর সেক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের টাকাও প্রত্যর্পণ করা হয় না। আর, ক্ষতি হইলে মালের মূল্যই ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হয়—সম্ভাব্য

লাভের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর অগ্নি-বীমার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) **নির্দিষ্ট বীমা** (Specific Policy)—এই শ্রেণীর বীমায় মালের যে মূল্য লিখিত থাকে ক্ষতিপূরণের সময় সেই নির্দিষ্ট মূল্যই দেওয়া হয়।

(২) **গড়পড়তা বীমা** (Average Policy)—এই শ্রেণীর বীমায় সমগ্র মালের মোট মূল্যের যত অংশের উপর চুক্তি করা হয় সেই অনুপাতেই ক্ষতিপূরণ করা হয়।

(৩) **চলতি বীমা** (Floating Policy)—এই শ্রেণীর বীমায় বিভিন্ন স্থানে মজুত মালের উপর একত্রে চুক্তি করা হয়।

(৪) **বিজ্ঞপ্তি বীমা** (Declaration Policy)—পরিবর্তনশীল মূল্যের মালের উপরেই এই শ্রেণীর বীমা করা হয়।

নমুনা : ৪। বীমার আবেদন।

দি ইস্টার্ন এক্সপোর্টার্স লিঃ

গ্রাম : এক্সপোর্ট ১১১, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন : ২৪-৬২২৪ ১।১২।৬১

দি বেঙ্গল ইনস্যুরেন্স কোং লিঃ

৭৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

সবিনয় নিবেদন,

'দি ইস্টার্ন এক্সপোর্টার্স লিঃ'-এর পরিচালকবর্গ কোম্পানির নিজস্ব গুদামে রক্ষিত যাবতীয় মাল ও গুদামের আসবাবপত্রের উপর আগামী বৎসরের জন্য ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি চলতি অগ্নি-বীমা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আমার উপর আপনাদের সহিত যোগাযোগ করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। সেই কারণে, আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, এতদ্-সংক্রান্ত প্রিমিয়াম-হার ও নিয়মাবলী যদি আপনারা আমার নিকট সত্বর প্রেরণ করেন, তাহা হইলে, আমি বর্তমান বৎসরের সমাপ্তি সভায় পরিচালকবর্গের নিকট উহা উপস্থাপন করিতে সক্ষম হইব। সুতরাং এ-সম্পর্কে আপনাদের মতামত যথাশীঘ্র জানাইয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীঅতনু মজুমদার,
কর্মাধ্যক্ষ,
দি ইস্টার্ন এক্সপোর্টার্স লিঃ।

নমুনা : ৪ (ক)। বীমা-প্রতিষ্ঠানের উত্তর।

(শিরোনামা, অন্তর্বর্তী ঠিকানা ইত্যাদি যথারীতি)

৫।১২।৬১

মহাশয়,

আপনার ১।১২।৬১ তারিখে লিখিত অগ্নি-বীমা সম্পর্কে অনুসন্ধান-পত্রখানি পাইয়া আমরা আনন্দিত এবং এজন্য আপনাকে ও আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী ও প্রিমিয়ামের হার সংক্রান্ত ব্যাপারে অনুষ্ঠান-পত্রের একটি কপি এই পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। এ-সম্পর্কে আপনাদের সহিত বিশদ-ভাবে আলোচনা করিবার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন এজেণ্ট শীঘ্রই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তবে, তৎপূর্বেই আমাদের প্রেরিত অনুষ্ঠানপত্র হইতে আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, অন্য যে-কোন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় আমাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী ও প্রিমিয়ামের হার বীমাকারীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই রচিত হইয়াছে। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীঅসিতবরণ সেন,

আধিকারিক,

অগ্নি-বীমা বিভাগ

ক্রোড়পত্র :—

একটি অনুষ্ঠান-পত্র।

নমুনা : ৫। ক্ষতিপূরণের দাবী।

(শিরোনামা ইত্যাদি নমুনা ৪-এর অনুরূপ)

তাং····২।১।৬২

আমাদের অগ্নি-বীমা পত্রসংখ্যা—৪১২

সবিনয় নিবেদন,

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত রাত্রে আমাদের ১১১, স্ট্র্যাণ্ড রোডে অবস্থিত গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে আনুমানিক ২৫,০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারটি আমাদের গোচরীভূত হইবামাত্রই আমরা দমকলবাহিনীকে সংবাদ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত মাল সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে পাওয়া যায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে হিসাবের খাতাপত্র উপরতলায় ছিল বলিয়া ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একটা অনুমান করিতে পারিয়াছি।

যাহাই হোক্, অনুগ্রহ করিয়া সত্বর আপনাদের একজন প্রতিনিধিকে এখানে পাঠাইবেন এবং ক্ষতিপূরণের দাবীর জন্য আমাকে কি কি করিতে হইবে ও কবে নাগাদ ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইবে তাহা জানাইয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীঅতনু মজুমদার,
কর্মাধ্যক্ষ
দি ইস্টার্ন এক্সপোর্টার্স্ লিঃ।

নমুনা ঃ ৫ (ক)। বীমা প্রতিষ্ঠানের উত্তর।

(শিরোনামা ইত্যাদি যথারীতি)

অগ্নি-বীমা পত্রসংখ্যা—৪১২

মহাশয়,

আপনার গতকল্যকার পত্র হইতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে আপনাদের যে সমূহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

অদ্যই আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে তাঁহার প্রয়োজন অনুযায়ী হিসাবের খাতাপত্র ইত্যাদি দেখিবার সুযোগ দিয়া বাধিত করিবেন। তাঁহার সহিত একখানি দাবী-পত্রের ফর্মও পাঠানো হইল। উহা যথাযথভাবে পূরণ করিয়া আমাদের নিকট সত্বর ফেরৎ পাঠাইবেন। অতঃপর আমরা আমাদের যাহা করণীয় তাহা অবশ্যই করিব। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীঅসিতবরণ সেন,
আধিকারিক,
অগ্নি-বীমা বিভাগ।

(গ) নৌ-বীমা সংক্রান্ত পত্র

বিভিন্ন শ্রেণীর নৌ-বীমার মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) **নির্দিষ্ট নৌ-বীমা (Voyage Policy)**—এই শ্রেণীর বীমায় জাহাজের নাম করিয়া কত টাকার কোন মাল কোথায় প্রেরিত হইতেছে তাহার উল্লেখ করিয়া সেইটুকুর জন্যই শুধু বীমা করা হয়।

(২) **চলতি বীমা** (Floating Policy)—এই শ্রেণীর বীমায় নির্দিষ্ট কোন জাহাজের নাম থাকে না। নির্দিষ্ট পথে নিয়মিত জাহাজযোগে মাল পাঠাইতে হইলে ব্যবসায়ী প্রতি ক্ষেপের (voyage) জন্য বার বার বীমা না করিয়া এককালীন অধিক টাকা দিয়া একটি বীমা করাইয়া রাখেন এবং প্রতি ক্ষেপে কত টাকার মাল কোন্ জাহাজে যাইতেছে তাহা বীমা-প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়া দিয়া সেই ক্ষেপের উপযুক্ত বীমাপত্র আনেন ও তাহা জাহাজী রসিদের সহিত ক্রেতার নিকট পাঠাইয়া দেন। এইরূপে ওই বীমাপত্রের পরিমাণ শেষ হইয়া গেলে ব্যবসায়ী নূতন আর একটি বীমা করাইয়া লন। এই শ্রেণীর বীমায় প্রিমিয়ামের হার কিছু কম হইয়া থাকে।

(৩) **নির্দিষ্ট-মূল্য নৌ-বীমা** (Valued Policy)—এই শ্রেণীর বীমার উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পণ্যের মূল্য স্থির করা হয় এবং ক্ষতি হইলে স্থিরীকৃত মূল্যই ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দেওয়া হয়।

(৪) **অনির্দিষ্ট-মূল্য নৌ-বীমা** (Unvalued Policy)—চুক্তি করিবার সময় এই শ্রেণীর বীমায় পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট হয় না—ক্ষতির পরে তাহা প্রমাণ করিয়া ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে হয়।

নৌ-বীমায় ক্ষতিপূরণের দাবী দুই প্রকারের হইয়া থাকে—আংশিক (Partial) এবং সামগ্রিক (Total)। মালের আংশিক ক্ষতি হইলে হয় আংশিক ক্ষতি এবং সামগ্রিক ক্ষতি হইলে হয় সামগ্রিক ক্ষতি। আংশিক ক্ষতি আবার দুই প্রকারের হইতে পারে—সাধারণ গড়পড়তা (General Average) এবং ব্যক্তিগত (Particular Average)। যখন জাহাজের সকলেরই স্বার্থে কোন মাল নষ্ট করিয়া ফেলা হয় তখন সেই ক্ষতি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকলকেই নির্দিষ্ট অনুপাতে বহন করিতে হয় বলিয়া উহাকে বলে সাধারণ গড়পড়তা ক্ষতি। আর ক্ষতি যদি ব্যক্তিবিশেষকেই বহন করিতে হয়, তাহা হইলে, হয় ব্যক্তিগত ক্ষতি। সামান্য কয়েকটির নমুনা নিচে দেওয়া হইল।

নমুনা : ৬। বীমার আবেদন

দি বেঙ্গল এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ

ম্যানুফ্যাক্চারার্স অ্যাণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স

গ্রাম : এঞ্জিনীয়ার ৭০, পার্ক ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ফোন : ৩৩-৩৩৩৩ ১।৩।৬২

দি বেঙ্গল ইন্স্যুরেন্স্ কোং লিঃ

৭৮, নেতাজী সুভাষ রোড্, কলিকাতা।

সবিনয় নিবেদন,

'এস্. এস্. কুমারী' নামক জাহাজে আমরা আমাদের কারখানায় প্রস্তুত ৫০,০০০৲ পঞ্চাশ্ হাজার টাকা মূল্যের টেবিল ফ্যান ও সিলিং ফ্যান আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই রেঙ্গুন বন্দরে রপ্তানি করিতে চাই। রপ্তানিযোগ্য এই মালের সর্বাধিক ঝুঁকি লইয়া আপনারা নৌ-বীমা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিলে অনুগ্রহপূর্বক সত্বর জানাইয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীবিপিনবিহারী প্রামাণিক,

কর্মাধ্যক্ষ,

দি বেঙ্গল এঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ।

নমুনা : ৬ (ক)। বীমা-প্রতিষ্ঠানের উত্তর

(শিরোনামা ইত্যাদি যথারীতি) তাং........৩।৩।৬২

মহাশয়,

আপনার ১।৩।৬২ তারিখে লিখিত পত্রখানি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম এবং উল্লিখিত রপ্তানিযোগ্য পণ্যের জন্য আপনি আমাদের নিকট নৌ-বীমা করিবার জন্য যে-প্রস্তাব দিয়াছেন তাহার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

'এস্. এস্. কুমারী' জাহাজযোগে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের টেবিল ফ্যান ও সিলিং ফ্যান সর্ববিধ ঝুঁকি লইয়া বিদেশে প্রেরণ করিবার জন্য আমরা ৫% শতকরা পাঁচ টাকা হারে প্রিমিয়াম লইয়া থাকি। এখন আপনার নিকট হইতে স্বীকৃতি-জ্ঞাপক পত্র পাইলেই আমরা বীমাপত্র প্রস্তুত করিয়া আপনার নিকট প্রেরণ করিব।

এ-সম্পর্কে আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলাম। ইতি—

নিবেদক,

শ্রীবৃন্দাবন পালিত

আধিকারিক, নৌ-বীমা বিভাগ

নমুনা ঃ ৭। মাল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপন

ইন্‌টারন্যাশনাল জুট এক্সপোর্টার্স্ লিঃ

গ্রাম ঃ জুটেক্স্ — ১০০, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

ফোন ঃ ২৪-২২২২ — ৪।৬।৬২

আধিকারিক,

নৌ-বীমা বিভাগ,

দি বেঙ্গল ইন্‌স্যুরেন্স কোং লিঃ

৭৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

নৌ-বীমাপত্র সংখ্যা—খ ৪৪০০।

মহাশয়,

এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে, কলম্বোগামী 'এস্. এস্. বারিধি' নামক জাহাজের খোলে অগ্নিকাণ্ড হওয়ার ফলে আমাদের রপ্তানিকৃত ১০,০০০ দশ হাজার টাকা মূল্যের ১০০ একশত গাঁইট পাটের মধ্যে ৫০ গাঁইট পাট সম্পূর্ণভাবে এবং ২০ গাঁইট পাট আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। উক্ত তথ্য আমাদের কলম্বোস্থিত আমদানিকারক মারফত প্রাপ্ত ও আপনাদের কলম্বোস্থ মনোনীত পরিদর্শকের বিবৃতি দ্বারা সমর্থিত। আমাদের আমদানিকারক এবং আপনাদের মনোনীত পরিদর্শক এই উভয়েরই পত্রের অনুলিপি এখানে সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

আপনাদের পরিদর্শকের বিবৃতি এবং আমাদের আমদানিকারকের দাবী অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ হইতেছে নিম্নরূপ—

১।	প্রতি গাঁইট ১০০৲ হিঃ সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ গাঁইট পাটের দাম—	৫,০০০৲
২।	" " ৫০৲ হিঃ আংশিকভাবে " ২০ " " " —	১,০০০৲
৩।	আপনাদের মনোনীত পরিদর্শকের পারিশ্রমিক—	১০০৲
	মোট—	৬,১০০৲

আশা করি ইতিমধ্যে আপনারা আমাদের আমদানিকারক 'সাহু এণ্ড জৈন কোং লিঃ'-এর নিকট হইতে দাবীজ্ঞাপক পত্র পাইয়া থাকিবেন। অনুগ্রহপূর্বক এ-সম্পর্কে আপনাদের যথাকর্তব্য সম্পাদন করিয়া আমাদের বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তী

ম্যানেজার,

ইণ্টারন্যাশনাল জুট এক্সপোর্টার্স্ লিঃ।

ক্রোড়পত্র :—

১। আমদানিকারকের পত্রের অনুলিপি।

২। পরিদর্শকের বিবৃতির অনুলিপি।

মূল পত্রের অনুলিপি আমদানিকারক 'সাহু অ্যাণ্ড জৈন কোং লিঃ'-এর নিকট প্রেরণ করা হইল।

....

স্বাক্ষর।

নমুনা : ৭ (ক)। আমদানিকারকের পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণের দাবী

সাহু এণ্ড জৈন কোং লিঃ

৭০, পার্লামেণ্ট রোড, কলম্বো।

৩।৬।৬২

(অন্তর্বর্তী ঠিকানা পূর্ববৎ)

বিষয় : খ ৪৪০০ সংখ্যক নৌ-বীমাপত্রের উপর দাবী।

মহাশয়,

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, 'ইণ্টার-ন্যাশনাল জুট এক্সপোর্টার্স্ লিঃ' কর্তৃক 'এস্. এস্, বারিধি' জাহাজযোগে প্রেরিত ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা মূল্যের ১০০ গাঁইট পাটের মধ্যে জাহাজের খোলে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৫০ গাঁইট সম্পূর্ণরূপে এবং ২০ গাঁইট আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আপনাদের এখানকার মনোনীত পরিদর্শকের বিবৃতি অনুযায়ী ক্ষতির মোট পরিমাণ হইতেছে নিম্নরূপ—

(নমুনা : ৭-এর অনুরূপ)

অতএব, মহাশয়, সত্বর ৬,১০০৲ ছয় হাজার একশত টাকা উপরোক্ত বীমাপত্রের ক্ষতিপূরণ বাবদ পাঠাইয়া আমাদের বাধিত করিবেন। আপনাদের পরিদর্শকের বিবৃতির অনুলিপি, বীমাপত্র ও রপ্তানিকারীর চালান এই পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীবিমলাপ্রসাদ জৈন

অংশীদার,

সাহু অ্যাণ্ড জৈন কোং লিঃ।

ক্রোড়পত্র :

(যথারীতি)

মূল পত্রের অনুলিপি রপ্তানিকারী 'ইণ্টারন্যাশনাল জুট এক্সপোর্টার্স্ লিঃ'-এর নিকট প্রেরণ করা হইল।

....

স্বাক্ষর।

নমুনা : ৭ (খ)। বীমা-প্রতিষ্ঠানের উত্তর (প্রথম পত্র)

(শিরোনামা ও ঠিকানা যথারীতি)

শ্রীবিমলাপ্রসাদ জৈন, তাং·······৬।৬।৬২

অংশীদার,

সাহু অ্যাণ্ড জৈন কোং লিঃ,

৭০, পার্লামেণ্ট রোড, কলম্বো।

পূর্বসূত্র : খ ৪৪০০ সংখ্যক নৌ-বীমাপত্রের উপর দাবী।

মহাশয়,

আপনাদের ও আপনাদের রপ্তানিকারী 'ইণ্টারন্যাশনল জুট এক্সপোর্টার্স লিং'-এর যথাক্রমে ৩।৬।৬২ ও ৪।৬।৬২ তারিখে লিখিত পত্র দুইখানি পাইয়া উক্ত ক্ষতির জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এ-সম্পর্কে আমরা আমাদের কলম্বোস্থিত পরিদর্শক ও 'ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশনে'র নিকট পত্র লিখিয়াছি। কিন্তু, তাঁহাদের নিকট হইতে উত্তর পাইবার পূর্বে আমাদের পক্ষে কোন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না।

যাহা হোক্, ইতিমধ্যে আপনারা আপনাদের দাবীভুক্ত আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ২০ গাইট পাট স্বতন্ত্রভাবে যথাসম্ভব সুরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া দিবেন এবং এ-সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত জানাইবার পর তবেই আপনারা ঐগুলির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক

শ্রীবৃন্দাবন পালিত,

আধিকারিক,

নৌ-বীমা বিভাগ

নমুনা : ৭ (গ)। বীমা-প্রতিষ্ঠানের উত্তর (দ্বিতীয় পত্র)

(শিরোনামা ইত্যাদি যথারীতি)

তাং·······১৫।৬।৬২

মহাশয়,

আমাদের ৬।৬।৬২ তারিখে লিখিত পত্রের সূত্র ধরিয়া আপনাদের জানাইতেছি যে, আপনাদের ক্ষতিপূরণ দাবীর প্রথম দফাটি আমাদের প্রতিষ্ঠান মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ২০ গাইট পাট সম্পর্কে আপনারা যে-দাবী জানাইয়াছেন সে-সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, উক্ত পরিমাণ মালের জন্য প্রতি গাইট ২০৲ কুড়ি টাকা হিসাবে ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত আছি। আমাদের এই প্রস্তাবে আপনারা যদি রাজী না থাকেন, তাহা হইলে, উক্ত ২০ গাইট পাট

আপনারা আমাদের মনোনীত পরিদর্শকের জিম্মায় ছাড়িয়া দিবেন এবং এই বাবদ আপনাদের আমরা পূর্ণ মূল্য ২,০০০৲ দুই হাজার টাকা প্রদান করিব। আপনাদের দাবীর তৃতীয় দফা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের পরিদর্শকের পারিশ্রমিক আমরাই বহন করিয়া থাকি। সুতরাং সে-সম্পর্কে আপনাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই।

আশা করি, আমাদের প্রস্তাব আপনাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্যই হইবে। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক, ইত্যাদি—

॥

১। আপনার কিছু পুরাতন শেয়ার বিক্রয় করিবার প্রস্তাব দিয়া ব্যাঙ্কের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করুন।

২। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে আপনার কিছু মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখিতে চাহিয়া পত্র লিখুন।

৩। আপনার কিছু সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ চাহিয়া ব্যাঙ্কের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করুন।

৪। আপনার সঞ্চয়ী আমানত (Savings Account) হইতে বীমা-প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত প্রিমিয়াম দিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া একখানি পত্র দিন।

৫। উপরোক্ত পত্রের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে একখানি উত্তর পত্র রচনা করুন।

৬। একটি নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকার দাদন চাহিয়া ও ব্যবসায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়া ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন লিখ। [ক. বি. (পার্ট ওয়ান) : '৬২]

[**মন্তব্য :** নমুনা—৬-এর আদর্শে পত্রটি নিজে রচনা করুন।]

৭। বিলাত হইতে মাল আনাইবার জন্য বিদেশী মুদ্রা চাহিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখ। [ক. বি. (পার্ট ওয়ান) : ৬৩]

[**মন্তব্য :** নমুনা—৭ দ্রষ্টব্য।]

৮। আপনার জীবন-বীমাপত্র হইতে ঋণ চাহিয়া বীমা-প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্রালাপ করুন।

৯। দাবীদারের পক্ষ হইতে জীবন-বীমার টাকা দাবী করিয়া বীমা-প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র লিখুন।

১০। জনৈক উত্তরাধিকারী এমন একটি ক্ষেত্রে বীমা সম্পর্কে তথ্য চাহিয়া ও বীমার টাকা দাবী করিয়া বীমা-প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, যেক্ষেত্রে বীমাকারী তাঁহার বীমাপত্রে পূর্ব হইতেই জনৈক ব্যক্তিকে তাঁহার দাবীদার নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন। এমতাবস্থায় বীমা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে সম্ভাব্য উত্তরটি রচনা করুন।

১১। ক্ষতিপূরক বীমার উপর ছাড় পাইবার দাবী জানাইয়া বীমা-প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র লিখুন ও বীমা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একটি উত্তর দিন।

১২। চলতি নৌ-বীমার প্রস্তাব দিয়া একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বীমা-প্রতিষ্ঠানের নিকট পত্র দিন।

১৩। চলতি নৌ-বীমার আবেদনকারীর পত্রের উত্তর বীমা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে একখানি পত্র রচনা করুন।

১৪। গড়পড়তা নৌ-বীমাপত্রের উপর ক্ষতিপূরণের দাবী জানাইয়া বীমা-প্রতিষ্ঠানের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করুন।

১৫। ভারতীয় বীমানিগমের নিকট বীমাপত্র বন্ধক রাখিয়া তুমি ঋণ লইতে ইচ্ছুক; কি সর্তে কতদিনের মধ্যে কত ঋণ লইতে পার জানিতে চাহিয়া কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট একটি পত্র লিখ। [ব. বি. (মড্) : '৬২]

[**মন্তব্য :** নমুনা—৪ দ্রষ্টব্য।]

১২

সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত পত্রালাপ

(Correspondence with the Government)

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিতও পত্রালাপ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এইরূপ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে রেল-কর্তৃপক্ষ, ডাক ও তার বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়, আয়কর ও বিক্রয়কর বিভাগ প্রভৃতি। এইরূপ দুই-একটি পত্রের নমুনা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

নমুনা ঃ ১। রেল-কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণের দাবী

ত্রিবেদী অ্যাণ্ড সন্স্

কার্যাধ্যক্ষ, দানাপুর, বিহার

পূর্ব-রেলপথ, ১।৪।৬১

কলিকাতা।

মহাশয়,

আমাদের নির্দেশক্রমে কলিকাতা বড়বাজারের 'আগরওয়ালা সাপ্লায়িং এজেন্সি' ৫০ বস্তা নৈনীতাল আলু ১।৩।৬২ তারিখে হাওড়া স্টেশন হইতে রেলযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত মাল মাত্র গতকল্য (৩১।৬।৬২) এখানে পৌছিয়াছে। মাল খালাস করিতে গিয়া আমরা দেখি যে, সমস্ত মালই পচিয়া গিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু ঐ মাল আপনাদেরই দায়িত্বে প্রেরিত হইয়াছিল সেই হেতু ইহার ক্ষতিপূরণের সর্ববিধ দায়িত্ব আপনাদেরই। উক্ত ৫০টি বস্তার প্রত্যেকটিতে দুই মণ করিয়া আলু ছিল এবং মণ প্রতি ১২৲ বারো টাকা হিসাবে ৫০ বস্তায় ১০০ মণ আলুর দাম হয় ১২০০৲ বারো শত টাকা। অতএব, ক্ষতিপূরণ বাবদ উক্ত ১২০০৲ বারো শত টাকা সত্বর আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

ক্ষতিগ্রস্ত মালের মূল্য সমর্থনের জন্য পত্রের সহিত মালের চালান প্রেরণ করা হইল। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,

শ্রীরামসুন্দর ত্রিবেদী,

কর্মাধ্যক্ষ,

ত্রিবেদী অ্যাণ্ড সন্স্।

ক্রোড়পত্র ঃ—

১টি চালান পত্র।

নমুনা ঃ ২। ডাক বিভাগের নিকট ঠিকানা পরিবর্তন-জ্ঞাপক পত্র

মান্না অ্যাণ্ড্ দে কোং

অধ্যক্ষ, ৫০১, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১

ডাকঘর, কলিকাতা-১ ২৫।১২।৬০

বিষয় ঃ ঠিকানা পরিবর্তন।

মহাশয়,

এতদ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, আগামী ১।১।৬১ তারিখ হইতে আমরা আপনার এলাকাভুক্ত ২৫, মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে অবস্থিত গৃহ হইতে আমাদের কার্যালয় উপরোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত করিয়াছি। অতএব নিম্ন-প্রদত্ত নামের যাবতীয় চিঠি,

পার্শেল, রেজিষ্ট্রী-করা চিঠি ও মোড়ক, মনি-অর্ডার, টেলিগ্রাম প্রভৃতি ২।১।৬১ তারিখ হইতে ৫০১, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ এই ঠিকানায় পুনঃপ্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীনলিনীরঞ্জন দে,
অংশীদার,,
মান্না দে অ্যাণ্ড কোং।

বি. দ্র. ঃ যে-সমস্ত নামের চিঠিপত্র নূতন ঠিকানায় প্রেরিতব্য—

১। শ্রীনলিনীরঞ্জন দে।
২। শ্রীপরেশচন্দ্র মান্না।
৩। মান্না দে অ্যাণ্ড কোং।

নমুনা ঃ ৩। শুল্ক বিভাগকে লিখিত পত্র

চ্যাটার্জি পাবলিশার্স

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা
৪।৬।৬১

সমাহর্তা,
আগম শুল্ক বিভাগ,
কলিকাতা।

মহাশয়,

গত ২০।৩।৬১ তারিখে গ/৩৪০ সংখ্যক সভ্য দেয় খন্না হুণ্ডিতে আমাদের যে চালানটি 'এস্. এস্. ময়ূরপঙ্খী'তে আসিয়াছিল, সেই চালানের জন্য ভারতীয় শুল্ক তালিকা অনুযায়ী ১০% শতকরা দশ টাকা হিসাবে আগম শুল্ক হিসাব করিলে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় টা. ৪৪০·৭৫ ন. প.। কিন্তু ভ্রমক্রমে আমরা উহার জন্য টা. ৮৮০·৭৫ ন.প. দিয়া ফেলিয়াছি এবং আপনারাও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি হিসাব পরীক্ষার সময় উক্ত ভুলটি আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসে।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক অতিরিক্ত পরিমাণে গৃহীত টা. ৪৪০৲ চারি শত চল্লিশ টাকা সত্বর ফেরৎ পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের সুবিধার জন্য তথ্যপ্রমেয় পত্রাবলী এই সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ধন্যবাদান্তে—

নিবেদক,
শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
স্বত্বাধিকারী
চ্যাটার্জি পাবলিশার্স।

ক্রোড়পত্র ঃ—

১। মালের চালান।
২। খন্না হুণ্ডির নকল।
৩। টাকা গ্রহণের রসিদ।

॥ অনুশীলনী ॥

১। আপনার প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে রেলযোগে প্রেরিত ১০০ ঝুড়ি কমলালেবুর মধ্যে পৌছিয়াছে মাত্র ৭০ ঝুড়ি। অতঃপর ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া রেল কর্তৃপক্ষের নিকট একখানি পত্র লিখুন।

২। আপনার আয় আয়করের আওতায় না আসিলেও আয়কর বিভাগ হইতে আপনার উপর আয়কর ধার্য করা হইয়াছে। অতঃপর উহার প্রতিবাদ জানাইয়া আয়কর বিভাগের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করুন।

৩। আপনার এলাকার হাসপাতালে কিছু টাকা দান করিয়া আপনি একটি 'ফ্রী বেড্' রাখিতে চান। এ-সম্পর্কে আপনার অভিপ্রায় জানাইয়া স্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তার নিকট একখানি পত্র লিখুন।

৪। রেলপথের পার্শ্বেই অবস্থিত একটি নার্সিং হোমের পক্ষ হইতে রেল কর্তৃপক্ষের নিকট এই মর্মে একখানি পত্র লিখুন যে রোগীদের জীবনের স্বার্থে ট্রেনচালকগণ উক্ত স্থান অতিক্রম করিবার সময় যেন বাঁশি না বাজান।

৫। আপনার বাড়িতে যাহাতে দ্রুত টাকা পৌছায় সেইজন্য আপনি একখানি টি. এম. ও. করিয়াছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেও তাহা পৌছায় নাই জানিতে পারিয়া ডাক ও তার বিভাগের নিকট কারণ অনুসন্ধান করিয়া একখানি পত্র লিখুন।

৬। রেলওয়ে পার্শেলে তুমি মফঃস্বলের খরিদ্দারের কাছে মাল পাঠাইয়াছিলে। সে মাল খোয়া গিয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষকে দায়ী করিয়া কমার্শিয়াল ম্যানেজারের কাছে যথারীতি দরখাস্ত লিখ। [ক. বি. (ওল্ড কোর্স্) : '৬৪]

[**মন্তব্য :** নমুনা—১-এর আদর্শে এটি নিজে রচনা করুন।]

৭। আসাম হইতে ২০০ কিলোগ্রাম দুই বাক্স চা রেলযোগে বর্ধমান স্টেশনে পাঠান হইয়াছিল। উহা হারাইয়া যাওয়ায় প্রাপকের পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া রেল কর্তৃপক্ষের কাছে একখানি দরখাস্ত কর। [ব. বি. (পার্ট ওয়ান) : '৬৪]

১৩
পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট পত্র
(Letters to the Editor)

ব্যক্তিগত মতামত জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার উদ্দেশ্যে, অথবা জনস্বার্থ-বিরোধী কোন কার্যের প্রতিবাদ করিয়াই সাধারণতঃ পত্র-পত্রিকার সম্পাদকগণের নিকট চিঠিপত্র লেখা হইয়া থাকে। পত্রের মতামত সম্পর্কে দায়িত্ব কিন্তু সম্পাদকের নয়—সম্পূর্ণভাবে পত্রলেখকের। ক্ষেত্রবিশেষে এইরূপ পত্র সম্বোধন ইত্যাদি অংশ বাদ দিলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধেরও মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পত্রের দুই একটি নমুনা নিচে দেওয়া হইল।

নমুনা : ১। খাদ্যমন্ত্রীর উক্তির প্রতিবাদ

সম্পাদক,

আনন্দবাজার পত্রিকা।

মহাশয়,

কলিকাতায় সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় নিযুক্ত অফিসারদের পূর্বাঞ্চলীয় আলোচনাচক্রে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, গত ১০ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের চাউল ও গমজাত খাদ্য গ্রহণের দৈনিক মাথাপিছু ৩ আউন্স করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে তাহারা মাথাপিছু চাউল বা গম খাইত ১৩ আউন্স, কিন্তু এখন খাইতেছে ১৬ আউন্স। তাই খাদ্যমন্ত্রী-হিসাবে প্রতি বৎসর অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদন করিয়াও তিনি নাকি পারিয়া উঠিতেছেন না।

খাদ্যমন্ত্রী যে-হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গবাসীদের পেটের বহর বাড়িয়াছে, কিন্তু এই অধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহপিছু শক্তি কতখানি বাড়িয়াছে, খাদ্যমন্ত্রী তাহা জানাইবেন কি ?

আমাদের কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র গৃহে তণ্ডুল বা গমজাতীয় খাদ্যের চাহিদা বেশি। ইহার কারণ অন্যান্য অনুপূরক খাদ্য, যাহা ইহার পরিবর্তে গ্রহণ করা যায়, তাহা সংগ্রহ করা দরিদ্রশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এখানেও তাহাই হইয়াছে। ঘি, দুধ, ফল-ফলাদি, মাছ-মাংসের প্রত্যেকটিরই মূল্য এতগুণ বাড়িয়াছে যে, দরিদ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীদের পক্ষে তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইতেছে না। চালের মূল্যও অবশ্য বাড়িয়াছে, কিন্তু কিছু অল্পমূল্যে খুদও তো বাজারে বিক্রী হইতেছে। ইহা দ্বারা তো ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যায়।

আমাদের খাদ্যমন্ত্রী নিজেও তো পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। সরকারী কর্মচারীদের দেওয়া পরিসংখ্যান ঘোষণা করিবার আগে তিনি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? পরিসংখ্যান আমাদের দেশে কি অবস্থা গ্রহণ করিতেছে, তাহা কলিকাতায় একটি ইংরাজি পত্রিকায় ৩০শে মে তারিখের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। একবার পড়িয়া লইতে অনুরোধ করি। তারপরে তিনিই বিচার করিতে পারিবেন।—ক্ষীরোদকুমার দত্ত, কলিকাতা-১৪।

নমুনাঃ ২। মৃত্যুদণ্ড রহিত করার প্রশ্ন

সম্পাদক, যুগান্তর পত্রিকা।

মহাশয়,

গত ১৫ই মের আনন্দবাজার পত্রিকায় ভারত রাষ্ট্রে মৃত্যুদণ্ড রহিত করার সমর্থন প্রসঙ্গে শ্রীপ্রবীরকুমার দত্ত প্রশ্ন তুলিয়াছেন, মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা বাড়াইয়া দিলেই সমাজের উন্নতি হইবে কিনা।

আমার মনে হয় যে, মৃত্যুদণ্ড বর্তমানে যে-অবস্থায় আছে তাহাতে উহা রহিত হওয়া প্রয়োজন। আকস্মিক ক্রোধবশত বা অন্যবিধ কোন উত্তেজনায় কেহ এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে হত্যা করার বিধান নিছক প্রতিশোধাত্মক বিধান। কোন সভ্য সমাজে প্রতিশোধ গ্রহণ করার এ-নীতি আইনানুমোদিত হওয়া উচিত নয়। আইনের উদ্দেশ্য সংশোধন। সংশোধনের কোন প্রকার সুযোগ না দিয়া এইভাবে হত্যার দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সমাজবিরোধী এবং সংশোধনের অতীত ঘোষণা করিয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

কিন্তু কয়েকটি নূতন অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান আমাদের দেশে অবশ্য প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, খাদ্যে বা ঔষধে ভেজাল মিশ্রণ। যে-ব্যক্তি বিষ প্রয়োগে কাহাকেও হত্যা করে সে একজনের হত্যার জন্য দায়ী। তাহার জন্য যদি প্রাণদণ্ড বিধান হইতে পারে, তবে যে-ব্যক্তি ভেজাল মিশাইয়া সমগ্র সমাজকে হত্যা করিতেছে তাহার অপরাধ কি আরও গুরুতর নয়? বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিনে আজ সকলেই সমাজের কল্যাণকামী হইবেন ইহাই কাম্য। কিন্তু তাহার পরিবর্তে যে-ব্যক্তি সমাজকে জানিয়া-শুনিয়া এবং ইচ্ছাকৃতভাবে মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইয়া যাইতেছে তাহার জন্য মৃত্যুদণ্ড কি অবশ্য প্রয়োজনীয় নয়? ইহা ভিন্ন নারীঘটিত অপরাধের জন্যও মৃত্যুদণ্ড বিবেচনা করা যাইতে পারে। আজ দেশ গঠনের যুগে এই অপরাধগুলি কঠোর হস্তে দমন করা না হইলে সুষ্ঠু এবং শক্তিশালী ভারতীয় সমাজ কখনই গড়িয়া উঠিবে না।—ক্ষীরোদ দত্ত, কলিঃ-১।

॥ অনুশীলনী ॥

১। বর্তমান বৎসরে বি. কম্. পরীক্ষায় 'ভারতীয় অর্থনীতি'র প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়ার জন্য প্রতিবাদ জানাইয়া সম্পাদকের নিকট পত্র লিখুন।

২। সরকারের পক্ষ হইতে জনসাধারণের উপর বিচিত্র উপায়ে জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে আপনার মতামত প্রকাশ করিয়া সম্পাদকের নিকট পত্র প্রেরণ করুন।

৩। ছাত্র-সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে আপনার মতামত প্রকাশ করিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট পত্র প্রেরণ করুন।

৪। ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র রচনা কর। [ব. বি. (পার্ট ওয়ান) : ৬৪]

[**মন্তব্য :** ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্পর্কে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।]

বিবিধ

১। সাহিত্য বা বিজ্ঞানের পরিবর্তে তুমি বাণিজ্যবিদ্যা বাছিয়া লইয়াছ কেন, তৎসম্বন্ধে বন্ধুকে একখানা পত্র লিখ। [ব. বি. (মড্ : ৬২]

সূত্র নির্দেশ :—বাণিজ্য-বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রবন্ধটিকে ভিত্তি করিয়া পত্রটি রচনা করিতে হইবে কিন্তু, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে পত্রলেখকের নিজস্ব ধারণা ছুটি স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদে প্রকাশ করিতে হইবে।

২। পুস্তক প্রকাশনের জন্য কাগজ চাহিয়া কাগজ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন লিখ। [ক. বি—৬৩]

টেণ্ডার

এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে চ্যাটার্জি পাব্লিশার্স্ (১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-১২) তাহার প্রকাশিতব্য স্কুল-কলেজের পুস্তকাবলীর জন্য কাগজ-ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে টেণ্ডার আহ্বান করিতেছে। এই প্রকাশনের ব্যাপারে কেবলমাত্র ২৮ পাউণ্ডের ½ ডিমাই সাইজের সাদা কাগজই (টিটাগড় হইলে ভাল হয়) প্রয়োজন। কাগজের নমুনাসহ সর্বনিম্ন দর উল্লেখ করিয়া আবেদনকারীকে অবশ্যই এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে এবং ন্যূনপক্ষে ২৫ বেল কাগজ সরবরাহ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বি. চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক,
চ্যাটার্জি পাব্লিশার্স

অনুবাদ

অনুবাদ সম্পর্কে

বর্তমানে বি. কম্. পরীক্ষায় বাঙ্‌লা বিষয়ে যে একশত নম্বর আছে তাহার মধ্যে ৪০ নম্বরই অনুবাদের জন্য নির্ধারিত। বাঙ্‌লা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিবার জন্য ২০ এবং ইংরেজী হইতে বাঙ্‌লায় ২০। নম্বর বিভাজনের এই আনুপাতিক হিসাব হইতে বুঝা যায় যে এই পরীক্ষায় অনুবাদ পর্যায়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও ক্রমে সাফল্য অর্জন করাতেই শুধু নহে, ভাল নম্বর সংগ্রহ করিতে হইলেও পরীক্ষার্থীদিগকে সঠিক ও সুন্দর অনুবাদ করিবার জন্য বিশেষরূপে অবহিত হইতে হইবে। অন্যথায় পরীক্ষার্থীর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, পরীক্ষার্থীগণ অনেক সময় সঠিকভাবে ভাষান্তর করেন কিন্তু ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়া যায়; কিংবা মূল ভাবটি বজায় রাখিতে গিয়া ভাষান্তরণ অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রথম হইতেই এই বিষয়ে পরীক্ষার্থীদিগকে অবহিত থাকিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, অনুবাদ হইবে স্বচ্ছন্দ কিন্তু ভাব রহিবে অটুট। ইংরেজী ও বাঙ্‌লা—দুইটি স্বতন্ত্র ভাষা। এই দুইটি ভাষারই নিজস্ব রচনারীতি ও ভাবগত মৌলিকতা আছে। ইংরেজী একটি শব্দের দ্বারা যে-ভাব ব্যক্ত হয় ঠিক সেই ভাবটি ব্যক্ত করিবার মতন বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ যে সর্বদা সুলভ তাহা নহে। ইংরেজদের শীতপ্রধান দেশে কাহাকেও আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করাকে বলা হয় warm reception, বাঙ্‌লা দেশে বাঙালীর ক্ষেত্রে ঐ শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ করিলে সঠিক মনোভাবটি কিছুতেই ব্যক্ত হইবে না। সেক্ষেত্রে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে যাহা ইংরেজের মনোভাবটি বাঙালীর মানস-গঠনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া যোগ্য অর্থ বহন করিবে।

ধরা যাক, একটি ইংরেজী অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া তাহা বাঙ্‌লায় অনুবাদ করিতে বলা হইয়াছে। প্রথমেই, ইংরেজী অনুচ্ছেদটি বারবার পড়িয়া তাহার মূল বক্তব্যটি বুঝিয়া লইতে হইবে। তৎপরে, প্রতিটি বাক্যকে পৃথকভাবে বাংলায় ভাষান্তরিত করা প্রয়োজন। মনে রাখিতে হইবে, যে-সকল ইংরেজী শব্দের বাঙ্‌লা পরিভাষা বাণিজ্য-পঠনে প্রচলিত সেই সকল পরিভাষাই ব্যবহৃত হওয়া বিধেয়। প্রয়োজন হইলে, অন্তর্নিহিত ভাবকে বাঙ্‌লাভাষায় সঠিক ব্যক্ত করিবার জন্য একটি দীর্ঘ ইংরেজী বাক্যকে দুই-তিনটি পৃথক বাক্যে পরিণত করিতে বাধা নাই। এইভাবে মূল ইংরেজী অনুচ্ছেদটি বাঙ্‌লায় ভাষান্তরিত করিবার পর লক্ষ্য করিতে হইবে যে বাঙ্‌লা বাক্যগুলি

সহজভাবে অর্থবহ হইয়াছে কিনা—বাক্যগুলিকে অর্থবহ করিবার জন্য সামান্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জন করা চলে। সর্বশেষে, ভাষান্তরিত এই অনুচ্ছেদ মূল ইংরেজীর ভাবটির বহন করিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিলেই অনুবাদ সন্তোষজনক হইবে।

ছাত্রছাত্রীদের অনায়াস অনুশীলনের জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রসমূহ হইতে এবং সমসাময়িক পুস্তকাদি ও সাময়িক পত্রাদি হইতে কিছু বৈশিষ্ট্যদ্যোতক অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিয়া দিতেছি। তাহারা নিজেরা যাহাতে অভ্যাস করিতে পারে তজ্জন্য কিছু ইংরেজী অনুচ্ছেদ এই পরিচ্ছেদের শেষে যোগ করিয়া দেওয়া হইল।

ইংরেজী অনুচ্ছেদ সমূহের ভাষান্তরণ

(১)

In ordinary speech a wealthy man is a man with a large-income. How do we state a man's income? Usually in pounds, dollars and francs and in the same way we state a country's income in terms of money. But the pounds, shillings and pence are not the wealth. No one except the miser, desires them for their own sake; they are wanted only for their purchasing power. The real wealth consists of the things that the money will purchase, and of those things we think when we try to realise what wealth is, the precious metals and precious stones, the materials and implements of manufactures, food-stuffs, land and buildings, these and not their money-prices are what we mean by wealth. [C. U. B. Com. 1951]

সাধারণ কথায় প্রচুর আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ধনী বলা হয়। মানুষের আয়কে আমরা কি-ভাবে প্রকাশ করি? সাধারণতঃ পাউণ্ড, ডলার এবং ফ্রাঙ্কের মাধ্যমে এবং এই একই উপায়ে কোন দেশের আয়কেও আমরা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করি। কিন্তু পাউণ্ড, শিলিং ও পেন্স এইগুলি সম্পদ নয়। একমাত্র কৃপণ ছাড়া আর কেহই শুধু অর্থের জন্য অর্থ চায় না; অর্থ চাওয়া হয় শুধু তাহার ক্রয়শক্তির জন্য। অর্থের দ্বারা যে-সব বস্তু কেনা যায়, তাহাই আসল সম্পদ। এবং যখন এইগুলির কথা চিন্তা করি, তখনই সম্পদ কি তাহা বোঝা যায়। মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তর, উৎপাদনের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি, জমি ও বাড়ি, এইগুলিই হইল সম্পদ; ইঁহাদের আর্থিক মূল্য সম্পদ নয়।

(২)

If human beings are to enjoy more consumers' goods then the comparatively small quantity of goods provided free by nature they must labour to produce them. Now, although most persons have laboured to produce goods many do not understand clearly just what is meant by production. When we say that a man has produced something, we do not mean that he has created something out of nothing, since a man can neither create nor destroy matter. All that man can do is to produce some change in matter, in such a way that it becomes more useful. So production consists in so changing things as to increase their utility. [C. U. B. Com. 1952]

প্রকৃতির কাছ হইতে যে স্বল্পপরিমাণ দ্রব্যাদি মানুষ এমনিই পায়, তাহার অধিক ভোগ্যদ্রব্য উপভোগ করিতে হইলে সেগুলি উৎপাদনের জন্য তাহাকে কঠোর শ্রম করিতেই হইবে। এখন, দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য বহু লোক পরিশ্রম করে সত্য; কিন্তু অনেকেই উৎপাদনের অর্থ কি পরিষ্কারভাবে তাহা বুঝিতে পারে না। যখন আমরা বলি যে একটি লোক কিছু উৎপাদন করিয়াছে তাহার অর্থ এই নয় যে সে শূন্য হইতে কিছু উৎপাদন করিয়াছে কারণ মানুষ কোন পদার্থ সৃষ্টি বা ধ্বংস করিতে পারে না। মানুষ যাহা করিতে পারে তাহা হইল পদার্থে এমন কোন পরিবর্তন সে আনে যাহার ফলে উহা আরও কার্যকর হইয়া দাঁড়ায়। অতএব উৎপাদনের অর্থ হইল, কোন বস্তুকে এমনভাবে পরিবর্তন করা যাহাতে তাহার উপযোগিতা বাড়ে।

(৩)

It is sometimes stated that a man's wants are unlimited; that however much he has there is always something more that he desires to possess or in other words, that man is never completely satisfied. This is no doubt true in a general sense, but is far too vague and needs a good deal of clarification. The wants we deal with in Economics are the wants which a person satisfies if he has the means of doing so: they are in fact the wants which give rise to effective demand which implies three things: the desire to possess a thing, the means of possessing it, and the willingness to use these means for this particular purpose. [C. U. B. Com. 1957]

কথনো কথনো বলা হইয়া থাকে যে, মানুষের অভাবের কোন সীমা নাই। যত অধিকই তাহার থাকুক না কেন, সব সময়েই আরও কিছু পাইবার আকাংক্ষা সে করে, কিংবা অন্য কথায় বলা যায় যে মানুষ কখনো সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় না। সাধারণ অর্থে ইহা নিঃসন্দেহে সত্য হইলেও ইহা অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বেশ কিছু আলোচনা সাপেক্ষ। ধনবিজ্ঞানে যে-সব অভাব লইয়া আলোচনা হয়, মানুষ সামর্থ্য থাকিলে সেইসব অভাব পূরণ করে। বস্তুতঃ এইগুলি সেইসব অভাব যাহা কার্যকরী চাহিদার সৃষ্টি করে এবং ইহার তিনটি বিশেষ তাৎপর্য আছে—যথা কোন বস্তু পাইবার ইচ্ছা, তাহা পাইবার উপায় এবং এই বিশেষ উদ্দেশ্যে এই উপায়গুলিকে প্রয়োগ করা।

(৪)

Acharyya Vinova Bhave stated here today that the Gramdan movement and the land reforms contemplated by Governments were not opposed to each other. If that were so, he told Pressmen, that the Yelwal (Mysore) conference would not have accepted the ideal of Gramdan. The leaders who participated in the conference had

agreed that the Gramdan movement would not come in the way of the 'Government's land legislation. The movement he had started was not idealistic but realistic. He was only propagating the demand of the times. Even Mr. Nehru had stated that the Gramdan movement had come to stay, and Mr. Nehru was a hard realist. Gramdan would not interfere with the ryot's initiative. If necessary, in a Gramdan village the available land could be cultivated on a co-operative basis or divided into blocks and then cultivated.

[G. U. B. Com. 1958]

আচার্য বিনোবা ভাবে আজ এখানে বলেন যে গ্রামদান আন্দোলন এবং সরকারের পরিকল্পিত ভূমিসংস্কার পরস্পরবিরোধী নয়। সাংবাদিকদিগকে তিনি বলেন যে, যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে মহীশূরের ইয়েলওয়াল সম্মেলনে গ্রামদানের আদর্শ গৃহীত হইত না। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নেতাগণ স্বীকার করেন যে গ্রামদান আন্দোলন সরকারের ভূমিসংক্রান্ত আইনগুলির পথে কোন বাধা সৃষ্টি করিবে না। তিনি যে, আন্দোলন শুরু করিয়াছেন তাহা ভাববাদী নয়, বাস্তববাদী। তিনি শুধু যুগের দাবীই প্রচার করিতেছেন। এমন কি শ্রীনেহেরুও গ্রামদান আন্দোলন স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন—এবং শ্রীনেহেরু একজন কঠোর বাস্তববাদী। রায়তদের উদ্যোগের ক্ষেত্রেও গ্রামদান বাধা সৃষ্টি করিবে না। প্রয়োজনবোধে গ্রামদানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত গ্রামের জমিগুলিকে সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ করা যাইতে পারে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়াও চাষ করা যাইতে পারে।

(৫)

India's exports were facing severe competition in overseas markets. In order that these might stand competition in both quality and price, per-unit productivity should increase. The importance of productivity at the present stage of industrial development should be realised by all concerned.

The primary aim of the national productivity movement was to stimulate productivity consciousness among employers and employees in all spheres of economic activity. Factors like outmoded plant and equipment, substandard raw material, faulty production techniques, lack of properly trained personnel and inefficient management contributed to the low level of production.

The object of the movement was to improve quality through improved techniques of production. It aimed at the optimum utilization of available resources in men, machines, material, power and capital.

[C. U. B. Com. 1960]

বিদেশের বাজারে ভারতীয় রপ্তানী-দ্রব্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হইয়াছে। গুণ এবং মূল্যের দিক দিয়া এইগুলি যাহাতে প্রতিযোগিতার আঘাত সহ্য করিতে পারে, তাহার জন্যে ইউনিট প্রতি উৎপাদনশীলতা বাড়ানো দরকার। শিল্পায়নের বর্তমান পর্যায়ে উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট সকলেরই উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

অর্থনীতিক কর্মক্ষেত্রের সর্বস্তরে মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে উৎপাদনশীলতা সম্বন্ধে চেতনা জাগরূক করাই জাতীয় উৎপাদনশীলতা আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। পুরাতন যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম, নিম্নস্তরের কাঁচামাল, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদনপদ্ধতি, যথোপযুক্ত শিক্ষিত কর্মীর অভাব এবং অক্ষম পরিচালনা, ইহারাই উৎপাদনের মান নিম্নগামী হওয়ার মূল কারণ।

উন্নত উৎপাদন-পদ্ধতির মাধ্যমে গুণের উৎকর্ষ সৃষ্টিই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। শ্রমিক, যন্ত্র, উপকরণ, শক্তি এবং মূলধনের আকারে যে-সম্পদ আছে তাহার কাম্য সদ্ব্যবহারই ইহার উদ্দেশ্য।

(৬)

Tomorrow's Lok Sabha debate on oil will be held in the context of the oil companies' decision to keep the crude oil prices unchanged at the level to which they were reduced in July, in spite of a subsequent decline in the official "posted" prices in the Persian Gulf.

What this decision of the companies—conveyed to the Government on Friday—amounts to is that the prices at which the foreign refineries will now import crude oil from their principals will continue to be lower than the posted price, but the extent of reduction will now be much less.

When the oil companies gave the "special price concession" to India, the lower prices were announced by one major company as 12½% less than the posted price, and 26 cents less per barrel by the other. In both cases, the posted price was the one in the force at that time. **[C. U. B. Com. 1961]**

পারস্য উপসাগরে সরকারীভাবে ঘোষিত দামের যথেষ্ট হ্রাস সত্ত্বেও, তৈল কোম্পানীগুলির জুলাই মাসে অপরিশোধিত তৈলের যে দামস্তর ছিল, তাহা অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আগামীকাল লোকসভায় তৈলের উপর বিতর্ক হইবে।

শুক্রবারে সরকারকে বিজ্ঞাপিত কোম্পানিগুলির এই সিদ্ধান্তের অর্থ এই যে, এখন হইতে বিদেশী শোধনাগারগুলি তাহাদের প্রধান কেন্দ্রগুলি হইতে যে-দরে অপরি-

শোধিত তৈল আমদানী করিবে তাহা ঘোষিত দাম হইতে কম হইবে, কিন্তু হ্রাসের পরিমাণ এখন অনেক কম হইবে।

তৈল কোম্পানিগুলি যে-ক্ষেত্রে ভারতকে "বিশেষ মূল্য সুবিধা" দেয়, সে-ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ কোম্পানি ঘোষিত দাম হইতে ১২½% কম দাম ঘোষণা করে এবং অপর একটি কোম্পানি পিপে-পিছু ২৬ সেন্ট বাদ দেয়। সেই সময় উভয় ক্ষেত্রেই একই ঘোষিত দাম প্রচলিত ছিল।

(৭)

Indian Industrial Development did not, by any means, begin with the period of planning though the extent of development attained was nothing like taht of today. Even before the First World War, the Cotton and Jute Manufacturing industries, for which the country had exceptional natural advantages, were well established. The policy of discriminating protection, adopted in 1922, gave an impetus to the development of a wide range of industries, including steel, paper, sugar, cement and matches. [B. U. B. Com. 1961]

ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন কোনভাবেই পরিকল্পনাকালের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নাই, যদিও তখন উন্নয়নের মান এখকার মত ছিল না। এমনকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই বস্ত্র এবং চট উৎপাদনকারী শিল্পগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এইগুলির ক্ষেত্রে দেশে কতকগুলি বিশেষ প্রকৃতিক সুবিধা ছিল। ১৯২২এ গৃহীত পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ নীতি ইস্পাত, কাগজ, চিনি, সিমেন্ট ও দিয়াশলাই ইত্যাদি বেশ কতকগুলি শিল্পের উন্নয়নে প্রেরণা যোগায়।

(৮)

The share markets have been moving rather indecisively of late. Shortage of funds and tightness in money market have led to a shrinkage in the volume of business, with values of most counter tending to look down. A good portion of investible funds is tied up with new issues and the markets will continue to feel the acute need for funds until the excess over calls is released.

[B. U. B. Com. 1962]

সম্প্রতি শেয়ারবাজারে বেশ কিছুটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে। পুঁজির ঘাটতি এবং আর্থিক বাজারের কাঠিন্যে ব্যবসায়ে সংকোচন দেখা দিয়াছে; প্রায় সব দোকানেই ঝাঁপ পড়িবার উপক্রম। বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির একটা মোটা অংশ নতুন বিলির সঙ্গে জড়িত এবং যতদিন না তলবী অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ ছাড়া হইতেছে, ততদিন বাজারে পুঁজির অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইবে

(৯)

There are persistent reports suggesting the distinct possibility of block closure of jute mills for sometime with a view to conserving available raw jute supplies till the arrivals of the new season's crops which are expected to begin not earlier than the end of July or August. A delegation of the Indian Jute Mills Association led by the acting Chairman Mr. C. L. Bajoria, met the Union Commerce and Industry Ministry Officials at New Delhi again this week and sought official permission for block closure for a fortnight either next month or in July. [B. U. B. Com. 1962]

নূতন মরসুমের ফসল যতদিন পর্যন্ত না আমদানী হইতেছে, যার সম্ভাবনা জুলাইয়ের শেষ বা আগস্টের আগে নাই, ততদিন পর্যন্ত কাঁচা পাটের প্রাপ্য যোগানকে মজুত রাখার জন্য চটকলগুলির কিছুদিনের জন্য এক জোটে বন্ধ রাখার নিশ্চিন্ত সম্ভাবনার কথা ক্রমাগত শোনা যাইতেছে। অস্থায়ী সভাপতি মিঃ সি. এল. বাজোরিয়ার নেতৃত্বে ভারতীয় চটকল সমিতির এক প্রতিনিধি দল কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের সঙ্গে নয়া দিল্লীতে এই সপ্তাহে আবার সাক্ষাৎ করেন এবং আগামী মাসে অথবা জুলাই মাসে একপক্ষকালের জন্য কলগুলি একত্র বন্ধ রাখার সরকারী অনুমতি চাহেন।

(১০)

The proposals are considered as "loosely knit" and the Government of India seem to have appreciated the reason that motivated the Colombo Powers to leave certain parts imprecise. In order to understand definitely the outline of the proposals the Government of India sought clarifications and interpretations from the sponsors in regard to those imprecise aspects of the scheme within the framework of the clarifications the Government of India seem to feel that by and large their principal stand—that the Chinese should vacate the latest aggression—is upheld. [B. U. Mod. 1963]

এই প্রস্তাবগুলিকে একটু 'ঢিলাবাঁধুনী' ধরনের বলে মনে করা হইয়াছে এবং কি কারণে কলম্বো শক্তিবর্গ এর কোনো কোনো অংশকে একটু অনির্দিষ্ট রাখিয়াছেন মনে হয় যে ভারত সরকার সেটা উপলব্ধি করিয়াছেন। ওই প্রস্তাবগুলির রূপরেখা সুনির্দিষ্টভাবে বুঝিবার জন্য ভারত সরকার পরিকল্পনাটির ঐ 'অনির্দিষ্ট দিকগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা উদ্যোক্তাদের কাছ হইতেও জানিতে চাহিয়াছেন। এই সব ব্যাখ্যার কাঠামোর মধ্যে হইতে ভারত সরকার মনে করেন যে মোটামুটি তাদের প্রধান দাবী—যে চীনাদের সাম্প্রতিক আক্রমণের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চল ছাড়িয়া যাওয়া উচিত ইহা মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

(১১)

Lately there have been some fears that the United States was promoting the common market at the expense of its own economic interests. Secretary of Agriculture Freeman has been particularly outspoken about common market discrimination against American agricultural products. The danger that the common Market might become 'inward-looking' and protectionist in character has been much discussed—but it was hoped that Britain's membership, in view of her world-wide interests, would be a safeguard against that.

[B. U. Mod. 1963]

সম্প্রতি এরূপ কিছু আশঙ্কা দেখা গিয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্র নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিনিময়ে 'সাধারণ বাজার' গড়িয়া তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হইতেছিলেন। কৃষি-বিভাগের সেক্রেটারী ফ্রিম্যান-মার্কিনী কৃষিপণ্যের বিরুদ্ধে সাধারণ বাজারের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে বিশেষভাবে আপত্তি জানাইয়াছেন। সাধারণ বাজার যে 'অন্তর্মুখী' এবং সংরক্ষণশীল চরিত্রের হইয়া উঠিতে পারে এই বিপদের সম্ভাবনা লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু আশা করা গিয়াছে প্রতিবন্ধক হিসাবে সারা পৃথিবীব্যাপী স্বার্থের সংযোগ থাকার দরুণ বৃটেনের সভ্যপদ ইহার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করিবে।

(১২)

The application of Britain- for entering the Common Market was doubtless made under U.S. pressure. Opinion in the U.K. was always sharply divided. Apart from the opposition of Labour, the Tories themselves were split. Prime Minister Macmillan staked his career on entry. The opposition of practically the entire Commonwealth was brushed aside. At the same time, it was obvious from the very outset that France from economic and political reasons could not allow the U.K. to join the six-nation club, even if five others agreed. France had the right of veto along with other members and she could always exercise it in the last resort.

[B. U. Part I, 1963]

স্পষ্টতই বুঝা যায় যে মার্কিনী চাপের ফলেই বৃটেন 'সাধারণ বাজারে' অনুপ্রবেশের জন্য আবেদন করিয়াছিল। যুক্তরাজ্যে এই প্রশ্নে কিন্তু সর্বদাই মতানৈক্য ছিল। লেবার পার্টির বিরোধিতা ছাড়াও, টোরীদের নিজেদের মধ্যেই মতপার্থক্য ছিল। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান অবশ্য যোগদানের ঝুঁকিই লইয়াছিলেন। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সকল দেশের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। তদুপরি, ইহা প্রথম হইতেই বুঝা গিয়াছিল যে অন্যান্য পাঁচটি দেশ অসম্মত না হইলেও ফ্রান্স,

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে, বৃটেনের এই 'যড়-জাতির সংগঠনে' যোগদান কিছুতেই অনুমোদন করিবে না। অন্যান্য দেশগুলির মত ফ্রান্সের 'ভেটো' দিবার ক্ষমতা ছিল এবং সে নিশ্চয়ই শেষ অস্ত্র হিসাবে এই 'ভেটো'র প্রয়োগ করিতে পারিত।

(১৩)

The failure of the D.V.C. irrigation schemes about which we have had occasions to make adverse comments is particularly serious. Against the irrigation capacity of 9·19 lakh acres for kharif crops, the area actually irrigated was only 6·30 lakh acres. Equally miserable is the record of irrigation for rabi crops; there is a difference of 24,000 acres between the target and the actual irrigation area. The Public Accounts Committee calculates that nearly 30 per cent of the D.V.C.'s irrigation potential could not be utilised for lack of proper planning. One of the causes of this shortfall is the slow rate of excavation of the field channels and water courses.

[B. U. Part I, 1963]

আমরা প্রায়ই ডি ভি সি (দামোদর উপত্যকা করপোরেশন) সেচ পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিরূদ্ধ সমালোচনা করিয়া থাকি। এবং ইহার ব্যর্থতা প্রকৃতপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ৯·১৯ লক্ষ একর 'খারিফ' শস্যের জমি চাষের সেচশক্তি থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৬·৩০ লক্ষ একর জমি সেচিত হইয়াছে। রবিশস্যের জমি জলসেচের চিত্রও সমান হতাশাব্যঞ্জক; প্রকৃত জলসেচিত অঞ্চল ও জলসেচনের লক্ষ্যের মধ্যে প্রায় ২৪০০০ একর জমির ব্যবধান রহিয়াছে। পাবলিক একাউন্টস্ কমিটির হিসাবে দেখা গিয়াছে যে উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে ডি. ভি, সি.-র পরিকল্পনার সম্ভাবনার প্রায় ৩০ ভাগ কার্যকে বাস্তবে রূপায়িত করা হইতেছে না। বিভিন্ন জলপথ এবং জমিগুলির মন্থর গতিতে খননকার্য পরিচালনা করা সেচ পরিকল্পনার অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ।

(১৪)

In the textile, jute and sugar Industries India has registered impressive progress. The textile trade has a pre-eminent position in the country and is the one big industry mainly controlled by the Indians. India has long excelled in the manufacture of textiles. Many people forget that until 1787 this country was exporting manufactured cotton goods to France, Britain and Holland. Indian Silk and Muslins were world famous.

[B. U. Mod. 1964]

পাট, চিনি ও বস্ত্রশিল্পে ভারত উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। বস্ত্রশিল্পের ব্যবসায়ে এদেশের স্থান উল্লেখযোগ্য এবং ইহা একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প যাহা প্রধানত ভারতীয়দের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বস্ত্র উৎপাদনে ভারত প্রাচীন কাল হইতেই উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। অনেকে ভুলিয়া যান যে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত এই দেশ ফ্রান্স, বৃটেন এবং হল্যাণ্ডে শিল্পজাত সূতীবস্ত্রাদি রপ্তানি করিতেছিল। ভারতীয় রেশম এবং মস্‌লিন ছিল পৃথিবী বিখ্যাত।

(১৫)

With the war an era of industrial expansion dawned upon the country. The lessons taught by the war brought about a remarkable change in the industrial position of the country as also in the outlook of the businessman as compared with those of 1913. The Government experienced a great shortage of materials required for munitions and the industries were handicapped on account of interruptions in the supply of machinery and stores. The Munition Board was started with the object of applying the manufacturing resources of India to war purposes. But the industrial boom was short-lived.

[B. U. Mod. 1964]

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিল্পপ্রসারের একযুগ সুরু হইল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা দেশের শিল্পগত অবস্থায় এবং ব্যবসায়ীদের মনোভাবে ১৯১৩ সালের তুলনায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনিল। সরকার অস্ত্রসস্ত্র নির্মাণের উপযোগী উপকরণের তীব্র অভাব অনুভব করিলেন এবং শিল্পগুলি যন্ত্র ও উপকরণের যোগানে প্রতিবন্ধকতার দরুন অসুবিধাগ্রস্থ হইয়া পড়িল। ভারতে অবস্থিত যন্ত্রশিল্পের উপযোগী উপকরণ-গুলিকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিবার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া 'দি মিউনিশন বোর্ডের' (অস্ত্রশিল্প বোর্ডের) কার্য সুরু হইল। কিন্তু এই শিল্প-সমৃদ্ধি ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

(১৬)

The Calcutta Stock Market is now in its usual Pre-Budget mood of caution, so a dull trend continues. Investors fear that the Union Finance Minister may have to put up tax rates to meet the growing cost of both development and defence, and he may even take stringent measures to trace "unaccounted money." It is unlikely, therefore, that the stock market will come back to life before Budget day. A particular class of shares which has suffered in recent weeks although for a different reason, is tea. The industry is expecting a smaller North Indian crop, and the average prices being realised at Calcutta auctions have been so far lower compared with those of the previous year.

[B. U. Part I, 1964]

কলকাতার শেয়ারবাজার এখন প্রাক-বাজেটীয় সাবধানতার মেজাজে রহিয়াছে, তাই এখানে একটা মন্দার ঝোঁক চলিতেছে। বিনিয়োগকারীরা আশঙ্কা করিতেছেন যে উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার ক্রমবর্ধমান ব্যয় মিটাইবার জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে হয়ত করের হারগুলি বাড়াইতে হইবে, এবং 'হিসাব-বহির্ভূত কালো টাকা' খুঁজিয়া বাহির করার উদ্দেশ্যে তিনি এমন কি কয়েকটি জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। তাই শেয়ার-বাজার বাজেট ঘোষণার পূর্বে যে সতেজ হইয়া উঠিবে এমন সম্ভাবনা নাই। বিগত কয়েক সপ্তাহে যে বিশেষ শ্রেণীর শেয়ারের দাম নামিয়া গিয়াছে তাহা হইল চায়ের শেয়ার, অবশ্য ইহার কারণ ভিন্ন। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করিতেছেন যে এবার উত্তর ভারতে উৎপাদন কম হইবে এবং কলিকাতার নীলামগুলি হইতে এতদিন পর্যন্ত যে গড় দাম পাওয়া গিয়াছে তাহাও গত বৎসরের দাম হইতে কম।

(১৭)

In order to meet the needs of an expanding population and raise the general standard of living, it is necessary steadily to increase the production of goods and services. There are two practical means to accomplish this objective. One is to enlarge the productive facilities of the economy; the other is to increase the output of each worker by introducing better machinery and more efficient methods of production. The best results can be expected when the expansion of productive factilities is combined with an increase in worker productivity. The tremendous production of the American economy and the high standard of living of the American people are the result of a steady, conscious effort to combine expanding productive capacity with higher individual productivity. [B. U. Part I, 1964]

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটানো এবং জীবনযাত্রার সাধারণ মান উন্নত করার জন্য দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যাদির উৎপাদন নিয়মিত হারে বাড়ানো প্রয়োজন। এই লক্ষ্যসাধনের দুটি কার্যকরী উপায় আছে। একটি হইল অর্থনৈতিক কাঠামোতে উৎপাদনের সুযোগগুলির প্রসার করা; অপরটি হইল উন্নততর যন্ত্রপাতি এবং দক্ষতর উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া শ্রমিক প্রতি উৎপাদন বাড়াইয়া তোলা। সবচেয়ে ভালো ফল আশা করা যায় তখনই যখন শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে একই সাথে উৎপাদনের সুযোগগুলিকে সম্প্রসারিত করা যায়। মার্কিন অর্থনৈতিক কাঠামোর বিপুল উৎপাদন এবং আমেরিকার জনসাধারণের উচ্চ জীবনযাত্রার মান; দুইই সম্ভব হইয়াছে উৎপাদন ক্ষমতার প্রসারের সঙ্গে উন্নততর ব্যক্তিগত উৎপাদন ক্ষমতার সম্মিলন করার জন্য নিয়মিত সচেতন প্রচেষ্টার ফলে।

(১৮)

The basic objective of India's development must necessarily be to provide the masses of the Indian people the opportunity to lead a good life. That indeed is the objective of all countries for their people, even though the good life may be defined in many ways. In the larger context of the world, the realisation of this objective for India, as for other countries, is intimately tied up with, and dependent on the maintenance of world peace. War, with the weapons of modern warfare, would not only be an end to all hopes of progress but would endanger the survival of the human race. Peace therefore, becomes of paramount importance and an essential pre-requisite for national progress. The existence of under-developed and poverty-stricken nations or peoples is itself an abiding danger to the maintenance of peace. It has, thus, been increasingly recognised that the welfare and peace of the world require the extermination of poverty and disease and ignorance from every country, so as to build up a liberated humanity. [*The Third Five Year Plan of India*]

ভারতের জনগণকে সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়াই ভারতের উন্নতির মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুস্থ জীবনকে বিভিন্নরূপে ব্যাখ্যা করা হইলেও সর্বদেশে সর্বসাধারণের জন্য এই একই লক্ষ্য স্থিরীকৃত হয়। এই পৃথিবীর বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে, অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় ভারতেও এই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিশ্ব-শান্তি রক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও নির্ভরশীলও বটে। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সম্বলিত যুদ্ধ শুধু প্রগতির সমস্ত আশারই পরিসমাপ্তি নয়, পরন্তু মানবজাতির অস্তিত্বকেও বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। অতএব, শান্তিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতির প্রগতির অগ্রধারক। অপূর্ণোন্নত এবং দারিদ্র্য-পীড়িত দেশ ও জাতিগুলির অস্তিত্বই শান্তি-রক্ষার পক্ষে এক মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ। ইহা তাই ক্রমশঃই স্বীকৃত হইতেছে যে, বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তির জন্য প্রতিটি দেশ হইতে দারিদ্র্য, রোগ এবং অজ্ঞানতার সম্পূর্ণ দূরীকরণ প্রয়োজন যাহার দ্বারা মুক্ত মানব-সমাজ গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

(১৯)

The socialist pattern of society is not to be regarded as some fixed or rigid pattern. It is not rooted in any doctrine or dogma. Each country has to develop according to its own genius and traditions. Economic and social policy has to be shaped from time to time in the light of historial circumstances. It is neither necessary nor desirable that the economy should become a monolithic type

of organisation offering little play for experimentation either as to forms or as to modes of functioning. Nor should expansion of the public sector mean centralisation of decision-making and of exercise of authority. In fact, the aim should be to secure an appropriate devolution of functions and to ensure to public enterprises the fullest freedom to operate within a framework of broad directives or rules of the game. [*The Third Five Year Plan of India.*]

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজবাদকে কোন একটি নির্দিষ্ট বা অপরিবর্তনীয় ধাঁচের বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কোন বিশেষ বিশ্বাস বা মতবাদেও এর মূল নিহিত নয়। স্বকীয় শক্তি ও ঐতিহ্য অনুসারেই প্রতিটি দেশকে উন্নয়নের পথে আগুয়ান হইতে হয়। যুগে যুগে ঐতিহাসিক পরিবেশে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নীতি নূতন রূপ গ্রহণ করে। ইহা তাই প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় নয় যে, অর্থনীতি হইবে একাত্মক সংগঠনের ন্যায় যাহাতে কর্মের প্রকৃতি বা উপায় লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষার সামান্যই সুযোগ থাকিবে। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রক্ষেত্রের প্রসারের অর্থ সিদ্ধান্ত-স্থিরীকৃত ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের কেন্দ্রীকরণও নয়। আসলে লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্মাবলীর উপযুক্ত প্রতিসংক্রম এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলিকে ক্রীড়ানীতি অনুসারে বা উদার নির্দেশাবলীর কাঠামোর মধ্যে কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া।

(২০)

Progress in mobilising savings and in developing exports depends largely on the burdens which the community is willing to bear. As a result of dvelopment during the past decade period of economic stagnation has been ended. For the bulk of the population, the existing levels of consumption are so low that a considerable proportion of the additional output of the economy must be devoted to the improvement of living standards. However, for many years to come if the stock of capital and the economic and social services on which the growth of the economy depends are to be developed, only a limited rise in consumption standards will be possible, specially in commodities or services which are considered to be non-essential in the early stages of India's economic development. This is a choice which a democracy has to make with general consent in the larger interest of the community and, in turn, calls for appropriate Social policies.

[*The Third Five Year Plan*]

সঞ্চয়ের সংহতিকরণ এবং রপ্তানী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেকাংশে সমাজের ভারবহনযোগ্যতার উপর নির্ভর করে। গত দশকে উন্নয়নের ফলে অর্থনৈতিক

অচলাবস্থার অবসান ঘটিয়াছে। জনসংখ্যার অধিকাংশেরই বর্তমান ভোগস্তর এত নীচু যে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে দেশের অতিরিক্ত উৎপাদনের এক বৃহৎ অংশ নিয়োজিত করিতে হইবে। যাই হোক্, অর্থনীতির ক্রমোন্নতি নির্ভর করে মূলধনের পুঁজি বা অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যাবলীর উপর। এগুলি যদি বাড়াইতে হয় তবে আগামী বেশ কয়েক বৎসরের জন্যে ভোগস্তরকে সামান্যই বাড়ানো যাইবে, বিশেষ করিয়া সেই সব বস্তু বা কর্মের ক্ষেত্রে যেগুলি ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম ধাপে অপ্রয়োজনীয় বলে গণ্য হইবে। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে সাধারণ সম্মতি লইয়া প্রতিটি গণতন্ত্রকেই এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয় এবং ইহার জন্যও আবার উপযুক্ত সামাজিক নীতির প্রয়োজন।

(২১)

In the scheme of development during the Third plan the first priority necessarily belongs to agriculture. Experience in the first two plans, and specially in the second, has shown that the rate of growth in agricultural production is one of the main limiting factors in the progress of the Indian economy. Agricultural production has, therefore, to be increased to the largest extent feasible and adequate resources have to be provided under the Third Plan for realising the agricultural targets. The rural economy has to be diversified and the proportion of the population dependent on agriculture gradually diminished. These are essential aims if the incomes and levels of living of the rural poupulation are to raise steadily and to keep pace with incomes in other sectors. Both in formulating and in implementing programmes for the development of agriculture and the rural economy during the Third Plan, the guiding consideration is that, whatever is physically practicable should be made financially possible, and the potential of each area should be developed to the utmost extent possible. [*Third Five Year Plan*]

তৃতীয় যোজনার উন্নয়নসূচীতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই কৃষিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। প্রথম দুইটি যোজনায়, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয়টির অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখি যে কৃষিজ উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধির হার ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের প্রধান বাধাগুলির মধ্যে অন্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব যতখানি সম্ভব কৃষিজ উৎপাদনকে বাড়াইতে হইবে এবং কৃষিজ উৎপাদনের লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য তৃতীয় যোজনায় পর্যাপ্ত সম্পদের প্রয়োজন হইবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনয়ন করিতে হইবে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত ক্রমশঃ কমাইয়া আনিতে হইবে। গ্রামীণ জনসংখ্যার আয় এবং জীবনযাত্রার মানকে দ্রুত বাড়াইতে হইলে এবং

অন্যান্য ক্ষেত্রের আয়ের সঙ্গে সমতা আনয়ন করিতে হইলে, এইগুলি অতি আবশ্যিক লক্ষ্য। তৃতীয় যোজনাকালে গ্রামীণ অর্থনীতি ও কৃষি উন্নয়নের কর্মসূচী গঠন ও তাহা কার্যকরী করার সময় বিবেচ্য বিষয় হইল এই যে যাহা প্রাকৃতিকভাবে সম্ভব তাহা আর্থিকভাবে কার্যকরী করা এবং প্রতিটি স্থানের সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব বিকশিত করিয়া তোলা।

(২২)

According to a reliable source in Calcutta, the agreement reached between the Union Shipping Minister and the HPA representatives provides for the appointment of a committee to look into the grievances of the pilots. It also envisages that the pilots will be placed under the direct charge of the Chairman of the CPC and not under the Deputy Conservator.

Nineteen pilots were assigned duties for Saturday and Sunday. Nine of them were given orders to pilot ships out of the port. Four pilots were asked to bring ships from Diamond Harbour and the rest the waiting vessels from Sandheads. It is expected that the congestion at the port will be cleared in the next three days.

কলিকাতায় এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় জাহাজ চলাচল দপ্তরের মন্ত্রী ও এইচ. পি. এ-র (হুগলী পাইলট সংস্থার) প্রতিনিধিবৃন্দের এক চুক্তিতে পাইলটদের অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য এক কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাও স্থির হয় যে, পাইলটেরা সি. পি. সির (কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের) চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে থাকিবেন এবং আর উপরক্ষকের অধীনে থাকিবেন না।

উনিশ জন পাইলটকে শনি এবং রবিবারের কর্মভার দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে নয়জনকে বন্দরের বাহিরে জাহাজগুলিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। চারজনকে ডায়মণ্ডহারবার হইতে জাহাজ লইয়া এবং বাকী সবাইকে বালিয়াড়ির মুখে অপেক্ষমান জাহাজগুলিকে লইয়া আসিতে বলা হয়। আশা করা যায় যে, আগামী তিনদিনের মধ্যে বন্দরের ভীড় পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

(২৩)

The two-day ministerial meeting on Britain's application for membership of the European Common Market resumed here today half-an hour behind schedule because of prolonged talks among the Six to co-ordinate their policies, reports Reuter.

Conference sources said the Ministers would today discuss the re-

maining four points of their overall review of the negotiations drawn up by experts.

These are agriculture, the association of certain Commonwealth countries, manufactured products exported by India, Pakistan and Hongkong and the economic union provisions of the Treaty of Rome, which set up the ECM.

রয়টার জানাইতেছেন যে, নীতির সমন্বয় সাধনের জন্য ছয় জন মন্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘকালীন আলাপ আলোচনা হেতু ইউরোপীয় সাধারণ বাজারের সদস্যপদের জন্য ব্রিটেনের আবেদনের উপর আলোচনার জন্য দু'দিন ব্যাপী মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক আজ নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা পরে এখানে শুরু হইয়াছে।

সম্মেলনের সূত্রে জানা যায় যে, আজ মন্ত্রীরা বিশেষজ্ঞদের চুক্তি-পূর্ব আলোচনার যে সাধারণভাবে পুনঃ পরীক্ষা করিতেছেন, তাহার বাকী চারটি বিষয় লইয়া আলোচনা করিবেন।

এইগুলি হইল কৃষি, কতিপয় কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সম্মেলন, ভারত পাকিস্তান এবং হংকং-এর তৈয়ারী দ্রব্য রপ্তানী ও রোম চুক্তির অর্থনৈতিক একীকরণের সেই ধারাটি যাহার ফলে ই. সি. এম স্থাপিত হইয়াছিল।

(২৪)

The Senate Foreign Aid Committee's cut of the proposed U.S. aid to India by 220 million dollars has made uncertain the availability of requisite aid to meet the country's foreign exchange needs during the first two years of the Third Plan. Mr. Morarji Desai, therefore, has been trying to induce the European members of the Aid India Club, on eve of its next meeting, to increase their original contribution. But how far his efforts will be successful is difficult to foresee because the other members of the World Bank-sponsored Club mainly followed the American lead in the matter of promising aid to India and, as such, might not feel enthusiastic about aid to India. It will, therefore, not be very easy to meet the foreign exchange requirements of the first two years of the Third Plan unless the cut in the American aid is finally restored.

সিনেটের পররাষ্ট্র সাহায্য দপ্তরের দ্বারা ভারতকে আমেরিকার প্রস্তাবিত সাহায্য দান হইতে ২২ কোটি ডলার হ্রাস করিয়া দেওয়ার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দু'বছরের জন্য দেশের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রাসংগ্রহ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। তাই যাহাতে ভারত সাহায্য সংস্থার ইউরোপীয় সদস্যগণ আগামী অধি-বেশনের প্রারম্ভে তাঁহাদের পূর্বের সাহায্য বাড়ান তাহার জন্য শ্রীমোরারজী দেশাই

চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টা কতখানি ফলবতী হইবে তাহা আগে হইতে জানা সম্ভব নয়, কারণ বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে স্থাপিত এই সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা ভারতকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে আমেরিকার নেতৃত্বই অনুসরণ করেন এবং সেই হেতু ভারতকে সাহায্যদানের ব্যাপারে উৎসাহিত নাও হইতে পারেন। তাই আমেরিকার সাহায্য যদি শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তৃতীয় যোজনার প্রথম দুইবছরের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রাসংগ্রহ খুব সহজ হইয়া উঠিবে না।

(২৫)

The question is often asked : You talk about socialism and yet you permit grave inequalities of income; you want to put a ceiling on land-holdings and yet you oppose ceiling on urban or other incomes. There is that contradiction, of course. ,But if we try to remove that type of contradiction, we put a stop in many ways to the type of progress we are aiming at. If you are not prepared to change completely the whole basis of society, you have to leave enough incentive for people to work. You can by taxation, etc., reduce disparities. But enforcing ceiling on urban incomes may well result in a slowing down of the process of development and production should not come down. After all, production comes first, before any kind of equalisation or division. There is no point in having an equal measure of poverty for all.

প্রায়ই প্রশ্ন তোলা হয়; এদিকে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়, অন্যদিকে তীব্র আয়-বৈষম্যকে মানিয়া লওয়া হয়; জোতের উপর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ চাওয়া হয় অথচ পৌর বা অন্যান্য আয়ের ওপর সর্বোচ্চ সীমা বসানোর প্রস্তাবে বিরোধিতা করা হয়। সত্যিই এই ধরণের অসঙ্গতি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু এই অসঙ্গতি দূর করার চেষ্টা করা হইলে, যে-ধরণের উন্নতি আমরা চাই, তাহার বিভিন্ন পন্থা আমরা রুদ্ধ করিয়া দিব। সমাজের সম্পূর্ণ ভিত্‌টাকে পরিবর্তিত করিতে না চাহিলে, জনগণকে কাজ করার জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হইবে। কর ইত্যাদি কমাইয়া আনা যায়। কিন্তু পৌর আয়কে সীমিত করিতে চাহিলে ঢিলা পড়িবে এবং উৎপাদন কমিয়া যাইবে। যাহাই হউক না কেন, কোন ধরণের সমতা বা বিভাজনের আগে উৎপাদনের কথাই আসে। সবার জন্য সমপরিমাণ দারিদ্র্য আনিয়া দেওয়ার পেছনে কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।

(২৬)

Employment orientation should give a marked turn to planning in India. People in India live, in the main, in rural areas and are scattered over a very large number of villages and this rural population is growing apace. There is currently, a relatively small movement away from rural areas or agriculture chiefly because of the lack of alternative opportunities. If this pattern of dispersal of population and the costs of movement are taken into account, it will be seen that not only in the short-run but also as a long-term objective providing employment in rural areas through decentralised and dispersed economic development is extremely important for India.

কর্মসংস্থানাভিমুখীতা ভারতীয় পরিকল্পনাতে এক সুনির্দিষ্ট পরিবর্তনের সূচনা করিবে। ভারতীয় জনগণ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করে। বহু সংখ্যক গ্রামে এই জনগণ ছড়াইয়া আছে এবং এই গ্রামীণ জনসংখ্যা অতি দ্রুত বাড়িতেছে। মুখ্যতঃ বিকল্প সুযোগের অভাবে গ্রামাঞ্চল বা কৃষি হইতে সম্প্রতি এই জনসংখ্যার তুলনামূলকভাবে অতি সামান্য অপসরণ ঘটিতেছে। জনসংখ্যার এই ধরণের ছড়াইয়া থাকা এবং তাহাদের অপসরণের হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে যে, বিকেন্দ্রীভূত এবং বিক্ষিপ্ত অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য শুধু অল্প সময় নয়, দীর্ঘ সময়ের জন্যও ভারতের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(২৭)

A notable development of the year under review was the publication of the final report of the third Five-year Plan. The report confirmed the production targets fixed for cotton textiles in the Draft Outline, namely, 9,300 million yards of cloth and 2,250 million lbs. of yarn. The target for cloth is based on the estimated requirements of 8,450 million yards for domestic consumption and 850 million yards for export. The figure for domestic consumption provides for an increase of about 20 per cent over the estimated level of demand in 1960-61; in other words, it allows for an annual rise of 2 per cent in population and 2 per cent in per capita consumption.

আলোচ্য বৎসরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক চূড়ান্ত বিবরণীর প্রকাশ। খসড়া পরিকল্পনাতে বস্ত্রশিল্পের যে-উৎ করা হইয়াছিল, যেমন ৯৩০ কোটি গজ কাপড় ও ২২৫ কোটি পাউণ্ড বোনা সুতা, এই বিবরণীতে তাহাই সমর্থন করা হইয়াছে। আভ্যন্তরিক ভোগের জন্য ৮৪৫ কোটি গজ এবং রপ্তানির জন্য ৮৫ কোটি গজের প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করিয়াই বস্ত্রের লক্ষ্য

স্থির করা হইয়াছে। আভ্যন্তরিক ভোগের যে-সংখ্যাদি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা ১৯৬০-৬১ সালের নিরূপিত ভোগস্তর অপেক্ষা প্রায় ২০ শতাংশ বেশী। অন্য কথায়, প্রতি বৎসর জনসংখ্যার ও মাথাপিছু ভোগের ২ শতাংশ বৃদ্ধিকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

(২৮)

In the works of economists following Pareto, income distribution has been said not to affect efficiency. It is assumed that once an efficient allocation of resources has been arrived at, income distribution can be changed at will, without impairing efficiency, by the use of lump-sum redistribution. In the Indian casc, under the present set up, lump-sum redistribution is not only impractical but something which is almost impossible. Moreover, it should be remembered that lump-sum taxes and subsidies altering income distribution in one period affects the amount of work supplied and risk taken in the succeeding periods, which, in turn, affect the dynamic efficiency of the economy.

প্যারেটোর অনুবর্তী অর্থনীতিবিদদের গ্রন্থসমূহে বলা হইয়াছে যে, আয়বণ্টন দক্ষতাকে প্রভাবিত করে না। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, যদি একবার সঠিক সম্পদ বণ্টন করা সম্ভব হয়, তাহালে দক্ষতাকে ব্যাহত না করিয়া, এক সঙ্গে অনেকখানি পুনর্বণ্টনের দ্বারা আয়বণ্টনকে ইচ্ছামত পরিবর্তিত করা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে, বর্তমান কাঠামোতে, একযোগে অনেকখানি পুনর্বণ্টন শুধু অবাস্তব নয়, অসম্ভবও বটে। তাছাড়া, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে একযোগে অনেকখানি কর বসাইয়া বা সরকারী সাহায্য দিয়া এক সময়ের আয়বণ্টনের যে-পরিবর্তন হইবে, তাহা পরবর্তী সময়ের কর্ম-সরবরাহ ও ঝুঁকি নেওয়ার পরিমাণকে প্রভাবিত করিবে এবং তাহা আবার অর্থনীতির গতিশীল দক্ষতাকে প্রভাবিত করিবে।

(২৯)

The budget of a country is the true index of its economic condition. For example, the budget of the United Kingdom shows a revenue of about Rs. 5000 crores although in territory and size the Indian Union is twelve times of U. K. Even the municipal revenue of a single city like New York in the U.S.A. exceeds Rs. 300 crores, while the entire revenue of the Indian Union amounts to about Rs. 32C crores, out of which Rs. 170 crores are earmarked for military and defence so as to leave very little for nation-building departments and plans of national progress. [B. U. B. Com. Comp. 1961]

কোন দেশের বাজেট সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সত্যকারের সূচক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভূখণ্ড ও আয়তনের দিক দিয়া ভারতবর্ষ যুক্তরাজ্য অপেক্ষা বারগুণ বড় হইলেও, যুক্তরাজ্যের বাজেটে রাজস্ব খাতে ৫০০৭ কোটি টাকা দেখা যায়। এমন কি আমেরিকার নিউইয়র্কের ন্যায় একটিমাত্র শহরের পৌররাজস্ব ৩০০ কোটি টাকারও বেশী, অথচ সারা ভারতবর্ষের মোট রাজস্ব মাত্র ৩২০ কোটি টাকার মত। ইহা হইতেও আবার সৈন্য ও প্রতিরক্ষা দপ্তরের জন্য ১৭০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা আছে, যাহার ফলে জাতিগঠন বিভাগ ও জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য খুব সামান্য অবশিষ্ট থাকে।

(৩০)

The shellac trade has come to a standstill in Calcutta. There has been virtually no business with foreign countries nor any export has been made during the past few weeks.

The stalemate has taken place due to official bungling. It may be recalled that the trade has formulated a new export scheme for shellac to replace the existing one by making export prices more flexible. The idea is that unless prices can be adjusted in line with supply and demand, trading will be hampered. The previous export scheme was rigid because maximum and minimum export prices were fixed.

The Government of India has, nevertheless, disapproved the new export scheme, but it has not made up its mind as to how the trade is to be regulated. As a result, export licenses, it is believed, have not been issued. [C. U. B. Com. 1962]

কলিকাতায় গালার ব্যবসায়ে অচলাবস্থা দেখা দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়াই বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত ব্যবসায় বা রপ্তানী বন্ধ ছিল।

অক্ষম সরকারী পরিচালনার জন্যই এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে, রপ্তানীমূল্যকে অধিকতর পরিবর্তনশীল করিয়া বর্তমান নীতির বদলে নূতন রপ্তানী-নীতি ব্যবসায়ী মহলে স্থিরীকৃত হয়। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, যদি যোগান এবং চাহিদার সহিত দামের সমতা আনয়ন না করা যায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইবে। পুরাতন রপ্তানী-নীতি ছিল দুষ্পরিবর্তনীয়, কারণ সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন রপ্তানীমূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যাহা হউক, ভারত সরকার নূতন রপ্তানী-নীতি অনুমোদন করেন নাই। কিন্তু কিভাবে এই ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত হইবে, তাহাও তাঁহারা স্থির করেন নাই। মনে হয়, ইহারই ফলে, রপ্তানীর অনুমতি পত্র দিলি হইতেছে না।

(৩১)

The company has a subscribed capital of Rs. 450 lakhs divided into ordinary shares of Rs. 10 each. It has now issued 195,000 ordinary shares of Rs. 10 each and 6000 cumulative redeemable preference shares of Rs. 100 each carrying 9% interest, free of company tax, but subject to the usual tax deduction at source. Out of this issue 4000 preference shares and 20000 ordinary shares will be subscribed by Rajasthan Government. The 175,000 ordinary shares and 2000 preference shares are being offered for public subscription at par. The lists are open next Friday.

The preference issue has been underwritten by the Life Insurance Corporation. The Industrial Finance Corporation has agreed to give a loan of Rs. 30 lakhs. The directors are hopeful about the future prospect and expect to pay reasonable dividends when production starts. [C. U. B. Com. 1962]

প্রতিটি দশ টাকা মূল্যের সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত ৪৫ কোটি টাকাই হইল কোম্পানিটির বিক্রীত মূলধনের পরিমাণ। বর্তমানে ইহা ১০ টাকা মূল্যের ১৯৫০০০ সাধারণ ও ৯% সুদযুক্ত ও কোম্পানির-কর হইতে মুক্ত, কিন্তু গোড়াতেই অন্যান্য প্রচলিত কর বাদ সাপেক্ষ ১০০ টাকা মূল্যের ৬০০০ সঞ্চয়ী পরিশোধযোগ্য সুবিধামূলক শেয়ার বাজারে ছাড়িয়াছে। রাজস্থান সরকার এই বিলির মধ্যে ৪০০০ সুবিধামূলক ও ২০০০০ সাধারণ শেয়ার কিনিবেন। জনসাধারণের মধ্যে সমমূল্যে বিক্রয়ার্থ ১৭৫০০০ সাধারণ ও ২০০০ সুবিধামূলক শেয়ার ছাড়া হইয়াছে। আগামী শুক্রবার হইতে ইহা বিক্রয় হইবে।

জীবনবীমা কর্পোরেশন সুবিধামূলক শেয়ারগুলির জন্য অবলেখন দিতে সম্মত হইয়াছেন। শিল্পঋণ সংস্থা ৩০ লক্ষ টাকার ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছেন। পরিচালকেরা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশাবাদী এবং উৎপাদন শুরু হইলে উপযুক্ত লভ্যাংশ দিবার আশা রাখেন।

(৩২)

Discrimination may be either personal, or local, or trade discrimination. Personal discrimination occurs when different prices are charged to different customers according to the intensity of their desire or according to their wealth. Firms are known to discriminate against persons living in fashionable quarters by charging higher prices for the same commodity. Local discrimination takes place when a monopolist sells at a lower price at one place, and charges a high price at other places. 'Dumping' is the best example of local dis-

crimination. Trade or use discrimination occurs when a monopolist charges a lower price to one trade than to another. Electric current, for example, may be sold at a low price to industrial concerns and at a higher price for the purpose of domestic consumption.

স্বতন্ত্রীকরণ ব্যক্তিগত স্থানীয় ব্যবসায়িক হইতে পারে। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রীকরণ তখনই হয়, যখন বিভিন্ন ক্রেতাদের নিকট হইতে তাহাদের সম্পদ বা চাহিদার তীব্রতা অনুসারে বিভিন্ন দাম চাওয়া হয়। ব্যবসায় সংস্থাগুলি শৌখীন অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিকট অধিক দাম চাহিয়া স্বতন্ত্রীকরণ করিয়া থাকে। স্থানীয় স্বতন্ত্রীকরণ তখন হয় যখন কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ী কোন দ্রব্য একস্থানে কম ও অন্যান্য স্থানে বেশী দামে বিক্রয় করে। "ক্ষতি দিয়া মাল খালাস করা" আঞ্চলিক স্বতন্ত্রীকরণের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ব্যবসায়িক বা ব্যবহারিক স্বতন্ত্রীকরণ তখনই হয় যখন কোন একচেটিয়া ব্যবসায়ী এক ব্যবসায়ে অন্যান্য ব্যবসায় হইতে কম দাম চায়। উদাহরণস্বরূপ, বৈদ্যুতিক শক্তি শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কম দামে এবং গৃহকর্মে ব্যবহারের জন্য বেশী দামে সরবরাহ করা যাইতে পারে।

(৩৩)

In perfect competition, there is at any rate only one homogenous commodity. In monopolistic competition there is differentiation of products. Products are not homogenous, as in perfect competition but neither are they only remote substitutes as in monopoly. What it really means is that in monopolistic competition, there are various "monopolists" competing with each other. These competing "monopolists" do not produce identical goods. Neither do they produce goods which are completely different. Product differentiation means that products are different in some ways, but not altogether so.

যে-ভাবেই হউক না কেন, পূর্ণপ্রতিযোগিতাতে একটি মাত্র সমসত্ত্ব দ্রব্য থাকে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতাতে দ্রব্যপৃথকীকরণ করা হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতাক্ষেত্রের ন্যায় দ্রব্যাদি সমসত্ত্ব হয় না, আবার একচেটিয়া ব্যবসায়ের ন্যায় দূর পরিবর্ত দ্রব্যও হয় না। আসল অর্থ হইল যে, একচেটিয়া প্রতিযোগিতাতে অনেকগুলি একচেটিয়া ব্যবসায়ী পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে। এই সব প্রতিযোগী একচেটিয়া ব্যবসায়ী সমপ্রকৃতির দ্রব্য উৎপাদন করে না। সম্পূর্ণ পৃথক দ্রব্যও আবার উৎপাদন করে না। দ্রব্য পৃথকীকরণের অর্থ কয়েকটি রূপে দ্রব্যগুলি পৃথক হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পৃথক নয়।

অনুশীলনী

1

The level of production and the material well-being of a community depends mainly on the stock of capital at its disposal—the amount of land per capita and of productive equipments in the shape of factories, locomotives, machinery, irrigation facilities, power installations and communications. An increase in the stock of capital accompanied by knowledge of how to use it to best advantage will lead to an increase in the community's output of goods and services and so to a rise in its material well-being. This may be put shortly in the sentence that "the key to economic progress is capital formation". [C. U. B. Com. 1953]

[সংকেত : Stock of capital—মূলধনের পুঁজি ; land per capita—মাথাপিছু জমি ; capital formation—মূলধন গঠন]

2

The argument that large-scale modern industries were no solution of the employment problem did not take into account the indirect employment which the manufacturing industries created. The number directly employed in the factories might be small but eight to ten times these numbers shared the prosperity created by new industries by finding employment in the subsidiary industries. The real solution of this problem of unemployment lay thus in the diversification of employment. No one can deny that there are certain lines of activity in which small-scale industries could and must find an honourable place. But it is dangerous to attempt to develop cottage industries by penalizing large-scale industries. [C. U. B. Com. 1954]

[সংকেত : Large-scale modern industries—বৃহৎ মাত্রার আধুনিক শিল্পগুলি ; Employment problem—কর্মসংস্থানের সমস্যা ; Indirect employment—পরোক্ষ কর্মসংস্থান ; Subsidiary industries—সহকারী শিল্পগুলি ; Cottage industries—কুটীর শিল্প ; Diversification of industries—শিল্পের ...]

3

The unemployment problem is not new in West Bengal. But its magnitude and acuteness have largely increased in recent years on account of certain socio-economic changes. Firstly, West Bengal's economy has suffered dislocation on account of increasing growth of population on the one hand and increasing effect of the transition

from the use of hand-driven to power-driven machines. Secondly, the middle class economy in the state has been dislocated by the loss of its support from land and by the disintegration of the joint family. Almost every family had a home and some income from land. This together with the joint family system provided insurance against sickness and unemployment. But it is common experience of all that under the stress of economic circumstances the joint family is breaking down first and the family home and the family land are also disappearing quickly. [C. U. B. Com. 1955]

[**সংকেত :** Unemployment problem—বেকার সমস্যা ; Socio-economic changes—সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ; Increasing growth of population—জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান গতি ; Power-driven machines—শক্তি চালিত যন্ত্র ; Disintegration—বিচ্ছিন্নতা ; Economic circumstances—অর্থনৈতিক পরিস্থিতি]

4

The principle of equal opportunity does not, of course, presume equal development for all ; the levels of attainment naturally depend upon individual capacities. But in this principle is discovered one of democracy's unique contributions ; it conceded for the first time the equal right of self realization to all the people, instead of limiting this right to those, who, by inherited or acquired power, could dominate the others. [B. U. B. Com. 1961]

[**সংকেত :** Equal opportunity—সমান সুযোগ ; Individual capacities—ব্যক্তিগত যোগ্যতা ; Democracy's unique contributio গণতন্ত্রের অভূতপূর্ব অবদান]

5

In a general sense, taxable capacity may be said to refer to the amount of tax burden which the community is in a position to bear without leading to the impairment of its productive effort and efficiency. Moreover, taxable capacity in the economic sense has often to be further qualified by political considerations and to some extent by question of administrative efficiency, especially in regard to the problem of enforcement of tax-payments. The knowledge of widespread tax-evasion undermines morale, puts a heavy strain on tax compliance by the honest tax-payers and undoubtedly impairs taxable capacity.

[সংকেত : Taxable capacity—করবহন যোগ্যতা ; Tax-evasion—কর ফাঁকি ; Political considerations—রাজনৈতিক বিবেচনা ; Admininis-trative efficiency—কার্য্যপরিচালনগত যোগ্যতা ; enforcement of tax-payment—করপ্রদানে বাধ্য করা]

6

A major constituent of price in this situation is fiscal and monetary discipline. Fiscal policy must be directed to mopping up the excess purchasing power which tends to push up demands above the level of available supplies and thereby to increase the savings to bring to the desirable conditions of equality between saving and investment. A word may be said in this context regarding the price policy of public enterprises have an important role in enlarging public savings. They must, therefore, operate at profit and maintain the high standard of efficiency required for this purpose. Their price policy should be such as would secure an adequete return on the investment made from public funds.

[সংকেত : Fiscal policy—ফিসক্যাল নীতি বা রাজস্ব সম্বন্ধীয় নীতি ; Excess purchasing power—বাড়তি ক্রয়-ক্ষমতা ; Equality between savings and investment—সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ঐক্য সাধন ; Public enterprises—সরকারী উদ্যোগগুলি ; Price-policy—দামনীতি]

7

The statistics of National Income provide the basis of what is called, "Social accounting." This accounting is presented in various forms such as the statements of total personal income, total personal expenditure on consumption such as food, clothing, housing, furniture, etc, and the total volume of savings; or the statements of the balance of international transactions of current account, or on Capital account etc. One important advantage of these various statements of social accounting is that they enable the statistician to check and verify the calculations made in different sectors.

[সংকেত : National Income—জাতীয় আয় ; Social Accounting—সামাজিক হিসাব গ্রহণ ; International transactions—আন্তর্জাতিক লেনদেন ; Statistician—পরিসংখ্যানকারী]

8

Balanced development of different parts of the country, extension of the benefits of economic progress to the less developed regions and

widespread diffusion of industries are among the major aims of planned development. In striving for such a balance, certain inherent difficulties have to be met, specially in the early phases of economic development. As resources are limited, frequently, advantage lies in concentrating them at these points within the economy at which the returns are likely to be favourable. As development proceeds, investments are undertaken over a wider area and resources can be applied at a large number of points, thereby resulting in greater spread of benefits.

[**সংকেত :** Balanced development—ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন ; Less developed regions—অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চল ; Early phase—প্রারম্ভে ; Investments—বিনিয়োগ]

9

Significant development during the Second Plan period included the introduction of the code of Discipline in Industry and the code of conduct, schemes for workers' participation in management and workers' education, and a growing awareness of the importance of higher productivity in Industry. In the context of the rising tempo of industrialisation, the working class has an important role and a growing responsibility during the Third Plan. The large expansion of the public sector will make a qualitative difference in the tasks set for the labour movement and will facilitate the transformation of the social structure towards socialism.

[**সংকেত :** Discipline in Industry—শিল্পে শৃঙ্খলা ; Worker's participation in management—শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ ; Rising tempo of industrialisation—শিল্পায়নের ঊর্দ্ধমুখী গতি ; Transformation of social structure—সামাজিক কাঠামোর রূপান্তরণ]

10

New Delhi, it appears, is seriously perturbed over the rising trend in prices in the country. Administrative circles point out that inflation is raising its head and effective measures are called for to bring price down to reasonable levels. This viewpoint is gaining ground as despite record output last year, the wholesale price index on January 23 last (119.2) stood 5.4 per cent higher than a year ago. A cut in Government spending and curbs on deficit financing have been suggested. Besides, the Planning Commission is reported to be seriously considering checking of consumption through further taxation.

Persistent rise in prices, if unchecked, it is felt, will have serious repercussions on the Third Five-Year Plan.

[সংকেত : Administrative circles—সরকারী মহল ; Reasonable levels—সহনশীল স্তরে ; wholesale price index—পাইকারী দামের সূচক ; Deficit financing—ঘাটতি ব্যয় ; Checking of consumption—ভোগ সংকোচন করা]

11

In recent years and more especially since the middle of the Second Plan period, a series of measures have initiated with the object of stepping up exports. These include, on the organisational side, the setting up of export promotion councils for individual commodities, establishment of the Export Risks Insurance Corporation, increased facilities for publicity, fairs, exhibitions etc. A second group of measures have consisted in the removal of export controls and quota restrictions, abolition of most of the export duties, refund of excise duties, special import license for raw materials for exports and priorities for transport facilities. Thirdly, attempts have been made to diversify India's foreign trade through the State Trading Corporation and the development of trading relations with the U.S.S.R. and countries in Eastern Europe.

[সংকেত : Stepping up exports—রপ্তানি বৃদ্ধি ; Export promotion council—রপ্তানী বৃদ্ধি সংগঠন ; Publicity—প্রচার ; Priorities—অগ্রাধিকার ; State-trading Corporation—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা ; trading relations—ব্যবসায়িক সম্বন্ধ]

12

What are trade unions? In keeping with the nature of the science of economics, there is no one definition and opinion about the origin of labour organisations in the modern industrial life. The most popular, of course, is the one given by Sidney and Beatrice Webb, who defined a trade union as "a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their working lives". Its fundamental objective, according to Webbs, is "the deliberate regulation of the conditions of employment in such a way as to ward off, from the manual-working producers, the evil effects of industrial competition".

[সংকেত : Trade Unions—শ্রমিক সংগঠন ; wage-earners—বেতন-[illegible] ; deliberate regulation—সচেতনভাবে নির্দিষ্ট করা ; manual working

producers—দৈহিক শ্রম দ্বারা যাহারা উৎপাদন করে ; industrial competition—শিল্প প্রতিযোগিতা]

13

In other words the first experiment of its kind—the implementation of a multipurpose project on the basis of cooperation between two States and the Centre—has nearly failed. It would not be irrelevant to point out that the DVC had originally been conceived as an autonomous corporation for the execution of a phased plan serving the interests of both West Bengal and Bihar as well as of the Centre. Some of the problems now facing the Corporation would not have probably arisen had it been allowed to function on the basis of its autonomy. But it can hardly be disputed that after the initial phase it virtually became a department of the Union Irrigation Ministry. Both West Bengal and Bihar came to feel subsequently that their interests were not being properly served by the Corporation.

[সংকেত : Multipurpose project—বহুমুখী পরিকল্পনা ; Not be irrelevant—অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ; autonomous corporation—স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা ; Union irrigation Ministry—কেন্দ্রীয় জলসেচ দপ্তর ; interests—স্বার্থ]

14

The biggest avalanche of selling since 1929 crash hit the New York Stock Exchange yesterday, wiping out between 16,000 and 20,000 million Dollars (between £5,670 and £7,000 million Sterling) in share values.

Today Americans looked anxiously to Wall Street for signs of a rally as they read, under huge headlines, of what some brokers called "Black Monday."

The 'New York Times' said : "Something resembling an earthquake hit the Stock Market yesterday,"

The high-speed ticker, which reports deals made on the floor of the Exchange, could not cope with the wave of selling.

It was 141 minutes behind when trading closed and showed that 9,350,000 shares changed hands—the most since July 21, 1933, and the fifth heaviest selling wave in history.

Wall Street brokers are divided in their forecasts of what may happen today. Some said a full-scale panic was on and the bottom would be reached today. Others said the climax was reached yesterday and a rally would come today.

[সংকেত : Avalanche—(বরফের ধ্বস) অতি দ্রুত নিম্নগামী হওয়া ; Black Monday—অশুভ সোমবার ; Stock Market—শেয়ার বাজার ; High-speed ticker—দ্রুততালে ধারকর্জ ; broker—দালাল ; forecasts—ভবিষ্যতের নির্দেশ]

15

The Chairman of the Tea Board was justified in expressing the hope at a Calcutta Press Conference on Monday that reduction of export duty should help boost consumption of Indian tea abroad, especially the U. S. A. and Canada which he recently visited as the leader of a delegation. The prospects for an expanding market for Indian tea in these countries, he said, were encouraging and they should be more so now with reduced export duty which would bring down its high price--one of their main complaints. But, besides the price factor now going to be largely countered by export duty reduction, improvement in quality and sustained and effective propaganda are necessary for stepping up tea export. These aspects of the matter, therefore, should not be ignored. Along with export promotion, expansion of internal market is vital for the stability of tea industry, as of other industries generally, for in the absence of an internal cushion it will remain basically weak in as much as the export market depending as it does as many uncertain factors, can hardly sustain an industry. Moreover, the huge world production of tea—about 1,460 millions lbs. in the current year and, according to F.A.O., expected to reach an over-production figure—will naturally result in the shrinkage of foreign market. To build up an internal market is, therefore, essential for the future of the tea industry. Unfortunately, however, the increased excise duty on tea will inevitably produce the contrary result.

[সংকেত : Chairman—সভাপতি ; Calcutta Press Conference—কলিকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন ; Boost consumption—ভোগ সম্প্রসারণ করা ; prospects for an expanding market—বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা ; sustained and effective propaganda—অবিরত এবং কার্যকরী প্রচার ; internal market—আভ্যন্তরীণ বাজার ; stability of tea industry—চা শিল্পের স্থায়িত্ব ; current year—চলতি বৎসর ; over production—অতি উৎপাদন ; shrinkage of foreign market—বিদেশী বাজারের সংকোচন]

16

The taste of the pudding, they say, is in the eating and the effectiveness of the Government's decision to take drastic action against

fish retailers will be judged by the result it produces. A spokesman of the Fisheries Department said on Wednesday that the steps already taken had brought down wholesale fish prices in Calcutta market by Rs. 15 to Rs. 20 a maund but it had not been reflected in the retail market. The consumers, whose patience, the spokesman admitted, had been exhausted, will hardly derive any consolation from the brave official declaration the worth of which has been adequately proved during the last so many months. They will, therefore, watch the repercussion of the Government's renewed determination on retail fish market not so much with hope of any relief as with a feeling of amused curiosity.

[**সংকেত :** Fish retailers—মাছের খুচরা বিক্রেতা ; wholesale fish prices—মাছের পাইকারী দাম ; repercussion—প্রতিক্রিয়া ; spokesman—প্রধান বক্তা, প্রতিনিধি ; amused curiosity—সকৌতুকে ; renewed determination—নূতনতর সিদ্ধান্ত]

17

An assured minimum price for jute growers, introduction on an experimental scale of cotton as a rabi crop in some of the southern States and a "package programme" for oilseeds are among the measures that have been decided upon here to achieve the Plan targets in commercial crops, reports PTI.

These measures, it is understood, were approved at recent meetings of the Planning Commission and the Union Ministries of Food and Agriculture and Community Development.

At the joint consultations it was noted that the target for jute production for the Plan, namely 62 lakh bales, had already been reached. To arrest the fall in prices, which are reported to have touched the low of Rs. 25 a maund the meeting felt that the jute Buffer Stocks Agency at Calcutta should make increased purchases this year. It was also agreed that a minimum price, namely Rs. 30 a maund, should be assured to the cultivators.

[**সংকেত :** Experimental scale of cotton—পরীক্ষামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা ; Package programme—প্যাকেজ পরিকল্পনা ; planning Commission—পরিকল্পনা কমিশন ; joint consultation—যুক্ত পরামর্শ ; Buffer stock Agency—পণ্য মজুত সংস্থা]

18

The proposal for deduction of gross dividend by the purchases from the purchase price of the cum-dividend shares after the books of

the Company are closed, will be in abeyance pending consultation with the Central Board of Revenue. The Standing Committee of the Stock Exchange Presidents, which concluded its two-day meeting at Ahmedabad last Saturday, decided to approach the Central Board of Revenue to ensure the refund on income tax deduction vouchers to the purchaser of cum-dividend shares, before taking any decision. It was felt that although adoption of the system would not involve any difficulty in respect of each section securities, some adjustments in the procedure for income-tax payment would be necessary in regard to cleared securities.

[সংকেত: gross dividend—স্থূল লভ্যাংশ; standing committee—স্থায়ী কমিটি]

19

Another factor which is threatening to hamper coal production in the private sector is the shortage of power. Although a number of collieries in the Behar-Bengal area have recently made out a case for increased power supply to meet their expansion plans, they have been told that it would not be available since the additional generating capacity being installed was already earmarked for other requirements. The railways' recent threat to stop wagon supply at short notice on charges of overloading and wasted wagon days, the zonal dumps plan for coal distribution which will disrupt the established business channels between collieries and consumers, the continuing problem of underground fires in extensive coal areas, the hasty and irregular way of downgrading collieries, the delay in the amalgamation of smaller collieries, the continuing shortage of industrial explosives, and the unsolved problem of coal prices—all these factors are also responsible, directly or indirectly, for lowering the tempo of coal production in the private sector.

[সংকেত: Generating capacity—উৎপাদন ক্ষমতা; earmarked—নির্দিষ্ট করা; zonal dumps plan—আঞ্চলিক মজুত পরিকল্পনা; amalgamation—সম্মিলন সাধন; industrial explosives—শিল্পীয় বিস্ফোরক; tempo—গতিবেগ]

20

The Third Plan envisages expansion of education facilities at all levels, but the outstanding feature of the Plan is the introduction of free and compulsory primary education in the country for the age

group 6 to 11 years. Allowing for slower progress in the education of girls in certain backward areas, it is estimated that the proportion of pupils to the number of children will go up from 61·1 per cent to 76·4 per cent in the age group 6-11, from 22·8 per cent to 28·6 per cent in the age group 11-14 and 21·5 per cent to 15·6 per cent in the age group 14-17 during the Third Plan period. The total number of students in schools will go up from 43·5 million in 1960-61 to 63·9 million in 1965-66. The requirement of school teachers for the Third Plan has been assessed at 5·51 lakhs. Teachers' training facilities are, therefore, proposed to be expanded substantially. The number of students in Universities is expected to go up from 9 lakhs in 1960-61 to 13 lakhs in 1965-66. One of the main tasks in the Third Plan will be to expand facilities for the teaching of science, the aim being to raise proportion of science students to about 43 per cent. This is essential for meeting the increased demand in a number of different fields, e.g. science teachers for schools, students for engineering and other technical institution and scientific personnel for industry.

[*Third Five Year Plan*]

[সংকেত : envisages—বিবেচনা করা ; outstanding feature—উল্লেখযোগ্য দিক ; introduction—সূত্রপাত ; Allowing for—ধরিয়া লইলেও ; scientific personnel—বিজ্ঞান দক্ষ কর্মী ।]

21

Jute shares have been hesitant and prices have drifted downwards. The easier trend is partly due to the general weakness in the stock market and partly because of the fall in gunny prices during the past few days.

Foreign inquiries for jute goods have become sluggish during the past couple of weeks. As stocks in the U.S.A. are sufficient, that country has not shown much interest. Inquiries from the Argentine have stopped due to the shortage of foreign exchange she is facing.

The trade is nevertheless optimistic about the outlook. Judging from present indications, it looks as if the demand for jute goods has increased due to an expansion of internal trade. As prices of gunnies have moved down to more reasonable levels, inquiries from overseas countries are expected to broaden. It is also hoped that the Government will meanwhile take steps to facilitate the shipment of goods by stopping harassment by the customs authorities.

(C.U. B.Com. 1963)

[সংকেত : Trend—ঝোঁক ; Gunny—পাটজাত থলি ; sluggish—মন্দা ; customs authorities—শুল্ক কর্তৃপক্ষ]

22

The substantial rise in the price of Indian Iron has been an outstanding feature of the stock market this week. The declaration of a taxable interim ordinary dividend of 8% for the year ended March 1962 has been the major stimulants. The directors have also decided to pay a final dividend for 1961-62 when the accounts of the company are finally closed after the announcement of the retention price of steel for the two years ended March 1962. Sentiment has been boosted by prospects of expansion in the activity of the company. There has been an increase in the production of the company during July.

Under the lead of Indian Iron, prices of other speculative shares have been marked up. At the settlement on Wednesday, the carry-forward charges were generally lower, indicating an oversold production. The full support apart, bears have covered their open positions in order to take profits.

[*C.U. B.Com. 1963*]

[সংকেত : substantial—বেশি মাত্রায় ; stimulant—শক্তিবৃদ্ধিকারী বিষয় ; speculative shares—ফাটকাদারী শেয়ার ; marked up—ঊর্ধে উঠিয়াছে ।]

বাংলা অনুচ্ছেদসমূহের ভাষান্তরণ

(১)

এদেশে কৃষির উপর যারা নির্ভর করে তাদের মধ্যে শতকরা ১৮ জনই কৃষি-শ্রমিক। এদের দুর্দশার অন্ত নেই। বৎসরের সব সময়ে এদের কাজ থাকে না, রোজগারও সামান্য। তা-ছাড়াও এদের আরও অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এদের এই দুরবস্থার জন্যই আমাদের গ্রাম্য-সমাজও দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের অবস্থার উন্নতি করা দরকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে এদের দুর্দশার অনেকটা লাঘব হবে। গ্রামের শিল্পসমূহ আবার চাঙ্গা হলে এবং সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা হ'লে এদের রোজগারের নূতন পথ খুলে যাবে। এছাড়া সর্বনিম্ন আইনবলে এঁদের মজুরীও কম হবে না। বিশেষতঃ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শহরাঞ্চলের নানা কাজে এদের অনেককে নিয়োগ করা যাবে।

[C.U. B.Com. 1956]

Eighteen per cent of those who depend on agriculture in this country are agricultural labourers. There is no end to their miseries. They do not find employment throughout the year; their earning is also meagre. Besides, they have to undergo many other difficulties. Our village community has also become weak in view of their distressed condition. So, there is an urgent necessity to improve their condition, as early as possible. The Five Year Plans will reduce their miseries to a great extent. With the revival of the village industries and with farming being carried on co-operative line, there will be new avenues of earning open to them. Besides, under the Minimum wages Act the rate of wages cannot but enhance. They can also be employed in various works in urban areas, particularly along with the development of the economic condition of the country.

(২)

আমাদের ইহা দৃঢ় ধারণা যে আদ্রা-হাওড়া সেক্‌সনের মধ্যে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে রেল কোম্পানীর যে আয় হয় সেরূপ আয় এই সেক্‌সনের মধ্যে অন্য কোন ষ্টেশনেই হয় না। কোম্পানির হিসাবাদি দেখিবার সুযোগ আমাদের না থাকিলেও আমরা ইহা অনুমানের ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, প্রতি মাসে বাঁকুড়া ষ্টেশন হইতে সর্বরকমে রেল কোম্পানীর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা আয় হইয়া থাকে। মাসিক এইরূপ আয় হওয়া কথার কথা নহে। অথচ ষ্টেশনের অবস্থা যাহা তাহা মেদিনীপুর, পুরুলিয়া হইতে শতগুণে নিকৃষ্ট। ষ্টেশনে উচ্চ প্ল্যাটফর্ম না থাকার জন্য মহিলা, রুগ্ন

বৃদ্ধ ও শিশুদিগকে লইয়া যাত্রীদিগকে কি হয়রানিই হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারটি যখন সংস্কার করা হইল এবং অপর একটি নূতন শেড তৈয়ারী করা হইল তখন আশা হইয়াছিল যে এই সঙ্গে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম উচ্চ করা হইবে। এই অসুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে নাই কেন? [*C. U. B. Com. 1958*]

We firmly believe that the revenue by the Railway Company from Bankura Station is higher than the earning of any other station in the Adra-Howrah section. Though we have no opportunity to look into the accounts of the company, yet we can guess that the total income of the Railway Company from the Bankura Station under all heads amounts to about six lakhs of rupees. Such a monthly income can hardly be ignored. But the condition of the station is hundred times worse than that of Midnapore or Purulia. As there is no high platform in the station, the trouble that the passengers with ladies, sick, old men and childen have to undergo is known to every sufferer. When the third-class waiting hall was renovated and a new shed was constructed, it was expected that the platform of the station would also be raised along with these reconstruction works. We don't know why this disadvantage was overlooked by the authorities?

(৩)

সাত বন্ধু বেকার এবং শিক্ষিত, তাহাদের তিনজন বিবাহিত। তাহারা চাকুরির জন্য নানাস্থানে দরখাস্ত করে, নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায়। চাকুরি কিন্তু হয় না। নিরাশ হইয়া তাহারা ঠিক করিল, চাকুরির খোঁজে আর নয়—অন্নাভাব ঘুচাইবার সত্যকার পথের সন্ধানে এবার নামিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা কৃষিকার্যে নামিয়া পড়াই স্থির করিল। নিজেদের সোনারূপা বিক্রয় করিয়া, হাওলাত করিয়া এবং নানাপ্রকারে তাহারা ১০,০০০ টাকা জোগাড় করিল। কাজ শুরু হইয়া গেল। তাহাদের প্রাথমিক সম্বল চারিটি গাই—প্রতিদিন সকাল বিকালে পনর-যোল সের দুধ পাওয়া যায়। নিজেদের জন্য পাঁচ সের রাখিয়া বাকি দুধ তাহারা বিক্রয় করে। তাহাতে গড়ে রোজ আট টাকা রোজগার হয়। জলতোলা ও ধানভানা কল আসিল। যখন জল তুলিবার দরকার হয় না তখন ঐ কল দিয়া ধান ভানিয়া কিছু রোজগার হইতে লাগিল। ছয় ঘণ্টাতে গড়ে চব্বিশ মণ ধান ভানিয়া আঠারো টাকা মুনাফা আসিতে লাগিল। [*C. U. B. Com. 1959*]

There were seven educated but unemployed friends, of whom three were married. They applied for jobs to many places and moved about from place to place. But there was no job found for them.

Being disappointed they decided not to seek jobs any more but to find out a real solution to the problem of their *livelihood. After a* long deliberation, they decided to take to agriculture. They procured a sum of ten thousand rupees by selling their gold and silver, by borrowing money and by other means. Their work was started. Their primary asset was four cows and they got fifteen to sixteen seers of milk every morning and evening. They kept five seers for their own use, and they used to sell the rest of milk. This sale yielded eight rupees a day on an average. Then came the water-pump and the husking machine. When there was no need for pumping water, the machine was used for husking paddy and they earned something out of it. There was a profit of eighteen rupees by husking twenty-four maunds of paddy on the average in six hours.

(৪)

ভারতে স্বল্পবিত্তদেব গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা ১৯৫৪ সালে গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৮ সালের শেষাশেষি সমগ্র ভারতে প্রায়, ৩৫ হাজার বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং আরও ১৪ হাজার বাসগৃহের নির্মাণ কার্য চলিতেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসের শেষাবধি মোট প্রায় ২৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে।

ভারতে সহরবাসীদের অধিকাংশের আয় স্বল্প বলিয়া তাঁহারা সরকারী সাহায্য ব্যতীত নিজ নিজ বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের সাহায্যের জন্যই সরকার এই গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। বহু লোকই এই পরিকল্পনার সুযোগ গ্রহণে ইচ্ছুক। কিন্তু জমির অত্যধিক মূল্য এবং ভাল জমির অভাবের জন্য সকলের পক্ষে ইহাব সুযোগ গ্রহণ সম্ভব হইতেছে না। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন রাজ্যের গৃহনির্মাণ মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে এই অসুবিধা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনার পর স্থির হয় যে পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দকৃত অর্থের একটা বড় অংশ রাজ্যসরকাবসমূহ জমি সংগ্রহ ও উন্নয়নে ব্যয় করিবেন। উপরন্তু অপর এক পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত-সরকার রাজ্যসরকারসমূহকে প্রকৃত বাসগৃহ নির্মাতাদের মধ্যে বিনা-লাভ বিনা-ক্ষতি ভিত্তিতে জমি বণ্টনের উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহ ও উন্নয়নের জন্য অর্থ প্রদান করিবেন। [C. U B. Com. 1960]

In India, the Low-Income Group Housing Scheme was adopted in 1954. By the end of 1958 about thirty-five thousand dwelling houses have already been built and construction work of fourteen thousand more have been going on in the whole of India according to this scheme. Under this scheme, a sum of about twenty nine

crores and fifty six lakhs of rupees is being spent upto the end of March, 1959.

In India, as the income of most of the urban people are low, they cannot build their own houses without the help of Government. The Govt. has adopted this scheme just to help them in this matter. Many persons are willing to take advantage of this scheme. But for the exorbitant prices of land and the want of good lands, it has not been possible for all to avail themselves of this opportunity. In the conference of the Housing ministers of different states in October 1958 held to discuss this disadvantage, it was decided after long deliberation that the state Govts. would spend a major portion of the allocated sum for acquiring land and their development under this scheme. Besides that, according to a different scheme, the Govt. of India would provide the State Govt. with funds for acquiring land and their development in order to distribute land among the bonafide house-builders on no-profit no-loss basis.

(৫)

গ্রামীণ শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক কারিগর, পুরুষানুক্রমে পল্লীশিল্পে নিযুক্ত থাকলেও কৃষিকাজ করে। তাতে জমির উপর আরও বেশি চাপ পড়ে। এই সমস্ত কারিগর আবার তাদের নিজেদের পৈতৃক ব্যবসায়ে ফিরে গিয়েছে। অবশ্য, এজন্য তারা সরকার থেকে শিল্প-ঋণ পেয়েছে। এই ঋণ সুবিধামত কিস্তিতে শোধ করতে হয়। আবার অনেকে এই ঋণ নিয়ে বেশি পরিমাণে কাঁচামাল এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে রেখেছে। তাতে তাহাদের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা সত্য যে, অনেক সময়ে এই ঋণ জমি পুনরুদ্ধারের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে অথবা কন্যার বিবাহে খরচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেখানে ঋণ সংগ্রহ করা খুবই দুষ্কর সেখানে এই ধরনের ব্যয় অসম্ভব নয়।

পল্লী অঞ্চলে হাজার হাজার নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। আর সেই বাবত খরচের ব্যাপারেও পল্লীবাসীরা সাহায্য করছে। পল্লীর জনসাধারণ পূর্বে একই পুকুরে জলে স্নান করত, কাপড়চোপড় কাচত আবার সেই পুকুরের জলই তারা পান করত। কিন্তু এখন তারা নলকূপ থেকে বিশুদ্ধ জল পাচ্ছে।

[*C.U. B.Com. 1961*]

In the village industry sector, many artisans, though engaged in the village industries by tradition, do the work of cultivation. It leads to more pressure on land. These artisans have, once again, gone back to their ancestral occupation. Of course, they have received industrial loans from the Government for this purpose. This loan is to be repaid

in instalments according to convenience. Again, many have piled stocks of raw material and modern machineries with this loan. Their cost of production is thereby reduced and their efficiency has increased. It is true that in most cases, this loan has been used for reclamation of land or spent in the marriage ceremony of daughter. But where it is difficult to procure such loans, the possibility of this type of expenditure cannot be ruled out.

Thousands of tube-wells have been sunk in the rural areas. And the villagers have also helped in the expenditure on that account.. Formerly they used to take bath, washed clothes and drank the water of the same tank. But now they are getting pure water from tube-wells.

(৬)

এই মহানগরীর দুর্গন্ধ অলিগলি, বস্তি প্রভৃতি দুঃখ ও দৈন্যের কেন্দ্র ; বেকার সমস্যা, নিদারুণ অর্থকষ্ট ও অভাবের গা ঘেঁসিয়া এখানে ভোগ ও ঐশ্বর্যের জাঁকজমক প্রকটভাবে দেখা যায়। বিপ্লব যদি ঘটে ত কলিকাতাতেই ঘটিতে পারে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই কলিকাতার উন্নতির জন্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতাধিক কোটি মুদ্রা ব্যয় করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু শহরের যাহারা স্বাভাবিক অধিবাসী তাহাদিগকে যদি যথাযথরূপে জীবনপথে সুপ্রতিষ্ঠ রাখা না যায় তাহা হইলে শুধু ড্রেন গড়িয়া শহরের বিস্ফোরক অবস্থা সুসংযত করা যাইতে পারে না। [*B. U. B. Com. 1961*]

The stinking lanes and slums of this metropolis are the centres of misery and poverty. Here the grandeur of luxury and wealth is displayed strikingly side by side with unemployment problem, acute financial stringency and wants. If there be revolution, it may happen here in Calcutta. In consideration of all these problems, Dr. Bidhan Chandra Roy has decided to spend more than hundred crores of rupees for the development of Calcutta in the Third Five Year Plan. But unless the regular inhabitants of the city are properly rehabilitated in normal occupations in life mere construction of drains will be of no avail in restraining the explosive situation.

(৭)

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি সবই নূতন-স্বাধীন-হওয়া দেশ, যাদের উপর পূর্বে সাম্রাজ্যিক এবং ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ বহুদিন ধরে চলে এসেছিল। আধুনিক বৈষয়িক দৃষ্টিতে এগুলি সকলেই কমবেশি অনুন্নত দেশ এবং ছোট হোক, বড় হোক, প্রত্যেকের সম্বন্ধেই এটা ধরে' নেওয়া হয়েছে যে বিদেশী সাহায্য ছাড়া এদের বৈষয়িক

উন্নতি সম্ভব নয়। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়নকল্পে যে সাহায্য আবশ্যক মনে করা হয়, তা যারা দিতে পারে তারা কিন্তু নিরপেক্ষ নয়।

[*B. U. B. Com. 1961*]

All the neutral nations are newly independent states all of whom were under the yoke of imperialistic and colonial rule and exploitation for a long time. In the light of modern economic perspective all of them are more or less underdeveloped countries and whether small or big, it is presumed that economic development of any one of them is not possible without foreign aid. But those who can afford to offer this aid, which is necessary for the underdeveloped countries, are not neutral.

(৮)

কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের সরবরাহ দপ্তর দেশী শিল্প উন্নয়নের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে মূল্য সম্পর্কে সুবিধা দান, দ্রব্য সরবরাহে দীর্ঘমেয়াদী ঠিকা ও দেশের কোন কোন কোন দ্রব্যের সম্পর্কে যে অভাব আছে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে থাকেন।

তাছাড়া এই সংস্থা বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে ব্যবহারের জন্য দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্য কিনে থাকেন। দেশে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনেও উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে। এই প্রচেষ্টার ফলে দেশীয় পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে বছরে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা বেঁচে যাচ্ছে। রেলওয়ের প্রয়োজনীয় যে সব দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং ভারতে যে সব দ্রব্যের অভাব রয়েছে, সেগুলির একটি তালিকা সরবরাহ দপ্তর প্রণয়ন করেছেন। এই তালিকা দেখে দেশী শিল্প উৎপাদকেরা নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে উদ্যোগী হতে পারেন।

[*C. U. B. Com. 1962*]

The informations about price-concession for encouraging industrial development, long-term lease for supply of goods and shortages of particular goods in the country are furnished by the Supply Department of the Central Works, Housing and Supply ministry.

Apart from that, this organisation purchases a huge amount of goods from the indigenous industrial undertakings for use in the different Government departments. It also encourages in the production of new merchandise. On account of this encouragement the production of indigenous goods has increased enormously. Thus, foreign exchange to the tune of about one crore and thirty lakhs rupees is

saved every year. The Supply Department has prepared a list of the necessary commodities imported by the Railways from foreign countries and also of the commodities in which there is a shortage in India. Going through this list, the industrial producers of the country may be enthusiastic about the production of new goods.

(৯)

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির উন্নতির ব্যাপারে গাফিলতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত নৈরাশ্যজনক। এই রাজ্য কৃষিজাত বহুপ্রকার পণ্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গকে চালের জন্য উড়িষ্যার নিকট হাত পাতিতে হয়। গমের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট ধর্ণা দিতে হয়। ডালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিহারের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গে রান্নার কাজে ব্যাপকভাবে সরিষার তৈল ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এই সরিষার তৈল আসে উত্তর প্রদেশ হইতে। পশ্চিমবঙ্গের গুড় ও চিনির অভাব মিটায় বিহার ও উত্তর প্রদেশ।

[*C. U. B. Com. 1962*]

The report that has been published about the negligence in agricultural development in West Bengal is quite disappointing. This state is dependent on other states in regard to various types of agricultural crops. West Bengal is to solicit rice from Orissa. For wheat, West Bengal is to approach the Central Government. For pulses, West Bengal is dependent on Bihar. Mustard oil is used widely for cooking in West Bengal but this mustard and the oil come from Uttar Pradesh. West Bengal's need for molasses and sugar is met by Bihar and Uttar Pradesh.

(১০)

ভারত সরকার বর্তমানে শিল্পে যে প্রকার বেপরোয়াভাবে অর্থ বিনিয়োগ করিতেছেন এবং তাঁহাদের শিল্পগুলি উৎপাদনের দিক হইতে বর্তমানে যে ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে শিল্পপণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজারের দিকে নজর দিতে হইবে। উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তাও আছে। কারণ, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে খাদ্যশস্যক্রয় পরিকল্পনার রূপায়ণ ইত্যাদির জন্য ভারত-সরকার ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও বেশী ঋণ সংগ্রহে তাঁহারা যেভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা সুদে আসলে পরিশোধের একমাত্র উপায় বিদেশে রপ্তানী বৃদ্ধি।

[*C. U. B. Com. 1962*]

The way the India Govt. is spending money desperately on industries and the way the progress is made by the industries presently

in regard to productivity, in near future they will have to look forward to foreign markets for selling industrial goods. That is really an urgent necessity. As the Govt. of India has procured after independence such enormous amount of loan from foreign countries for the implementation of Food Grains Purchase plan and as it also intends to obtain further loans in near future the only way to repay the loan inclusive of interest is to promote exports to foreign countries.

(১১)

বিগত বিশ বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি, দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে যে সব পণ্য অপরিহার্য, আমাদের দেশে সে-সব পণ্যের ঘাটতি বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দু' একটা পণ্যের উল্লেখ করছি, যেমন, বস্ত্র, ঔষধ, পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি। পণ্যের ঘাটতির ফলে অসামরিক জনসাধারণের ন্যূনতম চাহিদাও মিটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপর সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মিটাবার জন্য যদি ঐ পণ্যের বিরাট অংশ নির্দিষ্ট করা হয়, তা হ'লে অসামরিক চাহিদা মিটানো স্বভাবতঃই আরও কষ্টকর হয়ে উঠবে। ফলে, পণ্যের দর চড়াবার জন্যও চেষ্টা শুরু হয়ে যাবে।

(*B. U. Mod. 1963*)

It has been observed by us that for the last 20 years the commodities which are essential for our daily living are in short supply in our country. For example we mention a few commodities, such as clothes, medicines, nutritious food etc. It has become practically impossible to meet the minimum requirements of civil population due to the scarcity of goods. Over and above it, if a large portion of that supply is allocated for armed personnel, then naturally it will be much more difficult to meet the civil demand. As a result attempts will be made to raise the prices of goods.

(১২)

কমন মার্কেটের সূচনা হয়েছে মাত্র পাঁচ বছর আগে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত জাতীয় উৎপাদন ইতিমধ্যে শতকরা প্রায় বাইশ ভাগ বেড়েছে, বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে শতকরা তিয়াত্তর ভাগ। এসব দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি যে দ্রুত বাড়ছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। পরিসংখ্যান নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা অনুমান করছেন যে, আজ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে নব-ইউরোপ-এর রাষ্ট্রগুলি স্কুল, রাস্তাঘাট আর কলকারখানায় আরও প্রায় বাড়তি চারলক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারবে।

(*B. U. Mod. 1963*)

The common Market has come into existence just 5 years back, The total national product of the member countries has increased in the mean time by about 22%, the volume of trade has increased by 73%. It is needless to say that the material posperity of these countries is increasing rapidly. Those who deal with statistical estimate surmise that by the year 1970 now on the states of New-Europe would be able to spend an additional amount of about 4 lakh crores of rupees on schools, roads, building & factories.

(১৩)

পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতিরই চরিতার্থ করিবার মত উদ্দেশ্য আছে, প্রত্যেকেরই প্রচার করিবার মত কিছু না কিছু শাশ্বত বাণী আছে, এবং প্রত্যেক জাতিরই অনুসরণ করিবার মত একটি নিশ্চিত আদর্শও রহিয়াছে। অতএব প্রথমেই আমাদিগকে আমাদের জাতীয় আদর্শটি কি তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। আন্তর্জাতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এই দেশ কোথায় স্থানলাভ করিবে এবং জাতীয় সমন্বয়ের ক্ষেত্রেই বা আমাদের কি বলিবার আছে তাহাও যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে হইবে।

জগতে দুই প্রকার বিভিন্ন ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এক, ধর্ম ভিত্তির উপর ; আর এক, সামাজিক প্রয়োজনের উপর। একটির ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা, অপরটির জড়বাদ।

(B. U. Part I, 1963)

Each nation of the world has some object to achieve, each has some eternal sermon to propagate, each nation has some definite ideal to follow. At the outset, therefore, we have to understand what precisely is our national ideal. We should properly visualise the place our country is going to achieve in the progress of the commity of nations and what would be our say in the field of national integration.

In this world the establishment of social life has been attempted on two types of bases—one the religious basis, the other is the basis of social necessity. The basis of the one is spiritualism and of the other is materialism.

(১৪)

ঘাটতি ব্যয়ের তাৎপর্য কি, তাহা সকলেই জানেন। এক-একটা দেশের গভর্ণমেণ্ট যখন ট্যাক্স ও ঋণলব্ধ অর্থ দ্বারা নিজেদের অপরিহার্য ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারেন না, তখন তাঁহারা নোট ছাপাইয়া ওই নোটের দ্বারা ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া থাকেন। এক কথায় উহাই ঘাটতি ব্যয়। নোট ছাপাইবার একমাত্র মালিক মূলত গভর্ণমেণ্ট যত ইচ্ছা বেশী টাকার নোট আয়ত্তে আনিয়া তাহার দ্বারা নিজেদের অপরিহার্য ব্যয়

সন্ধান করিতে পারেন। সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহের সময়েই বিভিন্ন সরকারকে এই পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত সরকারকেও শেষ পর্যন্ত এই পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য এই পন্থা অবলম্বনের একটা বড় রকম বিপদ আছে। তাহা হইতেছে মুদ্রাস্ফীতি, অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি।

(B. U. Part I, 1963)

Everyone knows the significance of deficit financing. When the government of a country cannot meet unavoidable expenses from the amount raised by taxes and loans, it prints paper money and meets its expenses in this way. This is, in fine, deficit financing. The only authority of issuing paper money is government and it can meet its unavoidable expenditure by bringing within its reach as much of paper money as it likes. Generally the different government take recourse to this method during war. Under the present circumstances, ultimately the Government of India too will have to take resort to this means. However, there lies a great danger in such methods. The danger is Inflation, that is, exorbitant rise in the commodity prices.

(১৫)

সকল সমস্যা আমাদিগকে এমন ভীষণ ভাবে ঘিরিয়াছে যে, তাহা হইতে মুক্তির কোনো উপায় আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। সাধারণত অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে এদেশে নূতন ধান উঠে বলিয়া ধান চাউলের দাম কমিয়া যায়। এ বৎসর ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে চাউলের দাম বাড়িয়া ১০৲ টাকা মণের স্থানে ৪০৲ টাকা মণ হইয়াছে। মফঃস্বলে নূতন ধান ৮৲ টাকা মূল্য হইতে বাড়িয়া ১৮৲/২০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে; ফলে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণের পক্ষে দুইবেলা ভাতের সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

(B. U. Mod. 1964)

So many problems have engulfed us so seriously that we can find out no means to their solution. Generally the prices of rice and paddy come down in 'Agrahayan' and 'Poush' as new paddy is harvested. Just the reverse has happened this year. Since the second week of 'Agrahayan' the price of rice has gone up from Rs. 10/- per maund to Rs. 40/- per maund. In the rural areas the price of new paddy has increased from Rs. 8/- and is now being sold at Rs. 18/20; as a result, it has become virtually impossible for the middle and the poorer classes of people to arrange for enough rice for two meals a day.

(১৬)

বাংলার চাষী দরিদ্র। সামান্য কয়েকখণ্ড জমির উপর তার সারা বৎসরের জীবিকা নির্ভর করে। আবহমান কাল থেকে তারা একই উপায়ে সেই জমি চাষ করে আসছে। বর্তমান যুগের সমুন্নত কৃষিবিদ্যা তাদের স্পর্শমাত্র করেনি। এই শতাব্দীতে কৃষিবিজ্ঞানে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে, তার সাহায্যে ইউরোপ ও আমেরিকার কৃষক সম্প্রদায়ের অনেকেই প্রভূত সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের চাষী যে গরীব সেই গরীবই রয়ে গেছে।

(B. U. Mod. 1964)

The peasants of Bengal are poor. His annual subsistence depends upon only a few pieces of land. From times immemorial, they are tilling those lands in the same method. The developed agricultural knowledge of modern age has not touched them in the least. There has been a revolutionary change and development in the science of agriculture in this century, many peasants' of Europe and America by utilising of these methods have achieved happiness and prosperity. But the farmers of our country has remained as poor as ever.

(১৭)

ভারতের অর্থনীতিতে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়। প্রতি বৎসরেই এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বাজেট প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া আছে ভারতের রেল বাজেট। ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে, সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারীর শেষ দিনটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সংসদে পেশ করা হয়। ইহার কয়েকদিন পূর্বে বাহির হয় রেলপথের আয়ব্যয়ের হিসাব। আবার সঙ্গে সঙ্গে চলতি আর্থিক বৎসর অর্থাৎ এপ্রিল হইতে মার্চ শেষ হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বাজেট উপস্থিত করা হয়। এই বাজেট হইতে আগামী বৎসরের আর্থিক অবস্থার ও বিনিয়োগ-বাজারের সম্ভাব্য গতির নির্দেশ পাওয়া যায়।

(B. U. Part 1, 1964)

In Indian economy the months of February & March constitute the most decisive period. At this time each year the budgets of the central and different state governments are announced. Apart from these, there is India's railway budget. At the end of February, generally in the last working day of February, the central Budget is placed in the Loka-Sabha. The revenue and expenditure accounts of the railway are submitted a few days before it. Simultaneously, the bud-

gets of the different state governments are placed before the end of the current financial year, i.e., from April to March. From these budgets, we can have indication of the probable future course of the monetary situation and investment market.

(১৮)

শনিবার কলিকাতা বন্দরের মেরিন সার্ভিসের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিরা পোর্ট কমিশনারের অফিসে পৃথক পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

ঐ দিনের আলাপ-আলোচনায় প্রকাশ, মেরিন সার্ভিসের পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা পোর্ট কমিশনার্সের চেয়ারম্যান শ্রী বি বি ঘোষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অন্য সদস্যও নিযুক্ত হইতে পারেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মেরিন সার্ভিসের 'অপারেশনাল' বিভাগকে স্বতন্ত্র করিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বলিয়া শনিবার সংশ্লিষ্ট মহলে কেহ কেহ মন্তব্য করেন।

শনিবার পোর্ট কমিশনার্স অফিসে জাহাজমন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর অনুগত পাইলটদের সহিতও সাক্ষাৎ করেন।

The delegations of the different departments of the marine service of Calcutta Port called on the central shipping minister Srj. Rajbahadur seperately in the office of the Port Commissioners on Saturday.

It is disclosed in the talks of that day that the chairman of the Port Commission, Sri B. B. Ghosh would consider the plan if re-arrangement of the Marine Service. It is also reported that if required some other members may also be appointed to assist him. Some persons, associated with the circle concerned, commented on Saturday that there is a possiblity of separating the operational unit of the Marine service.

On Saturday, the Shipping minister Sri Rajbahadur met the loyal pilots also in the office of Port Commission.

(১৯)

পশ্চিমবঙ্গের সমবায়-সমিতিগুলির বেশীর ভাগই কৃষিকেন্দ্রীক এবং ওইগুলির কাজ প্রধানত কৃষি-ঋণ দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই রাজ্যেই ভারতবর্ষের প্রথম সমবায় কৃষি-ঋণদান সমিতি গঠিত হইয়াছিল। অথচ ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজ্যের সমবায়-আন্দোলন সবচেয়ে দুর্বল বলিলে অন্যায় হইবে না। হিসাব ঠিক না রাখা, সমিতির পরিচালনায় শিক্ষিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত কর্মীর অভাব, ঋণের টাকা ঠিক সময়ে পরিশোধ না করা, সম্পাদক বা ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের দ্বারা নিজেদের

কাজে সমিতির তহবিল ব্যবহার প্রভৃতি সমবায়-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হিসাবে সচরাচর উল্লেখ করা হয়। আসলে এগুলি কারণ নয়; বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। সমাজের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তিদেরই সমবায় প্রতিষ্ঠান হইতে উপকৃত হইবার কথা। কিন্তু এই রাজ্যের সমবায়-সমিতিতে গরিব ব্যক্তিদের ঠাঁই নাই।

—আনন্দবাজার

Most of the Co-operative Societies of West Bengal are agricultural and their activities are limited mainly to the advance of agricultural loans. The first Agricultural Co-operative credit society of India was found in this state. But it will not be wrong to say that the Co-operative movement in this state is perhaps the weakest in India. Correct accounts are not maintained, dearth of educated and trained workers for the management of society, the non-repayment of loans in due time, the use of the society's fund by the secretary or members of the managing committee for their own purpose etc. are generally cited as the causes of the failure of the Co-operative movement. But these are not the real reasons, these are only outward manifestations. The relatively poorer people of the society are to benefit from a co-operative organisation. But there is no room for poor people in the Co-operative societies of this state.

(২০)

একথা যে-কোনো সভ্য স্বাধীন দেশের লোকের চিন্তা করতে কষ্ট হবে। কিন্তু এদেশে ব্যবসায়ের সবক্ষেত্রেই এই রকম চলছে। ভেজাল জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী। কিন্তু এদেশে সমস্ত জিনিসই ভেজাল। বিশুদ্ধ খাদ্য আমরা তাকেই বলি যাতে অর্ধেকের বেশি ভেজাল থাকে না। তারা দেশের কথা ভাবে না, দেশের মানুষের কথা কিংবা ভবিষ্যতের কথাও না। ভাবে বর্তমান লাভের কথা। এইটেই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মৎস্যব্যবসায়ীরাও সেই দুষ্টচক্রের অন্তর্গত। তারা মাছ পচিয়ে নষ্ট করবে, তবু দেশের লোককে খেতে দেবে না, অতি লাভের লোভে। দেশের লোক অনাহারে থাক, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে জাতি দিন দিন স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল হয়ে পড়ুক। কিছু যায় আসে না। আমার টাকা চাই। এই দৃষ্টিভঙ্গী যাদের তারা স্বাধীনতার অনুপযুক্ত। বস্তুত আমরা নামেই স্বাধীন হয়েছি। স্বাধীন জাতির মনোভাব এখনও অর্জন করতে পারিনি। দুঃখের বিষয়, আমাদের গবর্ণমেণ্ট এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও জাতির মধ্যে সেই মানসিকতা সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়েছেন। গণতন্ত্রে সব চেয়ে মূল্যবান বস্তু হচ্ছে ভোট। এদেরই হাতে ভোট এবং টাকা। নির্বাচন-যুদ্ধে জয়লাভ করতে এই দুটি বস্তুই অপরিহার্য। সুতরাং এদের অপরিমিত লোভ দমনে সকলেই অক্ষম। —আনন্দবাজার

Any citizen of a civilized free nation will find it hard to believe. But this practice is widely prevalent in every field of business in this country. Adulteration is detrimental to public health. But each and every commodity is adulterated in this country. We call that pure food in which adulteration is not more than fifty per cent. They do not think of the country, neither of the countrymen nor of the future. They think only in terms of immediate gains. And this has become an established practice. The dealers in fish are also included in that vicious circle. The lure of excess profit would make them rather prefer to destroy the fish by putrefaction but they would not allow their country men to consume it. People may remain unfed, the nation may become weak and health may deteriorate day by day. It does not matter. Only money is needed. Men with this outlook are unfit for independence. In fact, we are independent only in name. We have not yet attained the spirit of a free nation. It is a matter of regret that the Govt. and the political leaders as well have failed to inspire the nation with this spirit. Exercise of franchise is the most precious possession of a democracy. They have both money & vote. These two things are indispensable for winning the battle of ballots. Therefore none can stem their unlimited greed.

(২১)

লোকসভায় আজ সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের অর্থবরাদ্দ দাবি সম্পর্কে বিতর্ক শেষ হইয়াছে। আলোচনা শুনিয়া মনে হইতেছে যে, দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের কৃতকার্যতা সম্পর্কে পরিষদের সদস্যদের ন্যায় সরকারও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

ডি ভি সি'র ব্যয়াধিক্য সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য সমালোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ডি ভি সি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম এই সমালোচনা হইতে ডি ভি সি'কে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ দপ্তরেরই রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ও ভি আলাগেশান অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, ডি ভি সি সম্পর্কে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়।

The debate on the demand for allocation of money by the Irrigation and Power Ministry has been concluded in Loksabha today. It seems from the discussion that like other members of the Parliament, the Government has also become disappointed regarding the success of Damodar Valley Corporation.

Different members have criticised the excessive expenditure of the D. V. C. and have opined that the D. V. C. has failed to control flood. The Minister for Irrigation and Power, Sri Hafiz Mahammed

Ibrahim tried to shield the D. V. C. from such criticism. But the Minister of State of the same department Sri O. V. Alagesan frankly confessed that their experience about the D. V. C. was not happy.

(২২)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার আজ লোকসভায় বলেন, বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন যে, ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতে বসন্ত মহামারী দেখা দিবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যয়বরাদ্দের দাবি সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরদানকালে ডাঃ নায়ার উপরিউক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া সদস্যগণকে বসন্ত রোগ দূরীকরণের কাজে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার আবেদন জানান।

তিনি বলেন যে, স্বাস্থ্য দপ্তর এবং সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের কর্মীরা একযোগে বসন্ত রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করিবেন।

ডাঃ নায়ার বলেন, গত ১লা এপ্রিল হইতেই রাজ্যসরকারগুলির বসন্ত রোগ প্রতিষেধক টীকা দেওয়ার কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করার কথা ছিল, কিন্তু "বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কিত" অসুবিধার জন্য সেই কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ আরম্ভ করা যায় নাই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ নাগাদ ভারত হইতে ম্যালেরিয়া, বসন্ত, গলগণ্ড প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হইবে।

The Health minister, Dr. Sushila Nayar disclosed in Loksabha to-day that in the opinion of the experts there would be an outbreak of small-pox in epidemic form in the year 1962-63. While answering the debate on the demand for allocation and expenditure of the health department, Dr. Nayar disclosed this information and urged the members to co-operate with the Govt. to eradicate small-pox. She said that the workers of the Health and the Community Development Ministry would begin the work of vaccination for prevention of small pox, according to schedule. Dr. Nayar said that the task of vaccination for prevention of pox was scheduled to be undertaken by the State Govts. from the 1st of April last. But in view of the difficulty regarding budget allocation, work could not begin according to schedule. The Health minister assured that by the end of the Third Plan period, Malaria, Small-pox, Goitre, etc. would be completely eradicated from India.

(২৩)

এই কারণেই অর্থনৈতিক-পরিকল্পনাকারীদের নিকট উপাদান-উৎপন্ন বিশ্লেষণের গুরুত্ব এত বেশী। নূতন উপাদান ও উৎপন্নের স্তরে পৌছাইবার পথ জানা

থাকিলে সমাজের কোন বিন্দুতে কি ধরনের পরিবর্তন আনিতে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। যদি আমরা মনে করি বস্ত্রশিল্পে ১০% এবং ইস্পাত শিল্পে ৩০% উৎপাদন বাড়ান দরকার তবে ইহার জন্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্র হইতে এবং কত উপাদান বস্ত্র ও ইস্পাতশিল্পে আনিতে হইবে তাহা আমরা এই তালিকা হইতে জানিতে পারি। সেই উদ্দেশ্যে সেই সকল ক্ষেত্রগুলির উৎপাদন বাড়াইবার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারি। বর্তমানে যে অর্থনৈতিক কাঠামোতে কোনরূপ পরিকল্পনা নাই সেখানে এই ভারসাম্য ফিরিয়া আসে বহু অপচয় ও সাংঘাতের মধ্য দিয়া। যেমন বস্ত্রশিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ১০% বাড়াইবার পূর্বে ২০% বাড়াইয়া ফেলিতে পারে, কিছুকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া বুঝিতে পারে যে, বর্ধিত চাহিদা হইল ১০%, ২০% নয়। সংক্ষেপে ইহাই হইল উপাদান-উৎপন্ন বিশ্লেষণ।

It is for this reason that the input-output analysis is so much important to the economic planners. If the way to reach a new input and output level be known, we can realize what type of change is to be brought about in what point of the society. If we think that output should be increased by 10% in the Cotton Textiles Industry and by 30% in the Iron and Steel Industry; we can come to know from this table how much input is needed in the Textiles or Steel Industry and from which sector these are to be brought. In that regard, for increasing production of those sectors we can adopt a plan and work for its implementation. This equilibrium is regained after much waste and friction in that economy where there is no plan at present. For example, the Cotton Textiles Industry may increase production by 20% instead of making it 10% and after some experimentation may realize that the increased demand is 10% and not 20%. This is in brief, the Input-Output analysis.

(২৪)

অর্থনৈতিক কল্যাণ কাহাকে বলে, এই প্রসংগে তাহা আলোচনা করা দরকার। কল্যাণ হইল ব্যক্তির ভাবজগতের এক বিশেষ ধারণা, তাহার মনের বা চিন্তার একটি বিশেষ অনুভূতি। অধ্যাপক পিগুর ভাষায় বলিতে গেলে, কল্যাণ হইল "মনের এক বিশেষ অবস্থা এবং মনের আনন্দময় অবস্থা।" মনের এই তৃপ্তিবোধ আসে অভাব মোচন হইলে, এই অনুভূতিকেই আমরা কল্যাণ বলিতে পারি। ব্যক্তির বা সমাজের এই সাধারণ কল্যাণের মধ্যে বহু ধরনের কল্যাণ জড়িত আছে, এই সকল ধরনের কল্যাণকেই আমরা অর্থনৈতিক কল্যাণ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। তাই অধ্যাপক পিগু দুই প্রকার কল্যাণের কথা বলিয়াছেন, অর্থনৈতিক

কল্যাণ এবং অনর্থনৈতিক কল্যাণ। কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার যে এই দুই ধরনের কল্যাণকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা চলে না। ইহারা কিছুটা পরস্পর নির্ভরশীল।

Discussions should be held, in this context, as to what is meant by Economic Welfare. Welfare is a distinct concept of an individual's subjective mind; it is a particular feeling of his mind or thought. In the words of Prof. Pigou, welfare is a 'state of the mind and an agreeable state of the mind'. This satisfaction of mind comes from the satisfaction of wants and this can be called the concept of welfare. There are different types of welfare that merge in this general welfare of an individual or of society. We cannot call all these types, economic welfare. Therefore Prof. Pigou has distinguished between two types of welfare—economic welfare and non-economic welfare. But this should also be remembered that these two types cannot be completely seperated. They are somewhat inter-dependent.

(২৫)

কেইন্‌সের মতে, সমাজে লেনদেনের এবং সাবধানতার অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা অর্থাৎ সক্রিয় তহবিলের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের স্তরের উপর, অপরদিকে ফাটকাদারীর অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকা, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় তহবিলের পরিমাণ নির্ভর করে সুদের হারের উপর। কেইন্‌সের এই ধারণা বাস্তব অবস্থা বিচারে সঠিক মনে করা যাইতে পারে। যখন দেশে আয়ের স্তর বাড়ে, তখনই লেনদেন ও সাবধানতার জন্য লোকের বেশি টাকা দরকার হয়, বাস্তবে ইহাই দেখা যায়। অবশ্য অনেক সময় সুদের হার বাড়িলে লেনদেন ও সাবধানতার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য লোকে পূর্বাপেক্ষা কম টাকা হাতে রাখে, কারণ সুদের হার বেশী হওয়ায় হাতে টাকা রাখায় লোকসান বেশী। অথবা, অনেক সময় সুদের হার কমিলে লোকে লেনদেন ও সাবধানতার জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশি টাকা হাতে রাখে, কারণ সুদের হার কম থাকায় টাকা হাতে জমাইয়া রাখার লোকসান কম। কিন্তু সাধারণভাবে দেখা যায়, লোকে লেনদেন ও সাবধানতার অভিপ্রায়ে যে টাকা হাতে রাখে, তাহা মোটামুটি সুদের হার নিরপেক্ষ এবং দেশের আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বিভিন্ন সুদের হারে লোকে যে বিভিন্ন পরিমাণ টাকা রাখে, তাহার তালিকা নির্ভর করে মূলতঃ ফাটকাদারীর অভিপ্রায়ে রক্ষিত টাকার পরিমাণের উপর।

According to Keynes, the amount of active balance, *i.e.* the money kept out of transaction and precautionary motive depends on the level of Income while, on the other hand, the amount of idle balances *i.e.* the money kept out of speculative motive depends on the rate of interest. Considering reality, this idea of Keynes can be regarded as

correct. It is found in reality that when there is a rise in the level of income, more money is needed then for transaction and precautionary purpose. Of course, sometimes when there is a rise in the rate of interest, men keep lesser amount of money than before for meeting the transaction and precautionary need, for with a rise in the rate of interest, keeping more money in hands means more loss. Or, sometimes when the rate of interest falls, men may keep more money in hand than before for transaction and precaution ; because with a fall in the rate of interest, keeping more money in hand means little loss. But generally, it is seen that the money kept by men out of transaction and precautionary motive, is more or less independent of the rate of interest and depends on the income-level of the country. Therefore, the schedule of the different amounts of money kept by men at different rates of interest, depends mainly on the amount of money kept out of speculative motive.

(২৬)

উদ্বৃত্ত সৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, অপূর্ণোন্নত দেশগুলিতে মোট অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই কম। মনে রাখা দরকার, ইহার মোট পরিমাণ কম হইলেও জাতীয় আয়ের অনুপাতে ইহার অংশ মোটেই কম নহে। দেশের সকল উপাদান ও সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় না বলিয়া জাতীয় আয় কম, সুতরাং উদ্বৃত্তও কম, কিন্তু জাতীয় আয়ের তুলনায় বিচার করিলে এই উদ্বৃত্তকে মোটেই কম বলা চলে না। জনসাধারণের ভোগের মাত্রা খুবই নীচু, কোনমতে ক্লায়ক্লেশে জীবন-ধারণের পক্ষে যতটুকু দরকার সমাজের অধিকাংশ লোকেরা তাহার বেশী আয় করে না। উপকরণগুলির পূর্ণ ব্যবহার হইলে আরও উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার জন্য বর্তমানের উদ্বৃত্তকে উপযুক্ত উপায়ে খাটানো দরকার, এবং অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এই উদ্বৃত্ত উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া দ্রুত মূলধনে রূপান্তরিত হইয়া অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে পারে না।

Considering the question from the point of view of generations of surplus, it is seen that the total volume of economic surplus is very small in under-developed countries. It should be taken into consideration that though the total volume may be small, but in relation to National Income, it is not at all small. The National Income is small for there is no fuller utilisation of the total factors and wealth of the country. Therefore, surplus is also small. But, in comparison with the national Income, it cannot be regarded as such. The level of consumption of the people is very low. Most of the persons do not earn more than what is needed for subsistence living. If the fac-

tors could be fully utilised, there is no doubt that the surplus would have been more. But for achieving that, the present surplus is to be effectively utilised. And the characteristic of an undeveloped country is such that this surplus, after being used fully and after being converted into capital, cannot make the development of economic growth easy.

(২৭)

অপূর্ণোন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, শ্রমশক্তির অধিকাংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত থাকে এবং কৃষিক্ষেত্র হইতে মোট জাতীয় আয়ের বৃহৎ অংশ উৎপন্ন হয়। জীবনযাপনের জন্য কৃষিকার্য চলিতে থাকে, চাষীর হাতে জমির পরিমাণ খুব কম থাকে, শ্রমিক-প্রতি ও একর-প্রতি উৎপাদনী শক্তি খুব কম। যে-সকল দেশে জনসংখ্যার মোট পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার বেশি, সেখানে কৃষকদের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা নাই বলিলেও চলে, অর্থাৎ কিছু পরিমাণ লোককে উৎপাদন হইতে সরাইয়া আনিলেও মোট উৎপন্ন কমে না। এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেকারির পরিমাণ খুবই বেশি থাকে।

A special feature of an Under-developed economy is that a major portion of the labour force is engaged in agriculture and a large part of the total national income comes from the agricultural sector. There is subsistence farming. The amount of land in possession of a cultivator is very small. The per labourer and per acre productivity is also very small. The marginal productivity of cultivators in the subsistence sector is almost nil in those countries in which the absolute volume and the rate of growth of population is high. Or otherwise, if some people are diverted from production, the total production does not register a fall. The volume of the type of disguised unemployment is very great.

(২৮)

তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্ধারিত শিল্পোন্নয়ন হইতে বহুদিকে বহুবিধ সুবিধা পাওয়া যাইবে। সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ও উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের লক্ষ্য আরও বেশ কিছুটা অগ্রসর করিয়া দিবে। আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কৃষি, বিদ্যুৎশক্তি, রেলপথ, মোটরযান প্রভৃতি বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণের আমদানির উপর নির্ভর করে—এই নির্ভরশীলতা অনেকটা কমিয়া যাইবে। শিল্প কাঠামোর নিজের মধ্যেই ভারি-এনজিনিয়ারিং ও যন্ত্রোৎপাদনের প্রসারের দরুণ শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও বর্তমানে আমদানীকৃত প্রচুর পরিমাণ মূলধনী যন্ত্রপাতি দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হইবে। কয়েকটি প্রধান শিল্প

সচল রাখার জন্য যে আমদানি দরকার হইতেছে, তাহার পরিমাণ কমিয়া যাইবে, কারণ মূল কাঁচামালসমূহ দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হইবে। এইরূপে তৃতীয় পরিকল্পনার শিল্প প্রসারের কার্যসূচী সমাপ্ত হইলে স্বনির্ভরশীল উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

The gains from the industrial development as formulated for the Third Plan, will be many-sided. The rapid growth of public sector investment and output will considerably further the objective of a socialistic pattern of society. The dependence of some of the vital sectors of the economy like agriculture, electric power, railways, motor transport, on imports of equipment and material from abroad will be substantially reduced. Within the industrial sector itself, the development of heavy engineering and machine-building will enable a large amount of capital equipment, required for the industries which is at present imported to be manufactured here. The imports required for the maintenance of a number of important industries will also be reduced through the production of the basic raw materials within the country itself. Thus, with the completion of the industrial programme drawn up for the Third Plan, essential foundations for self-sustaining growth will be laid.

(২৯)

যে-সমস্ত দেশে ঐচ্ছিক সঞ্চয় খুবই সামান্য এবং যেখানে করপদ্ধতির সাহায্যে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সুযোগ সংকীর্ণ, সেখানে মুদ্রাস্ফীতি মূলধন গঠনের গতিকে ত্বরান্বিত করিতে পারে। একদিকে মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে যে-সমস্ত বিনিয়োগের আর্থিক প্রয়োজন মিটানো হয়, সেগুলির মাধ্যমে মূলধন গঠন হয়, অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির জন্য ভোগ হ্রাস পাওয়ার ফলে অপ্রত্যক্ষভাবে মূলধন গঠন হইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের বা ঋণের যে-প্রসারণ ঘটে, তাহারই সুযোগ লইয়া উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সাধারণ ক্রেতাদের ক্রয়ের পূর্বেই সংগ্রহ করিতে পারেন। ক্রেতা সাধারণ এই সমস্ত সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে তাহাদের আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সাহায্যেও মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়তা করিতে পারে।

Inflation can speed up the rate of capital formation in those countries where voluntary savings are very small and where the scope of compulsory savings through taxation is also very limited. On the one hand, there is capital formation through the investments, the finan-

cial need for which is met by inflation, and, on the other hand, capital formation is possible indirectly as a result of fall in consumption due to the rise in the prices. As a result of the expansion of money and credit due to inflation, the development authority can collect the necessary factors of economic development before the ordinary buyers. The buyers, thus being deprived of these goods, are compelled to save some portion of their income. Therefore, it is seen that inflation can help in economic development even through compulsory savings.

অনুশীলনী

(১)

স্বাধীনতা যারা এনেছে তাদের পুরোভাগে ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা স্বভাবতই প্রত্যাশা করেছিল যে রাষ্ট্রীয় স্বাধিকার তাদের সামনে আত্মোন্নতির সিংহদ্বার খুলে দেবে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে তাদের সে প্রত্যাশা পেয়েছে রূঢ় আঘাত। আত্মোন্নতির সুযোগ-সুবিধা করা তো দূরের কথা, মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ আরও বিরূপ পারিপার্শ্বিকের সম্মুখীন হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছে। চোখ খুললেই এ দৃশ্য সহজে চোখে পড়ে। দেড়শ টাকা মাইনের একজন অধ্যাপক, দুইশো টাকা মাইনের একজন সাংবাদিক বা একশো টাকা মাইনের একজন কেরানীর পক্ষে আজ পরিবারাদি নিয়ে বেঁচে থাকা যে কি কঠিন ব্যাপার তা সহজেই বুঝা যায় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখবার দুষ্প্রয়াস করতে গিয়ে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে—অথচ এদিকে কারও দৃষ্টি নেই বললেই চলে।

[C. U. B. Com , 1951]

[*Indications* : মধ্যবিত্ত শ্রেণী—Middle Class ; আত্মোন্নতির সিংহদ্বার—Open the floodgates of self-realisation ; বিরূপ পারিপার্শ্বিক—Adverse circumstance ; জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা—to maintain the standard of life ; ধ্বংসের দিকে—Towards peril.]

(২)

দেশে পণ্যদ্রব্যের তুলনায় দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতার যোগান বৃদ্ধি পাইলেই যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি অপরিহার্য হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। দেশে তখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে যখন দেশবাসীর হাতে অতিরিক্ত হিসাবে প্রভূত পরিমাণে ক্রয়ক্ষমতা সঞ্চিত হইবে—অথচ সঙ্গে সঙ্গে দেশে সেই অনুপাতে পণ্য-দ্রব্য ও মজুরীর যোগান বাড়িবে না। কিন্তু এইরূপ একটা অবস্থার মধ্যেও টাকার

সুদ বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের ধার দিবার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, শ্রমিকের মজুরী নিয়ন্ত্রণ, শিল্প ও বণিক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত লভ্যাংশের সীমা নির্দেশ ইত্যাদি বহু প্রকার ব্যবস্থার দ্বারা দেশে মুদ্রাস্ফীতির কুফল নিবারণের নানা পন্থা বর্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইসব ব্যবস্থা অবলম্বনেই বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে জগতের বহু দেশ দেশবাসীর হাতের প্রচুর অর্থ ছড়াইয়াও দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

[C. U B. Com , 1953]

[*Indications* : অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা—additional purchasing power ; অপরিহার্য—indispnsable ; চলাচল—movements ; মজুরি নিয়ন্ত্রণ—regulation of wages ; অবলম্বন—adoption ; নির্দিষ্ট সীমারেখা—definite stage or ceiling.]

(৩)

নিউ ইয়র্কের খবরে প্রকাশ, গতকল্য নিউ ইয়র্ক শেয়ার বাজারে ব্যাপকভাবে শেয়ার বিক্রয়ের হিড়িক দেখা দেয়। ১৯২৯ সালে বিপর্যয়ের পর এইরূপ কখনও হয় নাই। ইহার ফলে শেয়ারের সামগ্রিক মূল্য ১৬,০০০ হইতে ২০,০০০ মিলিয়ান ডলার হ্রাস পাইয়াছে।

নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেন, গতকাল শেয়ার বাজারে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাকে ভূমিকম্পের সহিত তুলনা করা চলে।

নিউ ইয়র্ক শেয়ার বাজারের সভাপতি শ্রীকেথ কানস্টন অবশ্য আমেরিকানদের কিছুটা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ইহাতে লগ্নীকারীদের প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষতি হইবে না। বাজারে এই ধরনের অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

[*Indications* : ব্যাপকভাবে—extensive ; বিপর্যয়—catastrophe ; লগ্নীকারীদের—investors,]

(৪)

কর্তৃপক্ষ জাতীয় সংহতির কথা বারে বারেই বলে থাকেন। ভারতবর্ষের উন্নতির জন্যে জাতীয় সংহতির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। কিন্তু সেই সংহতি আসবে কি করে? কর্তৃপক্ষ মনে করেন, এর সমস্ত দায়িত্ব জনসাধারণের। সুতরাং এর জন্যে জনসাধারণের কাছেই আবেদন করে থাকেন। জনসাধারণ ভাবে, তাইতো। প্রদেশে প্রদেশে, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, এক ভাষাভাষীর

সঙ্গে অন্য ভাষাভাষীর ঐক্য থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে ঐক্য তো তাদের উপর নির্ভর করে না, করে কর্তৃপক্ষের উপর। কর্তৃপক্ষ যদি সুবিচার করতে না পারেন, প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, এক ভাষাভাষীর সঙ্গে অন্য ভাষাভাষীর বিরোধের ক্ষেত্রে যদি পক্ষপাতিত্ব বিসর্জন দিতে না পারেন তাহলে সংহতি আসবে না, আসতে পারে না। কিন্তু কি জাতীয় জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে, কি সঙ্কীর্ণতর ক্ষেত্রে সুবিচারের পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়।

[*Indications* : জাতীয় সংহতি—National integration ; অনস্বীকার্য—indisputable ; পক্ষপাতিত্ব—discrimination ; সুবিচার—justice.]

(৫)

শিল্প-পরিকল্পনা করিতে গেলে যে-সমস্ত দক্ষতা দরকার, তাহা কয়েক পুরুষের অভিজ্ঞতার সাহায্যে রপ্ত করিতে হয়। অথচ এই অভিজ্ঞতার অভাবে এক দিকে যেমন অপচয় বাড়িয়া যায় তেমনিই অন্য দিকে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে না। আগে এই দিকটার প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। জাতীয় উৎপাদনক্ষমতা-পরিষদ্ ১৯৬০ সনে শিল্প-পরিচালনা সম্পর্কে যখন প্রথম শিক্ষাদান শুরু করেন, তখন এ-বিষয়ে শিল্প-মালিকদের খুব বেশী আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে এত বেশি লোক শিল্প-পরিচালনা শিক্ষা করিতে আগ্রহী যে, জাতীয় উৎপাদনক্ষমতা পরিষদের পক্ষে এখন আর সকলকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া রাজ্য-সরকার শ্রমিকদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন, কিন্তু শিল্প-পরিচালনা সম্পর্কে শিক্ষাদানের ব্যাপারে রাজ্য-সরকার মোটেই সজাগ নন। অথচ দক্ষ শ্রমিকের মত দক্ষ পরিচালকও শিল্পপ্রসারের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

[*Indications* : জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা পরিষদ্—National Productivity Council.]

(৬)

ভারতীয় লোকসভায় সম্প্রতি সরকারী তরফ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতের কৃষি সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা আলোচনার জন্য ভারত সরকার একটি কৃষি-কমিশন গঠন করিবেন। বর্তমানে এই বিষয়ে বিভিন্ন রাজ্য গভর্ণমেণ্টের অভিমত গ্রহণ করা হইতেছে। জানানো হইয়াছে যে, সমস্ত রাজ্য গভর্ণমেণ্টের অভিমত পাওয়ার পর এই বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবে। ভারতে অনেক দিন পূর্বে বিদেশী শাসনের আমলে রাজকীয় কৃষি-কমিশন গঠিত হইয়াছিল। এই কমিশন ভারতের

কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিয়া দেশে কৃষির উন্নতি বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ রিপোর্টও দিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন কালের বিদেশী গভর্ণমেণ্ট উক্ত রিপোর্টের বিভিন্ন সুপারিশ কার্যক্ষেত্রে বলবৎ করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

Indications : সরকারী তরফ—Government bench ; কৃষি কমিশন—Agricultural Commission ; পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে—in detail ; বলবৎ করা—to execute.]

(৭)

ওয়াল স্ট্রীটের ঢেউ কলিকাতার ফাটকা বাজারেও পৌঁছিয়াছে। বুধবার কলিকাতার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বিভিন্ন শেয়ারের দাম বেশ কিছুটা পড়িয়া গিয়াছে। মঙ্গলবার বাজার বন্ধের সময় ইণ্ডিয়ান আয়রণের সাধারণ শেয়ারের মূল্য ২৬ টাকা ৪০ নয়া পয়সা ; বুধবার শুরুর সরকারী দর ২৫ টাকা ৭০ নয়া পয়সা। দুপুরে ওয়াল স্ট্রীট হইতে কিছুটা ভাল খবর আসায় দিনের শেষে বাজারে সামান্য তেজীভাব পরিলক্ষিত হয়—ইণ্ডিয়ান আয়রনের সাধারণ শেয়ারের দাম ·১৫ নয়া পয়সার মত বৃদ্ধি পায়।

কলিকাতার শিল্প-বাণিজ্য মহলের অভিমত, ওয়াল স্ট্রীটের বিপর্যয় সাময়িক। মার্কিন অর্থনীতিতে অদূর-ভবিষ্যতেও কোন বড় রকমের সঙ্কট দেখা দিবার আশঙ্কা নাই সুতরাং ওয়াল স্ট্রীটেরও কোন দীর্ঘস্থায়ী মন্দাভাব সৃষ্টি হইতে পারে না।

ওয়াল স্ট্রীটের সাময়িক বিপর্যয় ভারতীয় অর্থনীতির উপর কোন প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে বলিয়াও অর্থনীতিবিদ্‌রা আশঙ্কা করেন না। বুধবার ইহাদের একজন জানান, পৃথিবীর যে-সকল রাষ্ট্র মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাদের উপরও ওয়াল স্ট্রীটের বিপর্যয়ের খুব বেশী প্রভাব পড়ে নাই।

[*Indications* : বিপর্যয়—depression, catastrophe ; দৃঢ়তর বন্ধন—closer ties]

(৮)

ভারতে সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য-সংস্থার জন্য এ-পর্যন্ত ৭ হাজার কোটি টাকা মূলধন নিয়োজিত হইয়াছে। এই মূলধনের উপর গড়পড়তা শতকরা বার্ষিক পাঁচ টাকা লাভ হইলেও গভর্নমেণ্টের বৎসরে ৩৫০ কোটি টাকা এবং পাঁচ বৎসরে ১৭৫০ কোটি টাকা লভ্যাংশ পাওয়া উচিত। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য-সংস্থার লাভ হিসাবে মাত্র ৪৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া বলাহ

হইয়াছে। উহার দ্বারা গভর্নমেণ্ট নিজেও যে নিজেদের পরিচালিত শিল্প-সংস্থাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে না বলিয়া স্বীকার করেন তাহা বুঝা যাইতেছে। কয়লা বিদ্যুৎ, পরিবহণ, বিদেশী মুদ্রা ইত্যাদির অভাব এবং পরিচালনাগত ত্রুটিই উহার কারণ। এইসব বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট যদি বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবসায়সম্মত নীতি দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন তাহা হইলে দেশ বর্তমানে যে আর্থিক বিপর্যয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা হইতে রক্ষা পাইবে।

Indications : সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা—Public sector enterprises ; ব্যবসায় সম্মত নীতি—businesslike policies.]

(৯)

গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন ভারতবর্ষকে আমেরিকা যে আর্থিক সাহায্যদান করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে বর্তমান বৎসরে তাহার সিকিভাগ কমাইয়া দেওয়া হউক। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ৮ জন এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন এবং ৭ জন বিরোধিতা করিয়াছেন—আর সভাপতি শ্রীফুলব্রাইট কোনও দিকেই ভোট দেন নাই। কিন্তু কম ভোটেই হউক আর বেশী ভোটেই হউক প্রস্তাবটি যে কমিটিতে গৃহীত হইয়াছে সেটাই মুখ্য কথা এবং মার্কিন সরকার যদি কমিটির এই নির্দেশ অনুসারে কাজ করেন তাহা হইলে ভারতবর্ষে আর্থিক সংকট আরও ঘনীভূত হইবে। কেননা আগামী ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হইবে তাহার জন্য বরাদ্দ মার্কিন অর্থ-সাহায্যের পরিমাণ তখন ৩৬·৩৫ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ২৭·২৬ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। সে-ক্ষেত্রে আগামী বৎসর সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইয়া ৪০·৭৫ কোটি করা হইবে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে সেটাও বাতিল হইবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণ ইহাতে যে ব্যাহত হইবে তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

[*Indications* : বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটি—Foreign relations Committee ; ঘনীভূত—deepen]

(১০)

তৃতীয় পরিকল্পনা কেন তাহার লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিবে না তাহা আরও বুঝা যাইবে যদি এই পরিকল্পনার ব্যয়ের কাঠামো আমরা বিশ্লেষণ করি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যক্তিক্ষেত্র তুলনামূলক অধিকতর প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; সরকারী ক্ষেত্রে ব্যয় হইবে পূর্বের ১½ গুণ, কিন্তু ব্যক্তিক্ষেত্রে ব্যয় হইবে পূর্বের তুলনায় ১⅔ গুণ। বিনিয়োগের ধরন আরও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে গত

পরিকল্পনার তুলনায় এই পরিকল্পনায় কৃষির উপর ব্যয় অনেক বেশি, এমন কি শিল্প ও খনির তুলনাতে ইহার পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শিল্প প্রসারের গতি ইহাতে দ্রুততর না হইবার সম্ভাবনাই বেশি।

বিভিন্ন দিকে অগ্রগতির লক্ষ্য বিচার করিলে দেখা যায় যে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নহে।

[*Indications* : তুলনামূলক অধিকতর প্রসার—expansion at a comparatively greater rate]

(১১)

ঘাটতি ব্যয়ের নিরাপদ সীমা পরিমাপ করার কোন সহজ পথ নাই। কেবলমাত্র সরকারের বাজেটীয় কাজকর্মের মাধ্যমেই দেশের মধ্যে টাকার যোগান বৃদ্ধি পায়, তাহা নহে; ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার ঋণ প্রসারের দ্বারাও ইহা বাড়িয়া যায়। তাই এই দুইটিকে একত্রে হিসাব করিতে হয় এবং ইহাদের উপযুক্ত সীমা নির্ধারণের সময়ে উঁহাদের নিজ নিজ প্রয়োজনের কথা এবং সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কতখানি গ্রহণ করিতে পারে সেই কথা মনে রাখিতে হয়। মোটামুটিভাবে এই সকল বিষয়কে হিসাবের মধ্যে রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঘাটতি ব্যয় ৫৫০ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

[*Indications* : নিরাপদসীমা—safe limit]

(১২)

একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে স্পষ্ট হওয়া দরকার। আজ যদি ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমিয়াও যায় তাহা হইলেই কি আমাদের মাথাপিছু আয় বিপুলবেগে বাড়িয়া যাইবে? ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অনশন ও হতাশার হাত হইতে ভারতবাসী রক্ষা পাইবে? তাহা কিন্তু সত্য নয়। এই সকল দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী আমাদের অর্থনৈতিক অনুন্নত ও অচলাবস্থা। তাই একমাত্র অতিক্রত এই অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করিয়াই উন্নয়নের হার বাড়ানো সম্ভব—জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমাইলে আপনা-আপনিই আমাদের উন্নয়নের হার বাড়িয়া যাইবে না।

[*Indications* : অনুন্নত ও অচলাবস্থা—underdevelopment and stagnation ; অর্থনৈতিক কাঠামো—Economic structure.]

(১৩)

ব্যক্তির হাতে ভূমিগত আয় বা গ্রাম্য আয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিয়া জোতের ঊর্ধ্বসীমা কিরূপে স্থির করা যায়? বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এবং একই রাজ্যের বিভিন্ন

অঞ্চলের মধ্যে উর্বরতা, জলবায়ু বা জলসেচ ব্যবস্থাতে (অর্থাৎ একর-প্রতি উৎপাদনের পরিমাণে) এত পার্থক্য থাকে যে, সমান একরের হিসাবে সারা দেশে এইরূপ ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ সম্ভব হয় না। সারা দেশের অন্যান্য সকল উৎপাদন-ক্ষেত্রে আয়ের বা মূলধনের ঊর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট হইল না, কিন্তু যাহারা বংশপরম্পরায় কেবল জমির উপর নির্ভর করিয়া চাষের কাজ করে তাহাদের ক্ষেত্রে কি দোষ হইল? কেবলমাত্র তাহাদের ক্ষেত্রেই আয়-বৃদ্ধির সীমা নির্দিষ্ট হইবে কেন?

[*Indications* : গ্রাম্য আয়—rural income ; ঊর্ধ্বসীমা—ceiling]

(১৪)

ভারতের ভূমিহীন চাষীরা যাহাতে জমি পায় এবং গ্রামাঞ্চলে সম্পদ-বৈষম্য হ্রাস পায় এই উদ্দেশ্যে বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার হিসাব মতে ভারতে ৫ কোটি ভূমিহীন চাষী আছে। প্রত্যেক ভূমিহীন চাষীর জন্য ১ একর হিসাবে জমি ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে তিনি এই আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ৫ জন হিসাবে লোক ধরিয়া পরিবার পিছু ৫ একর জমি তিনি লক্ষ্য হিসাবে ধার্য করিয়াছিলেন। গান্ধী প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তিনি জমিদারদের মনে ভূমিহীন কৃষকের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সহানুভূতির বাস্তব প্রকাশ হিসাবে প্রত্যেক জমিদারকে নিজ মালিকানার ⅙ অংশ দান করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। সারা দেশে এইরূপ নির্দিষ্ট অনুপাতে দান হইলে ৫ কোটি একর পাওয়া যাইবে এবং তাহার পরে ভূদান কর্মীদের নেতৃত্বে এই জমি উপযুক্ত ভাবে বণ্টন করা হইবে।

[*Indications* : গান্ধীপ্রদর্শিত পন্থা—Gandhian way or Gandhian method ; ভূদান কর্মী—Bhoodan Worker]

(১৫)

পুরানো একটি ফরাসী প্রবাদ প্রচলিত আছে, "ফাঁসির দড়ি যেমন আসামীকে, ঋণও তেমনি চাষীকে ঝুলাইয়া রাখে।" ভারতেও এইরূপ বলা হয় যে, সেই গ্রামই বাসের উপযুক্ত যেখানে প্রয়োজনে ঋণ পাইবার মত মহাজন, অসুখের সময় বৈদ্য, পূজা-অর্চনার কাজে ব্রাহ্মণ এবং গ্রীষ্মে শুকাইয়া যায় না এইরূপ একটি নদী আছে। কৃষিঋণ পাওয়া না গেলে সমস্যা তো বটেই, কিন্তু পাওয়া গেলেও উহা লইয়া সমস্যার শেষ নাই, কারণ অনেক ক্ষেত্রে এরূপভাবে ঋণ পাওয়া যায় যাহা উপকারের তুলনায় অপকারই বেশি করে। ভারতে কৃষিঋণের সমস্যা দুইটি : প্রয়োজনের তুলনায় ইহা কম এবং যেভাবে ইহা পাওয়া যায় তাহা চাষীর পক্ষে বিপজ্জনক। স্যার ডেনিয়েল

হ্যামিলটনের ভাষায় বলিতে গেলে, ভারতে উন্নয়নের প্রধান বাধা হইল শয়তানী টাকার শক্তি।

[*Indications* : ফাঁসির দড়ি—Hangman's rope ; শয়তানী টাকা—evil-money]

(১৬)

কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের উদ্দেশ্যে শিল্প-তালুক গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। রেলপথ বা জাতীয় সড়কের কাছাকাছি বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হইবে। স্বল্পমূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইবে, সরকারী ব্যয়ে শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণ করা হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়িয়া উঠার উপযোগী স্থান এবং এই সকল গৃহ অতি অল্প মূল্যে ভাড়া দিবার ব্যবস্থা হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাগুলি বা বাহ্য ব্যয়সংকোচের সকল সুবিধা সরকারী ব্যয়ে তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাগণ শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়া উঠেন। ইহাই শিল্প-তালুক পরিকল্পনা।

[*Indicatinos* : শিল্পতালুক—Iudstrial Estates ; জাতীয় সড়ক—National Highways]

(১৭)

তৃতীয় পরিকল্পনাতে কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৫৬-এর শিল্পনীতি অনুসারেই শিল্পগুলির প্রসার চলিতে থাকিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতই সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রকে পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া গণ্য করা হইবে। যেমন, নাই-ট্রোজেনযুক্ত সারের ক্ষেত্রে এতদিন সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল, তৃতীয় পরিকল্পনাতে ব্যক্তিগত ব্যবসাদারদেরও এই শিল্পে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। কাঁচা লোহার ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের বৃহত্তর উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপনের সুবিধা দেওয়া হইবে। ইহারই পাশাপাশি বলা হইয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ-গঠনের আদর্শ সফল করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিক্ষেত্রে একচেটিয়া বা আধা-একচেটিয়া অবস্থা যাহাতে গড়িয়া না উঠে সেই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। সর্বোপরি, প্রথম শিল্পনীতিতে যে আঞ্চলিক শিল্পোন্নয়নের ভারসাম্যের কথা বলা হইয়াছিল ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পনীতির এই অংশ কার্যকরী করার দিকে জোর দেওয়া হইয়াছে।

[*Indications* : নাইট্রোজেনযুক্ত সার—Nitrogenous fertiliser ; আধা-একচেটিয়া—semi-monopolistic ; আঞ্চলিক শিল্পোন্নয়নের ভারসাম্য—Balance in regional industrial development.]

(১৮)

বর্তমানে দেখা যায়, এই শিল্পপুঁজি করপোরেশন ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে অনেকটা সক্ষম হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার অর্থভাণ্ডার অনেকাংশে অব্যবহৃত পড়িয়া আছে। ১৯৫৭-৫৮ সালের সংশোধনের পূর্বে ইহার সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল কিরূপে অর্থসংগ্রহ করা যায়, আর বর্তমানে ইহার সমস্যা হইল কিরূপে সেই অর্থ উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া যায়। করপোরেশনের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার বণ্ডগুলি বাজারে ভাল দামে বিক্রয় হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও ইহার কাজকর্মের পরিধি প্রসারিত করিতে পারা যায় নাই। যেমন, ১৯৫৯-৬০ সালে মাত্র ৭·৮৪ কোটি টাকার ঋণ দান হইয়াছে। এই অব্যবস্থার কারণ হিসাবে করপোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ মেনন সরকারের আমদানি নিয়ন্ত্রণের নীতি দায়ী বলিয়া মনে করেন। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার দরুন বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভারতে আসিতে পারে না, ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

[*Indications* : অর্থভাণ্ডার—Funds]

(১৯)

এই প্রসংঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতের জাতীয় আয় এবং রপ্তানিবাণিজ্যের নীতি ও সম্ভাবনা বিচার করিয়া বলা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বৈদেশিক মূলধন গ্রহণ ক্ষমতা এখনও ভারতের আছে। তবে সর্বদাই লক্ষ্য রাখা দরকার যেন এই সকল ঋণ দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ্য হয় এবং সুদের হার কম থাকে। উপরন্তু, বৈদেশিক মূলধন দেশে আনিয়া জনসাধারণের ভোগের হার বাড়ানো চলে, ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার বাড়িল না এইরূপ অবস্থা দেখা দিতে পারে। ভোগের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য ব্যবহার করার (যেমন ভারতের খাদ্য, অনাবশ্যক বিলাসসামগ্রী আমদানি) দোষই হইল যে, উহা আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়, মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগের হার বাড়িবে এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

[*Indications* : গ্রহণ ক্ষমতা—absorptive Capacity.]

(২০)

মূল্যস্তরের উঠানামা মাপ করিবার সময় সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্যের গড়পড়তা হিসাবকে ব্যবহার করা হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতি

অনুযায়ী সূচকসংখ্যা নির্ণয় করা হয়। প্রথমত, একটি ভিত্তি বৎসর হইতে দ্রব্যমূল্যের গড়পড়তা হিসাব শুরু করা হয়। যে-বৎসরে বা সময়ে বিশেষ কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে নাই ও জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি স্বাভাবিক ছিল, সেই বৎসরকে ভিত্তি-বৎসর হিসাবে ধরা। দ্বিতীয়ত, কোন কোন জিনিসের দামের হিসাব করা হইবে ইহা ঠিক করা হয় এবং ইহাদের ভিত্তি-বৎসর ও অন্য সময়ে কি কি দাম ইহা নির্ণয় করা হয়। এই দামের সংখ্যাগুলির গড়পড়তা হিসাব করা হয়। কোন জিনিসের কিরূপ গুরুত্ব তাহাও ঠিক করিতে হইবে ও জিনিসটির দাম, এই গুরুত্ব সংখ্যা দিয়া গুণ করিতে হইবে।

[*Indications* : ভিত্তি-বৎসর—Base year ; গুরুত্ব—weightage]

(২১)

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের মাঝামাঝি সময়ে প্রতি শিল্পে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য স্থির করার সিদ্ধান্ত করা হয়। বর্তমানে বস্ত্র, চিনি ও সিমেন্ট শিল্পে অনুরূপ বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক বোর্ড উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে সেই শিল্পের গুরুত্ব ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার বিচার অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ন্যায় মজুরী স্থির করিবেন।

বর্তমানে পরিচালন ব্যাপারে শ্রমিকের অংশ গ্রহণ, মুনাফা বণ্টন ইত্যাদি ব্যাপারে যেভাবে শ্রমিকেরা অগ্রসর হইতেছে তাহাতে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা এই সমস্যার সমাধানই সর্বাপেক্ষা সহজ বলিয়া মনে হয়। শ্রমিকেরা যাহাতে সুন্দর ভাবে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, সেজন্য সরকারের উচিত এই সমস্ত যাহাতে সকল শিল্পে গঠিত হয় ও সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি করিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

[*Indications* : ত্রিপাক্ষিক আলোচনা— Tripartite discussions ; ন্যায্যমূল্য —Fair Price.

(২২)

অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ বিশেষ উপকারিতা আছে। ইহা অবশ্য সত্য যে, রিজার্ভ-অনুপাতে পরিবর্তন সমগ্র অর্থনীতির উপর কার্যকরী হয়, কিন্তু উন্নয়নের সময় এমন কতকগুলি বিপজ্জনক সম্প্রসারণ শক্তি দেখা যায় যাহাদের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ; সেখানে সামগ্রিক কার্যকারিতার প্রয়োজন নাই। বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রিত হইলেই চলে। এইজন্যই নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

ভারতের মত অনুন্নত দেশে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার জন্য, বিনিয়োগ লইয়া ফাট্‌কাবাজী রোধ করার জন্য এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিস মজুত করিবার ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে, তাহা প্রতিরোধ করার জন্য নির্বাচিত ঋণ-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন। এই সময় সামগ্রিকভাবে ব্যাঙ্কে ঋণ অপ্রয়োজনীয় এবং মুদ্রাস্ফীতি-প্রবণ ক্ষেত্রে দেওয়া সম্ভব নয়; সেইজন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাচিত ঋণ ব্যবস্থার দরকার।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ তিন বৎসর যাবৎ এই পদ্ধতির সাহায্যে "অর্থনৈতিক চাপ কেন্দ্রগুলি" নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করিতেছে।

[*Indications* : রিজার্ভ-অনুপাত—Reserve-ratio ; নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ—selective credit control ; সম্প্রসারণ শক্তি—expansionary forces ; মুদ্রাস্ফীতি প্রবণ—inflation-sensitive ; অর্থনৈতিক চাপ কেন্দ্রগুলি—Centres of economic pressure.]

(২৩)

পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থাতে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের দুইটি গুরুত্ব আছে। প্রথমতঃ পণ্য-কর অপেক্ষা সহজতর ভাবে ইহা রাজস্ব বাড়াইতে পারে, এবং দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রাস্ফীতি সময়ে ইহা ন্যায্য মূল্যে পণ্য যোগদান দিয়া জনসাধারণকে সুবিধাজনক হারে সরবরাহ করিতে পারে। সরকার যে ভাবে কর নির্ধারণ করে তাহার পরিবর্তনের দ্বারা পণ্য-মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা সময় সাপেক্ষ। ফলে ব্যবসায়িগণ ক্রমবর্ধমান মূল্যের সুযোগে অতিরিক্ত মুনাফা করিতে পারে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের সাহায্যে চাহিদা, মূল্য ও উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব। কারণ রাষ্ট্রকে মোট চাহিদা এবং যোগানের হিসাব রাখিতে হয়। ফলে প্রয়োজনানুরূপ মূল্য পরিবর্তন করিয়া বাজার মূল্য ও উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য কমাইয়া আনা সম্ভব হয়। এবং লব্ধ মুনাফা উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

[*Indications* : পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা—Planned economy : পণ্যকর—Commodity taxes]

(২৪)

কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটিতে সম্প্রতি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জানান যে, সরকার কাঁচা পাটের মূল্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। গত বৎসর কাঁচা পাটের অভাবহেতু অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ বৎসর পাটের ফসল ভাল হয়েছে। সেজন্য মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নজর রাখা আবশ্যক হয়েছে।

খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীমহাশয় এই আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন ফসল উৎপাদনকারী কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গত কয়েক বৎসর ধরে পাটের অধিক ফসলের জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে পাটের উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালের ১৬ লক্ষ গাঁইট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১-৬২ সালে ৬২ লক্ষ ৬৯ হাজার গাঁইট হয়েছে।

তিনি বলেন, অধিক ফলনের ফলে চাষীদের যাতে অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। জাতীয় স্বার্থেই তা করা প্রয়োজন। আশা করা যায়, পাটের মণ-প্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ৩০ টাকার বেশী হবে।

কৃষি সেক্রেটারি শ্রী জি আর কামাথ বলেন যে, পাট উৎপাদন ব্যয় পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে ধান চাষের ব্যয়ের তুলনামূলক আলোচনা হবে। আশা করা যায়, ভারত সরকার শীঘ্রই পাট উৎপাদকদের নায্য মূল্য পাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হবেন। (C. U. B. Com. 1962)

[*Indications* : উপদেষ্টা কমিটি—Advisory Committee ; গাঁইট—bale]

বৈষয়িক পরিভাষা

বৈষয়িক পরিভাষা

A

Abatement—ছাড়, ছুট, বাদ
Ab initio—গোড়া হইতে
Above par—অধিমূল্য, অধিহার
Abrasion, in coins—মুদ্রা ক্ষয়, মুদ্রায় ধাতুর ঘাটতি
Abstract—চুম্বক, সার
✓Acceptance—স্বীকৃতি, স্বীকার
✓—, of bill—হুণ্ডি স্বীকার
—, Conditional—শর্তাধীন স্বীকৃতি
—, General—সাধারণ স্বীকৃতি
—, Partial—আংশিক স্বীকৃতি
✓Accepting house—নিকাশ ঘর
Acceptor—স্বীকৃতিদাতা
Accession, Accessio—আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি
Accommodation bill—সুপারিশী হুণ্ডি
✓Account—হিসাব, খাতে
—, Abstract—চুম্বক হিসাব
✓—, Book—হিসাব বহি
—, Cash—নগদ হিসাব
—, Capital—মূলধন হিসাব
—, Current—চলতি হিসাব
—, Cost—পড়্‌তা হিসাব
—, Dead—অচল হিসাব
—, Drawing—টাকা তোলার হিসাব
—, Fictitious—কাল্পনিক হিসাব
—, Impersonal—অব্যক্তিক হিসাব

Account, Imprest—জিম্মা হিসাব
—, Over due—মেয়াদ অতীত হিসাব
—, Real—সম্পত্তির হিসাব
—, Rough—কাঁচা হিসাব
—, Sales—বিক্রয় খাতে
—, Suspense—স্থাপিত হিসাব
—, Written off—বাতিল হিসাব
Accountant—হিসাবনবীশ, গাণনিক
Accountancy—হিসাব-শাস্ত্র, গণনাশাস্ত্র
Accumulation—সঞ্চয়
Acknowledgment—প্রাপ্তি স্বীকার
Acquitance—দায়মুক্তি
Acting—কার্যকরী
Actuary—বীমা গাণনিক
Active Bond—চলতি
Ad hoc—তদর্থক
✓Ad interim—অন্তর্বর্তীকালীন
Adjournment—স্থগিত, মুলতুবী
Adjustment—নিষ্পত্তি, সমন্বয়
Administration—শাসন পরিচালন, প্রশাসন
Advance—অগ্রিম, দাদন
✓Addendum—পরিশিষ্ট
Admissible—গ্রাহ্য
Ad Valorem—মূল্যানুসারে
Affidavit—হলফ্‌-নামা
Agenda—কার্যক্রম
Agency—আড়তদারী, কারপরদাজী

Agent—প্রতিনিধি, আড়তদার, কারপরদাজ
—, Clearing—নিকাশী প্রতিনিধি
—, Commission—দস্তুরীভুক প্রতিনিধি
—, General—সাধারণ প্রতিনিধি
—, Sole—একমাত্র প্রতিনিধি
—, Special—বিশেষ প্রতিনিধি
—, Travelling—ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি
✓'Agio'—মুদ্রাবাট্টা
Agreement—চুক্তি, সম্মতি
—, of Sale—বিক্রয় কোবালা
—, Co-lateral—আংশিক চুক্তি
—, Stand still—স্থিতাবস্থার চুক্তি
Agrarian—জমি-সংক্রান্ত
Agricultural—কৃষি সংক্রান্ত
—, Bank—কৃষি ব্যাঙ্ক
—, Credit Society—কৃষি ঋণদান সমিতি
—, Economy—কৃষি অর্থনীতি
—, Indebtedness—কৃষকের ঋণগ্রস্ততা
—, Marketing—কৃষিজ পণ্য বিপণন
Alien—বিদেশী
Alienation of land—ভূমি হস্তান্তরকরণ
Allocation—বণ্টন, বিলি ব্যবস্থা
✓Alias—ওরফে
Allotment—বিলিকরণ, আবণ্টন
✓Allonge—হুণ্ডীর সহপত্র
Allowance—ভাতা, অধিদেয়
—, Daily—দৈনিক ভাতা
—, Dearness—মাগ্‌গী ভাতা
—, Subsistence—নির্বাহ ভাতা

Alloy—খাদ
Amalgamation—একত্রীকরণ
Amortisation—ঋণ পরিশোধ
Annuity—বার্ষিকী, বার্ষিক বৃত্তি
—, Fund—বার্ষিক তহবিল
Appreciation—মূল্যবৃদ্ধি
Appropriation—উপযোজন
—, Account—উপযোজন গণিতক
Approximation—নিকটতম অনুমান
Approval—অনুমোদন
Appraiser—যাচনদার, মূল্য নিরূপক
Arable—কর্ষণ যোগ্য
Arbiter—মধ্যস্থ, সালিশ
Arbitrage—পরোক্ষ বিনিময়
Arbitration—মধ্যস্থতা, সালিশী
Arrear—বাকী, বকেয়া
Articles of Association—বিধানপত্র, কোম্পানির বিধিসমূহ
Artisan—শিল্পজীবী, কারিগর
Article—দ্রব্য, অনুচ্ছেদ
Assets—সম্পত্তি, পরিসম্পদ
—, Fixed—স্থায়ী সম্পত্তি
—, Floating—চল্‌তি সম্পত্তি
—, Intangible—অদৃশ্য সম্পত্তি
—, Liquid—নগদানুরূপ সম্পদ
Assay—যাচাই
Assess—নিরূপণ করা
Assort—বাছাই
✓At call—চাহিবামাত্র দেয়
At par—সমমূল্যে
At premium—অতিরিক্ত মূল্যে

At sight—দৃষ্টিমাত্র
Attorney—আম-মোক্তার
—, Power of—আম-মোক্তারনামা
Attachment—ক্রোক
Auction—নীলাম
Auditor—হিসাব পরীক্ষক
Authentic—প্রামাণিক
Authentication—প্রমাণীকরণ
Authoritative—প্রামাণিক
Automatic—স্বয়ংক্রিয়
Authorisation—প্রাধিকার অর্পণ
Average—গড়
—, Successive—পৌনঃপুনিক গড়
—, Price—গড় দাম
Award—রোয়েদাদ
—, Interim—মধ্যবর্তী রোয়েদাদ

B

Back a bill—হুণ্ডি পিছ্ সহি করা
Bad coin—জাল মুদ্রা, নিকৃষ্ট মুদ্রা
Bad debt—অনাদায়ী দেনা, বিলাত বাকী
Bail—জামিন
—, Bond—জামিননামা
Balance—বাকি, উদ্বৃত্ত
—, Sheet—পাকা মিল, স্থিতিপত্র, উদ্বর্ত পত্র
—, Debt—ফাজিল বাকি, খরচের জের
—, Credit—জমা বাকী
—, opening—প্রারম্ভিক তহবিল
—, of trade—আমদানী-রপ্তানীর ক্ষমতা
—, trial—রেওয়া মিল
—, of account—কৈফিয়ৎ কাটা
—, of ledger—খতিয়ানের কৈফিয়ৎ কাটা
—, outstanding—বাকি উদ্বৃত্ত
Ballot—গোপন ভোট
Bank—ব্যাঙ্ক
Banker—ব্যাঙ্কার, শ্রেষ্ঠী
Banking—মহাজনী
Bank balance—ব্যাঙ্ক জমা
—rate—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বাট্টার হার
—charges—ব্যাঙ্কের দক্ষিণা, ব্যাঙ্কের মাশুল
—return—ব্যাঙ্কের বিবরণ
Bank of issue—নোট মুদ্রণের ক্ষমতাযুক্ত ব্যাঙ্ক
—draft—ব্যাঙ্কের হুণ্ডি
—reference—ব্যাঙ্কের অভিমতপত্র
—acceptance—ব্যাঙ্কের অনুমোদন
—, rebate—ব্যাঙ্কের ছাড়
—, Agricultural—কৃষি ব্যাঙ্ক
—, Commercial—বাণিজ্য ব্যাঙ্ক
—, Exchange—বিনিময় ব্যাঙ্ক
—, Co-operative—সমবায় ব্যাঙ্ক
—, Credit—দাদনী ব্যাঙ্ক
—, Indigenous—মহাজনী ব্যাঙ্ক
—, Joint stock—যৌথ ব্যাঙ্ক
—, Land mortgage—জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক
—, Scheduled—তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক
Bankrupt—দেউলিয়া

Bankruptcy—দেউলিয়া
Bargain—লাভজনক সওদা, দাঁও
Barter—বিনিময়
Barred by limitation—তামাদি
Bear—নিম্নগ, মন্দী
Bearer cheque—বাহক-দেয় চেক
Below pay—উন মূল্য, উনহার
Bill—হুণ্ডী, মূল্যপত্র, বিল, আদেয়ক
—, clear—নির্দোষ বিল
—, Inland—দেশী বরাত চিঠ্‌
—, Treasury—সরকারী সাময়িক ঋণপত্র
Bill Documentary—দলিলী হুণ্ডী
—, Foreign—বিদেশী হুণ্ডী
—, Accomodatiry—সুপারিশী হুণ্ডী

Bill of Sale—বিক্রয় কোবালা
—, of lading—বহন পত্র
—, of entry—খন্তা হুণ্ডী
—, of store—শুল্ক ছাড়পত্র
—, of exchange—হুণ্ডী, ব্যবসায়ী

—, of sight—নিদর্শন পত্র
—, of right—অধিকার পত্র
Bill at sight—দর্শন হুণ্ডী
—, after sight—মেয়াদী হুণ্ডী
—, on demand—দর্শন হুণ্ডী
Bill book—বিল বহি
Bi-metalism—দ্বি-ধাতুমান
Black market—চোরাবাজার, চোরাকারবার

Blockade—অবরোধ
Blank cheque—পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ, টাকার অঙ্ক অলিখিত চেক
Black-list—দাগীর তালিকা
Board—মণ্ডলী, সঙ্ঘ, পর্ষৎ
—, of directors—পরিচালক সঙ্ঘ
—, of trustees—ট্রাস্টী বোর্ড, অছিপর্ষৎ
—, arbitration—সালিশী বোর্ড
Board of revenue—রাজস্ব-পর্ষৎ
— of debt settlement—ঋণসালিশী পর্ষৎ
Bonafide—প্রকৃত
Bond—পাট্টা, তমসুক
—, Indemnity—ক্ষতিপূরণ পত্র
—, Mortgage—বন্ধক পাট্টা
—, Simple—সরল খত, তমসুক
—, Security—জামিননামা
Bonded goods—শুল্কাধীন দ্রব্য
— godown—শুল্কবাকী মালগুদাম
— man—প্রতিভূ
Bonus—অধিবৃত্তি
Book, Abstract—চুম্বক হিসাব বহি
—, Returns—আগম বহি
Book-keeping—হিসাব রক্ষণ
Boom—চড়া, তেজী, গরম
Bourgeoise—বুর্জোয়া, পরশ্রমজীবী
Brussage—মুদ্রা নির্মাণবানি
Breach of trust—বিশ্বাসভঙ্গ, চুক্তিভঙ্গ
—, of agreement—সংবিদ লঙ্ঘন
—, of contract—চুক্তি ভঙ্গ

Brought forward—জের, ইজা
Broker, Brokerage—দালাল, দালালী
— , Sole—বাঁধী দালাল
— , Produce—কৃষিজ মালের দালাল
Budget—আয়ব্যয় বরাদ্দ
— estimate—আনুমানিক আয়ব্যয় বরাদ্দ
— , Revised—সংশোধিত আয়ব্যয় বরাদ্দ
Budgetary Surplus—উদ্বৃত্ত আয়-ব্যয় বরাদ্দ
Bull—তেজী, ঊর্ধ্বগ
Bullion—বুলিয়ান, ধাতুপিণ্ড
Bulletin—ইস্তাহার
Bulk purchase—একজোট খরিদ
Bureaucracy—আমলাতন্ত্র
Business—কারবার, ব্যবসায়
— , cycle—বাণিজ্যচক্র
Bye-law—উপনিয়ম, উপবিধি
By-product—উপজাত দ্রব্য, উপদ্রব্য, উপ-সামগ্রী

C

Calculation—হিসাব, গণনা
Cancellation—বিলোপন, বাতিল করা
Call—কিস্তির তলব
— of letter—তলবপত্র
— money—তলবমাত্র দেয় অর্থ, তলবী টাকা
Cambist—হুণ্ডী ব্যবসায়ী
Canvassing—উপার্থন
Canal toll—খাল-কর
Canons of taxation—করনীতির সূত্রাবলী, করকানুন
Capital—মূলধন, পুঁজি
—account—মূলধন খাত
— , Auxiliary—সহায়ক মূলধন
— , Authorised—অনুমোদিত মূলধন
— , called-up—তলবী মূলধন
— , Floating—চলতি মূলধন
— , Formation—মূলধন গঠন
— , Glut of—মূলধন প্রাচুর্য
— , Instrumental—সহায়ক মূলধন
— , Issued—বিক্রেয় মূলধন
— , Fixed—স্থায়ী মূলধন
— , Indigenous—দেশজ মূলধন
— , Intensive—মূলধন প্রগাঢ়
— , Joint—সম্মিলিত মূলধন
— , Nominal—নামিক মূলধন
— , Outlay—মূলধন বিনিয়োগ
— , Paid-up—আদায়ীকৃত মূলধন
— , Sunk—ব্যয়িত মূলধন
— , Subscribed—আদায়ীকৃত মূলধন
— , Unpaid—অনাদায়ী মূলধন
Capitalism—পুঁজিবাদী ধনতন্ত্র
Capitalist—ধনিক, পুঁজিপতি, মহাজন
Caretaker—অবধায়ক
Cargo—জাহাজী মাল
Cartel—কার্টেল, বিক্রয়-জোট
Carry forward—জের টানা
Case of need—গতিকারী
Case in need—বেগতিকে
Cash—নগদ, নগদ টাকা, রোক

—account—রোকড় খাতে
Cash book—রোকড় বহি
— balance—নগদ তহবিল
— Certificate—সরকারী নগদীপত্র
— , credit—নগদ লেনদেন
— deposit—নগদ আমানত
— entry—রোকড় বন্ধ
— in hand—নগদ পুঁজি
— , Hard—নগদ পুঁজি
— register—নগদ হিসাব বহি
— reserve—নগদে রক্ষিত পুঁজি
— transaction—নগদ কারবার
Cashier—খাজাঞ্চী
Caution money—জামানত টাকা
Casual—আকস্মিক, নৈমিত্তিক
—leave—নৈমিত্তিক ছুটি
— labour—সাময়িক শ্রম বা শ্রমিক
Caveat emptor—ক্রেতা সতর্কীকরণ
Ceiling price—মূল্যের ঊর্ধ্বসীমা
Censure—তিরস্কার, নিন্দা
Census—আদমসুমারি, লোকগণনা
Centralisation—কেন্দ্রীকরণ
Certified copy—প্রামাণ্য প্রতিলিপি
Certificate—নিদর্শন পত্র, প্রশস্তিকা
— of origin—উৎপাদন নিদর্শন পত্র
— of posting—ডাকবিভাগীয় প্রমাণ পত্র
— of identity—অভিজ্ঞাপত্র
— Sale—বয়নামা
— Succession—উত্তরাধিকার পত্র
Cess—উপকর

Chattel—নিশ্বর ব্যতীত অন্য সম্পত্তি
Cheap money—সুলভ অর্থ
Cheque—চেক্
— , Crossed—রেখিত চেক্
— , Post dated—ভবিষ্যৎ দেয় চেক্
—Bearer—বাহকদেয় চেক্
— , Dishonoured—প্রত্যাখ্যাত চেক্
Charge—ব্যয়
— , Contingent—সম্ভাব্য ব্যয়
—,Overhead—পরিচালন ব্যয় (গড়পড়তা)
—Direct—প্রত্যক্ষ ব্যয়
Charter— চার্টার, সনদ
Charter party—জাহাজ ভাড়ার চুক্তিপত্র
Circle—মণ্ডল
Circular—পরিপত্র
—letter—প্রচারপত্র
Circulating medium of exchange—প্রচলিত বিনিময় মাধ্যম
Civil—দেওয়ানি
—Supply—জন-সংভরন
—aviation—অসামরিক বিমান চালনা
—population—জনসাধারণ
—Service——জনপালক কৃত্যক
Class—শ্রেণী
Classification—বর্গীকরণ
Claim—দাবী
Claimant—দাবীদার
Clearance Sale—নিকাশ বিক্রি
Clearing house—চেক্ বিনিময় কেন্দ্র

—bank—নিকাশী ব্যাঙ্ক
Client—মক্কেল
Closing entry—আখেরী হিসাব
—balance—সমাপণ স্থিতি
— of account—হিসাব বন্ধ করা
— stock—আখেরী মজুত
Code—সঙ্কেত
Code language—গূঢ় লেখ্য
Coin—মুদ্রা, ধাতু মুদ্রা
— , Artificial—কৃত্রিম মুদ্রা
— , Abraded—ক্ষয়প্রাপ্ত মুদ্রা
— , Bad—মেকি টাকা, জাল মুদ্রা
— , Base—হীন মুদ্রা
— , Current—চালু মুদ্রা
— , Counterfeit—জাল মুদ্রা
— , False—জাল মুদ্রা
— , Gold—স্বর্ণমুদ্রা
— , Rubbed—ঘর্ষিত মুদ্রা
— , Standard—মান মুদ্রা
— , Silver—রৌপ্য মুদ্রা
— , Token—নিদর্শন মুদ্রা
Coinage—মুদ্রাঙ্কন
— , Free—অবাধ মুদ্রাঙ্কন
— , Gratuitous—নিঃশুল্ক মুদ্রাঙ্কন
— , Restricted—সংকুচিত মুদ্রাঙ্কন
Collection—জমা, সংগ্রহ
Collective—যৌথ
— , bargaining—যৌথসওদা, জোটবন্দী দরদস্তুর
— , Security—যৌথ নিরাপত্তা
Colonisatoin—উপনিবেশন
Colonial—ঔপনিবেশিক
—trade —ঔপনিবেশিক বাণিজ্য
—preference —ঔপনিবেশিক পক্ষপাত
Combination—একার্থ সংঘ, জোট, সমবায়
— , Horizontal—সমশিল্প সমবায়
— , Vertical—ভিন্নশিল্প সমবায়
— , Lateral—পার্শ্বিক সমবায়
Commercial—বাণিজ্যিক
— crisis—বাণিজ্যিক সঙ্কট
— depression—বাণিজ্যিক মন্দা
— route—বাণিজ্য পথ
— treaties—বাণিজ্য সন্ধি
— tax—বাণিজ্য কর
Commission—দস্তুরী, কমিশন
— agent—কমিশন এজেন্ট, কারপরদাজ
— , Sale—বিক্রয়ের দরুন দস্তুরী
Commodity—পণ্য
— taxation—পণ্যানুযায়ী কর-নির্ধারণ
Communication—সমযোজন
Community development—সমাজ উন্নয়ন
Commuted value—লঘুকৃত মূল্য
Company—সংঘ, কোম্পানি
— , Joint Stock—যৌথ মূলধনবিশিষ্ট কোম্পানি
— , Limited—সসীম দায়িত্ব যুক্ত কোং
— limited by Share—ক্রয়অংশে সীমাবদ্ধ কোং
—limited by guarantee—সসীম দায়িত্বের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কোং

—, Private limited—ঘরোয়া দায়িত্ব-বদ্ধ যৌথ কোং
—, Public limited—সসীম দায়িত্ব বদ্ধ যৌথ কোং
Complainant—অভিযোক্তা, ফরিয়াদী
Compensation—ক্ষতিপূরণ, খেসারত
—, Workmen's—কর্মীদের ক্ষতিপূরণ
Competitive—প্রতিযোগিতামূলক
— value—প্রতিযোগিতামূলক মূল্য
— wage system—প্রতিযোগিতামূলক মজুরি বিধি
Compensatory allowance—ক্ষতি-পূরণ ভাতা
Complementary—অনুপূরক
Composite—সম্মিলিত, মিশ্রিত
— demand—সম্মিলিত, মিশ্রিত চাহিদা
Compromise—রফা, নিষ্পত্তি
Compound interest—চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ
Concession—রেয়াত, ছাড়, অনুগ্রহ
Conciliation—মিটমাট, আপস
Condition—শর্ত, কড়ার
—, Expressed—বিহিত শর্ত
—, Implied—নিহিত শর্ত
Conditionl—শর্তাধীন
— sale—কড়ারী বিক্রয়
Confidential—গোপনীয়
Confirmation—সমর্থন
Confiscate—বাজেয়াপ্ত করণ
Consequential—অনুবন্ধী
— loss—আনুষঙ্গিক বা পরোক্ষ ক্ষতি
Consideration—প্রতিলাভ
Consolidation—একত্রীকরণ
— of debt—ঋণ একত্রীকরণ
—of holdings—জোতের চকবন্দী করণ
Consignment—চালান
Consignee—মালের প্রাপক, প্রাপক
Consignor—প্রেরক
Constitution—কাঠামো, সংবিধান, শাসনতন্ত্র
Consul—বাণিজ্যদূত
Consulage—বাণিজ্যদূতের দক্ষিণা
Consumer—ভোগী, ব্যবহারক
Consumer's Capital—ভোগ্য মূলধন
—, surplus—ভোগোদ্বৃত্ত
Consumption—ভোগ, ব্যবহার
— goods—ভোগ্য বস্তু
Contango—ব্যাজ, হর্জানা, ক্ষতিপূরণ
Contingencies—সম্ভাব্য ব্যয়
Contingent bill—মূল্যপত্র
— charge—সম্ভাব্য ব্যয়
— liability—সম্ভাব্য দায়
Contract—চুক্তি
—, Breach of—চুক্তিভঙ্গ
—, Contingent—আনুষঙ্গিক চুক্তি
Contraction—সংকোচ
—, Unilateral—একতরফা চুক্তিনামা
—, Forward—আগাম চুক্তি
— of demand—চাহিদার সংকোচ
— of supply—যোগানের সংকোচ
Contractor—ঠিকাদার
Controller—নিয়ামক

Conventional—ব্যবহারমূলক, প্রথানুযায়ী
Conversion—পরিবর্তন, রূপান্তর
Convertible—বিনিময়যোগ্য
Convertible securities—পরিবর্তন-যোগ্য জামানত
—paper money—পরিবর্তন যোগ্য কাগজী মুদ্রা
Co-operative—সমবায়
— credit society—সমবায় ঋণদান সমিতি
— production—সমবায় উৎপাদন
—store—সমবায় ভাণ্ডার
Co-partnership—ভাগী কারবার, সহ-মালিকানা
Copy—প্রতিলিপি
Copy-right—মুদ্রণাধিকার, মূল স্বত্বাধিকার
Corner—একায়ত্তি
Corvee—বেগার
Corporate body—বিধিবদ্ধ যৌথ-প্রতিষ্ঠান
— management—যৌথ পরিচালনা
Corporation tax—নিগম কর
Correspondence—পত্র ব্যবহার, চিঠিপত্র
— register—পত্র ব্যবহার রেজিস্টার
Correlation—অনুবন্ধ
Co-sharer—সহ-অংশীদার, হিস্যাদার
Cost—খরচ, ব্যয়, পড়তা
— of living—জীবনযাত্রার ব্যয়
— of maintenance—প্রতিপালন-ব্যয়
— of production—উৎপাদন-ব্যয়
— Comparative—আপেক্ষিক বা পড়তা ব্যয়
— price—আসল দাম
— prime—প্রাথমিক খরচ বা পড়তা
— of establishment—সরঞ্জামী খরচ
— Total—মোট ব্যয়, সামগ্রিক ব্যয়
— Constant—স্থির বা অবিচল ব্যয়
Cottage Industry—কুটীর-শিল্প
Counter Signature—প্রতিস্বাক্ষর
Counter vailing—সমকারী
Counterfeit—জাল, কৃত্রিম
Counterfoil—মুড়ি, প্রতিপত্র
Counter action—প্রতিক্রিয়া
— claims—পাল্টা দাবী
— part—প্রতিরূপ, অনুরূপ
— receipt—রসিদ মুড়ি
Convenant—চুক্তি
Craft—কারুকলা
— guild—কারুসংঘ
Craftsman—কারিগর, শিল্পী
Credit—পসার, বাজার সম্ভ্রম, প্রত্যয়, ধার
Credit bank—দাদনী ব্যাঙ্ক
— balance—জমা বাকি
— bill—একবারী হুণ্ডী
— entry—জমার দাখিলা
Credit Business—বাজার সম্ভ্রম
—note—নামে জমা-পত্র
— sale—ধারে বিক্রয়
— side—জমার খাত

—, rural—গ্রামীণ ঋণ
— purchase—ধারে ক্রয়
Creditor—পাওনাদার, উত্তমর্ণ
Crop—ফসল
Criterion—নির্ণায়ক
Crisis—সঙ্কট
Cultivation—আবাদ, চাষ
—, Extensive—ব্যাপক চাষ
—, Intensive—আত্যন্তিক চাষ
Crown land—খাসমহল
Cumulative—সঞ্চয়ী
Cum-dividend—লাভাংশ সহ
— interest—সুদ সহিত
Currency—কারেন্সী, চলতি মুদ্রা
— deflation—মুদ্রা সংকোচন
— contraction—ঐ
— expansion—মুদ্রা সম্প্রসারণ
— inflation—মুদ্রাস্ফীতি
— reflection—মুদ্রার পুনঃপ্রসার
— Hard—দুর্লভ বৈদেশিক মুদ্রা
— Soft—সুলভ বৈদেশিক মুদ্রা
— Devaluation of—মুদ্রামূল্য হ্রাস
Currency notes—কাগজী মুদ্রা
— system—মুদ্রা পদ্ধতি
—, Composite—মিশ্র মুদ্রাব্যবস্থা
Current—চলতি
— account—চলতি হিসাব
— bill—চলতি হুণ্ডী
— billprice—চলতি মূল্য
— deposit—চলতি আমানত
— duty—বহিঃ শুল্ক
Custom House—মাশুলঘর, শুল্ককুঠি
Customer—গ্রাহক, ক্রেতা
Cycle—বাণিজ্যচক্র
Cyclical influctuation—চক্রানুক্রমিক আবর্তন
Cycle order—চক্রাকারে

D

Damage—ক্ষতি
Data—তথ্য, অঙ্ক
Date of maturity—হুণ্ডি চুকাইবার তারিখ, মেয়াদ পূর্ণের তারিখ
Day book—টোকচা খাতা, দৈনিক ফিরিস্তি
— labourer—দিন-মজুর
Days of grace—অনুগ্রহ মেয়াদ
Dead account—বাতিল হিসাব
— loss—পূর্ণ ক্ষতি
— rent—নিম্নতম নির্দিষ্ট খাজনা
Dead stock—অচালু মাল
— weight—স্থিতি সাম্যভার
Dealer—ব্যবসায়ী, বিক্রেতা
—, Wholesale—পাইকারী বিক্রেতা
—, Retail—খুচরা বিক্রেতা
Dear money—দুর্লভ অর্থ
— wages—মজুরী
Death duty—মৃত্যু কর
Debenture—ঋণপত্র, তমসুক
— bond—ঋণপত্র
—, Mortgage—বন্ধকী ঋণপত্র
— loan—ঋণপত্র দ্বারা প্রাপ্ত ঋণ
—, Simple—সাধারণ ঋণপত্র

—, Naked—ঐ
— redeemable—পরিশোধনীয় ঋণপত্র
— redemption fund—ঋণ মুক্তিকরণ তহবিল
Debit—খরচ
— and credit—জমা খরচ
— balance—ফাজিল বাকি
— note—বাকির হিসাব, নামে খরচ
Debt—ঋণ
—, Public—জাতীয় ঋণ
— conciliation—ঋণ মীমাংসা
—, Disputed—বিতর্কমূলক ঋণ
—, Liquidation of—ঋণ পরিশোধ
—, Floating—অল্পকালীন ঋণ
Debt National—জাতীয় ঋণ
—, Redemption of—ঋণ মুক্তি
—, Repudiation of—ঋণ অস্বীকার
—, Recovery of—কর্জ উশুল
Debtor—খাতক, ঋণী, অধমর্ণ
—, Sundry—বিবিধ খাতক
Decentralisation—বিকেন্দ্রীকরণ
Deciduous—পর্ণমোচী
Declaration—ঘোষণা
Declared value—ঘোষিত মূল্য
Decree—ডিক্রি, আজ্ঞপ্তি
Decrease of demand—চাহিদার হ্রাস
— of Supply—যোগানের হ্রাস
Deed—দলিল, দস্তাবেজ
— of acquittance—রেহাই নামা
— of agreement—একরার নামা, চুক্তিপত্র
—of assignment—অর্পণনামা
— of compromise—সোলেনামা
— of gift—দান-পত্র
— of conditional Sale—কট্-কবালা
— of lease—পাট্টা
— of mortgage—রেহেন-নামা, বন্ধকী
— of partition—বাঁটোয়ারানামা
Deed of partnership—অংশীদারী পত্র
—of private Sale—কবলা
—of tenure—পাট্টা
De-facto—কার্যত
Defalcation—তহবিল তছরূপ
Defendent—প্রতিবাদী
Default—ব্যতিক্রম; খেলাপ
Deffered—বিলম্বিত
— annuity—বিলম্বিত বার্ষিকী
— bond—বিলম্বিত বণ্ড
— payment—বিলম্বিত পরিশোধ
— share—বিলম্বিত অংশ অথবা শেয়ার
— stock—বিলম্বিত স্টক
Deficit—ঘাটতি
— financing—ঘাটতি ব্যয়
Definition—সংজ্ঞার্থ
Delivery—মাল খালাস
— order—মাল খালাসের হুকুমনামা
—, Express—দ্রুত বিলি, জরুরী বিলি
—, Forward—আগাম বিলি
De jure—আইনত
Demand—চাহিদা, টান
— bill—দর্শনী হুণ্ডী
— curve—চাহিদা রেখা

Demand Price—চাহিদা মূল্য
—schedule—চাহিদা তপশীল
—, Competitive—প্রতিযোগিতামূলক চাহিদা
—, Composite—মিশ্র চাহিদা
—, Continuous—অবিরাম চাহিদা
—, Deposit—চাহিবামাত্র দেয় আমানত
—, Definite—নিশ্চিত চাহিদা
—Derived—উদ্ভূত চাহিদা
—, Effective—কার্যকরী চাহিদা
—, Elastic—পরিবর্তনশীল চাহিদা, সংকোচ-প্রসারশীল চাহিদা, স্থিতিস্থাপক চাহিদা
—, Extension of—চাহিদা বিস্তার
,— Genuine —অকৃত্রিম চাহিদা
—, Inelastic—অস্থিতিস্থাপক চাহিদা
—, Joint—সম্মিলিত বা যুগ্ম চাহিদা
—, Reciprocal—পরস্পরানুবর্তী চাহিদা
—, Strong—প্রবল চাহিদা
Demarcation—সীমাঙ্কন
Demonetisation—মুদ্রা বিচ্যুতি
Demurrage—বিলম্ব শুল্ক, মালখালাসে বিলম্বের ক্ষতিপূরণ
Denominator—পরিমাপক
Density—ঘনত্ব
Department—বিভাগ
Depopulation—জনশূন্যকরণ
Deputation—প্রতিনিধি, দল
Deposit—গচ্ছিত, আমানত, ন্যাস
account—আমানতী জমার হিসাব
— book—আমানত বহি
— receipt—জমা রসিদ
— warrant—আমানত পত্র
—, Cash—নগদ আমানত
—, current—চলতি আমানত
—, Taire—মুদ্দতী জমা, মেয়াদী জমা
Deposition—আমানতকারী
Depreciation—অপচয়, মূল্যহ্রাস
— of money—অর্থের মূল্যহ্রাস
Depression—মন্দা
—, of market—মন্দা বাজার
—, Trade—মন্দা ব্যবসা
Derived—উদ্ভূত
Despatch—প্রেরণ
Detailed account—পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব
Detention—অবরোধ, আটক
Deviation—বিচ্যুতি, ব্যত্যয়
Devaluation—মূল্যহ্রাস
—, of property—সম্পত্তির মূল্যহ্রাস
Difference—অন্তর
Differentiation—বিভেদন
Differential—বিভেদাত্মক
Diminishing—ক্রমহ্রাস
—, Point—ক্রমহ্রাস বিন্দু
—, returns—ক্রমিক উৎপাদন হ্রাস
—, utility—ক্রমিক উপযোগ হ্রাস
Diplomatic move—কূটনৈতিক চাল
Direct—প্রত্যক্ষ
— charge—প্রত্যক্ষ ব্যয়
— tax—প্রত্যক্ষ কর
Director—পরিচালক

—, Managing—কর্মাধ্যক্ষ
Directors, Board of—
পরিচালকমণ্ডলী
Disability insurance—অশক্ততা বীমা
Disbursement—ব্যয়ন।
—, account—ব্যয়ের হিসাব
Discharge—বরখাস্ত, কার্যচ্যুতি
Discount—বাট্টা, ব্যাজ
—, cash—নগদ ব্যাজ
—, Market rate of—বাজারের
বাট্টা হার
—, Trade—কারবারী ব্যাজ, দস্তুরী
—, broker—হুণ্ডি দালাল
—, house—বাট্টা কুঠি
—, market—বাট্টা বাজার
—, rate—বাট্টা হার
Discounting of bill—বিল ভাঙ্গানো,
বিল বাট্টাকরণ
Disputed debt—বিতর্কমূলক ঋণ
Dimissal—পদচ্যুতি
Distribution—বণ্টন, বিভাজন
Distributor—পরিবেশক
Dividend—লাভাংশ
—, Accumulated—সঞ্চিত লাভাংশ
—, Interim—অন্তবর্তী লাভাংশ
—, Paying—প্রদায়ী লাভাংশ
—, unclaimed—না-দাবী লাভাংশ
Division of labour—শ্রম বিভাগ,
কর্মবিভাগ
Doctrine—মতবাদ
Document—দলিল, নথিপত্র

Documentary bill—দলিলসহ হুণ্ডি
Domestic trade—স্বদেশী ব্যবসা
Dormant partner—নিষ্ক্রীয়
অংশীদার
Double dealing—দ্বৈত ব্যবহার
—entry—তকরারি দাখিলা
—, Standard—দ্বিমান
—, taxation—দ্বৈত কর
Draft—হুণ্ডি, খসড়া
Drawback—ফেরৎ শুল্ক
Drawee—হুণ্ডি গ্রাহক
Drawer—হুণ্ডি প্রেরক, হুণ্ডিকার
Dull—মন্দা
Dumping—ক্ষতি দিয়া বিদেশে মাল
চালান
Duplicate—প্রতিরূপ
Durable—মজবুত, টেকসই
Duty—শুল্ক
—, Ad valorem—মূল্যানুসারে শুল্ক
—, Customs—বহিঃশুল্ক, বাণিজ্য
শুল্ক
Duty Discriminating—প্রভেদাত্মক
শুল্ক
—, Estate—সম্পদ শুল্ক
—, Excise—অন্তঃ শুল্ক
—, Export—রপ্তানী শুল্ক
—, Import—আমদানী শুল্ক
—, Protective—সংরক্ষণ শুল্ক
—, Sucession—উত্তরাধিকার শুল্ক
—, Specific—নির্দিষ্ট শুল্ক

E

E. & O. E—ভুলচুক বাদে
Earmarked—নির্দিষ্ট, নির্ধারিত
Earned income—অর্জিত আয়
Eearnest money—বায়না, দাদন
Easement—পরভূমিতে অধিকার
Easy market—অনুকূল বাজার
Economic—অর্থনৈতিক, আর্থিক
—, activity—আর্থিক প্রয়াস
—, freedom—আর্থিক স্বাধীনতা
—, holding—উপযোগী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ জোত
—, law—অর্থনৈতিক সূত্র
—, Planning—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা
—, rent—অর্থনৈতিক বা উপযৌগিক
—, Structure—অর্থনৈতিক কাঠামো
—, Survey—আর্থিক পরিমাণ
—, welfare—আর্থিক কল্যাণ
Economics—অর্থশাস্ত্র, ধনবিজ্ঞান
—, Applied—ব্যবসায়িক অর্থশাস্ত্র
—, Descriptive—বর্ণনাত্মক অর্থশাস্ত্র
Education, Commercial—বাণিজ্যিক শিক্ষা
—, Industrial—শিল্প শিক্ষা
—, Technical—কারিগরি শিক্ষা
Efficiency—নৈপুণ্য, কর্মদক্ষতা
—, bar—নৈপুণ্য-বাধ
—, of money—অর্থের কর্মক্ষমতা
Ejectment—উচ্ছেদ, উৎখাত
Elastic—স্থিতিস্থাপক, সংকোচ-প্রসারশীল
Elasticity of demand—চাহিদার নম্যতা বা স্থিতিস্থাপকতা
Elasticity of supply—যোগানের নম্যতা বা স্থিতিস্থাপকতা
Election—নির্বাচন
—, Direct—প্রত্যক্ষ নির্বাচন
—, General—সাধারণ নির্বাচন
—, Indirect—পরোক্ষ নির্বাচন
Elector—নির্বাচক
Electorate—নির্বাচকমণ্ডলী
Elimination—অপনয়ন, বাদ
Elucidation—স্পষ্টীকরণ
Embargo—বাণিজ্য অবরোধ, আটক
Embarkation Permit—আরোহ পত্র
Emergency—জরুরী, সংকট
Emigrant—প্রবাসী
Emolument—আর্থিকলাভ, পরিলাভ
Employee—কর্মচারী
Employment—নিয়োগ
—, bureau—নিয়োগ সংস্থা
—, exchange—কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র
—, Full—পূর্ণনিয়োগ
Emporium—ভাণ্ডার
Enclosure of lands—জমির ঘেরবন্দী
Encumbered estate—ভারগ্রস্ত সম্পত্তি
En bloc—একযোগে
Endorse—দস্তখত করা, পিছসই করা
Endorsee—স্বত্ব গ্রহীতা
Endorser—সহিদাতা
Eudorsment—সহি, স্বত্বান্তরকরণ
—, Geneɹal—সাধারণ স্বত্বান্তরকরণ

—, Partial—আংশিক স্বত্বান্তরকরণ
—, Restrictive—নিয়ন্ত্রিত স্বত্বান্তরকরণ
—Restricted—সীমাবদ্ধ স্বত্বান্তরকরণ
—, Special—বিশেষ স্বত্বান্তরকরণ
Endowment—নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্থ বা সম্পত্তি দান
—, assurance—মেয়াদী বীমা
—, Policy—মেয়াদী বীমাপত্র
Enfrachisement—ভোটাধিকার
Enterprise—উদ্যোগ, ব্যবসায়িক সাহস
Entrepreneur—উদ্যোক্তা, নিষ্পাদক, কর্মকর্তা
Entry—দাখিলা
Entry Double—দ্বিবারণী লিখন
—, Single—একবারণী লিখন
—, Debit—ঋণখাতে দাখিলা
Equation—সমীকরণ
Equilibrium—স্থিতিসাম্য, সাম্যাবস্থা
—, of price—মূল্যসাম্য
—, point of—সাম্যবিন্দু
—, of demand and supply—চাহিদা ও যোগানের সাম্য
—, normal—স্বাভাবিক সাম্য
Equimarginal—সমসীমন্তক
—, return—সমসীমন্তক আগম
Equitable Distribution—ন্যায়সঙ্গত বণ্টন
Equivalent—তুল্য
Error—ত্রুটি
—, compensatory—পূরক ভুল
—, Relative—আপেক্ষিক ভুল
—, Cummulative—একত্রিত ভুল
Errors of Commission—ত্রুটি
—, of omission—বিচ্যুতি
Establisment—সংস্থা
Estate—সম্পত্তি
Estimate—অনুমান
—, Revised—সংশোধিত অনুমান
Evacuation—উদ্বাসন, নিষ্ক্রামণ
Evacuee—উদ্বাস্তু
Eviction—বহিষ্কার, উৎখাতকরণ
Excess—অতিরিক্ত
Exchange—বিনিময়
—, above par—অধিহারে বিনিময়
—, at par—সমহারে বিনিময়
Exchange below par—ঊনহারে বিনিময়
—, Control—বিনিময় দর-নিয়ন্ত্রণ
—, rate—বিনিময়-হার
—, rates—বিনিময়-হারসমূহ
—, Foreign—বৈদেশিক মুদ্রা
—, Ratio—বিনিময় অনুপাত
Exchequer—সরকারী কোষ
Excise—আবগারী
Ex-dividend—লাভাংশ বাদে
Executive—পরিচালক
—, Committee—পরিচালকমণ্ডলী
Exceutor—নির্বাহক
Exemption—মুক্তি
Ex-officio—পদাধিকার হেতু
Expansion—প্রসার

—, of demand—চাহিদার প্রসার
—, of supply—যোগানের প্রসার
Expenditure—ব্যয়
—, Authorised—অনুমোদিত ব্যয়
—, Non-recurring—অনাবর্তক ব্যয়, এককালীন ব্যয়
—, Recurring—পৌনঃপুনিক ব্যয়, আবর্তক ব্যয়
—, Source of—ব্যয় প্রভব, ব্যয় মূলক
Experimental—প্রয়োগাত্মক, পরীক্ষামূলক
Export—রপ্তানী
Exporter—রপ্তানীকারক
Exploitation—শোষণ
Explosive—বিস্ফোরক
Exparte—একতরফা
—, decree—একতরফা রায়
Extensive—ব্যাপক
—, agriculture—ব্যাপক কৃষি
—, business—ব্যাপক কারবার
—, cultivation—ব্যাপক চাষ
Extraordinary—বিশেষ
External trade—বহির্বাণিজ্য
Extra-territorial—অতিরাষ্ট্রিক

F

Face value—অভিহিত মূল্য, লিখিত মূল্য
Factor—প্রতিনিধি, কারক
—, of production—উৎপাদনের উপাদান
Factory—কারখানা
—, law—কারখানা আইন
Fair—ন্যায্য
Fair cash—পাকা রোকড়
—, dealing—ন্যায্য ব্যবহার
—, Price—ন্যায্য মূল্য, উচিত মূল্য
—, Rent—ন্যায্য খাজনা, ন্যায্য ভাড়া
—, Trade—ন্যায্য বাণিজ্য
Family, joint—যৌথ পরিবার
Fare—ভাড়া
Farm—ক্ষেত, খামার
Fees—মেহনতানা, পারিশ্রমিক
Feudalism—সামন্ততন্ত্র
Fiat mones—অবিনিময় কাগজী মুদ্রা
Fiduciary—অছি সম্বন্ধীয়
—, paper money—সরকারী হুণ্ডী সম্বন্ধীয় কাগজী মুদ্রা
Finance—অর্থ, বিত্ত
—, act—অর্থ-বিহিতক বা আইন
—, Commission—বিত্তাযোগ, রাজস্ব কমিশন
—, Corporation—বিত্ত সংস্থা
—, Deficit—ঘাটতি ব্যয়
—, Public—রাজস্ব বিজ্ঞান
Financial Statement—আয়-ব্যয় বিবরণী
—, advisor—রাজস্ব বিষয়ে বা আর্থিক বিষয়ে পরামর্শদাতা
—, Condition—আর্থিক পরিস্থিতি
—, Control—আর্থিক নিয়ন্ত্রণ
—, Year—আর্থিক বৎসর

Financier—পুঁজিপতি
Fine—জরিমানা
Fire Insurance—অগ্নিবীমা
Firm—ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, সার্থ
Fiscal—রাজস্ব সম্বন্ধীয়
— , policy—রাজস্ব সম্বন্ধীয় নীতি
Fixed assets—স্থায়ী সম্পত্তি
— , accounts—স্থায়ী হিসাব, মেয়াদী হিসাব
Fixed capital—স্থায়ী মূলধন
— , charges—স্থায়ী খরচা
— , deposit—স্থায়ী আমানত
— , price—নির্দিষ্ট মূল্য
— , proportion—নিশ্চিত ও স্থায়ী অনুপাত
Floating (a Company)—পত্তন (কোম্পানি ইত্যাদির)
Floating assets—প্রবাহী পরিসম্পদ
— , capital—প্রবাহী পুঁজি
— , charges—প্রবাহী জামানত
— , debt—প্রবাহী ঋণ
— , policy—চলতি জাহাজী বীমা
Flow of Capital—মূলধনের গতি, মূলধন আগম
Fluctuation—উঠানামা
Folio—পৃষ্ঠা
Forced labour—বেগার খাটুনি, বাধ্যতামূলক শ্রমদান
Forecast—পূর্বানুমান
Foreign bill of exchange—বিদেশী হুণ্ডী
— , rate—বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার
— , trade—বৈদেশিক বাণিজ্য
— , affairs—বৈদেশিক ব্যাপার
For favour of orders—আদেশ প্রার্থনীয়
Forfeiture—বাজেয়াপ্ত, অপবর্তিত
Freight—মাশুল, মালের ভাড়া
Formula—সূত্র
Forward—অগ্রিম
— , contract—অগ্রিম চুক্তি
— , exchange—অগ্রিম বিনিময়
— , price—অগ্রিম দাম
— , purchase—অগ্রিম সওদা
Fragmentation—বিখণ্ডন
Franco—সর্বব্যয় সাকুল্য
Free coinage—অবাধ মুদ্রা মুদ্রণ
— , Competition—অবাধ প্রতিযোগিতা
— , labour—বেগার
— , mintage—নিঃশুল্ক মুদ্রা ঢালাই
Function of money—মুদ্রার কার্যাবলী
Fund—কোষ, তহবিল
— , parmanent—স্থায়ী কোষ, স্থায়ী তহবিল
— , Reserve—রক্ষিত কোষ, গচ্ছিত তহবিল
—Sinking—ঋণশোধক তহবিল
— , Contingency—নৈমিত্তিক তহবিল
— , Redemption—ঋণমুক্তি
Funded debt—নিহিত ঋণ

Gain—লাভ
Gambling—জুয়া
Gazettee—ঘোষ পত্র, গেজেট
General—সাধারণ
—, price level—পণ্য সাধারণের মূল্যস্তর
—, manager—সাধারণ ব্যবস্থাপক
Gilt edged—স্বর্ণসমান
—, bill—সাহুকারী হুণ্ডী
—, security—স্বর্ণসমান ঋণপত্র
Glut of Capital—পুঁজি প্রাচুর্য
—, in market—পণ্য প্রাচুর্য
Gold Standard—স্বর্ণ মান
— —, reserve—স্বর্ণ মান কোষ
—, bullion standard—স্বর্ণ পিণ্ডমান
—, exchange—স্বর্ণ বিনিময় মান
—, specie—স্বর্ণ মুদ্রা মান
—, reserve fund—সংরক্ষিত স্বর্ণকোষ
—, certificate—স্বর্ণ জমার প্রমাণ পত্র
Good will—সুনাম, প্রতিষ্ঠাধিকার
Goods—মাল
—, Economic—অর্থনৈতিক দ্রব্য
—, Finished—তৈয়ারী মাল
—, Manufactured—শিল্পজাত দ্রব্য
—, Natural—প্রাকৃতিক দ্রব্য
—, Perishable—ক্ষয়িষ্ণু বস্তু, পচনশীল বস্তু
Goods Personal—ব্যক্তিগত বস্তু
—, Productive—উৎপাদক বস্তু
—, Transferable—বিনিময়সাধ্য বস্তু
Government paper—গভর্নমেণ্ট কাগজ, সরকারী ঋণপত্র
—, promissory note—কোম্পানির কাগজ
—, securities—সরকারী প্রতিভূতি
Governing body—পরিচালকবর্গ, শাসন পরিষদ
Grace, days of—অনুগ্রহ মেয়াদ
Grade—ক্রম, পর্যায়
Graded—পর্যায়িত
Grant—আর্থিক সাহায্য, অনুদান
—, in-aid—সহায়ক অনুদান
Granary—শস্যাগার
Gratis—বিনামূল্যে
Gratuitious Coinage—নিঃশুল্ক মুদ্রাঙ্কণ
—, goods—মুফতী মাল
—, relief—নিরপেক্ষ সাহায্য
Gratuity—গ্র্যাচুয়িটি, আনুতোষিক
Gross—মোট
—, income—মোট আয়
—, product—মোট উৎপাদন
—, profit—মোট মুনাফা, মোট লাভ
—, value—মোট মূল্য
Ground rent—ভূমি কর
—, work—প্রাথমিক কাজ
Guarantee—গ্যারাণ্টি, প্রত্যাভূতি
Guild—কারু সমবায়
Guidance—পরিচালনা নির্দেশ

H

Handicraft—কারুকলা, হস্তশিল্প
Handnote—হাত চিঠা

Hard money—কাঁচা টাকা
Hardware—লৌহ দ্রব্য
Hereditament—পৈতৃক বিত্ত, মৌরস
Hire purchase—ঠিকা সওদা
Higgle—দর কষাকষি করা
Heir apparent—অব্যবহিত উত্তরাধিকারী
Home trade—অন্তর্বাণিজ্য
—, Industry—গৃহ শিল্প
—, Comsumption—দেশীয় ভোগ
Honorarium—দক্ষিণা
Horizontal Combination—সমশিল্প সমন্বয় বা জোট
Hush money—ঘুষ
Hypothetication—বন্ধক
—, Letter of—বন্ধক পত্র
Hypothesis—অনুমান

I

Identical—একরূপ, অনুরূপ
Identification—সনাক্তকরণ
Identity—পরিচয়, অভিন্নতা
Identification—পরিচয়ণ
Illegal Contract—অবৈধ চুক্তি
Immigrant—অভিবাসী
Immigration—অভিবাসন
Immovable—স্থাবর
Immunity—মুক্তি, অব্যাহতি, প্রতিরোধ ক্ষমতা
—, from taxation—কর বিমুক্তি
Impact—কর সংঘাত অগ্রভাব, চাপ
Import—আমদানি
—, duty—আমদানি শুল্ক
—, quota—আমদানি বরাদ্দ
—, Gross—মোট আমদানি
Imperial preference—সাম্রাজ্যিক অগ্রাধিকার
Imprest money—স্থায়ী জিম্মা তহবিল, অগ্রদত্ত
Incidence—করভার
Incidental—আনুষঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক
Income—আয়
—, tax—আয় কর
—, per capita—মাথাপিছু আয়
—, Net—নীট আয়
—, Real—খাঁটি আয়, বাস্তব আয়
—unearned—অনুপার্জিত আয়
Inconvertible—অপরিবর্তনীয়
Incorporated—বিধিবদ্ধ, সমিতিবদ্ধ
Increasing return—ক্রমবর্ধমান আগমন
Increase of demand—চাহিদা বৃদ্ধি
—, of supply—যোগান বৃদ্ধি
Indemnity—খেসারত, ক্ষতিপূরণ
Indemnity bond—ক্ষতিপূরণ পত্র
Indent—মাল প্রেরণের আজ্ঞা, সংভুক্তি পত্র
—' Direct—সরাসরি মাল চালান
—, Pending—বিলম্বিত মাল চালান
Index number—সূচক সংখ্যা
Indigenous—দেশীয়
Indirect—পরোক্ষ
—, utility—পরোক্ষ উপযোগিতা

Indorsement—পৃষ্ঠাঙ্কণ, সহি
Industrial—শিল্প বিষয়ক
—, crisis—শিল্প সংকট
—, depression—শিল্প মন্দা
—, expansion—শিল্প প্রসার
—, housing—শিল্প-শ্রমিকের গৃহ নির্মাণ
—, labour—শিল্প-শ্রমিক
—, organisation—শিল্প সংগঠন
—, tribunal—শিল্প ন্যায়পীঠ
Industrialisation—শিল্পায়ন, শিল্পযোজন
Industry—শিল্প, শ্রমশিল্প
—, Infant—শিশুশিল্প
—, Small Scale—ক্ষুদ্রায়তন শিল্প
—, Nationalisation of—শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ
—, Subsidiary—উপজাত শিল্প
Inefficient—অনিপুণ
Inflation—স্ফীতি, উৎসার, সম্প্রসারণ
—, of currency—মুদ্রাস্ফীতি
Ingot—ধাতুপিণ্ড
Inheritance—উত্তরাধিকার
—, taxes—উত্তরাধিকার করসমূহ
Initials—আদ্যাক্ষর, সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর
Injunction—নিষেধাজ্ঞা
Inland bills of exchange—অন্তর্দেশীয় বিনিময় পত্র
In lieu of—পরিবর্তে
Insatiable rant—অতৃপ্ত ভোগবাসনা
Insolvency act—দেউলিয়া আইন
Insolvent—দেউলিয়া
Instalment—কিস্তি
Insurance—বীমা
—, Accident—দুর্ঘটনা বীমা
—, Disability—অক্ষমতা-বীমা
—, Fire—অগ্নিবীমা
—, Life—জীবন-বীমা
—, Marine—নৌ-বীমা
—, broker—দালালী-বীমা
—, Policy—বীমা-পত্র
—, Premium—বীমা-কিস্তি
Installation—স্থাপন
Intensity of demand—চাহিদার প্রাবল্য
Inter alia—প্রসঙ্গক্রমে
Interest—সুদ
—, Compound—চক্রবৃদ্ধি সুদ
—, Gross—মোট সুদ, মোট কুসীদ
—, Landed—ভূসম্পত্তি জড়িত স্বার্থ
Interest, Vested—কায়েমী স্বার্থ
—, Net—নীট সুদ
Intrinsic—নিহিত
—value—স্বকীয় মূল্য, নিহিত মূল্য
Inverse ratio—বিপরীত হার
Investment—বিনিয়োগ
—of capital—মূলধন বিনিয়োগ
Issued capital—বিক্রেয় মূলধন
Item—দফা, পদ

J

Jobber—ঠিকাদার, দালাল
Job work—খুচরা কাজ

Joint—যৌথ, মিলিত, সংযুক্ত
—, account—সম্মিলিত হিসাব
—, adventure—যৌথ ঝুঁকিদারী কারবার
—, capital—যৌথ পুঁজি
—, liability—যৌথ দায়িত্ব
—, ownership—সম্মিলিত বা এজমালি স্বত্ব
—, purse—সংযুক্ত কোষ
—, supply—সংযুক্ত যোগান
Jointure—স্ত্রীধন
Journal—খসড়া, জাবেদা খাতা
Journeyman—মজুর
Juror—নির্ণায়ক সভ্য
Judiciary—বিচার বিভাগ
Jurisdiction—এলাকা, অধিক্ষেত্র
Jurisprudence—ব্যবহার শাস্ত্র, আইন শাস্ত্র
Juvenlie labour—শিশু শ্রম

K

Kartel (cartel)—কার্টেল, বণ্টনজোট
Keelage—বন্দরস্থ জাহাজী শুল্ক
Keeper of records—লেখ্যপাল, মহাফেজ
Key industry—বুনিয়াদি শিল্প, মূলশিল্প
Kite—সুপারিশী বিল বা হুণ্ডী
Kite flying—উপযোজক কাটা

L

Labour—শ্রম
Labour Bureau—শ্রমিক পরিষদ বা সংস্থা
—, dispute—শ্রমিক বিরোধ বা সংঘর্ষ
—, party—শ্রমিক দল
—, union—শ্রমিক সংঘ
—, welfare—শ্রম কল্যাণ
Laissez faire—অবাধনীতি
Land Alienation Act—ভূমি হস্তান্তর আইন
—, Revenue—ভূমি রাজস্ব
—, Servey—ভূমি জরিপ
—, Tax—ভূমি কর
—, Tenure—ভূমি
—, System—ভূমি প্রথা
—, Arable—কৃষিযোগ্য ভূমি
—, Barren—অনুর্বর জমি
—, cultivated—আবাদী জমি
—, Fallow—পতিত জমি
—, Fertile—উর্বর জমি
—, Irrigated—জলসেচিত জমি
—, Nationalisation of—ভূমির রাষ্ট্রীয়করণ
—, Rent-free—নিষ্কর জমি
—, waste—পতিত জমি, কেরাম জমি
Landed property—ভূসম্পত্তি
Landing permit—অবরোহ পত্র
Landlord—জমিদার, ভূস্বামী
Lapsed policy—বাতিল বীমাপত্র
Law—বিধি, আইন, নিয়ম
—, commercial—বাণিজ্যিক আইন
—, of demand—চাহিদার নিয়ম
—, of derived demand—উদ্ভূত —চাহিদার নিয়ম

League of Nations—রাষ্ট্রসংঘ
Lease—পাট্টা, ইজারা
Lease-hold property—পাট্টাধীন সম্পত্তি
Lease-holder—ইজারাদার
Ledger—খতিয়ান বহি
— , folio—খতিয়ান পৃষ্ঠা
Leagal tender—বৈধ মুদ্রা, বিহিত মুদ্রা
Leisure class—শ্রমবিমুখ গোষ্ঠী
Letter of administration—প্রবন্ধাধিকার পত্র
— , allotment—বিলিকরণ পত্র, হিস্তা-স্বীকৃতি পত্র
— , application—দরখাস্ত, আবেদন পত্র
— , credit—প্রত্যয় পত্র
— , guarantee—জামিন পত্র
— , hypothetication—বন্ধক পত্র
— , indemnity—ক্ষতিপূরণ পত্র
— , introduction—পরিচয় পত্র
— , renunciation—স্বত্বত্যাগ পত্র
Liability—দায়িত্ব, দায়
— , contingent—সম্ভাব্য দায়
— , joint and serial—সম্মিলিত ও বিভিন্ন দা:
— , limited—সীমাবদ্ধ দায়
— , unlimited—সীমাহীন দায়
License—অনুজ্ঞা, লাইসেন্স
Lien—পূর্ব স্বত্ব
Life annuity—আজীবন বৃত্তি
— , assurance—জীবন বীমা
— , interest—জীবন স্বার্থ

Light railway—ছোট রেলপথ
Limited company—সীমিত সংঘ
Limited liability—সীমিত দায়িত্ব বা দায়বদ্ধ সংঘ
Liquid asset—নগদ পুঁজি, তরল সম্পত্তি
Liquidation—কারবার গুটান
— , of debt—ঋণ পরিশোধ
Liquidator—দেউলিয়া, অবসায়ক
Livestock—গবাদি পশুধন
Livelihood—জীবিকা
Living, cost of—জীবনযাত্রার ব্যয়
Living wages—জীবন ধারণের উপযোগী মজুরী
Loan—কর্জ, ধার
Loan capital—ঋণকৃত পুঁজি
— , in kind—বস্তু ঋণ
— , Long term—দীর্ঘকালীন ঋণ
— , National—জাতীয় ঋণ
— , Public—রাষ্ট্রীয় ঋণ
— , Secured—নিরাপদ দাদন বা ধার
— , Short term—স্বল্পমেয়াদী ঋণ
— , Unsecured—বন্ধনহীন ঋণসমূহ
Local—স্থানীয়
Local Self-Govt.—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন
Local demand—স্থানীয় চাহিদা
Local value—স্থানীয় মূল্য বা মান
Localisation—স্থানীয়করণ
— , of Industries—শিল্পের ...ীয়

Lock-out—তালাবন্ধ
Lock up—হাজত
Loco price—উৎপাদন-স্থানে পণ্যমূল্য
Log book—গতি পরিচায়ক পুস্তিকা
Long term Contract—দীর্ঘমেয়াদী চুক্তি
Loss in transit—চলাচল পথে ক্ষতি
Lump—থোক
Luxuries—বিলাস দ্রব্য

M

Machine—কল, যন্ত্র
Machinery—কলকব্জা
Magnitude—পরিমাণ, মান
Mail order business—ডাকযোগে ব্যবসায়
Maintenance cost—পোষণ বা রক্ষণ ব্যয়
Maintenance grant—রক্ষণ অনুদান
Major—মুখ্য, প্রধান
— , works—মুখ্য নির্মাণ কার্য
Malafide—প্রবঞ্চনামূলক
Maldistribution of wealth—ধনবৈষম্য
Malleability—ঘাতসহতা
Managed currency—নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা
Management—পরিচালনা
Manager—ব্যবস্থাপক, কর্মাধ্যক্ষ
Managing agents—নির্বাহী-নিযুক্তক
— ,committee—নির্বাহক সমিতি
— , Director—নির্বাহক পরিচালক
Mandate—আজ্ঞাপত্র, আজ্ঞা
Mandatory—আদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি
Manifesto—ঘোষণাপত্র
Manipulation of accounts—হিসাবের কারসাজি
Manorial system—মহাল প্রথা
Manual—কায়িক, সারগ্রন্থ
— , Labour—কায়িক শ্রম
— , Training—হস্তকলা শিক্ষণ
Manufactory—কারখানা
Manufacture—উৎপাদন, নির্মাণ
Manufactured goods—শিল্পজদ্রব্য, পাকামাল
Manufacturer—উৎপাদক, নির্মাতা
Malfeasance—সরকারী কার্যে
Malpractices—অবৈধ কার্যকলাপ
Margin—সীমা, প্রান্ত, পর্যন্ত
— , of profit—লাভের পরিমাণ
Marginal—প্রান্তীয়, প্রান্তিক
— , demand—প্রান্তিক চাহিদা
— , cost—প্রান্তিক ব্যয়
— , utility—প্রান্তিক উপযোগ
—demaned price—প্রান্তিক চাহিদা মূল্য
— , dose—প্রান্তিক মাত্রা
— , produce—প্রান্তিক উৎপাদন
— , Productivity—প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা
— , Purchase—প্রান্তিক ক্রয়
— , Profit—প্রান্তিক লাভ
— , Price—প্রান্তিক মূল্য

Mart—গঞ্জ, পটী
Market—বাজার, হাট
—, Fluctuation—বাজারের উঠ্‌তি-পড়তি
—, Price—বাজার-দাম, ভাও
—, Rate—বাজার দর
—, value—বাজার দর
—, Reaction—বাজার ফের, প্রতিক্রিয়া
—, Firm—বাজার গরম
—, Active (Brisk)—তেজী বাজার
—, Excited—অস্থির বাজার
—, Dull—মন্দা বাজার
—, Rising—চড়তি বাজার
—, Steady—স্থির বাজার
—, weak—বাজার নরম
—, Quite—শান্ত বাজার
Marketable goods—বিক্রয়যোগ্য মাল
Marketing condition—বাজার হাল
—, Problem—পণ্যবিক্রয় সমস্যা
Mate's Receipt—জাহাজী মাল রসিদ
Material goods—পার্থিব বস্তু
—, Prosperity—পার্থিব সমৃদ্ধি
Maturity—পক্কতা
Maturity of bill—বিলের মেয়াদ পূর্তি
Maturity Debt of—মেয়াদি তারিখ
Mean—গড়, মধ্যম
—, Arithmetic—যোগোত্তর মধ্যম
—, Geometric—গুণোত্তর মধ্যম
Measure—পরিমাপ
—, of value—মূল্যের পরিমাপ
Measurement of Purchasing power—ক্রয়শক্তির পরিমাপ
Mechanism—যন্ত্রকৌশল
Mediator—মধ্যস্থ
Medium—মাধ্যম
—, of Exchange—বিনিময়ের মাধ্যম
Memo—রোকা, স্মারক
Memorandum—স্মারকলিপি
Mercantilism—বাণিজ্যতন্ত্র, বণিকতন্ত্র
Merchandise—পণ্যসম্ভার
Mercantile Marine—বাণিজ্য নৌবহর
Merchant—বণিক, ব্যবসায়ী
Metal, over-valued—অতি মূল্যীকৃত ধাতু
—, under-valued—ঊনমূল্যীকৃত ধাতু
Metallic currency—ধাতুমুদ্রা ব্যবস্থা
—, money—ধাতুমুদ্রা
Metalled road—পাকা রাস্তা
Metalloid—অপধাতু
Metayor System—ভাগচাষ প্রথা
Method—প্রণালী
Middleman—ফড়িয়া, দালাল
Migration of labour—মজুরের স্থানান্তরে গমন
Milling—মুদ্রার কিনারায় খাঁজ কাঁটা
Minerals—খনিজ পদার্থ
—, resources—খনিজ সম্পদ
Minimum—ন্যূনতম

Mint—টাঁকশাল
Mintage—টাঁকশালী শুল্ক
Mint par—টাঁকশালী দর
Minority—সংখ্যালঘু
Minute book—কার্যবিবরণী বহি
Misappropriation—আত্মসাৎকরণ
Miscellaneous—বিবিধ
Mixed crop—মিশ্রিত ফসল
—, currency—মিশ্রিত মুদ্রাব্যবস্থা
Mobility—চলনশীলতা
—, of labour—শ্রমিকের চলনশীলতা
Mobilisation—যোজন
Moderate—পরিমিত, সাধারণ
—, demand—সাধারণ চাহিদা
Modification—সংপরিবর্তন
Modus operandum—কার্যপ্রণালী
Money—অর্থ
—, bill—ধন বিধেয়ক
—, consideration—মুদ্রামূল্য
—, Making—অর্থোপার্জন
—, rent—নগদ খাজনা
—, Appreciation of—মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি
Money Caution—জামানতী টাকা
—, cheap—সুলভ মুদ্রা, সস্তা টাকা
—, convertible—বিনিময়যোগ্য মুদ্রা
—, Fiat—অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রা
—, Paper—কাগজী মুদ্রা
—, purchasing power of—মুদ্রার ক্রয়শক্তি
—, Quantity theory of—অর্থ পরিমাণতত্ত্ব
—, Ready—নগদ টাকা
—, Standard—মানমুদ্রা
—, Tender—বায়না মুদ্রা
—, Soft—সুলভ টাকা
—, Spurious or counterfeit—কৃত্রিম মুদ্রা
—, value of—অর্থের মূল্য
Monometallism—একধাতু মান
Monopoly—একচেটিয়া, একাধিকার
—, price—একচেটিয়া দাম
—, Absolute—নিরংকুশ বা পূর্ণ অধিকার
—, Legal—আইনানুগ একাধিকার
—, Natural—প্রাকৃতিক একাধিকার
—, Revenue—একচেটিয়া রাজস্ব আয়
—, value—একচেটিয়া মূল্য
Moratorium—টাকাকড়ির লেনদেন সম্বন্ধে আইনগত বিরতি
Mortality table—মৃত্যু তহশীল, মৃতবিবরণী
Mortgage—বন্ধক
Mortgager—বন্ধকদাতা
Mortagagee—বন্ধকগ্রহীতা
Motive power—চালিকা শক্তি
Movables—অস্থাবর সম্পত্তি
Multi-purpose—নানার্থক, বহুমুখী
Mutual agreement—পারস্পরিক চুক্তি
Mutation—নামজারিকরণ, নামান্তকরণ

N

National debt—জাতীয় ঋণ
—, income—জাতীয় আয়

—, income calculation—জাতীয় আয় পরিগণনা
—, expenditure—রাষ্ট্রীয় ব্যয়
—, labour—জাতীয় শ্রম
—, prosperity—জাতীয় সমৃদ্ধি
—, wealth—জাতীয় সম্পদ
National Defence Fund—জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল
Nationalisation—রাষ্ট্রীয় করণ
—, of industries—শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ
—, of insurance—বীমার রাষ্ট্রীয়করণ
—, of land—জমির রাষ্ট্রীয়করণ
Naturul goods—প্রাকৃতিক বস্তু
—, liberty—প্রকৃতিগত স্বাধীনতা
—, laws—প্রাকৃতিক নিয়ম
Natural resources—প্রাকৃতিক সম্পদ
Nature—প্রকৃতি
Naturalisation—দেশীয়করণ
Navigable—নাব্য
Navigation—নৌবাহ
—, canal—নৌবাহ খাল
—, law—নৌবহন-আইন
Necessaries—আবশ্যক সামগ্রী
—, Conventional—কৃত্রিম আবশ্যক

ls—প্রয়োজন
Negative Service—প্রতিকূল সেবা
Negotiable instrument—হস্তান্তর যোগ্য পত্র
Net—নীট

Neutral—নিরপেক্ষ
Nominal—নাম মাত্র
—, Capital—অভিহিত মূলধন
—, price—নামমাত্র মূল্য
—' value—লিখিত বা অভিহিত মূল্য
—, wages—আর্থিক মজুরি
Nominee—মনোনীত ব্যক্তি
Nomination—মনোনয়ন
Non-aligned country—জোট-নিরপেক্ষ দেশ
Non-acceptance—অস্বীকৃতি
Non-business day—ছুটির দিন
Non-cumulative dividend—অসঞ্চয়ী লাভাংশ
Non-elastic—অস্থিতিস্থাপক
Non-recurring—অনাবর্তক
Non-transferable—হস্তান্তরের অযোগ্য
Normal demand—স্বাভাবিক চাহিদা
—, interest—মামুলি সুদ
Notary Public—লেখ্য প্রামাণিক
Notice—বিজ্ঞাপন
Notification—বিজ্ঞপ্তি
Noting a Bill—অস্বীকৃতি হুণ্ডি প্রমাণিত করা
Null & Void—বাতিল

O

Oath—শপথ
Obligation—ঋণ, দায়, বাধ্যবাধকতা
Objective Value—ব্যবহারিক মূল্য

Obsolescence—নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হেতু পুরাতন যন্ত্রের মূল্য হ্রাস
Occupancy right—দখলী স্বত্ব, মৌরসী স্বত্ব
Octroi duty—চুক্তি দ্বারা-দেয় শুল্ক
Occupation—পেশা
—, Regional—আঞ্চলিক উপজীবিকা
—, Seasonal—মরসুমী উপজীবিকা
Officiating—স্থানাপন্ন
Off-take—মোট খরিদ
On cost—পরোক্ষ পড়তা
On approval—অনুমোদনার্থ
Onerous tax—দুর্বহ কর
Open cheque—খোলা চেক
Opening—প্রারম্ভিক
Opening balance—, জমা
—, stock—, সম্ভার
Optimum—সর্বোত্তম, কাম্য
Option—ইচ্ছা, বিকল্প
—, call—তেজী
—, pull—বন্দী
—, double—তেজীমন্দী
Optional—ঐচ্ছিক, বৈকল্পিক
Order—আদেশ, নির্দেশ
Ordinance—বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত অস্থায়ী আইন
Ordinate—কোটী
Ordinary debt—সাধারণ ঋণ
—, shares—সাধারণ শেয়ার
Organisation—সংগঠন
—, of industries—শিল্প সংগঠন
Organiser—সংগঠক, ব্যবস্থাপক
Origin—মূল
Ostensible partner—নামমাত্র
Out-of-date cheque—গত মেয়াদ চেক; কালান্তরিত বা কালোত্তীর্ণ চেক
Out-lay—ব্যয়, খরচ
Output—উৎপাদন
Outstanding claim—বাকী দাবী
—, debt—বকেয়া দেনা
Overdraft—জমা হইতে অধিক লওয়া
Overhauling—সংস্কারকরণ
Overhead charge—উপরি ব্যয়
Over due—মেয়াদ অতীত
—, population—জনাধিক্যতা
—, time—নির্ধারিত সময় অপেক্ষা অতিরিক্ত
—, valued—অতিমূল্যীকৃত
—, work—অতিশ্রম
Owner's risk—মালিকের ঝুঁকি

P

Paid in full—সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত
—, up capital—আদায়ীকৃত মূলধন
—, share—মূল্যপ্রাপ্ত শেয়ার
Paper credit—কাগজী ঋণ
Parity—সমতা
—, of exchange—বিনিময় সমমূল্য হার
—, of price—দামের সমতা
Parliament—সংসদ
Parallel—সমান্তরাল

Partner—অংশীদার
Part payment—আংশিক প্রদান
Part time—অংশকাল
Passive bond—সুদহীন ঋণপত্র
Patent—কৃতিস্বত্ব
Pattern—নমুনা, প্রকার
Pawn—বন্ধক দেওয়া, বন্ধকীদ্রব্য
— , broker—বন্ধকী ব্যবসায়ী
Pay—বেতন
— , bill—বেতন দেয়ক
— , day—বেতন দিবার দিন
Payee—প্রাপক
Paying-in slip—জমাপত্রী
Payer—দায়ক
Payment for honour—সম্ভ্রমার্থ প্রাপ্য মিটানো
— in kind—বস্তুদ্বারা প্রাপ্য মিটানো
— on account—অগ্রিম অর্থ মিটানো
Pecuniary—আর্থিক
Pegging—হারবদ্ধ
— of exchange—বিনিময়ের হারবদ্ধ
Per unit—প্রতি এককে
Per capita—মাথা পিছু
Per cent—শতকরা, শতাংশ
Per annum—প্রতি বৎসর
Periodicity—পর্যাবৃত্তি
Pending list—অপেক্ষ্য তালিকা
Permit—আজ্ঞাপত্র
Perpetual debenture—চিরস্থায়ী ঋণপত্র
— loan—চিরস্থায়ী ঋণ
Per pro—ব্যক্তিক হিসাব
Personal bond—মুচলেকা
— ledger—ব্যক্তিক খতিয়ান
— security—ব্যক্তিগত জামিন
— tax—ব্যক্তিক কর
Petty cash—খুচরা রোকড়
Piece goods—কাপড়
—wage—ফুরান মজুরি
—work—ফুরানের কাজ
Plaint—আরজি
Plaintiff—পূর্বপক্ষ, বাদী
Plea—ওজর
Plotting—অঙ্কন
Poll—ভোট গ্রহণ
Portability—বহনযোগ্যতা
Populace—জনসাধারণ
Post dated—পরবর্তী তারিখ লেখ
Potential wealth—সম্ভাব্য সম্পত্তি
Possession certificate—আমলনামা
Power-loom—শক্তিচালিত তাঁতযন্ত্র
Preference—পক্ষপাত
—bond—পক্ষপাতমূলক ঋণ
—share— " শেয়ার
Premium—কিস্তি
Pre-emption—অগ্রক্রয়াধিকার
Prerogative—বিশেষাধিকার
Prejudicial—পক্ষপাতদুষ্ট
Preamble—ভূমিকা, প্রস্তাবনা
Price—দর, দাম, মূল্য
— level—মূল্যস্তর, দামস্তর
— list—মূল্য-তালিকা

—, Preferential—পক্ষপাতমূলক দাম
—, Average—গড়পড়তা দাম
—, Closing—শেষ বাজারের দাম
—, Current—চলতি দাম
—, Demand—চাহিদা মূল্য
—, Equilibrium—সাম্য মূল্য
—, Gross—মোট মূল্য
Price, Net—নীট মূল্য
— Real—প্রকৃত মূল্য
Price, Selling—বিক্রয় মূল্য
— Supply—যোগান মূল্য
Primary factor—প্রাথমিক উপাদান
Prime cost—মুখ্য খরচ, প্রত্যক্ষ খরচ
—entry—মুখ্য দাখিলা
Priority—অগ্রাধিকার
Proforma account—নকল
—invoice—খসড়া চালান
Probate—উইলের আইনগত স্বীকৃতি
—duty—মৃত্যু পত্রকর
Probationary—অবেক্ষাধীন
Procedure—প্রণালী, প্রক্রিয়া
Process—পরোয়ানা
Prodigal—অপচয়ী
Produce—উৎপন্ন দ্রব্য, ফসল
— rent—ভাগ খাজনা, ফসল খাজনা
Producer—উৎপাদক
Producer's monopoly—উৎপাদকের একচেটিয়া
— rent—উৎপাদকের লাভ
— surplus— „ উদ্বৃত্ত
Product, Finished—তৈয়ারী মাল
— Joint —সম্মিলিত উৎপত্তি
— Net—নীট বা আসল উৎপত্তি
Production—উৎপাদন
— duty—উৎপাদন শুল্ক
—cost— „ ব্যয়
— Mass—পাইকারী উৎপাদন, বহুল উৎপাদন
Production wealth—ধনোৎপত্তি
Productive consumption—উৎপাদক উপভোগ
—goods—উৎপাদকীয় পণ্য
— labour — „ শ্রম
—work— „ কার্য
Profession—পেশা
Profit—লাভ, মুনাফা
Profit & loss account—লাভ-লোকসান হিসাব
Profit-sharing scheme—লাভবণ্টন ব্যবস্থা
Proforma account—নমুনা হিসাব
—invoice—নমুনা চালান
—dependent—গৌণ প্রতিবাদী
Progress—উন্নতি
Progression—প্রগতি
—Harmonic—সমান্তর প্রগতি
—Principle—প্রগতিশীল নীতি, ক্রমোন্নতিমূলক নীতি
— Tax — ক্রমবর্ধমান কর
— wage— „ মজুরি
Prohibited goods—নিষিদ্ধ মাল
Prohibition—প্রতিষেধ

Proletariate—সর্বহারা
Promoter—প্রবর্তক
Prompt Sale—চটপট বিক্রি
Proprietory—মালিকানা স্বত্ব
Prospectus—যৌথ কারবারের অনুষ্ঠান পত্র
Pro rata—আনুপাতিক
Protected—সংরক্ষিত
—, trade— „ ব্যবসা
Protection—সংরক্ষণ
—, bill—সংরক্ষক বিধেয়ক
Protection Discriminating—পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণ
—, of Industries—শিল্প সংরক্ষণ
Protective duty—সংরক্ষণ শুল্ক
—, tariff— „
Provision—বিধান, ব্যবস্থা
Proviso—উপবন্ধ, অনুবিধি
Proximo—আগামী মাস
Proxy—প্রতিনিধি
Public—সর্বজনিক, সরকারী
—, deposit—সরকারী জমানত
—, health—জনস্বাস্থ্য
—, loan—সরকারী ঋণ
—, money—সাধারণের টাকা
—, monopoly—রাষ্ট্রীয় একাধিকার
—, revenue—রাষ্ট্রের আয়
—, sale—নীলাম
—, servant—সরকারী কর্মচারী
—, service— „ চাকরি
—, utility service—জনসেবামূলক কার্য
—, works—সরকারী নির্মাণ কার্য
Purchase—ক্রয়
Purchase Board—ক্রয় পর্ষৎ
—, document—কবালা
Purchasing Power—ক্রয়শক্তি
—, Put and call—শেয়ার ক্রয়বিক্রয় অধিকার

Q

Quantum—পরিমাণ
Qualified acceptance—শর্তাধীন গ্রহণ
Qualitative—গুণানুসারে
—, distribution— „ বণ্টন
Quantity—পরিমাণ
—, theory—পরিমাণবাদ
—, of money—অর্থের পরিমাণবাদ
Quarantine—নিরোধন
Quarterly—ত্রৈমাসিক
Quasi-monopoly—আংশিক একচেটিয়া অধিকার
—, rent—খাজনার অনুরূপ
Quayage—ঘাটের খাজনা বা ভাড়া
Quid pro quo—পরিবর্ত দ্রব্য
Quinquennial—পঞ্চবার্ষিক, পাঁচসালা
Quire—কাগজের দিস্তা
Quit rent—পরিশ্রমের পরিবর্তে দেয় খাজনা
Quittance—ঋণমুক্তি
Quoram—অপেক্ষ সংখ্যা
Quota—বরাদ্দ, নির্ধারিত অংশ
Quotation—দর, মূল্যজ্ঞাপন
Quo warranto—অধিকার চর্চা

R

Race—জাতি

Range—অঞ্চল, গণ্ডি

Rank—পদমর্যাদা

Rapidity of circulation—প্রচলনের

Rate—দর, হার

—, of exchange—বিনিময় হার

—, wages—মজুরির হার

Ratio—অনুপাত

—, mean—মধ্যক অনুপাত

—, inverse—বিপরীত অনুপাত

Ration—সংবিভাগ, বরাদ্দ

Rationalisation—সুসংবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত সংস্কার

—, of industry—শিল্পের সুসংবদ্ধ সংস্কার

Raw material—কাঁচা মাল

Real—প্রকৃত, বাস্তব

—, cost—প্রকৃত খরচ

—, estate—স্থাবর সম্পত্তি

—, exchange—বাস্তবিক বিনিময়

—, income—বাস্তব আয়

Realisation—উসুল, আদায়

Realisable dues—আদায়যোগ্য পাওনা

Reassessment—পুনঃ করনির্ধারণ

Rebate—ছাড়, বাটা

Receipt and disbursement—জমা ও খরচ

Reciprocal—পারস্পরিক

Reciprocity—পারস্পর্য

Reclamation—উদ্ধার, উপযোগীকরণ

Record—দলিল, লেখ্য

Reconciliation—মিলকরণ, রাজীনামা

Recurring expenditure—আবর্তক ব্যয়

Redemption—মোক্ষন

—, debenture—পরিশোধযোগ্য ঋণপত্র

—, of debt—কর্জ শোধ

—, charge—মোক্ষণ প্রভাব

Reference—নির্দেশ

Referendum—নির্দেশন

Region—অঞ্চল

—, of increment—বর্ধিষ্ণু অঞ্চল

Regional—আঞ্চলিক

Registration—নিবন্ধন, পঞ্জিকরণ

—, capital—নিবদ্ধ মূলধন

Rejection—বাতিল

Remainder—বাকি, অবশেষ, বকেয়া

Remission of revenue—খাজনা ছাড় দেওয়া

—, rent—খাজনা রেহাই

Reminder—তাগিদ

Remittance—প্রেরণ

Remunerative Capital—লাভদায়ক মূলধন

—, debt—লাভদায়ক ঋণ

Remuneration—পারিশ্রমিক

Rent—কর, খাজনা, ভাড়া

—, consumer's—ভোগকর

—, Dead—তামাদি কর

—, original—আসল কর
—, of ability—কর্মদক্ষতার কর
Rental—জমাবন্দী
Reparation—ক্ষতিপূরণ, প্রতিকার
Repatriation—পুনর্বাসন
Repeal—প্রত্যাহার
Replenishment—পুনঃ পূরণ
Requisition—অধিযাচন
—, slip—অধিযাচন পত্র
Reserve—সংরক্ষণ, সংরক্ষিত ভাণ্ডার
—, fund—সংরক্ষিত তহবিল
—, liability— „ দায়িত্ব
—, capital— „ মূলধন
—, price—ন্যূনতম দর
—, subjects—সংরক্ষিত বিষয়
Residual share—অবশিষ্ট অংশ
Rejudicate—পূর্ব ন্যায়বিধি
Resource—সম্পদ, উপায়
Restricted—সীমাবদ্ধ
Retail—খুচরা
Retention money—জামানতের
Return—আগম
Return inward—বিক্রী ফেরত
—, outward—খরিদ ফেরত
—, Constant—সম আগম
—, Increasing—ক্রমবর্ধমান আগম
Revenue—রাজস্ব, আয়
—, account—রাজস্ব গণিতক
—, fee—লাখেরাজ

Review—পুনর্বিবেচনা
Revoke—প্রত্যাহার করা
Right—অধিকার
Rights and liability—অধিকার ও দায়িত্ব
Right, authority and jurisdiction—অধিকার, কর্তৃত্ব ও অধিক্ষেত্র
Rigid account—সূক্ষ্মহিসাব
Ring—মণ্ডল
Rise and fall—উঠানামা, তেজীমন্দী
Risk—ঝুঁকি
—, charges—ঝুঁকির মাশুল
—, note—ঝুঁকি পত্র
—, owner's—মালিকের ঝুঁকি
Rotation of crops—ফসলের হেরফের
Rough—চোথা, খসড়া
—, account book—খসড়া হিসাব বহি
—, ledger—খসড়া খতিয়ান
Royalty—অধিকার শুল্ক
Rules—নিয়মাবলী
Rules, business—কার্যক্রম-নিয়ম
—, of procedure—কার্যক্রম
Ruling—বিনির্দেশ
Rural—গ্রাম্য
—, Credit—গ্রাম্য ঋণ
—, uplift—গ্রামোন্নতি, পল্লী-উন্নয়ন

S

Sag—মূল্য হ্রাস
Safeguard—রক্ষাকবচ
Sale—বিক্রয়

—, account—বিক্রীর হিসাব
—, commission—বিক্রীর পরওয়ানা
—, on approval—পছন্দমতে বিক্রয়
—, certificate—বিক্রয়ের রসিদ
Sale warrant—বিক্রয় পরওয়ানা
—, Deed of Conditional—বিক্রয় কটকবালা
—, ring—খরিদ্দারের জোট
Salesman—বিক্রেতা
Salesmanship—বিক্রয়-দক্ষতা
Sample—নমুনা
Salvage—নিস্তারণ
Sanctuary—সংরক্ষণ ক্ষেত্র
Satiable—সংতৃপ্ত
Satiation of want—চাহিদার সংতৃপ্তি
Satiety price—সংতৃপ্তি মূল্য
Satisfaction—তৃপ্তি, মোচন
— of wants—অভাব মোচন
Savings—সঞ্চয়
— bank—সেভিংস ব্যাঙ্ক
Scarcity—টান, দুষ্প্রাপ্যতা
— rent—দুষ্প্রাপ্যতা কর
— value—অনটন মূল্য
Schedule—তপসীল
Scheme—পরিকল্পনা
Scope—ক্ষেত্র, সুবিধা
Scrivener—টাকা-পয়সা দাদনের দালাল
Scrutiny—সমীক্ষা
Seasonal occupation—মরসুমী পেশা
Sealed—সীলমোহরাঙ্কিত
Secondary—গৌণ
Seconder—সমর্থক
Second-hand goods—পুরাতন মাল
— mortgage—দ্বিতীয় বন্ধক
Section—বিভাগ, ধারা
Sector—ক্ষেত্র
—, Private—বেসরকারী ক্ষেত্র
—, Public—সরকারী ক্ষেত্র
Secular State—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র
Security—জামিন, জামানত, নিরাপত্তা
— deposit—জামানত, জমা
— Govt.—সরকারী সিকিউরিটি
— Marketable—বিক্রয়যোগ্য দলিল
— Gilt edged—প্রথম শ্রেণীর ঋণপত্র
Security, Personal—ব্যক্তিগত জামিন, প্রতিভূ
Self-balancing ledger—স্বয়ং সংতুলন খতিয়ান
Self-determination—অন্তর্নির্ধারণ
Self-sufficiency—স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বাতন্ত্র্য
Selling at cost—উৎপাদন-মূল্যে বিক্রয়
— Price—বিক্রয় দর
Sericulture—রেশমকীট পালন
Series—শ্রেণী, মালা
Service book—কৃত্যক বহি
Set off—কাটাকাটি
Settlement—ভূবাসন, জমি বন্দোবস্ত

— amicable—আপসরফা, সোলেনামা
— decennial—দশসালা বন্দোবস্ত
— permanent—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
Share—অংশ, শেয়ার
Share Capital—শেয়ারের মূলধন
— certificate—শেয়ার-পত্র বা সার্টিফিকেট
— transfer—শেয়ার হস্তান্তর
— warrant—শেয়ার পরওয়ানা
Shareholder—অংশীদার
Shipment—জাহাজে মাল চালান
Shipping bill—নৌ-পরিবহণ চালান
— order—নৌ-পরিবহণ আদেশ
Short delivery—ঘাটতি সরবরাহ
Short payment—ঊন-প্রদান
— realisation—ঊন-আদায়
— title—সংক্ষিপ্ত নাম
Sight bill—দর্শনী হুণ্ডী
— rate—দর্শনী হুণ্ডীর দর
Single entry—একহারা দাখিলা
— Standard—একধাতুমান
Site value—স্থানমূল্য
Skill—কুশলতা, নিপুণতা
Slab system—পর্বীয় পদ্ধতি বা প্রথা
Slave labour—দাসশ্রম
Sliding scale—সহচারী মান
Slump—অতিমন্দা
Smuggling—চোরাই কারবার
Social contract —সামাজিক চুক্তি
— evolution—সামাজিক বিকাশ
— insurance— " বীমা
— Science—সমাজ বিজ্ঞান
—, Service— " সেবা
—Sociology—সমাজ-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব
Soft currency—সহজলভ্য মুদ্রা
Solvency—সচ্ছলতা, ঋণশোধের ক্ষমতা
Specialised skill—বিশিষ্ট নিপুণতা
Speculation—ফাট্‌কা বা ঝুঁকিদারী অনুমান
Speculative business—ফাট্‌কা কারবার, ঝুঁকিদারী ব্যবসায়
—, demand—ফাট্‌কা চাহিদা
Speculator—ফাট্‌কাবাজ
Spurious demand—কৃত্রিম বা অমূলক চাহিদা
Stability—স্থিরতা
—, of value—মূল্যের স্থিরতা
—, of wants—আবশ্যক দ্রব্যের স্থিরতা
Stale cheque—বাতিল চেক
Stamp—প্রমুদ্রা
—, duty— " শুল্ক
Standard—মান
—, Coin—মানমুদ্রা
—, of comfort—ভোগের বা আরামের মাপকাঠি
—, of living—জীবনযাত্রার মান
—, Alternative—বিকল্প মান
—, Double—দ্বিমান
Standardisation—মান-নির্ধারণ
Standing Committee—স্থায়ী সমিতি
— order—স্থায়ী আদেশ

State—রাষ্ট্র
— owned—রাষ্ট্রায়ত্ত
Statement—বিবরণ, বর্ণনা, উক্তি
Stationary—স্থির
Statistics—পরিসংখ্যান. সংখ্যাতত্ত্ব, সংখ্যা বিজ্ঞান
Status Enquiries—পদমর্যাদা সম্পর্কে অনুসন্ধান
Statute—বিধিবদ্ধ আইন
Statutory—সংবিধিবদ্ধ
—, meeting—আইনানুগ সভা
Statutory tenant— „ রায়ত
Steady—স্থির
Sterling balance—উদ্বৃত্ত স্টার্লিং স্থিতি
Stock—পুঁজিপাটা, সংভার, স্টক
—, book—সংভার বহি
—, broker—স্টক দালাল
—, exchange—স্টক এক্সচেঞ্জ, শেয়ারবাজার
—, holder—স্টক অধিকারী
—, in hand—মজুত মাল
—, in trade—বিক্রীর মাল, ব্যাপারিক সংভার
—, list—স্টক বিবরণী
—, taking—মজুত মালের হিসাব নেওয়া
—, Dead—অচল মাল
—, Deffered—মুলতুবী স্টক
Store—ভাণ্ডার
—, house—গুদাম
Strong room—দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ
Subjudice—বিচারাধীন
—, head—অনুশীর্ষ
—, lease—দর পাট্টা
—, let—কোর্ফা বিলি
Subordinate—অধীন
Subsidiary—সহায়ক
—, industry— „ শিল্প
Subsidy—সরকারী সাহায্য, সহায়ক
Sub-tenant—কোর্ফা ভাড়াটিয়া প্রজা
Succession—উত্তরাধিকার
Suffrage—নির্বাচনাধিকার
Super tax—অতিরিক্ত বা উপরি কর
Supplementary—পরিপূরক, অনুপূরক
—, cost—পরিপূরক খরচ
—, earning— „ আয়
—, estimate—„ প্রাক্কলন
—, grant— „ অনুদান
Supply—সরবরাহ, যোগান
—, curve—সরবরাহ রেখা
—, department— „ বিভাগ
—, price— „ মূল্য
—, Contraction of—যোগানের সংকোচন
—, Decrease of—যোগানের হ্রাস
—, Expansion of— „ প্রসার
—, Inelastic—অস্থিতিস্থাপক যোগান
—, Intensity of—যোগানের প্রবলতা
—, Joint—যৌথ যোগান
Surcharge—উদ্বর্ত, অতিরিক্ত

Surety—জামিন, প্রতিভূ, জামানত

Surplus—উদ্বৃত্ত

Surplus labour—অতিরিক্ত শ্রম বা শ্রমিক

—, produce— „ উৎপাদন

—, value— „ মূল্য

Surrender—প্রত্যর্পণ

Surrender value— „ মূল্য

Sur-tax—উপরি কর

Survey—পরিমাপ, জরিপ

System—পদ্ধতি, প্রথা

—, Sweating—শোষণ পদ্ধতি

Symbol—প্রতীক

Symmetry—প্রতিসাম্য

Syndicate—সংঘ

Syndicalism—শ্রমিক সংঘবাদ

T

Tabulation—সংখ্যা শ্রেণীকরণ

Tabular Standard—সংখ্যা শ্রেণী-মান

Tag—নথ

Tally—মিল

Tare—কড়তা

Tariff—শুল্ক বা শুল্ক তালিকা

—, reform—শুল্কনীতির সংস্কার

—, wall—শুল্ক প্রাচীর

Taskerage—কার্য পরিমাণানুসারে মজুরি

Tax—কর

—, process—কর প্রণালী

—, revenue—কর রাজস্ব

—, system—কর পদ্ধতি

—, Direct—প্রত্যক্ষ কর

—, Fixed—স্থায়ী কর

Tax Impact of—কর সংঘাত

—, Income—আয়কর

—, Indirect—পরোক্ষ কর

Tax Progressive—আয়ানুপাতিক ক্রমবর্ধমান কর

—, Profession—বৃত্তিকর

Taxable—করযোগ্য

—, capacity—করভার বহনশক্তি

Taxtion, cannon of—কর নির্ধারণের সূত্রাবলী

—, commodity—পণ্যকরা থান

Technical words—পারিভাষিক পদ

—, education—কারিগরী শিক্ষা

Technician—কারিগর

Technique—প্রয়োগকৌশল

Technology—প্রযুক্তি বিদ্যা

Tenancy—প্রজাস্বত্ব

—, act—প্রজাস্বত্ব আইন

Tenant—রায়ত, প্রজা, ভাড়াটিয়া

—, at will—ওঠবন্দী প্রজা

—, for life—আজীবন প্রজা

—for right—অধিকার যুক্ত প্রজা

—, occupancy—স্বত্বাধিকারী প্রজা

Tenure—পদাবধি

—, of land—ভূমিস্বত্ব

—, of property—সম্পত্তির ভোগস্বত্ব

Terminal loan—মেয়াদী ঋণ

—, tax—সীমাকর

Territorial division of labour—স্থানানুসারে শ্রমবিভাগ

Theory—তত্ত্ব
Theoretical—তত্ত্বীয়
Tight (market)—চাপা (বাজার)
Time bill—মুদ্দতী হুণ্ডী
Title deed—অধিকার পত্র
Toll—তোলা, উপশুল্ক, পথকর
Tools—যন্ত্রপাতি
Total cost—মোট পড়তা
—, Product—মোট উৎপাদন
—, utility—মোট উপযোগিতা
Trade—ব্যবসায়, বাণিজ্য
—, allowance—ব্যবসায়ের দস্তরী
—, balance—বাণিজ্যউদ্বৃত্ত
—, bill—ব্যবসায়ী হুণ্ডী
—, commissioner—বাণিজ্য প্রতিনিধি
depression—ব্যবসায় মন্দা
—, directories—ব্যবসায় পঞ্জী
—, dispute—বাণিজ্যিক বিবাদ
—, mark—ব্যবসায় চিহ্ন, পণ্যচিহ্ন
—, references—বাণিজ্য সুপারিশ
—, wind—বাণিজ্য বায়ু
—, Carrying—বহন বাণিজ্য
—, Coastal—উপকূল বাণিজ্য
—, Export—রপ্তানি বাণিজ্য
—, Foreign—বৈদেশিক বাণিজ্য
—, Free—অবাধ বাণিজ্য
—, Import—আমদানি বাণিজ্য
—, Inland—অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য
—, Overland—স্থলপথ বাণিজ্য
—, Protection—সংরক্ষণ বাণিজ্য
—, Retail—খুচরা কারবার
Trade Sea-borne—পোতবাহী বাণিজ্য
Sea Transit—বৈদেশিক দ্রব্যবহণ বাণিজ্য
—, Wholesale—পাইকারী ব্যবসা
Transaction—কারবার, লেনদেন
Transferrable—হস্তান্তর যোগ্য, বিনিময় যোগ্য
Transferred subject—হস্তান্তরিত বিষয়
Transit—মালচালান
—, stoppage in—রাস্তায় আটক
Transitional period—পরিবর্তনকাল
Transport—পরিবহণ
—, system— „ ব্যবস্থা
Treasury—খাজাঞ্চিখানা
—, warrant—রাজকোষ আদেশপত্র
Trial balance—রেওয়া মিল
Tribute—নজরানা
Tropical—ক্রান্তীয়
Trust—ব্যবসায় সংহতি, ন্যাস
Trustee—অছি

U

Unanimous—সর্বসম্মত
Ultimatum—চরম পত্র
Ulta vires—অবৈধ
Unclaimed—অকৃতদাবী
Under developed—অপূর্ণোন্নত
Under-sale—অববিক্রয়
—, supply—কম-যোগান

Under tenant—কোর্ফা প্রজা
—, writing—অবলেখন, দায় গ্রহণ
Unearned income—অনুপার্জিত আয়
—, increment— „ বৃদ্ধি
Unemployment—বেকারী
Unfavourable exchange—প্রতিকূল বিনিময়
Uniformity—সমতা
Unit—একক
Universal—সর্বজনীন
Unstable—অস্থির
Unproductive consumption—অনুৎপাদী ভোগ
University Grants Commisssion—বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি সংস্থা
Up—তেজী
Usance—দস্তুরী
—, bill—মুদ্দতি হুণ্ডী
Usufructuary—খাই-খালাসী
Usury—কুসীদবৃত্তি
Utility—উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা
—, Curve—উপযোগিতা
—, Final—অন্তিম উপযোগিতা
—, Marginal—প্রান্তিক „
—, Time—সময়োপযোগিতা
—, Total—মোট উপযোগিতা
Utopia—কাল্পনিক সুখচিত্র

V

Vacancy—শূন্যপদ, খালি
Validity—বৈধতা, প্রামাণিকতা
Valid—আইনসঙ্গত, বৈধ
Value—মূল্য, মান
—, in use—ব্যবহার মূল্য, উপযোগিতা
—, Intrinsic—নিহিত মূল্য
—, Normal—স্বভাবী মূল্য
—, Nominal—নামীয় মূল্য
—, Surrender—প্রত্যর্পণ মূল্য
—, Relative—আপেক্ষিক মূল্য
Valuation—মূল্য নির্ধারণ
Valued policy—মূল্য ঘোষিত বীমাপত্র
Variation—তারতম্য
Vendibility—বিক্রয় ক্ষমতা
Vendor—বিক্রেতা
Velocity—গতি বেগ
—, of circulation—প্রচলন-গতি
Venture—ঝুঁকি, ব্যবসায় প্রচেষ্টা
Veto—নাকচ
Via—ভায়া
Visa—প্রবাসাজ্ঞা
Void—বাতিল
Volume—আয়তন
Voucher—রসিদ
Verification—মিলান
Versus—বনাম
Vox populi—জনমত

W

Wages—বেতন, মজুরি
Wages, Nominal—নামীয় মজুরি

Wages Normal—স্বভাবী মজুরি
— , Piece—ফুরান মজুরি
— , Real—বাস্তব মজুরি
— , Time—সময়ানুসারে মজুরি
Waiver—স্বত্বত্যাগ
Want—অভাব
War loan—যুদ্ধ ঋণ
Ware house—গুদাম, পণ্যাগার
— , Bonded—শুল্কাধীন পণ্যাগার
Warrant—পরওয়ানা
Warranty—নির্ভর পত্র
Wastage—বরবাদ, অপচয়
Waste book—কাঁচা ও খসড়া বহি
— , product—বাতিল পদার্থ
Wealth—ধনসম্পদ
Wealth Tax—সম্পদ কর
Wear aud tear—ব্যবহারজনিত ক্ষয়
Weight book—ওজন বহি
— , man—কয়াল
Wholesale—পাইকারী
Whole-life policy—আজীবন বীমাপত্র
Wholetime—পূর্ণকাল
Wide—ব্যাপক
Winding up—গুটানো
Window dressing—প্রচারচাতুর্য, বিজ্ঞাপন কৌশল
Withdrawal—তোলা
Will—ইষ্টিপত্র, অসিয়ৎনামা
Work day—কাজের দিন
Work in hand—করণীয়
Working capital—সক্রিয় মূলধন
Worker—মজুর, শ্রমিক
Writing off—খরচের খাতে লেখা

Xylography—কাঠখোদাই বিদ্যা

Year—বৎসর, সন, সাল, বর্ষ
— ; book—বর্ষপঞ্জী
— , ending—আখেরি, সালতামামি
Yearly—বার্ষিক
— , Half—অর্ধ-বার্ষিক
Yearly Half (closing)—অর্ধ-সালিয়ানা
Yeoman—কৃষক
Yeomanry—কৃষক সম্প্রদায়
Yield—উৎপাদন

Zonal—আঞ্চলিক
Zone—অঞ্চল
— , Temperate—নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল
— , Tropical—উষ্ণ অঞ্চল

সরকারীকার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা

Accountant—হিসাবরক্ষক, গাণনিক
Additional—অপর
Administrative officer—পালনাধিকারিক
Advocate General—মহাব্যবহারিক
Assistant—সহায়ক
—, Lower Division—অবরবর্গীয় সহায়ক
—, Upper Division—উত্তরবর্গীয় সহায়ক
—, Chemist—সহ-রাসায়নিক
—, Director—সহ-অধিকর্তা
Assistant Headmaster—সহ-প্রধান শিক্ষক
—, Headmistress—সহ-প্রধান শিক্ষিকা
—, in-charge—আযুক্ত সহায়ক
—, Personal—স্বকীয় সহায়ক
—, Registrar—সহ-করণাধ্যক্ষ
—, Secretary—সহ-কর্মসচিব

B

Bacteriologist—জীবাণুবিদ্

Casuality officers—আত্যয়িক
Chemist, Industrial—শিল্প রসায়নী
Chief—মুখ্য
Chief Accountant—মুখ্য গাণনিক
Chief Administrative officer—মুখ্য পালনাধিকারিক
—, Engineer—মুখ্য বাস্তুকার
—, Executive officer—মুখ্য নির্বাহক
—, Interpreter—মুখ্য ভাষান্তরিক
—, Judge—মুখ্য বিচারক
—, Presidency Magistrate—মুখ্য পুরশাসক
—, Whip—মুখ্য প্রতোদক
Civil Supplies—জন সংভরণ
Civil Surgeon—পৌর চিকিৎসক
Clerk, Confidential—আপ্ত করণিক
—, Personal—স্বকীয় করণিক
—, Correspondence—পত্র করণিক
Collector—সমাহর্তা
—, of Customs—আগম শুল্ক সমাহর্তা
—, Land Acquisition—ভূমিগ্রহ সমাহর্তা
Commission, Public service—রাষ্ট্রনিয়োগাধিকারিক
Commissioner—মহাধ্যক্ষ
—, of excise—অন্তঃশুল্ক মহাধ্যক্ষ
—, for the port of Calcutta—কলিকাতা বন্দরপাল
—, of police—পুলিস কমিশনার, নগরপাল
—, of a Division—ভুক্তিপতি
Commission Labour—শ্রম মহাধ্যক্ষ
Computor—পরিগণক

Constable—আরক্ষিক
Controller—নিয়ামক
—, of Coal—কয়লা নিয়ামক
—; Examination—পরীক্ষা নিয়ামক
—, Rationing—দ্রব্য নিয়ামক
—, Trade—বাণিজ্য নিয়ামক
—, Import trade—আগম-বাণিজ্য নিয়ামক
Coroner—আশুমৃত-পরীক্ষক

D

Demonstrator—প্রদর্শক, ব্যাখ্যাতা
Department—বিভাগ
Depot—আগার
—, assistant—আগার সহায়ক
Deputy—উপ
—, Magistrate & Collector—উপ-শাসক ও সমাহর্তা
—, Secretary—উপকর্মসচি
Deputy Secretary, Additional—অপর উপ-কর্মসচিব,
Director—অধিকর্তা
—, of Agriculture—কৃষি-অধিকর্তা
—, Deputy—উপকৃষি-অধিকর্তা
—, Fuels—এধ-অধিকর্তা
—, Posts & Telegraphs—প্রৈষ-তার অধিকর্তা
—, Deputy—উপ-প্রৈষ-তার অধিকর্তা
—, Rationing & Distribution—দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ-পরিবেশন অধিকর্তা
—, Storage & Inspection—মজুদ-পরিদর্শন অধিকর্তা
Director Textile—বয়ন অধিকর্তা
—, Physical—দেহচর্চা অধিকর্তা
Directorate—অধিকার

E

Engineer (mechanical)—যন্ত্রবিদ্ যান্ত্রিক
—, (civil, Irrigation)—বাস্তুকার
Engineer, Chief—মুখ্য বাস্তুকার
Engineer, Executive—নির্বাহ বাস্তুকার
Engineer, Chief Executive—মুখ্যনির্বাহী বাস্তুকার
Entomologist—কীটবিদ্
Establishment—সংস্থা

F

Fitter—সন্ধায়ক
Foreman—অধিকর্মিক
—, (of jury)—নির্ণায়ক মুখ্য
Forester—বনকর্মী

G

Gazetted—ঘোষিত
Governor—রাজ্যপাল, দেশপাল

H

Head—প্রধান
—, assistant—প্রধান সহায়ক
—, clerk—প্রধান করণিক
—, master—প্রধান শিক্ষক

Health offiicer—স্বাস্থ্যাধিকারিক
Home Department—স্বরাষ্ট্র বিভাগ
House surgeon—সন্নিযুক্ত শাস্ত্র-চিকিৎসক

I

Inspector—পরিদর্শক
—, of schools—বিদ্যালয় পরিদর্শক
—, General—মহাপরিদর্শক
Inspector, Deputy—উপ-মহাপরিদর্শক
—, of police—মহা-আরক্ষা পরিদর্শক

J

Jailor—কারাপাল
Judge, Small Cause Court—বিচারক, ছোট আদালত
Juror—নির্ণায়ক সভ্য
Jury—নির্ণায়ক সভা

Land Acquisition—ভূমিগ্রহ
Leader of the house—সদস্য-প্রধান
Lecturer—উপাধ্যায়
Librarian—গ্রন্থাগারিক

M

Magistrate—শাসক
—, Deputy—উপশাসক
—, Sub-deputy—অবর উপশাসক
—, District—জিলা শাসক
—, Police—আরক্ষা শাসক
—, Presidency—পুরশাসক
Mayor—মহানাগরিক
Minister—মন্ত্রী
—, Chief—মুখ্য মন্ত্রী
—, Deputy—উপমন্ত্রী
Minister, Prime—প্রধানমন্ত্রী
—, in charge—আযুক্ত মন্ত্রী
Ministry—মন্ত্রক
—, of Agriculture—কৃষি মন্ত্রক
—, Commerce—বাণিজ্য মন্ত্রক
—, Defence—দেশরক্ষা মন্ত্রক
—, Education—শিক্ষা মন্ত্রক
—, External affairs & Commonwealth relations—পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ মন্ত্রক
—, Finance—অর্থ মন্ত্রক
—, Health—স্বাস্থ্য মন্ত্রক
—, Home Affairs—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক
—, Industries & supplies—শিল্প ও সংভরণ মন্ত্রক
—, information & Broad-casting—প্রচার মন্ত্রক
—, Labour—শ্রম মন্ত্রক
—, Law—বিধি মন্ত্রক
—, Railways—রেলপথ মন্ত্রক
—, States—সামন্তরাজ্য মন্ত্রক
—, Transport—পরিবহণ মন্ত্রক

O

Officer—অধিকারিক

—, Administrative—পালনাধিকারিক

—, Executive—নির্বাহক

Officer, Income tax—আয়কর অধিকারিক

—, Land acquisition—ভূমিগ্রহ অধিকারিক

—, Liaision—সংযোগাধিকারিক

—, Labour—শ্রমাধিকারিক

—, Part-time—অল্পকাল অধিকারিক

—, Publicity—প্রচারাধিকারিক

—, Port—পত্তনাধিকারিক, বন্দরাধিকারিক

—, Rationing—নিয়ন্ত্রণ অধিকারিক

—, Special—প্রাধিকারিক

—, Transport—পরিবহণ-অধিকারিক

—, Whole-time—পূর্ণকাল অধিকারিক

—, Working—কার্যক্রম অধিকারিক

Officer-in-charge—আযুক্তক

Overseer—উপদর্শক

—, Public works—বাস্তুকর্ম উপদর্শক

Peon—পিয়ন, পেয়াদা

Postmaster—প্রৈষাধিকারিক

—, General—মহা-প্রৈষাধিকারিক

Postmaster, Presidency—প্রাদেশিক প্রৈষাধিকারিক

Presidency Postmaster general—প্রাদেশিক মহা-প্রৈষাধিকারিক

Principal—অধ্যক্ষ

—, Vice—উপাধ্যক্ষ

Professor—অধ্যাপক

Public prosecutor—অভিশংসক

Public relations officer—জনসম্পর্ক অধিকারিক

R

Record keeper—লেখ্য-রক্ষক

Rector—অধিশিক্ষক, অধিপুরুষ

Regional Controller of Civil Supplies—মাণ্ডলিক নিয়ামক, জন সংভরণ

Registrar—নিয়ামক, নিবন্ধক

—, of Insurance—লেখ্য নিবন্ধক

S

Salesman—বিক্রয়িক

Saleswoman—বিক্রয়িকা

Secretary—কর্মসচিব

—, Under—অবর কর্মসচিব

Service—কৃত্যক

—; Agricultural—কৃষিকৃত্যক

—, Civil (executive)—জনপালনকৃত্যক (নির্বাহী)

Service, Civil (judicial)—জনপানসকৃত্যক (ব্যবহারিক)

—, Educational—শিক্ষণকৃত্যক,

—, Engineering—বাস্তুকৃত্যক (Irrigation, Roads & Buildings)

—, Essential—অত্যাবশ্যক কৃত্যক

—, Excise—অন্তঃশুল্ক কৃত্যক

—, Fisheries—মীনপোষ কৃত্যক
—, Inferior—অধরিক কৃত্যক
—, Public—সরকারী কাজ রাষ্ট্রকৃত্যক
Speaker of the Assembly—পরিষদ্‌পাল
Superintendent—অধীক্ষক
Supervisor—অবেক্ষক

T

Traffic manager—পরিযান নির্বাহক
—, Police man—পরিযান আরক্ষী
Trade controller—ব্যাপার নিয়ামক
Typist—মুদ্রলেখক
—, Lady—মুদ্র-লেখিকা

U

Unaffiliated—অসবন্ধ
Under disposal—বিবেচ্য
Union—সংঘ
—, Trade—পূগ, কর্মিসংঘ

V

Verdict—নির্ণয়
Veto—প্রতিষেধ
Vice-Chancellor—উপাচার্য, অধিপাল
Visa—প্রবাসাজ্ঞা

W

Ward (in a Municipality)—পাটক
Ward headclerk—প্রধান কক্ষাকরণিক
Whole-time officer—পূর্ণ কাল আধিকারক

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী

ক. বি. (বি. কম্) প্রশ্নপত্র *

1943

1. Write an essay in Bengali on one of the following subjects :—

(a) Rural reconstruction in India—its aims and methods ; (b) The idea of self-sufficiency ; (c) Instruments for the formation and expression of public opinion.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions :—

(a) Working capital ; (b) Liquidator ; (c) Letter of hypothecation ; (d) Overdraft from banks ; (e) Account sales ; (f) Bullion ; (g) Demurrage ; (h) Preference shares ; (i) Drawback.

1944

1. Write an essay in Bengali on one of the following subjects :—

(a) The impact of war on India's trade and industries : (b) The rise of prices in India—its cause and remedies ; (c) The introduction of free and compulsory education in India.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions :—

(a) Jute Futures Market ; (b) 'Ceiling' and 'floor' prices ; (c) Authorised capital ; (d) Discounting of bills ; (e) Demurrage ; (f) Marine insurance ; (g) Bill of lading ; (h) Preference shares ; (i) Surrender value.

1945

1. Write an essay in Bengali on one of the following subjects :—

(a) State control or economic activities in India during the war ; (b) Types of land tenure in British India ; (c) Economic rehabilitation of Bengal.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions :—

(a) Excess profits tax ; (b) Letter of credit ; (c) Profiteer ;

---

* অনুবাদগুলি 'অনুবাদ'-অংশে পাওয়া যাইবে। এখানে প্রবন্ধ, চিঠি ও পরিভাষা অংশের প্রশ্নগুলি দেওয়া হইল।

(d) Handicraft ; (e) Inflation ; (f) Overhead costs ; (g) Consignment ; (h) Liquidator ; (i) Auctioneer.

1946

1. Write an essay in Bengali on any one of the following Subjects :—

(a) The recent food shortage—its causes and remedies ; (b) Industrial labour in India ; (c) The Indian Banking system ; (d) Economic planning for Bengal.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions :—

(a) Paid-up capital ; (b) Death duty ; (c) Endorsment ; (d) Fixed daposit ; (e) Negotiable instrument ; (f) Freight ; (g) Fire insurance ; (h) Days of grace ; (i) Bank charges.

1947

1. Write an essay in Bengali on any one of the following subjects :—

(a) Currency inflation in India and its consequenees ; (b) Pressure of population in India ; (c) The provision of finance for Indian industries.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions :—

(a) Ad valorem duties ; (b) Bonded warehouse ; (c) Demurrage ; (d) Piece wages ; (e) Whole life insurance policy ; (f) Certi ficate of origin (g) Mortgage debenture ; (h) Prospectus ; (i) Consideration ; (j) Debit note.

1948

1. Write an essay in Bengali on one of the following subjects :

(a) Thhe problem of rehabilitation of refugees ; (b) The influence of social institutions on the ecoeomic life of the people ; (c) Post war planning of Indian Industries ; (d) Food production in India.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following expressions :—

(a) Trade union movement ; (b) Foreign exchange ; (c) Civil aviation ; (d) Rural reconstruction ; (e) Textile protection bill ; (f) Gold Standard Reserve ; (g) Inflation and deflation ; (h) General price level ; (i) Home charges ; (j) Balance of trade.

1949

1. Write an essay in Bengali on any one of the following :—

(a) Sales tax and its effect on the consumers ; (b) God made man and man made the town ; (c) Black marketing and the measures required to combat it ; (d) Scientific inventions and their effect upon trade and commerce.

2. Give the Bengali equivalents of any five of the following :—

(a) Annuity Fund ; (b) Exchange rates ; (c) Hire purchase ; (d) Tariff Reform ; (e) Excise duty ; (f) Transport system of a country ; (g) Nationalisation of industry ; (h) Industrial tribunal ; (i) Stock valuation ; (j) Bill of lading.

1950

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা কি উপায়ে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে ?

(খ) বাস্তুহারাদের ভবিষ্যৎ ;

(গ) দেশে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য কি উপায়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে ?

2. নিম্নে প্রদত্ত ইংরেজী শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Broadcast, Embargo, Life annuity, Successive average, Protection, Investment, Full employment, Subsidy, Fiscal policy, Allocation.

1951

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) পাকিস্তান ও ভারতের নূতন বাণিজ্য চুক্তি ;

(খ) জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা ;

(গ) মধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর পণ্যমূল্যবৃদ্ধির প্রভাব।

2. নিম্ন প্রদত্ত ইংরেজী শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Credit, Money-market. Speculation, Price-level, Barter, Import-quota, Self-sufficiency, Purchasing power, Balance of payments, Index-number.

1952

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) ভারতে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ;

(খ) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সরকারী নিয়ন্ত্রণ ;

(গ) বর্তমান পণ্যমূল্যহ্রাসের কারণ ও ভারতের আর্থিক অবস্থার উপর ইহার প্রতিক্রিয়া।

2. নিম্নে প্রদত্ত ইংরেজী শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Moratorium, Sinking fund, Face value, Corporate management, Labour Union, Inheritance taxes, Drawings account; Overdraft; Restrictive endorsement; Unsecured loans.

1953

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) ঘাটতি ব্যয়ের (Deficit financing) সুবিধা ও বিপদ;

(খ) পণ্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা;

(গ) জাতীয় উন্নয়নে সমবায়ের স্থান।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Resources; Target; Development; Agricultural economy; Land policy; Community development; Rehabilitation; Productivity; Capital formation; Current consumption.

1954

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) জাতীয় অর্থনীতিতে বৈদেশিক মূলধন নিয়োগের প্রভাব;

(খ) ভারতের বেকার সমস্যা;

(গ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কিরূপ হওয়া উচিত।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির যে কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Labour welfare, Industrial housing, Employees' Provident Fund, Community Development, Workmen's Compensation, Broker, Death duty, Paid-up Capital.

1955

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) পশ্চিমবঙ্গে জনশিক্ষা;

(খ) বাঙালী কৃষিজীবীর সমস্যা;

(গ) বাঙালীর অর্থ নৈতিক জীবন ও বাঙালীর উৎসব।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Audit, Betterment fee, Cheap money, Commodity taxation, Federal Finance, Financial control, Multi-purpose River Schemes, Nationalisation.

3. তোমার কোন বিদেশী বন্ধুকে ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একখানি চিঠি লিখ।

1956

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) ভারতে মৌলিক শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ;

(খ) পণ্যদ্রব্য-ব্যবহারকারীদের স্বার্থরক্ষা ;

(গ) পল্লী-অঞ্চলের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Budgetary surplus, Capital expenditure, Cheap money policy, Contingency fund, Corporation tax, Deficit financing, Entertainment tax, Economic Rehabilitation.

3. কারখানা শিল্পের কার্যক্ষেত্রের সঙ্কোচ সাধন করিয়া ক্ষুদ্র ও কুটীর-শিল্পের প্রসার বিষয়ে তোমার মতামত কি সংক্ষেপে লিখ।

1957

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) ভারতে পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি : তাহার কারণ ও প্রতিকার ;

(খ) নগর ও পল্লীর ব্যবধান অপসারণ ;

(গ) পাট ও পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির যে-কোন পাঁচটির বাংলা কর :—

Ad valorem duty, Bill at sight, Soft currency, Fiduciary issue, Negotiable instrument, Reciprocal demand, Subsidiary coin, Under writing.

3. ব্রিটেনের একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ীর সঙ্গে কারবারের উদ্দেশ্যে তোমার অভিপ্রেত ও সামর্থ্য জানাইয়া একটি পত্র রচনা কর।

1958

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) বিদেশে সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণের উপযোগিতা ;

(খ) মানুষ বনাম কল ;

(গ) পল্লী-অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়ন ;

(ঘ) ব্যবসায় ক্ষেত্রে শিল্পকলার স্থান।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটির বাংলা প্রতিশব্দ দাও :

Contingency fund, Deficit financing, Excise duty, Octroi, Industrial tribunal, Gold standard, Hire purchase, Bill of lading, Bank rate, Dollar reserve.

3. রেলে তোমার যে মাল চালান আসিতেছে তাহা ঠিকমত আসে নাই বলিয়া ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া রেলকর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে দরখাস্ত রচনা কর।

1959

1. নিম্নে উল্লিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) ইউ-এন্-ও ;

(খ) গ্রামদান আন্দোলন ;

(গ) বিজ্ঞানের উন্নতি ও মানবজাতির ভবিষ্যৎ ;

(ঘ) শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালী।

2. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটির বাংলা প্রতিশব্দ দাও :—

Annuity fund, Bill of exchange, Ad valorem duty, Overdraft, Purchase tax, Tariff reform, Exchange rate, Soft currency, Wealth tax, Preferential duty.

3. কাস্টমস্ হইতে মাল খালাস করিবার জন্য তোমার ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ চাহিয়া একটি পত্র রচনা কর।

1960

1. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে কোন পাঁচটির বাংলা প্রতিশব্দ দাও :—

Bank draft, Capital expenditure, Convertible money, Bill of lading, Deficit financing, Devaluation, Octroi, Imprest cash, Preferential share, Deferred payment.

2. তোমার চালানী মালের ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখ।

3. নিম্নলিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) ভারতবর্ষে কৃষিসমস্যা ;

(খ) ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা ;

(গ) নৈতিক বোধ বনাম ব্যবসায়-বুদ্ধি ;

(ঘ) টেলিভিশন।

1961

1. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটির বাংলা প্রতিশব্দ দাও :—

Ceiling price, Consignment, Debit note, Demurrage, Indemnity,

Marine insurance, Post-dated cheque, Trade discount, Underwriting, Unsecured loans.

2. তোমার পরিচালিত কুটীরশিল্পের প্রসার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে যুক্তি দেখাইয়া অতিরিক্ত মূলধনের জন্য ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে পত্র লিখ।

3. নিম্নলিখিত যে-কোন **একটি** বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ;

(খ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ও তাহার প্রতিকার ;

(গ) ভারতের জনবৃদ্ধি-সমস্যা ;

(ঘ) পাটচাষ ও পাটব্যবসায়।

1962

1. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটির বাংলা প্রতিশব্দ দাও :—

Auditor, Excise Duty, Managing Agent, Demurrage, Liquidator, Monopoly, Public debt, *Pro rata*, Preference share, Quorum.

2. তোমার বিদেশী মাল আমদানির ব্যবসায় আছে। কিছু মাল পথে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত খেসারত চাহিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লিখ।

অথবা

তুমি বাঙলা দেশে একটি নূতন চিনির কল স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া সরকারী সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছ। এই কল লাভজনকভাবে চালাইবার পক্ষে তোমার কি কি সুবিধা তাহা বিবৃত করিয়া সরকারের নিকট একটি আবেদন পত্র পাঠাও।

3. নিম্নলিখিত যে-কোন একটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা কর :—

(ক) স্থলপথে ও জলপথে পরিবহণ সমস্যা ;

(খ) সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলার আবশ্যকতা ;

(গ) ভারতে কুটীরশিল্পের উপযোগিতা ;

(ঘ) বর্তমান সময়ে মধ্যবিত্ত সংসারে কৃচ্ছ্রতা।

ক. বি. (ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী)

1962

1. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে-কোন পাঁচটির বাংলা প্রতিশব্দ দাও :—

Blue print, Establishment clerk, Trade discount, Negotiable instrument Act, Insurance policy, Overtime work, Indemnity, Ceiling price, Revenue Account, Managing Agent.

2. কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্কে ধার চাহিয়াছেন ও তাঁহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় জানিবার জন্য তোমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক এ বিষয়ে তোমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। তুমি এ বিষয়ে যথোপযুক্ত উত্তর লিখ।

অথবা

তুমি যে মালের অর্ডার দিয়াছিলে তাহা সরবরাহ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মান ঠিক নাই এবং দরও বাজার অপেক্ষা উচ্চ। তুমি বাজারদরে যথামানের মাল ঐ ব্যবসায়ী ফার্মের নিকট হইতে এই মালের পরিবর্তে লইতে ইচ্ছুক। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পত্রালাপ কর।

3. নিম্নোক্ত যে-কোন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) অনগ্রসর দেশে শিল্পপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা ;

(খ) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ;

(গ) বৃটেনের ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান বনাম ভারতীয় অর্থনীতি ;

(ঘ) বাঙলার অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ।

New Course

1963

1. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে কোনো পাঁচটির পরিভাষা লিখ :

Ad valorem Duty ; At par ; Negotiable Instrument Act ; Indemnity ; University Grants Commission ; National Defence Fund ; Industrial Housing ; Demurrage ; Post-dated Cheque , Wealth Tax.

2. তোমার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণকল্পে ব্যাঙ্ক হইতে টাকার দাদন চাহিয়া ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লিখ।

অথবা

কোনো ভোগ্যপণ্যের সরবরাহকারকের নিকট উক্ত পণ্যদ্রব্যের এজেন্সী চাহিয়া তোমার নিজ কারবারের বিস্তৃত পরিচয়সহ একটি পত্র লিখ।

3. নিম্নলিখিত যে কোনো একটি বিষয় লইয়া একটি বাণিজ্যিক প্রবন্ধ রচনা কর :

(ক) দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতি

(খ) ভারতীয়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে নূতন স্বর্ণনিয়ন্ত্রণনীতির প্রতিক্রিয়া

(গ) গ্রামীন বাংলার উন্নতি কোন পথে? কৃষি না শিল্পে?

(ঘ) মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবকের বাণিজ্য শিক্ষার সার্থকতা

Modified Course
1963

1. যে-কোনও **পাঁচটি** পারিভাষিক বাংলা লিখ:

Equitable distribution; Long-term Contract; Non-aligned Country; Diplomatic move; Bill of exchange; Authorised Capital; Deed of gift; Indentification.

2. (ক) ক্রেতা প্রেরিত মালের সহিত চালান এবং বিল পাইয়াও এক মাসের মধ্যে টাকা শোধ করেন নাই। একমাসের মধ্যে টাকা শোধ করিলেই ১২½% কমিশন দিবার ব্যবস্থা আছে, সেকথা স্মরণ করাইয়া আর ১৫ দিন সেই সুযোগের মেয়াদ বর্ধিত করিয়া একখানি তাগিদ-পত্র রচনা কর।

অথবা

(খ) কোনও প্রকাশক ও পুস্তক ব্যবসায়ীর পক্ষ হইতে বড় একটি লাইব্রেরিতে সুবিধাজনক সর্তে ভালো ভালো বই জোগান দিবার প্রস্তাব করিয়া একখানি পত্র লিখ।

3. নিম্নোক্ত কোনও বিষয়ে **একটি** প্রবন্ধ লিখ:

(ক) ভারতের আমদানি ও রপ্তানি নীতি।

(খ) যুক্তরাষ্ট্র সংস্থা (U. N.)।

(গ) ভারতীয় অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যয় সংকুলান।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যের পরিবহণ-ব্যবস্থা।

Modified Course
1964

1. যে কোনও পাঁচটির পারিভাষিক বাংলা লিখ:—

Subscribed capital, Index number, Ceiling price, Trade depression, Advalorem duty, Soft currency, Negotiable Instrument, Bill of Exchange, Compound interest.

2. কোন বিদেশী কোম্পানিকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের বস্ত্রশিল্পের জন্য বিদ্যুৎ-চালিত বয়নযন্ত্র সরবরাহের নির্দেশ দিয়া একখানি পত্র লিখ।

কোনও ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ শাখার ম্যানেজার পদের জন্য দরখাস্ত কর

3. নিম্নোক্ত কোন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখ :

(ক) পল্লী অঞ্চলের সমস্যাগুলির সমাধান।

(খ) সাম্প্রতিক পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলাফল।

(গ) ভারতের শিল্প শ্রমিক।

(ঘ) আমাদের দেশের বেকার সমস্যা।

New Course

1964

1. নিম্নলিখিত ইংরেজী শব্দগুলির মধ্যে যে কোন **পাঁচটির** বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ লিখ :—

Stock in trade; Quinquennial; Sale Certificate; Status enquiries; Subsidy; Circular Letters; Liquid Asset; Giltedged Security; Pro-forma Account; Bill of entry.

2. আসাম হইতে ২০০ কিলোগ্রাম ওজনের দুই বাক্স চা রেলযোগে বর্ধমান স্টেশনে পাঠান হইয়াছিল। উহা হারাইয়া যাওয়ায় প্রাপকের পক্ষ হইতে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া রেলকর্তৃপক্ষের কাছে একখানি দরখাস্ত কর।

অথবা

ব্যাঙ্ক-ব্যবসায় জাতীয়করণের পক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একখানি নাতিদীর্ঘ পত্র রচনা কর।

3. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে-কোন **একটি** অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখ :—

(ক) পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

(খ) ভারতীয় শিল্প-সম্প্রসারণে বৈদেশিক মূলধন।

(গ) মধ্যবিত্ত পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ।

(ঘ) আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাণিজ্যের দান।